শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

From women's eyes this doctrine I derive :
They sparkle still the right Promethean fire ;
They are the books, the arts, the Academes,
That show, contain, and nourish all the world.

—*Love's Labour's Lost*

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার
প্রণীত

বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়
গ্রাম-কুলগাছিয়া ; পোঃ-মহিষরেখা ;
জেলা-হাওড়া
১৩৫৭

প্রকাশক : শ্রীজ্ঞানসুন্দর মাইতি এম. এ., বি. এল.
গ্রাম-কুলগাছিয়া ; পোঃ-মহিষরেখা ;
জেলা-হাওড়া ; বি. এন. আর.

প্রথম সংস্করণ—জন্মাষ্টমী, ১৩৫৭
মূল্য আট টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা—৬

উপহার

নারী-দেবতার পূজার অর্ঘ্যরাজি
তব আহুতির বেদীমূলে রাখিলাম ;
হেরিতে না চাও পূজারীর বেশে আজি—
কবিতার তাই দিনু ওই শিরোনাম।

জানি, কেন তুমি কৌতুকে আঁখি ভরি'
নেহারিবে এই অযাচিত উপহার,
তবু পরশিও—ক্ষণতরে সম্বরি'
সেবারত-কর-কঙ্কণ-ঝঙ্কার।

অঙ্গুলিমুখে বারেক পরশি' তায়
রঞ্জিত কর' সীমন্ত-সিন্দূরে,
জীবনের শেষ-শ্রাবণের সন্ধ্যায়
উজলিয়া তোল' মেঘ-ম্লান ইন্দুরে।

শ্রাবণ-পূর্ণিমা, ১৩৫৭

পূর্ব্বভাষ

'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইতেছিল; পরে উক্ত পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হওয়ায় রচনাটি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, তাই অবসরমত বাকি অংশ শেষ করিয়া আমি একেবারে পুস্তকাকারে ইহা প্রকাশিত করিলাম। তাহাতে একপক্ষে ভালই হইয়াছে—আরও ধীরে, এবং আরও সুচিন্তিতভাবে আমি এই রচনাটি সম্পন্ন করিতে পারিয়াছি। যাঁহারা 'বঙ্গদর্শনে' ইহার প্রথম অংশ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, আমি ক্রমে আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়াছি, এবং আলোচনার ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃত করিয়াছি। ইহার কারণ,—আমার আদি উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়াই, আমি শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-উপন্যাস অবলম্বনে এমন একটি চিন্তা ও ভাবের জগৎ বাংলার পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছি, যাহা আজিকার শিক্ষিত সমাজেও অপরিচিত; সাহিত্যের রস-বিচার উপলক্ষ্যে আমি জীবন-দর্শনের কয়েকটি মূলতত্ত্ব—বিশেষ করিয়া বহুকালাগত সাধনায় যাহা বাঙালীর স্বভাব-সংস্কারে পরিণত হইয়াছিল—তাহাই নানা দিক দিয়া, দেশী ও বিদেশী কাব্যের ও ভাবচিন্তার সাক্ষ্য সহকারে, সাহিত্যিক প্রণালীতে হৃদয়গ্রাহী করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য, ইংরাজীতে যাহাকে thought-provoking বলে তাহা তো বটেই—সাহিত্যের রস-আস্বাদনে হৃদয়-মনের যত গভীরতর জিজ্ঞাসা আমাদিগকে উৎকণ্ঠিত করে, পাঠক-চিত্তে সেই অস্পষ্ট অনুভূতিকে স্ফুটতর করিয়া তোলা। জানি না, ইহাতে আমি কতটুকু সফল হইয়াছি, অথবা, খাঁটি সাহিত্যিক আলোচনায় এইরূপ ভাবুকতার অনধিকার-প্রবেশ একালের রসজ্ঞ ও রসপিপাসু পাঠকের কতখানি মনঃপূত হইবে।

তথাপি আমি সাহিত্য-রসের আলোচনা-প্রসঙ্গে এই যে অবান্তর এবং অশাস্ত্রীয় আলাপ কিছু অধিক পরিমাণেই করিয়াছি তাহার প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয়; 'শ্রীকান্তে'র ঐ অতিসরল, কবিত্বপূর্ণ কাহিনী হইতেই আমি যে সকল তত্ত্বের উদ্ভাবনা করিয়াছি, তাহাতে—জীবনের সহিত সাহিত্যের যে ঘনিষ্ঠ যোগ, এবং সেই কারণেই সাহিত্যের ভিতর দিয়াই নর-নারী-জীবনের যে অন্তরঙ্গ পরিচয়,

তথা বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধঘটিত যে গভীরতর জ্ঞান লাভ করা যায় —এক কথায়, এইরূপ আলোচনাই যে একটা বড় কালচারের আধার হইতে পারে —ইহাই প্রমাণিত হয়। আমি তাহা করিতে পারিয়াছি কিনা, এই গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য দিবে; না পারিয়া থাকিলেও আশা করি, তাহার একটু ইঙ্গিত ইহাতে আছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-উপন্যাস-পাঠে বাংলার তরুণ-তরুণীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আমি এই গ্রন্থে আমার নিজের অর্জ্জিত যেটুকু মূলধন ছিল তাহা অকাতরে খরচ করিয়াছি,—আমার মনে হয়, ঠিক এই ধরণের গ্রন্থ অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে অতিশয় নূতন। এইরূপ পুস্তকের দ্বারা আরও যে প্রয়োজন-সাধন হইবে মনে করি তাহা এই যে, বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার যে অবস্থা, এবং শিক্ষিত হওয়া অপেক্ষা সাহিত্যিক হওয়াই যেরূপ অত্যাবশ্যক হইয়াছে, তাহাতে—আমার গ্রন্থের বিষয়টার ঐ সাহিত্যিক আকর্ষণে যাঁহারা ইহা ধৈর্য্য ধরিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য, পাঠপদ্ধতি ও অধ্যাপনার দৌলতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন—তাহার অধিক বলিব না—তাহা হইতে ভিন্ন আর এক প্রকার শিক্ষা বা শিক্ষার সংকেত পাইবেন। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এই গ্রন্থে যে তত্ত্বকথা ও যে চিন্তাধারা আছে তাহা বিলাতী নয়, দেশী,—বিশেষ করিয়া বাঙালীর; এজন্য ইহার একটি বিশেষ মূল্য আছে।

আমার এই পুস্তক সম্বন্ধে নিজেরই এই দাবী—অহমিকা বা আত্মশ্লাঘা বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু আমার ঐ কথাগুলি গর্ব্বের বা দর্পের নহে,—দুঃখের। আমার গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে পণ্ডিত ও সাংবাদিকমহলে একটা 'Conspiracy of Silence' আছে—কেন আছে তাহাও জানি। সেজন্য, আমার গ্রন্থের—সমালোচনা না হউক—অভিপ্রায় আমাকে নিজেই একটু স্পষ্ট করিয়া জানাইতে হয়, নহিলে বড় বড় সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের বৈঠকে যে-সব গভীর মন্তব্য প্রকাশ হওয়া সম্ভব, তাহা আপ্তবাক্যের মতই প্রচারিত হইয়া যায়। আমার একখানি কাব্য সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ স্যার-পণ্ডিত যে আপ্তবাক্য উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা অপাঠ্য হইয়া গিয়াছে; উঁহাদের 'জগত্তারিণী' অথবা, 'পতিতোদ্ধারিণী'—কোন মেডালই আমার কোন কাব্য লাভ করিতে পারে নাই—যাঁহাদের সেই সৌভাগ্য হইয়াছে, সেই সব কবি ও সাহিত্যিকের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার কোন কালেই নাই; কিন্তু তাই বলিয়া আমার কোন গ্রন্থকে টানিয়া আনিয়া ঐরূপ দুর্নাম দেওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি উঁহাদের হয় কেন? এমন অহেতুক প্রীতি যে-সমাজের 'গণ্য-মান্য-বরু-

বদান্ত’-গণের থাকিতে পারে, সেই সমাজে গ্রন্থ প্রচার করিতে হইলে, প্রাণের দায়ে —আত্মপ্রচারের জন্য নয়—নিজেই নিজের গ্রন্থ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার তাহা খুব স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়াই ভালো। অতএব অবস্থা বুঝিয়া সহৃদয় পাঠক-সমাজ আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

“শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র” সম্বন্ধে কোন পৃথক ভূমিকা লিখিবার প্রয়োজন নাই—ইহার সম্বন্ধে লেখকের পক্ষ হইতে যাহা কিছু বলিবার, তাহা গ্রন্থমধ্যে সবিস্তারে বলিয়াছি। তথাপি একটা কথা পুনরায় স্মরণ করাইতে চাই, তাহা এই যে, “শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র” বলিতে আমি যে শরৎচন্দ্রের পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা আমাদের পরিচিত মানুষ-শরৎচন্দ্র নহেন—শ্রীকান্ত-উপন্যাসও শরৎচন্দ্রের সেইরূপ আত্মজীবন-চরিত নয়। ঐ উপন্যাসের কাহিনীতে বাস্তবের (লেখকের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা) উপরেই ভাবনা-কল্পনার যে প্রলেপ আছে—সেই কল্পনাগত কবিমানসকে অনুসরণ করিয়া লেখকের যে একটি অপর চরিত্র অনুমান করা যায়, তাহা ঐ ব্যক্তি-চরিত্র হইতে স্বতন্ত্র; সাধারণ অর্থে চরিত্র বলিতে যাহা বুঝায় উহা সেই চরিত্র নয়। তথাপি, সেই দুই চরিত্র একই ব্যক্তি-সত্তার দুই পিঠ হইতে পারে; কিন্তু অন্তর্য্যামী না হইলে তেমন যোগ দেখানো কাহারও সাধ্য নয়, আমার কাজও তাহা নয়। আমার যাহা কিছু অনুমান ও সিদ্ধান্ত তাহা ঐ শ্রীকান্ত-উপন্যাসের শ্রীকান্ত-জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তথাপি, যেহেতু এই উপন্যাসেও শ্রীকান্তের জবানিতে লেখকের যে আত্মপরিচয় আছে, তাহার উপরেও স্থানে স্থানে শরৎচন্দ্র-নামক পৃথক ব্যক্তিটিরও ভাবনা-চিন্তার ছাপ পড়িয়াছে, সেজন্য শ্রীকান্ত-কাহিনীর রচয়িতা শিল্পী-শরৎচন্দ্রের সহিত ঐ পৃথক ব্যক্তি-শরৎচন্দ্রের যেটুকু সাদৃশ্য সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, আমি তাহার সুযোগ লইতে ছাড়ি নাই; কিন্তু তাহার সত্যতা নির্ভর করিবে শরৎচন্দ্রের জীবনেতিহাস এবং শরৎচন্দ্রকে সাক্ষাৎভাবে যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের সাক্ষ্যের উপরে; যদি মেলে, তবে আমার অনুমান অভ্রান্ত হইবে; যদি না মেলে তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না, কারণ, আমার যাহা কিছু বিচার-বিশ্লেষণ ঐ ‘শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র’কে লইয়া। এইকথা আমি গ্রন্থমধ্যেও বলিয়াছি।

সর্ব্বশেষে, আমার পাঠক-পাঠিকাগণের নিকটে কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। এই রচনাটি যখন ‘বঙ্গদর্শনে’ প্রকাশিত হইতেছিল, তখন আমি চারিদিক হইতে—পত্রযোগে অতিদূর হইতেও—ইহা পাঠে অনেকের ঔৎসুক্য ও সাগ্রহ প্রতীক্ষা প্রভৃতির প্রমাণ পাইয়া অনুমান করিয়াছিলাম, আমার এই আলোচনা যত সূক্ষ্ম

বা জটিল হউক, বাংলাদেশে এখনও এমন একটি পাঠকসমাজ আছেন যাঁহারা আমার সমধর্ম্মী, অর্থাৎ আমি এই উপন্যাসের রস যেমন করিয়া উপভোগ করিয়াছি তাঁহারাও তেমনই করিয়াছেন; কিম্বা এমনও বলা যায়, 'শ্রীকান্তে' শরৎচন্দ্র যে রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহার এমন একটি সহজ আবেদন বাঙালীমাত্রেরই হৃদয়ে আছে যে, ঐ রসের বিশ্লেষণ যত সূক্ষ্মভাবেই করা হউক না কেন, তাহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইবে না। এই ভরসাই আমার বড় ভরসা, সেই ভরসাতেই আমি "শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রকে" অনেকদূর ঘুরাইয়াছি; পূর্ব্বে যে উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছি, সেই উদ্দেশ্যে নয়—সেটা পরের কথা, আমি তাঁহাদের সহিত অসঙ্কোচে আমার যতকিছু ভাব ও ভাবনার বাণী-বিহার করিয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমি ভুল করি নাই, তাঁহাদের মনের দুয়ার শেষ পর্য্যন্ত খোলাই থাকিবে।

বড়িশা, ২৪ পরগণা
রথযাত্রা, ১৩৫৭

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠা
পূর্ব্বভাষ	...	...	।৶০
অবতরণিকা			
আত্মকাহিনী	...	...	৩
আত্মকাহিনী বনাম উপন্যাস	...	...	১৩
শরৎচন্দ্রের কৈফিয়ৎ	...	...	২৪
শ্রীকান্তের বাল্য-জীবন			
ইন্দ্রনাথ	...	...	৩৩
শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ	...	...	৪৯
অন্নদা দিদি	...	...	৬৪
অন্নদা ও শ্রীকান্ত	...	...	৭৭
নারীর প্রেম			
পরিচয়	...	...	৯১
প্রাক্কন	...	...	১০৭
ব্যাখ্যা-সূত্র—নাটক-রূপ	...	...	১১৫
প্রস্তাবনা—বাল্য-প্রণয়	...	...	১২২
প্রথম অঙ্ক—পিয়ারী বাইজী	...	...	১২৬
দ্বিতীয় অঙ্ক—নিয়মচারিণী	...	...	১৩৩
দ্বিতীয় অঙ্কের জের—দুর্ভাগিনী	...	...	১৪০
তৃতীয় অঙ্ক—দণ্ডিতা	...	...	১৫২
তৃতীয় অঙ্কের জের—'স্বখাত সলিলে'	...	...	১৬৩
চতুর্থ অঙ্ক—তপস্বিনী	...	...	১৮৪
চতুর্থ অঙ্কের জের—হৃদয়-যমুনা	...	...	১৯৩

নেপথ্য-কাহিনী
গহ্বর ২০৪
কমললতা ও শ্রীকান্ত ২০৯
কমললতা ২২৩
প্রেমের দেহতত্ত্ব ২৩২
নারীর প্রেম (পূর্ব্বানুবৃত্তি)
পঞ্চম অঙ্ক—পূর্ণাহুতি ২৪৫
পঞ্চম অঙ্কের জের—ভাবসম্মিলন ... ২৫৩
উপসংহার
রাজলক্ষ্মী ও কমললতা ২৬৭
শ্রীকান্তের পরাজয় ২৮১
রাজলক্ষ্মীর শেষ ২৯৫
অভয়া ৩১৩
অন্যায়ের প্রতিকার ও মানুষের দুঃখ-নিবারণ ... ৩২৮
পরিশিষ্ট
শ্রীকান্ত-কাহিনী ও পুনর্বিচার ৩৩৯
ফলশ্রুতি ৩৪৬
শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র ৩৫৯

অবতরণিকা

(১)

আত্মকাহিনী

"One may appeal from fiction unto fact. From the soul there is no appeal." —*OSCAR WILDE.*

শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" অনেক দিন আগে পড়িয়াছিলাম, খণ্ড খণ্ড ভাবে—কতক পত্রিকার পৃষ্ঠায়, কতক পুস্তকাকারে। শেষ দুইখণ্ড আরও পরে পড়িয়াছিলাম। এজন্য ঐ উপন্যাসখানির ভাব-সৌন্দর্য্য বা রচনা-রূপের একটা সমগ্র-ধারণা হয় নাই; কতকগুলি চরিত্র, কোন কোন বর্ণনা এবং কয়েকটি ঘটনামাত্র মনে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল; উপন্যাস হিসাবে উহা কিঞ্চিৎ অযত্ন-সম্বদ্ধ, এবং ইহার প্রথম পর্ব্বটিই শ্রেষ্ঠ অংশ বলিয়া মনে হইয়াছিল।

সম্প্রতি, কিছুদিন হইল 'শ্রীকান্তে'র চারিটি খণ্ডই এক সঙ্গে পড়িবার অবকাশ হইয়াছিল তাহাতে সহসা ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে যেন একটা নূতন দৃষ্টি লাভ করিলাম, সাহিত্য-শিল্পকলারও একটা অভিনব রূপ যেন চাক্ষুষ করিলাম, এই অর্থে যে—কবি ও কাব্যের মধ্যে যে নানাপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তাহার অনেক কথাই জানিতাম, কিন্তু একটা বড় তত্ত্ব যেন এইবার এই বইখানিতে স্পষ্ট হৃদয়গোচর করিলাম; কবি-মনীষিগণ, আধুনিক শ্রেষ্ঠ সমালোচকগণ যাহার একাধিক উল্লেখ করিয়াছেন তাহার এমন দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে আর দেখি নাই। 'শ্রীকান্তে'র এই আলোচনায় আমি সেই কথাটি বলিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিব, পাঠক-পাঠিকাগণের যদি শুশ্রূষা থাকে, তবে হয় তো আমি আমার সেই দৃষ্টিকে তাঁহাদের চক্ষেও ধরাইয়া দিতে পারিব।

এই দ্বিতীয়বার 'শ্রীকান্ত' পাঠ করিয়া আমার যে কথাটি সর্ব্বাগ্রে মনে হইয়াছে তাহা এই যে, যাঁহারা কবি-শিল্পী—বিশেষ করিয়া যাঁহারা কাব্যের জবানীতে তাঁহাদের নিজ-জীবনের গভীরতম অনুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন—তাঁহাদের জীবন-চরিত কি ঐরূপ কাব্য হইতে পৃথক? অথবা আমরা সাধারণ অর্থে যাহাকে জীবনবৃত্ত বলিয়া থাকি, তাহা কি এইরূপ কবি-শিল্পীর প্রকৃত জীবনবৃত্ত

হইতে পারে? মনে হইতেছে, রবীন্দ্রনাথও একদা এ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছিলেন, ঐরূপ জীবনবৃত্ত কবি-জীবনের কাহিনীহিসাবে অতিশয় মূল্যহীন। কবিগণের জীবনই স্বতন্ত্র, তাঁহাদের জীবনের যে ইতিহাস, তাহা বাহিরের ঘটনাগত ইতিহাস নহে, কারণ, কর্ম্ম বা আচরণের মধ্য দিয়া যে চরিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা ঐরূপ মানুষের পরিচয় নহে, বাহিরের সহিত তাহার যোগ অন্যরূপ। একে ত' শিল্পীমাত্রেই জগৎ ও জীবনকে কতকটা অনাসক্তভাবে দেখিয়া থাকেন, এজন্য তাঁহাদের রচনাবলীতে সেই অন্তর-বাসী রসিক-পুরুষের যে পরিচয় পাই তাহাই তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয়; অন্য যে পরিচয় সাক্ষাৎভাবে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সাংসারিক বা সামাজিক নানা ব্যবহারে তাঁহাদের যে পরিচয় সকলে পাইয়া থাকে, তাহা তাঁহাদের দিক দিয়া তুচ্ছ। তাঁহারা যে জীবন যাপন করেন তাহা যদি সাধারণের মতই হইত, তবে তাঁহাদের দ্বারা ঐরূপ রসসৃষ্টি সম্ভব হইত না। অতএব তাঁহাদের জীবনের ঐ বাহিরের দিকটাকে যদি সেই ভিতরের দিকটার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হয়, এবং উভয়ের মধ্যে একটা সঙ্গতিস্থাপনের চেষ্টা করা হয়, তবে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করাই হইবে। এইজন্যই বোধ হয়, একজন ইংরেজ লেখকও কবিগণের জীবনচরিত-রচনাকারীকে মৃতের দেহাবশিষ্ট-সংগ্রহকারী undertaker, বা মুর্দ্দাফরাসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সেই পুরুষের দেহ-জীবন-সংক্রান্ত যতকিছু টুকরা সংবাদ সংগ্রহ করিয়া তাহারা যে বিপুলায়তন জীবন-বৃত্ত রচনা করে, তাহাতে আর সকলই থাকে, থাকে না কেবল সেই আত্মাটি—যে অতিশয় নির্জ্জনে আপনাকে আপনি অনুভব করিয়াছিল, আপনার সেই অন্তরতম সত্তাকে পৃথক করিয়া দেখিবার জন্য বাহিরের পটভূমিতে তাহাকে প্রসারিত করিয়াছিল। তাহার সেই আত্মদর্শন এমনই যে, সাংসারিক ও সামাজিক বন্ধন-ঘটিত কর্ম্ম বা অকর্ম্মের কাহিনীরূপে তাহাকে লিপিবদ্ধ করা যায় না। বলা বাহুল্য, এ আত্ম-দর্শন বেদান্তের আত্মদর্শন নয়—ব্যক্তি-পুরুষের আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শনই তাহাদের জীবন,—জীবনের গতি সেই অনুভূতিকে ক্রিয়াশীল করে, তাহাকে স্ফুটতর ও গভীরতর করিয়া তোলে। সে-পুরুষের জীবনই অন্যরূপ, তাহাকে সাধারণ জীবনবৃত্তের দ্বারা একটা মিথ্যা পরিচয়ে পরিচিত করা হয় মাত্র।

তবে কি কবিশিল্পীদের সেই জীবন একেবারেই দুর্লক্ষ্য? সাহিত্যে আমরা ত' অনেকের আত্মকাহিনী বা Confession পড়িয়া থাকি; সেগুলি প্রায়ই নির্লজ্জ আত্মপ্রচারের মত মনে হয়। যে অনুভূতি বা উপলব্ধি সম্পূর্ণ আত্মগত বলিয়াই পরের নিকটে প্রকাশযোগ্য নয়, তাহা ঐরূপ আত্মকাহিনীতে পাওয়া যাইবে না;

সেখানেও লেখক অতিশয় সজ্ঞান অভিপ্রায়ের বশে আপনাকে যে-দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাহা অপরোক্ষ নয়, পরোক্ষ—পরে যেমন দেখিতে চায়, বা পরকে যেরূপ দেখাইতে ইচ্ছা হয়, ইহা সেইরূপ দেখা। তাই লেখকের ব্যক্তি-জীবনের বহিরঙ্গটাই বড় হইয়া উঠে, অন্তরতম সত্তাটি হারাইয়া যায়। কোন কোন লেখক কাব্যে বা উপন্যাসে তাঁহাদের আত্মচরিতের একটা অংশ যোজনা করেন। সেই চরিত্র-চিত্রণও আংশিক, এবং তাহাও সেই আত্মপরিচয় নহে—যাহাকে লেখকের আত্ম-সাক্ষাৎকার বলা যাইতে পারে; কারণ তাহাতেও সেই পর-মুখাপেক্ষিতা আছে। ইহাই কবি-শিল্পীগণের আত্মকাহিনী-রচনার দুইটি উপায় বা দৃষ্টান্ত। এইরূপ আত্মকাহিনী তাঁহাদের আত্মার কাহিনী নয়। তাই সাহিত্যের তত্ত্ববেত্তাগণ হতাশ হইয়া একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র কবি-কীর্ত্তিকে কবির আত্মপরিচয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কবিরা তাঁহাদের সেই আত্মকাহিনী কাব্যের রূপকচ্ছলে নিজেরাই রচনা করিয়া থাকেন, কাব্যের সেই পুষ্পমালিকার মধ্যেই তাহার ডোর-রূপে সেই জীবন-সূত্র প্রসারিত হইয়া আছে। কথাটা সত্য, কিন্তু সকল কাব্যকার কাব্যসৃষ্টিতে এমন আত্মসচেতন বা আত্মনিষ্ঠ নহেন, অনেকে আত্মবিস্মৃতি বা আত্মবিলোপেই কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা পাইয়া থাকেন।

আসল কথা, ঐরূপ কবি-জীবনের জীবনবৃত্ত-রচনা সহজ নহে, 'জীবনবৃত্ত' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ঐরূপ পুরুষের সত্যকার পরিচয় বহন করে না। কবিগণ তাঁহাদের রচনার স্থলবিশেষে, ইঙ্গিতে-ইসারায়, ঠারে-ঠোরে যে আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকেন তাহা প্রায়ই আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। এটুকু পরিচয়ও তাঁহারাই দিতে পারেন—যাঁহারা বাণীকে বশ করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ যাঁহারা অনির্ব্বচনীয়কে বচনীয় করিতে পারেন, যাহা অন্তর্গূঢ় তাহাকে অপরের দৃষ্টিগোচর করিবার শক্তি যাঁহাদের আছে। তাঁহারা, আত্মার সহিত আত্মার সেই নিভৃত সাক্ষাৎকারকে—সেই অতি-বিচিত্র মিলন-বিরহের নিত্য-নূতন অভিসার-কাহিনীকে যদি কোথাও ব্যক্ত করিতে পারেন, তবেই আমরা কবির সেই অন্তরতর আত্মপরিচয় কতক পরিমাণে বুঝিয়া লইতে পারি। 'শ্রীকান্ত' পাঠ করিয়া ইহাই মনে হইয়াছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহার কি কোন প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন নাই,—তবে এদিকে কবির জীবনবৃত্ত-রচনার এত ধূমধাম কেন? জগতের বহু মহাকবির জীবনবৃত্ত নাই; কাব্যের সঙ্গে কবি-ব্যক্তিটি যেন এক হইয়া গিয়াছে;

অর্থাৎ কাব্য হইতে কবির কোন পৃথক সত্তা নাই। তাহাতে আমরা বিশেষ ক্ষতি বোধ করি না—আমাদের যেন তাহা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। শেক্সপীয়ারের কবি-ব্যক্তিত্ব না থাকাই তাঁহার কাব্যের গৌরব। তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের যেটুকু কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা না থাকিলেও চলিত। আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবৃত্ত এখনও অলিখিত আছে, এবং তাহাই থাকিবে; যাহা ভবিষ্যতে রচিত হইবে তাহা ঐ undertaker-এর কাজ, তাহাতে শিব বানর হইয়া উঠিবে, এখনই তাহা হইবার উপক্রম দেখা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবনবৃত্ত-রচনার প্রয়াস হইতেছে, উপকরণের অভাব নাই, বরং বাহুল্যই আছে। কিন্তু সেই জীবন-চরিতে রবীন্দ্রনাথের কোন নূতন পরিচয় থাকিবে না, কবি তাঁহার অজস্র রচনারাশিতে যে আত্ম-পরিচয় যে-ভাবে ও ভঙ্গীতে এবং নানারূপে দিয়াছেন, ঐ জীবন-চরিত তাহারই একটা সুসম্বদ্ধ প্রতিলিপিমাত্র হইবে; তাহাও কবির স্বলিখিত আত্মকাহিনীর মত হইবে—যদি না হয়, তবে সেই কাহিনী ব্যর্থ বা বৃথা হইবে। কিন্তু সে চরিত-কথাও কবিচরিত-কথাই হইবে, ব্যক্তি-মানুষের পরিচয় তাহাতে থাকিবে না। সাধারণ জীবনবৃত্তের সহিত তাহার সাদৃশ্য থাকিলেও সেই দিকটা অতিশয় গৌণ হইয়া থাকিবে।

কিন্তু যদি কোথাও কোন কবি-শিল্পীর মধ্যে ব্যক্তি ও কবি দুইই সমান বা অভিন্ন হইয়া উঠে; ব্যক্তিকে কবি আচ্ছন্ন করে নাই বরং আরও অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়াছে; ব্যক্তি-জীবনের যাহা-কিছু তাহা কবি-জীবনে রূপান্তরিত হইতেছে না,—এমনই প্রত্যক্ষ ও বাস্তব আকারে ব্যক্তি-চিত্তকে বিদ্ধ করিতেছে যে, তাহার মধ্যে যে কবি আছে, ভাব-কল্পনার যে অতিরিক্ত সচেতনতা আছে, তাহা ঐ বাস্তবের নিকটে, ঐ ব্যক্তির নিকটে আত্মসমর্পণ করে—কবিরও যেমন, ব্যক্তিরও তেমনই স্বতন্ত্র জীবন থাকে না, তবে এমন পুরুষের পক্ষে কাব্যরচনাই যে অর্থে আত্মকাহিনী-রচনা, তেমন আর কাহারও পক্ষে নয়। সেই কাব্য এমন একটি রসে অভিষিক্ত হইবে যাহা কাব্যরসও বটে, অথচ ব্যক্তি-জীবনের বাস্তব-অনুভূতির অপূর্ব্ব মমতা সেই রসকে তীব্র তীক্ষ্ণ করিয়া তোলে। কবি ও ব্যক্তি স্বতন্ত্র হইলেও এখানে যেন এক হইয়া আছে।

ইহা সত্য যে, সেইরূপ আত্মকাহিনী-রচনাতে লেখককে একেবারে আত্মহারা হইতে হইবে, অর্থাৎ এমন আত্ম-তন্ময়তার ভাবাবেশ চাই যে, নিজ হৃদয়ের সেই পরমোৎকণ্ঠা যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই উৎসারিত হইতে পারে। আপনাকে যেথায় ত্যাগই আপনাকে প্রকাশ করা; যাহা মর্ম্মমূলে জড়াইয়া আছে তাহার পাক

খুলিয়া যাওয়ার একটা পরম স্বস্তিসুখও আছে। কবির সকল রচনাতেই এইরূপ স্বস্তিসুখ থাকে বটে, ভাবাবেশের গুরুভার লাঘব করিয়া কবি একরূপ আনন্দ পান; কিন্তু যে ভাবাবেশে আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাহা তাঁহারও জীবনে দুইবার হয় না; কবির অন্যান্য কাব্যসৃষ্টির তুলনায় এই ভাবাবেশের যে কাব্য তাহা অতিশয় স্বতন্ত্র, তাহাতে কল্পনার কুশলতা তত নাই, যত আছে অনুভূতির আন্তরিকতা। এক হিসাবে সেই কাব্য কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, কারণ তাহা আত্মার আত্মসৃষ্টি; তাহার বেদনা যেমন সত্য, আনন্দও তেমনই। কবি-জীবনের এমন অন্তরঙ্গ কাহিনী সাহিত্যে অতিশয় দুর্লভ।

উপরে যে কথাগুলি বলিয়াছি, শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া তাহাই মনে হইয়াছে। উপন্যাসখানির ভিতর দিয়া লেখকের আত্মকথার যে ধারাবাহিক নিবেদন চলিয়াছে, সে যে কিরূপ আত্মকথা তাহাই সহসা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিলাম। সাধারণ পাঠকের মনে 'শ্রীকান্ত' সম্বন্ধে যে ধারণা আছে—তাঁহারা ঐ উপন্যাসকে যে-কারণে ও যে-অর্থে শরৎচন্দ্রের আত্মজীবন-কাহিনী বলিয়া মনে করেন,—বলা বাহুল্য, এ আলোচনার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহার মত মানুষ যে অতিশয় নিঃসঙ্গ অথচ তীক্ষ্ণ চেতনাময় জীবন যাপন করে—করিতে বাধ্য হয়; যে-জীবন তাঁহারই, আর কাহারও নয়; সমাজে বা শাস্ত্রে যাহা সুস্থ বা সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না,—অথচ, যাহা একটা দেহবাস্তব-বর্জ্জিত অপার্থিব ভাব-জীবনও নয়, বরং বাস্তবেরই অতি তীব্র অনুভূতি যে-জীবনকে স্পন্দিত ও গতিশীল করিয়াছে—সেই জীবনেরই ইতিহাসকে যে-ভাষায় ও যে-ভঙ্গীতে ঐ সমাজসংস্কারযুক্ত মানুষের চিত্তগোচর করা সম্ভব—ইহা যেন তাহাই। প্রত্যেক মানুষেরই একটা আত্মজীবন আছে, ভিতরকার ব্যক্তি-মানুষের একটা পৃথক পরিচয় আছে; কিন্তু সে পরিচয় দুই কারণে অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। প্রথমতঃ, প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাহা সাধারণ মনস্তত্ত্বঘটিত একটা ব্যাপার, তাহার ব্যক্তিটা স্বতন্ত্র হইলেও খুব বিশিষ্ট নয়—তেমন বৈশিষ্ট্যকেও মনোবিজ্ঞানের কয়েকটি তত্ত্বের অধীন করিয়া ব্যাখ্যা করা যায়—তাহাতেই রহস্যের সমাধান হয়। দ্বিতীয়তঃ, যেখানে তাহা সাধারণের একটু উপরে উঠিয়া থাকে, সেখানে হয় ত' ব্যক্তির সেই আত্মজীবনের বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য তাহার নিজের নিকটেও তেমন সুস্পষ্ট নয়—আপনাকে আপনি দেখার মত দৃষ্টি তাহার নাই; তারও কারণ—সেই অনুভূতিও তেমন গভীর বা তেমন স্বতন্ত্র নয় যাহাতে সে নিজেও চমৎকৃত হয়। আবার, শুধু চমৎকৃত হইলেই হইবে না,

সেই অনুভূতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার মত প্রকাশ-শক্তিও চাই—এই শক্তিই কবি-শক্তি, বাণীনির্মাণের শক্তি, বাক্যের আকারে সেই আত্মানুভূতিকে রূপ দিবার শক্তি। এমনও বলা যাইতে পারে যে, সেই আত্মসাক্ষাৎকার যদি ঐরূপ অনুভূতি-মার্গে সত্যই হইয়া থাকে—'আত্মা'টা যেমন অতিশয় বিশিষ্ট, সাক্ষাৎকারটাও তাহার অনুরূপ হয়—তবে তাহার বাণী বা Expression-ও অবশ্যম্ভাবী; যাহা বাণীতে রূপ গ্রহণ করে নাই, তাহা ভিতরেও ঘটে নাই। সকল উৎকৃষ্ট কাব্যরচনার মূলে এই তত্ত্বটি আছে, কবির চিত্তে সকল বস্তুই ভাবরূপে ঐরূপ সাক্ষাৎ-দৃষ্টিগোচর হয় বলিয়াই তাহা এক একটি বাঙ্ময়ী সৃষ্টিতে পরিণত হয়—আমরা যাহাকে কাব্য বলি। কিন্তু এখানে আমি যে-সৃষ্টির কথা বলিতেছি তাহা একটু বিশেষ ধরণের সৃষ্টি—সেই শক্তি এখানে নিযুক্ত হইয়াছে কবি-ব্যক্তির যে নিজস্ব জীবন—কোন ভাববস্তু নয়—তাহাকেই বাণীরূপ দান করিতে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'-উপন্যাসে আমি এইরূপ একটি আত্মজীবন-কথা পাঠ করিলাম।

এই কাহিনীর সহিত যদি তাঁহার বহির্জীবনের ঘটনা-কাহিনীর মিল না থাকে, তবে অবশ্যই আমরা তাহাকে তাঁহার 'জীবনবৃত্ত' বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। অথচ, অন্তর্জীবন যেমনই হোক, বহির্জীবনে তাহার একটা আভাস থাকিবেই, কারণ যে-অন্তর বাহির হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন তাহা কখনো ব্যক্তির অন্তর হইতে পারে না,—ব্যক্তি যতই স্বতন্ত্র হোক তাহা দেহহীন 'আত্মা' বা 'নির্গুণ পুরুষ' নয়; যদি তাহাই হয়, তবে তাহার ব্যক্তিত্বই বা কি? অতএব 'শ্রীকান্ত' যদি কোন অর্থে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী হয়, তবে সেই কাহিনীর ছায়ারূপেই আমরা তাঁহার বহির্জীবনের কোন একটা রূপ দেখিতে পাইব। ইহাই সাধারণ বুদ্ধিসম্মত; কিন্তু আমাদের কি সেই দৃষ্টি আছে? তা ছাড়া যে-কাহিনী মানুষের নিজস্ব আত্মার কাহিনী, তাহার সত্য কিসের দ্বারা যাচাই করিবে? "One may appeal from fiction unto fact. From the soul there is no appeal"—ইহা অতিশয় সত্য। তথাপি উহারও প্রমাণ আছে, সে প্রমাণ বাহিরের তথ্য-প্রমাণ নয়, তাহা আর একজনের সহানুভূতিতে হইয়া থাকে; আত্মার সংবাদ আত্মাই পাইতে পারে—"Deep calleth unto deep" সাধারণ মানুষের ভিতরকার সত্য পরিচয় আমরা কতটুকু পাই? "Every man is an enigma to his fellow"—ইহাই কি সত্য নয়? যাহার সহিত বহুকাল একসঙ্গে বাস করিয়াছি, যাহার সকল কথা, সকল কার্য্য, গোপন ও ব্যক্ত সকল

প্রবৃত্তি বা অভিপ্রায়, বহুদিন ধরিয়া লক্ষ্য করিয়াছি—সেই সকল হইতে যদি তাহার একটি চরিতকথা রচনা করি, তাহা কি সেই ব্যক্তির যথার্থ পরিচয়-কাহিনী হইবে? ঘনিষ্ঠগণ সেই স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই আত্মীয় ব্যক্তিটি নিজের সম্বন্ধে যে গর্ব্ব অথবা দীনতা প্রকাশ করে, তাহাও কি সত্য? তাহাকে যে অবস্থায় যে আচরণ করিতে দেখি তাহাতে কি তাহার আত্মারও সম্মতি আছে বলিয়া মনে করিতে পারি? মানুষ কি সর্ব্বদা অজ্ঞানে বা সজ্ঞানে আত্মগোপন করে না? বাহিরের শরৎচন্দ্রকে যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে জানিয়াছিলেন, জানিতেন বলিয়া তাঁহাদের সেই জ্ঞানের একটু গর্ব্বও করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি তাঁহার ভিতরের জীবনটাকেও দেখিয়াছিলেন? সে কোন্ জীবন? 'শ্রীকান্তে'র কাহিনীতে এবং তাঁহার সেই বহির্জ্জীবনের কাহিনীতে তাঁহারা কি কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন? তাঁহারা ব্যক্তির যে-কাহিনী অবগত আছেন, তাহাতে 'শ্রীকান্ত' একটা পৃথক কবি-কাহিনী মাত্র, উহাতে ব্যক্তি-শরৎচন্দ্র নাই, কবি-শরৎচন্দ্রই আছেন—অর্থাৎ উহার fact-গুলা কোন অর্থে তাঁহার জীবনের fact নয়, উহা একটা কবিকল্পিত fiction মাত্র—ইহাই তাঁহাদের অভিমত হওয়া সম্ভব। বাহিরে কোন 'রাজলক্ষ্মী' ছিল না; 'অভয়া', 'কমললতা'ও বাস্তব হইতে পারে না—যাঁহারা যুক্তিবিচারশীল তাঁহারা এমন কথাই বলিবেন; যাঁহারা ভাবালু ও অতিবিশ্বাসী, তাঁহারা শরৎচন্দ্রের জীবনটাই রহস্যাবৃত বলিয়া মনে করিবেন—তাহার একটা গোপন দিক ছিল, তাহা গোপনেই রহিয়া গিয়াছে। এই দ্বিতীয় মনোভাবটি যেমন কৌতুকাবহ, তেমনই অর্থপূর্ণ—উহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, 'শ্রীকান্তে'র কাহিনীতে সাধারণ পাঠক-পাঠিকা এমন একটা কিছু অনুভব করে, যাহাকে তাহারা নিছক কল্পনা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। আমি ইহার কোনটারই প্রতিবাদ করিব না, কেবল এই 'শ্রীকান্তে'র জবানীতে শরৎচন্দ্রের যে আত্মকাহিনী পাঠ করিয়াছি, তাহাই একটু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সহকারে বিবৃত করিব; যদি বাহিরের ধারণার সহিত তাহা মিলে—শরৎচন্দ্রের ভিতরটার পরিচয় যাঁহারা কিছুও পাইয়াছিলেন, তাঁহারা যদি এই ব্যাখ্যা যথার্থ মনে করেন—ভালই, না করেন তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, এই নূতনতর চরিত্রোদ্ঘাটন বিফল হইবে না। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এক্ষণে আবার বলিতেছি যে, এক অর্থে, শরৎচন্দ্রের মধ্যে দুইটা মানুষ ছিল না, তাঁহার জীবনে শিল্পী-কবি ও ব্যক্তি-মানুষের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না, অর্থাৎ বাস্তব অনুভূতি ও কল্পনার মধ্যে কোন সজ্ঞান লুকাচুরি ছিল না। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-কীর্ত্তির যে একটি

বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—খুব বড় দরের প্রতিভার অধিকারী না হইয়াও তিনি যে বাংলাসাহিত্যে একটা অনন্যসুলভ আসন অধিকার করিয়াছেন, রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তিকেও প্রতিহত করিয়া তিনি যে স্বতন্ত্রভাবে দীপ্তিমান হইতে পারিয়াছেন, তার কারণ—তাঁহার কবি-জীবন ও ব্যক্তি-জীবনের ঐ অতি-দুর্লভ সাযুজ্য। 'শ্রীকান্ত' পাঠকালে এই তত্ত্বটিই বিদ্যুৎচমকের মত আমার অন্তরে উদ্ভাসিত হয়; গল্পের আকারে, কাহিনী-রচনার ছলে, তিনি তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের এমন সকল অনুভূতি ও আধ্যাত্মিক সঙ্কট যেন প্রাণের অন্তস্তল উন্মুক্ত করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাহাতে শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা ত' নহেই, বরং ব্যক্তির হৃদয়-শোণিত-রাগে তাহা শিল্পকেও পরাস্ত করিয়াছে। এই কথাটা এইখানেই আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলি—কবি ও কাব্যের মধ্যে, শিল্পী ও তাহার শিল্পকর্ম্মের মধ্যে যে একাধিক সম্পর্ক থাকে—সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনে কবি-বিধাতার কাব্যসৃষ্টির প্রয়াস আছে। কিন্তু সেখানে কবি নৈর্ব্যক্তিক। যে শিল্পী যত নৈর্ব্যক্তিক তিনিই তত বড় কবি। নাটক ও লিরিক, এই দুই জাতীয় কাব্যে, ব্যক্তির সম্পর্ক প্রায় বিপরীত হইলেও, লিরিক-কবিও এক অর্থে নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠেন, নিজের বুকের বেদনাকে তিনি এমন একটি সুর-মূর্চ্ছনা দান করিতে পারেন যে, সেই বেদনা আর সকলের বক্ষেও বাজিয়া উঠে; এই অর্থে তাঁহার কাব্যও নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু সেই নৈর্ব্যক্তিকতার লক্ষণ নাটকের মত নয়, কারণ, নাটকীয় কল্পনা নৈর্ব্যক্তিক হইলেও তাহা কেবল নির্ব্বিশেষ ভাব-রসের সৃষ্টি করে না—অসংখ্য অনন্যসদৃশ ব্যক্তি-বিগ্রহ সৃষ্টি করিয়াই নিজের নৈর্ব্যক্তিকতা সপ্রমাণ করে। লিরিক-কাব্যের রস ব্যক্তিকে (কবির নিজ-হৃদয়কে) আশ্রয় করিয়া এমন ভাব-গভীর হইয়া উঠে যে, সেই গভীরতার দ্বারাই সে যেন সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ের তলদেশ স্পর্শ করে, একের বেদনা সকলের বেদনা হইয়া উঠে; ইহারই নাম রস; ইহা যেমন নৈর্ব্যক্তিক তেমনই নির্ব্বিশেষ। কিন্তু নাট্যকার যে রস সৃষ্টি করেন তাহা একাধারে বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ; অতিমাত্রায় বিশেষ বলিয়াই তাহা একটি আশ্চর্য্য কারণে নির্ব্বিশেষ রসপদবীতে আরোহণ করে, অর্থাৎ ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গোচর হয়। তাঁহার রসকল্পনায় এক-একটি ব্যক্তি (নাটকীয় চরিত্র বা পাত্র-পাত্রী) এমন সুগভীর ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে, মনে হয়, তিনি এক একটি পৃথক মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন—সে মানুষ ভাব-বিগ্রহ নয়, ব্যক্তি-বিগ্রহ; তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক দেহ আছে। এই সৃষ্টিকেই সত্যকার

সৃষ্টি বলে; ইহা যেন পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টি—ভাবের সূক্ষ্ম বায়বীয় উপাদানে যেরূপ সৃষ্টি হয়, তাহা নয়। ইহার জন্য চাই সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ। লিরিক-কবি আপনারই অন্তরের অন্তস্তল হইতে যাহা ব্যক্ত করেন, তাহাতে দেহটা বাদ যায়, কেবল একটা ভাব-মূর্ত্তি নানা ছন্দে, গানের আকারে—গড়িয়া উঠে না—উৎসারিত হয়। নাট্যকার যে ব্যক্তি-বিগ্রহ সৃষ্টি করেন—লিরিক-কবি সেইরূপ দেহবিশিষ্ট বাস্তবআকার-আয়তনযুক্ত মূর্ত্তি গড়িয়া দিতে পারেন না; তার কারণ, তিনি আপনারই মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকেন, এবং সেই নিজেকেও একটা পৃথক মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া দিতে পারেন না; নিজকে তেমন করিয়া কেহ দেখিতেও পায় না। কিন্তু পরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার রূপ ধারণ করা যে সম্ভব তাহার প্রমাণ শেক্সপীয়ারের নাটক। কিন্তু শেক্সপীয়ারও কি কোন একটি চরিত্রে আপনাকে হুবহু রূপ দিতে পারিয়াছেন? ইহা অসম্ভব, মানুষের সৃষ্টিশক্তির একটা সীমা আছে; তাই সেই নৈর্ব্যক্তিক কল্পনা লইয়া, শত চরিত্র-সৃষ্টিতেও কোন কবি আপনাকে প্রতিমূর্ত্ত করিতে পারেন নাই। যে সকল কাব্যে বা উপন্যাসে কবির আত্মপরিচয় আছে বলিয়া একটা প্রসিদ্ধি আছে, সেখানে কিছু-পরিমাণ ঐ লিরিক-আত্মনিবেদনই আছে, নাটকীয় চরিত্রসৃষ্টি নাই—অর্থাৎ সে পরিচয় কবির আত্মনিরপেক্ষ আত্ম-পরিচয় নহে। সেইরূপ খাঁটি আত্ম-প্রতিমূর্ত্তি গড়িতে হইলে কবিকে যেমন মুখ্যতঃ লিরিক-আত্মনিমগ্নতার অধিকারী হইতে হইবে, তেমনিই, সেই মুহূর্ত্তেই, উৎকৃষ্ট নাটকীয় কল্পনার আশ্রয় লইতে হইবে, আপনা হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

'শ্রীকান্তে' এই নিয়মের যেন একটু ব্যতিক্রম দেখি, যেটুকু ব্যতিক্রম সেইটুকুই আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, ঐ কাহিনী বিশেষ অর্থে আত্মকাহিনীই বটে—উহার মূলে আছে অতিপ্রবল লিরিক-প্রেরণা। কিন্তু লেখক নিজের সেই অন্তরতম অনুভূতিকেই এমন একটি রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মনে হয় তাহাতে একটি পরম বৈরাগ্য বা অসঙ্গতাও রহিয়াছে, না থাকিলে তিনি তাহাকে এমন করিয়া রূপ দিতে পারিতেন না। যেন, তিনি যাহাকে দেখিতেছেন (অনুভব করিতেছেন) তাহার সঙ্গে তিনি জড়াইয়া যান নাই; তাহাকে অতি গভীর ভাবেই অনুভব করিতেছেন, অথচ তাহারই সঙ্গে একটা নির্ব্বেদ বা ঔদাসীন্যও আছে। শোনা যায়, যোগী ভিন্ন আর কেহ স্বপ্নেও নিজের মূর্ত্তি দেখিতে পায় না; বাহিরে অপর ব্যক্তিকে যেমন দেখি, তেমনই নিজের চোখের সম্মুখে নিজেকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখি না; যোগীই

তেমন দৃশ্য দেখে। মনে হয়, শরৎচন্দ্রও সেইরূপ যোগীর দৃষ্টিতে আপনার মূর্ত্তিটিকে দৃশ্যরূপে দেখিয়াছিলেন—সমগ্র 'শ্রীকান্ত'খানি সেই স্বপ্ন, তিনি আপনাকে স্বপ্নে দেখিয়া সেই স্বপ্নদৃষ্ট আত্ম-প্রতিমূর্ত্তির পরিচয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

'শ্রীকান্ত' শরৎচন্দ্রের সেই আত্মকাহিনী—উহা কেবল উপন্যাসই নহে। এইরূপ আত্মকাহিনীও উপন্যাস হইয়া উঠে, তার কারণ, ইহার নায়ক একাধারে 'আত্ম'ও বটে, 'পর'ও বটে। লেখক যেন আপনাকেই, বাহিরে একটু তফাতে ধরিয়া দেখিতেছেন; ভাল করিয়া দেখিবার জন্য যেরূপ সংস্থান ও পশ্চাৎ-পট আবশ্যক তাহা উত্তমরূপে সংযোজন করিয়া লইয়াছেন। সেই পশ্চাৎ-পট ও নানা সংস্থান situation-গুলি—সামাজিক ও সাংসারিক সম্পর্কগুলি—এই অর্থে কাল্পনিক নহে যে, তদ্দ্বারাই তাঁহার সেই অন্তরের স্বরূপটিকে তিনি আমাদের দৃষ্টিগোচর করিতে পারিয়াছেন; এজন্য তথ্যের সত্যকে তত্ত্বের সত্যে মণ্ডিত করিয়াছেন, তাহাতে কল্পনার মিথ্যাচরণ হয় নাই; তথ্য যদি ক্ষুদ্র ও সামান্যও হয়, লেখক তাহাকেই নিজ আত্মার বা হৃদয়ের স্পর্শমণির স্পর্শে নিজ প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন—সেগুলি তাঁহার সেই অন্তর-অনুভূতির symbol বা সঙ্কেত-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে; এমনই করিয়া বাহির ও ভিতরের যোগ-রক্ষা হইয়াছে। খণ্ড বা ভগ্ন বলিয়াই কোনটা তাঁহার পক্ষে মিথ্যা হয় নাই, কারণ সেই অপূর্ণ বা খণ্ড ক্ষুদ্র বস্তুগুলিই তাঁহার প্রাণকে বিস্ফারিত করিয়া নিজেরাও একটা সুমহৎ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে; তাই ঐ তথ্যগত সত্যই সেই জীবনের সত্য নয়,—অথচ সেই তথ্যগুলিও মিথ্যা নয়। আমি 'শ্রীকান্তে'র জবানীতে শরৎচন্দ্রের সেই আত্মকাহিনী বুঝিবার চেষ্টা করিব, ইহাই হইবে এই গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য; সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস বা কাব্যহিসাবেও ইহার সৌন্দর্য্য-বিচার করিব।

আত্মকাহিনী বনাম উপন্যাস

Certainly nearly every great book of any feeling is largely autobiographical, not in precise detail, but in its manifestation of the author's attitudes and reactions to life.—*ETHEL MANNIN.*

প্রস্তাবনায় বলিয়াছি, 'শ্রীকান্ত' ও 'শ্রীকান্তের' লেখকের মধ্যে একটি গূঢ় অন্তরঙ্গ যোগ আছে; ইহাও বলিয়াছি, ঐ উপন্যাসখানি এক অর্থে শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনীই বটে। কিন্তু তাহা স্বলিখিত জীবন-বৃত্তের মত নয়। পাঠকগণের জন্য উপন্যাসের আকারে লিখিত হইলেও, উহা কতকটা আপনার মধ্যেই আপনাকে দর্শনের মত। এই আত্মদর্শনের ভঙ্গীটি সাহিত্যে অতিশয় নূতন—আপনাকেই দেখা বটে, কিন্তু তাহাতে এমন একটি আত্মনিরপেক্ষতা আছে যে, সে যেন অপর কাহাকে দেখার মত; উপন্যাসগত অপর সকল নরনারী সম্বন্ধে একটা অতি তীক্ষ্ণ মানস-সচেতনতা আছে, কিন্তু শ্রীকান্ত নিজের সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য অকপটতা ও বিচারবিমুখতা—এমন কি, যেন সজ্ঞানতার অভাব রক্ষা করিয়াছে। সে যে নিজে কি—কেমন মানুষ, নিজের শক্তি ও অশক্তি, দোষ ও গুণ মিলাইয়া একটা কেমন ধারণা দাঁড়ায়, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। কোনরূপ আত্মপ্রচার নাই, কোন কৈফিয়ৎও নাই। আত্ম-চেতনা আছে, আত্মপ্রকাশ বা আত্মোদ্‌ঘাটন আছে, কিন্তু তাহার কোন ব্যাখ্যা বা অর্থসন্ধানের প্রবৃত্তিমাত্র নাই। ইহা সেইরূপ Confession, যাহাতে মানুষ শুধুই ইহাই বলে, আমার ভালমন্দ-জ্ঞান, আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম, আমার অন্তরের ভাব-অভাব-বোধ আমি যতদূর সম্ভব যথাযথভাবে ব্যক্ত করিতেছি, যতটুকু পারো বুঝিয়া লও, আমি কেবল আমাকে তোমাদের সম্মুখে ধরিতেছি—আমি নিজেকে যেমন দেখিয়াছি অর্থাৎ অনুভব করিয়াছি, তেমনই দেখাইতেছি; বুঝিবার চেষ্টা করি নাই,—সে চেষ্টা করিলে বুঝানোই হইত, দেখানো হইত না। ইহাকে যদি আত্মকাহিনী বলা যায়, তবে 'শ্রীকান্ত' সেইরূপ আত্মকাহিনী। এইবার ঐ উপন্যাসখানির আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধেও কিছু ভূমিকা করিয়া রাখিব।

প্রথমতঃ ইহাতে গল্প বা উপন্যাসের মত কোন আত্মস্তযুক্ত প্লট নাই; লেখক ইহাকে নায়কের জীবন-ঘটিত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন স্মৃতিকথার একটা সংকলনমাত্র বলিয়াছেন, সেই ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত স্মৃতিগুলির কয়েকটিকে একটা সূত্রে নূতন করিয়া গাঁথিয়া দিয়াছেন। এই সূত্রটি কি? বেশ বুঝিতে পারা যায়, একটি অতিশয় স্পর্শকাতর এবং জিজ্ঞাসু মানব-মন ও মানব-হৃদয় এক বিশিষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবন-পথে যাত্রা করিয়াছে; বাহিরের নূতন নূতন অভিজ্ঞতা এবং ভিতরের কতকগুলি ব্যক্তিগত সংস্কারের দ্বন্দ্বে, সেই যাত্রা—জীবনের রহস্য-সন্ধানে সেই যে দুঃসাহসিক অভিযান—তাহা ক্রমশঃ জটিল ও গভীর হইয়া উঠিতেছে, ইহাই ঐ কাহিনীকে একটি কেন্দ্রগত সৌষম্য দান করিয়াছে। রহস্য গভীরতর হয়, তাহার সমাধান হয় না—ইহাও আমাদিগের মনকে উৎসুক করিয়া রাখে। মুখ্যতঃ কতকগুলি ঘটনা ও চরিত্র আমাদিগকে সমধিক আকৃষ্ট করে। বর্ণনা ও বিবৃতিগুলি কাব্যের মত উপভোগ্য; প্লট থাক বা নাই থাক্, এগুলি উপন্যাসেরই উপাদান বটে, এবং পৃথকভাবে রসোদ্রেক করে। প্লট না থাকিলেও ঐ নায়ক-চরিত্রের এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহাই একগাছি ডোরের মত অবিন্যস্ত ফুলরাশিকে একটি মালার আকার দান করিয়াছে।

কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, ঐ নায়কের চরিত্র খুব সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় আকার লাভ করে নাই, তাহার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। অন্যান্য চরিত্রগুলি যেমন তাহাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ পরিধির মধ্যে আপন-আপন পরিচয় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে—তার কারণ, লেখক সেগুলিকে আপনার বাহিরে অতিশয় সজ্ঞান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়াছেন,—নায়কের চরিত্র তেমনই আমাদের দৃষ্টিকে ক্রমাগত এড়াইয়া যায়। অতএব কাহিনী হিসাবে ইহার অন্তরালে যে একটি ঐক্যসূত্র আছে তাহাও নায়কের চরিত্র নয়। একটা বিশিষ্ট সমাজ, কতকগুলি দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার, এবং তাহারই কারণে বা তাহারই প্রতিক্রিয়ার ফলে,—সেই সমাজেরই শক্তি ও অশক্তিসূচক যে কয়েকটি নর-নারী নায়কের জীবনপথে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাদের সংস্পর্শে বা সংঘাতে তাহার যে চিত্তস্ফুরণ—এই কাহিনী তাহারই কাহিনী। নায়কের কোন কার্য্য বা কীর্ত্তিঘটিত চরিত্র নয়—তাহার সেই বিস্ময়, তাহার শ্রদ্ধা, তাহার ক্ষোভ এবং তাহার সুগভীর সহানুভূতি—হৃদয়ের রাগ ও বিরাগ—এই কাহিনীকে একটি বিশিষ্ট রস-রূপ দান করিয়াছে। সেই সকল বিষয়ে নায়কের এমন কোন নিজস্ব বিশ্বাস, বা মতামত, বা নীতিনিষ্ঠা প্রকাশ পায় নাই, ...র জীবনে এমন কোন স্বার্থ বা নিঃস্বার্থের প্রাণপণ প্রয়াস নাই, যাহাতে—

একটা চারিত্রিক ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া ওঠে। যেখানে তাহার যেটুকু কর্মোত্তম দেখা যায় তাহা সেই ক্ষণের সেইটুকুর জন্য; তাহার অতি গভীর অনুকম্পার মধ্যেও একটা বৈরাগ্য রহিয়াছে। অতএব, এই কাহিনী যদি একটা ব্যক্তি-চরিত্রের কাহিনীও হয়, তাহার কোন চরিত্র-গৌরব নাই। এই জন্যই, ইহার নায়ক যেমন একদিকে কাহিনী-কল্পিত নায়ক নহে, তেমনই আত্মকাহিনীহিসাবেও সেই নায়ক বা লেখক আপনাকে একটা চরিত্ররূপে দেখে নাই; অন্য চরিত্রগুলির সম্বন্ধে যেমনই হোক, নিজ চরিত্রকে সে সেইরূপ সজ্ঞানতা বা সমালোচনা হইতে মুক্তি দিয়াছে। কাহিনীর এই ভঙ্গীটি সর্ব্বাপেক্ষা লক্ষণীয়। পরে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই কাহিনীর মধ্যে লেখক নিজেও কিছু কিছু সজ্ঞান আত্ম-সমালোচনা করিয়াছেন। মনে রাখিতে হইবে, এগুলি নায়ক শ্রীকান্তের কথা নয়, শ্রীকান্তের নামে লেখক শরৎচন্দ্রের কথা। এগুলি যে-কালের মন্তব্য সেকালে লেখকের শ্রীকান্ত-জীবন গত হইয়াছে—লেখক তখন সেইগুলির মধ্যে স্মৃতিপথে বিচরণ করিতেছেন। তখন অন্তরের সেই সাক্ষাৎ-অনুভূতি ও বর্ত্তমানের এই সমালোচনার মধ্যে একটা ব্যবধান ঘটিয়াছে—দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই স্মৃতিগুলি এমন সুস্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, আমরা দুইটাকে পৃথক করিয়া লইতে পারি, মূল শ্রীকান্ত ও লেখক শ্রীকান্তকে—একজনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি এবং অপরের পরোক্ষ চিন্তা বা তর্ক-সংশয়গুলিকে—বিযুক্ত করিয়া লওয়া দুরূহ নয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, এই আত্মকাহিনীরও দুইদিক বা ধারা আছে, একটি—অজ্ঞান বা প্রশ্নবিহীন আত্মোদ্ঘাটন; অপরটি—সজ্ঞান সমালোচনা। আমরা দেখিতে পাইব, আত্মকাহিনী হিসাবে ঐ প্রথমটাই মূল্যবান, সেইখানেই লেখক নিজের অজ্ঞাতসারে আত্মপরিচয় দিয়াছেন; অপরটিতে যে সজ্ঞানতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা আমাদের পরিচিত শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক আত্ম-পরিচয়—তাহা অন্নদা-দিদি ও রাজলক্ষ্মীর শরৎচন্দ্র নয়; যদিও সে শরৎচন্দ্র কখনো মরে নাই, কেবল অন্তরের অন্তস্তলে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এবং সেইখানে সে এক অজ্ঞান-স্ফূর্ত্ত আত্মচৈতন্যের নেশায় বিভোর হইতেছে। কখনো রাজলক্ষ্মী কখনো কমল-লতার পানে চাহিয়া সে বুঝিতে পারিতেছে যে, সে চিরদিনই একটা 'ভবঘুরে'; তাহার কোন বন্ধন নাই, তাহার হৃদয় কখনও সত্যকার আশ্রয় চাহে নাই, সর্ব্বপ্রকার বাঁধনকে সে ভয় করিয়াছে; তাহার বাসনা-কামনায় একাগ্রতা নাই, জিজ্ঞাসারও আদি-অন্ত নাই। এক কথায় সে কিছুরই শেষ চায়

না—অভাবেরও নয়, সংশয়েরও নয়। শেষ মানেই অস্থিরতার অন্ত, একটা কোন স্থানে বসিয়া পড়া। ইহাই তাহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। এ কাহিনী অসমাপ্ত থাকিয়া যাওয়ার কারণ এই যে, শ্রীকান্ত হইতে শরৎচন্দ্রে রূপান্তরিত হওয়ার সেই ইতিহাস—অবন্ধন হইতে বন্ধনে, অতৃপ্তি হইতে তৃপ্তিতে, সমাজ-সংসারের বহির্দেশ হইতে তাহার ভিতরে—সেই যে গত্যন্তর, তাহা আর শ্রীকান্তের কাহিনী নয়,—তাহা নিতান্তই বাহিরের, তাহা শরৎচন্দ্রের জীবনবৃত্ত হইতে পারে, শ্রীকান্তের নহে। কিন্তু এখানে সে সকল কথা অপ্রাসঙ্গিক।

আমি বলিয়াছি, এই কাহিনীতে দুইটি ভাগ বা ধারা আছে; একটা লেখকের আত্মজীবন বা আত্মচরিত, আর একটা সেই জীবন সম্বন্ধে চিন্তা বা তাহার সমালোচনা। প্রথমটি আত্ম-প্রকাশ, দ্বিতীয়টি আত্মচিন্তা; আত্মপ্রকাশের মধ্যেই যে আত্মদর্শন আছে তাহাই আরও সত্য, আরও গভীর; আত্মচিন্তায় সেই চেতনা আর নাই, সেই অপরোক্ষ অনুভূতি আর নাই। আমি ভূমিকায় বলিয়াছি, যে-মুহূর্ত্তে মানুষ আপনাকে সজ্ঞানে চিন্তা করিতেছে সে মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সাক্ষাৎ-দর্শন করিতেছে না, সে আর সে নাই; অথচ ঐরূপ সজ্ঞান বিচারবুদ্ধি ব্যতিরেকে মানুষ আপনাকে বুঝিবে ও বুঝাইবে কেমন করিয়া? এইজন্য প্রকৃত আত্মপরিচয় দেওয়া একরূপ অসম্ভব। কিন্তু এই গ্রন্থে তাহা সম্ভব হইয়াছে একটি দৈব কারণে, একটি ধারার নিম্নে যে আর একটি ধারা বহিতে পারিয়াছে, তাহাতেই ঐ বাধা কতকটা অপসারিত হইয়াছে। নায়ক শ্রীকান্ত ও লেখক শ্রীকান্ত সর্ব্বত্র এক হইয়া নাই, তাই মনটা একদিকে এবং প্রাণটা—অজ্ঞান আত্মানুভূতিটা—আর দিকে থাকিয়া পরস্পরকে স্বাধীনতা দিতে পারিয়াছে। এজন্য এই কাহিনীর অন্ততঃ একটা অংশে আমরা সেই মূল শ্রীকান্তকে কতকগুলি লক্ষণে চিনিয়া লইতে পারিব। শক্তি ও অশক্তি, মোহ ও দুর্ব্বলতা, লোভ ও ত্যাগ, সংস্কারের বশ্যতা এবং তাহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, এ সকলই তাহাতে অকপটে প্রকাশ পাইয়াছে; এই যে স্ববিরোধী মনোভাব, দুই বিরুদ্ধ আদর্শের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, ইহার জন্য কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই। এই সকল কারণে সন্দেহ মাত্র থাকে না যে, ঐ কাহিনী লেখকের নিজেরই অন্তরঙ্গ-জীবনের কাহিনী, উহা পরের কাহিনী নয়, শ্রীকান্ত একটা ঔপন্যাসিক চরিত্র নয়।

তাহা হইলে, অপর চরিত্রগুলিও কি কিছুমাত্র কল্পিত নয়? এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে ভূমিকায় কিছু বলিয়াছি। বাস্তবের তথ্য ও হৃদয়ের সত্য যখন পরস্পর পরিপূরক হয়, অথবা যখন বাস্তবকেই ভেদ করিয়া তাহার অন্তর্গত সেই ভাব-সত্যকে আত্মা

আপন সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তখন সে সকলের বাস্তবতাকে যাচাই করিতে হইবে কোন্ কষ্টিপাথরে? শ্রীকান্তের কাহিনীতে যে প্রধান চরিত্রগুলি আছে, অর্থাৎ যে চরিত্রগুলির সহিত লেখকের জীবনে, বাহিরে বা ভিতরে, একটু বিশেষ গ্রন্থি পড়িয়াছিল—যাহাদের সংস্পর্শে তিনি আপনাকে একটু বিশেষ করিয়া আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন—সেগুলি যে কবিকল্পিত একরূপ বাস্তব বা বাস্তব-সদৃশ চরিত্র নয়, তাহা পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। অপর চরিত্রগুলি বাস্তবের অনুকৃতি, অথবা অর্দ্ধেক বাস্তব ও অর্দ্ধেক কল্পনা। লেখক, অভিজ্ঞতার সহিত নিজের ভাবদৃষ্টি মিলাইয়া, এই সকল চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন; এগুলি তাঁহার মানস-প্রকৃতি ও সজ্ঞান হৃদয়বৃত্তির সাক্ষ্য দিতেছে; এগুলিতে তাঁহার সেই অজ্ঞান অবশ আত্মপ্রকাশের অবকাশ নাই। অতএব এই কাহিনীর বর্ণনীয় বস্তুকে আমরা সাধারণ ভাবে কাব্যকল্পনার সত্য বা কল্পিত বাস্তব বলিতে পারি বটে, অর্থাৎ তাহাদের যাথার্থ্য বিচার করিতে হইলে "we can appeal from fiction unto fact"; কিন্তু ঐ প্রধান কয়েকটির সম্বন্ধে সেইরূপ পদ্ধতি খাটিবে না। সেখানে কবি-কল্পনা নয়—হৃদয়-গভীরের মর্ম্মজ্ঞতা বাস্তবকেই যে জ্যোতিশ্ছটায় মণ্ডিত করিয়াছে তাহা কেবল কবিত্ব বা কল্পনারস নয়; তাহা সেই বাস্তবের সত্যতম পরিচয়; সেখানে আত্মায় আত্মায় সাক্ষাৎ আছে; সে যেন বাস্তব হইয়াও বাস্তব অপেক্ষা সত্য। এইগুলি সেই আত্মকাহিনীর উপাদান স্বরূপ হইয়াছে। ইহার একটি উদাহরণ এখানে দিব। আমার কথা বুঝাইবার পক্ষে ঐ একটিই যথেষ্ট। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ-পর্ব্বের একস্থানে, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর একটি কথোপকথন আছে। রাজলক্ষ্মী সেই অপর, অর্থাৎ প্রধান চরিত্রগুলির একটি; এই কথোপকথনের লগ্নটিও শ্রীকান্ত-জীবনের একটি গুরুতর লগ্ন। চিরবিচ্ছেদের নিশ্চিত সম্ভাবনা যখন উভয়ের মনে ঘনাইয়া উঠিয়াছে, তখন উভয়ের—বিশেষ করিয়া একজনের—অন্তর-রুদ্ধ বাষ্পবেগ একটা তড়িৎস্ফুরণে তরল হইয়া যে অশ্রু-ধারায় ঝরিয়া পড়িল, তাহাতে উভয়ের দৃষ্টিও যেন স্বচ্ছ হইয়া গেল; শ্রীকান্ত যেমন রাজলক্ষ্মীকে দেখিতে পাইল, রাজলক্ষ্মীও সেই মুহূর্ত্তে শ্রীকান্তকে নিঃশেষে চিনিয়া লইল। কিন্তু এ কাহিনীর লেখক শ্রীকান্ত নিজে, অতএব রাজলক্ষ্মীর সেই দেখাটাও শ্রীকান্তেরই দেখা, রাজলক্ষ্মীর দেখাটা শ্রীকান্তই দেখিল। এই দেখা যে কেমন দেখা, এবং সেইজন্য উহার কোন পক্ষই কল্পিত চরিত্র হইতে পারে না—নিম্নোদ্ধৃত কথোপকথনে তাহা নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে।—শ্রীকান্ত বলিল,

—এর চেয়ে বরং আমাকে মুরারীপুর আখড়ায় পাঠিয়ে দাও না কেন?

—তাদেরই বা তুমি কি উপকার করবে?

—তাদের ফুল তুলে দেবো। ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যতদিন বাঁচি থাকবো, তারপরে তারা দেবে আমাকে সেই বকুলতলায় সমাধি। ছেলেমানুষ পদ্মা কোন সন্ধ্যায় দিয়ে যাবে প্রদীপ জ্বেলে, কখনো বা তার ভুল হবে—সে সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে না। ভোরবেলায় ফুল তুলে ভারি পাশ দিয়ে ফিরবে যখন কমল-লতা, কোনদিন বা দেবে সে একমুঠো মল্লিকা ফুল ছড়িয়ে, কোনদিন বা দেবে কুন্দ। আর পরিচিত কেউ যদি কখনো আসে পথ ভুলে, তাকে দেখিয়ে বলবে, ঐখানে থাকে আমাদের নতুন গোসাঁই। ঐ যে একটু উঁচু—ঐ যেখানটায় শুকনো মল্লিকা কুন্দ-করবীর সঙ্গে মিশে ঝরা-বকুলে সব ছেয়ে আছে—ঐখানে।

রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম সে আমি জানিনে। হয়ত অনেক টাকা খরচ ক'রে মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে—

রাজলক্ষ্মী কহিল না, হ'লো না। সে বকুল-তলা ছেড়ে আর যাবে না। গাছের ডালে ডালে করবে পাখীরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুকনো পাতা, শুকনো ডাল, সে সব মুক্ত করবার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব কবিদের গান; তার পর সময় হলে ডেকে বলবে, কমললতা-দিদি, আমাদের এক ক'রে দিও সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা ব'লে চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিও মন্দির গড়িয়ে, কোরো রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা; কিন্তু দিও না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।

বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার ছবিটি যে হ'লো আরও মধুর, আরও সুন্দর।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এ তো কেবল কথা গেঁথে ছবি নয় গোসাঁই! এ যে সত্যি। তফাৎ যে ঐখানে। আমি পারবো, কিন্তু তুমি পারবে না। তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হ'য়েই থাকবে। [শ্রীকান্ত, চতুর্থ পর্ব্ব, পৃ: ২০৪-২০৬]

পড়িবার সময়ে প্রথমেই মনে হইবে, রাজলক্ষ্মী যদি একটা বাস্তব চরিত্রই হয় তবে সে কি এমন কাব্য রচনা করিয়া কথা কহিতে পারে? অতএব এ চরিত্র বাস্তব হইতে পারে না; এ চরিত্র নয়, একখানি কাব্যময় চিত্র। কিন্তু ভুল আমাদেরই, আমরা উহার ঐ কবিত্বটাকেই বড় করিতেছি,—হৃদয়টাকে নয়; বাস্তব-বুদ্ধির বশে মনে করিতেছি, উহা মিথ্যা। একথা আমরা ভুলিয়া যাই যে, বাহিরের সত্যটাই কবিত্বহীন, ভিতরের সত্যটা—মানব-মানবীর সেই অন্তরের রূপটা—কবিত্বের অধিক, কোন কবিত্বই তাহার চেয়ে বড় নয়। ঐ কথাগুলি এমন ভাষায় এমন করিয়া নিশ্চয় সে বলে নাই, কিন্তু ঐ কালে দুই হৃদয়ের মধ্যে যে বোঝাপড়া চলিতেছে তাহাতে শ্রীকান্ত তাহার অন্তঃকর্ণে রাজলক্ষ্মীর কথা ঠিক ঐরূপই শুনিয়াছিল তাহার বাহিরের অর্দ্ধস্ফুট, অসম্বদ্ধ বাণীকেই সে সম্পূর্ণ করিয়া লইয়াছিল। শ্রীকান্ত সেই বাস্তব রাজলক্ষ্মীকেই গভীরতর বাস্তবরূপে দেখিয়াছে—তাহাকেই সে ঐ বাণীমূর্ত্তি দিয়াছে। কিন্তু আমার উপস্থিত প্রয়োজন অন্যরূপ। এই চরিত্র এবং এই ঘটনা যে কল্পিত নয়, উহা যে লেখকের অতিশয় ঘনিষ্ঠ, আত্ম-

 দা।৮.১৪৭

সম্পর্কিত একটি ঘটনা, এজন্য ঐ চরিত্র, ও তাহার মুখের ঐ কথা যে সত্য হইতে বাধ্য, ইহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই স্বীকার করিতে হইবে। উহার মধ্যেই শ্রীকান্তের একটা এমন পরিচয় রাজলক্ষ্মীর জবানীতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে যাহা লেখক শরৎচন্দ্রের একটা Confession বা আত্মকথা না হইয়া পারে না, তিনিও উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর ঐ শেষ কথাগুলি যেমন করুণ, তেমনই নির্ম্মম ও নিদারুণ। রাজলক্ষ্মী যে তাহাকে কিরূপ চিনিয়াছে—শ্রীকান্তের ঐ আত্ম-মমতা বা আত্মাভিমানের অন্তরালে যে একটা শূন্যময় গহ্বর রহিয়াছে, এবং সেই শূন্য সে অবশেষে কোন্ উপায়ে পূর্ণ করিয়া জীবনের নিষ্ফলতা-বোধ নিবারণ করিবে, রাজলক্ষ্মীর ঐ শেষ কথাগুলির মধ্যে শ্রীকান্ত সেই ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল—সে চকিতে আপনারই একটা রূপ দেখিতে পাইল। "এ তো কেবল কথা গেঁথে ছবি নয়, গোসাঁই। তোমার আঁকা কথার ছবি কেবল কথা হয়েই থাকবে।" এ পরাজয় শ্রীকান্ত স্বীকার করিয়াছে, এমন স্বীকৃতি এ গ্রন্থে আর কোথাও নাই। শ্রীকান্ত তাহার জীবনের সেই দারুণ নিষ্ফলতার কথা জানে; সে যে আসলে 'ভবঘুরে', তাহার সংসার নাই, সমাজ নাই—কোন বাঁধনই যে তাহার জীবনে সত্যকার বাঁধন হইতে পারে না, অতএব সে-জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কি—তাহার আভাস ঐ নারীর মুখে পাইয়া সে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করে নাই; সে তাহা স্বীকার করিয়াই লইয়াছে। এ সকল তাহার জীবনের সত্য হইতে পারিবে না, স্বপ্নের বস্তু বা আর্টের বিষয় হইয়া থাকিবে। রাজলক্ষ্মী তাহার জীবনব্যাপী বেদনার এক অন্তিম মুহূর্ত্তে ঐ যে ভবিষ্যৎবাণী করিল, তাহা কচের প্রতি দেবযানীর সেই অভিশাপ-বাক্য নয়; তাহার কোন অভিমান বা অভিযোগ নাই; সে কেবল নিজ জীবনের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিকে যেন যোগীর দৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছে—শ্রীকান্ত সেই নিয়তিরই একটা অঙ্গস্বরূপ; বেদনার দিব্য-চেতনায় সে কেবল তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে মাত্র—"like some bold seer in a trance, seeing all his own mischance"। তাহার তদানীন্তন মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে আরও কত কি পাওয়া যাইবে; শ্রীকান্তের প্রতি একটি অপূর্ব্ব মমতাও তাহাতে আছে; তার কারণ, নিজ জীবনের কোন পরিণাম-চিন্তা শ্রীকান্তের নাই বলিয়া যে ব্যর্থতাবোধও নাই, রাজলক্ষ্মীর সে বোধ আছে, তাই এই মানুষটির প্রতি তাহার মমতার অন্ত নাই। এই যে একটি দৃশ্য বা ঘটনা এই কাহিনীর একস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে, ইহা ঔপন্যাসিক প্রয়োজনে ত নহেই, কোন প্রয়োজনেই নহে—এ চরিত্রও যেমন, ঐ দৃশ্যটিও তেমনই, একটা অবারণ এবং অকারণ আবির্ভাব—কল্পিতও নয়, ঈপ্সিতও

নয়; বাস্তবতার সেই পূর্ব-লক্ষণ ইহাতে আছে। অকারণ এই জন্য যে, শ্রীকান্তের অন্তরঙ্গ হইয়াও, এ কাহিনীর এতখানি অংশ গ্রহণ করিয়াও, নায়কের চরিত্রে বা জীবনে রাজলক্ষ্মী কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে নাই। তবে ঐ চরিত্র, রূপে, রঙে ও রেখায় এত বৃহৎ, এত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে কেন? তাহার কারণ, শ্রীকান্ত ইহাকেও দেখিয়াছে; অন্নদাদিদি ও কমল-লতার মতই এ চরিত্র, আর একদিক দিয়া আর এক প্রকারে তাহার অন্তর-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল।

শুধুই এইরূপ আত্মজীবনঘটিত নয়, অপেক্ষাকৃত নিঃসম্পর্কিত অনেক নরনারীর কাহিনী ইহাতে স্থান পাইয়াছে—কতক দেখা, কতক হয় ত' বা শোনা। সেখানে শ্রীকান্ত দর্শকমাত্র। ইহার অধিকাংশ যদি অভিজ্ঞতা-প্রসূতও হয়, তথাপি তাহারা সেই আত্মকাহিনীর অন্তর্গত নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সেখানে মানুষ শ্রীকান্ত অপেক্ষা লেখক শরৎচন্দ্রকে আমরা বিশেষরূপে পাইয়া থাকি। অনেক স্থলে তিনি বাস্তবকে নিজ ভাবুকতা ও ভাবপ্রবণতার বশে হয় ত' অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, আবার কোথাও বস্তু ও চরিত্রবিশেষের দুর্লক্ষ্য বা উপেক্ষিত দিকটি, আমাদের অন্তশ্চক্ষুর গোচর করিয়াছেন। এ সকলই এ কাহিনীর সেই আর এক দিক যাহার কথা আমি বারবার উল্লেখ করিয়াছি, ইহাতে শ্রীকান্তের আত্মহারা আত্মপরিচয় নাই—পরবর্তীকালের লেখক শরৎচন্দ্রের, শিল্পী শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক আত্মনিবেদন আছে। এই আলোচনায় আমি সেই দুই দিক দেখিব, কিন্তু দুইটিকে সর্ব্বদা পৃথক রাখিবার চেষ্টা করিব।

এতক্ষণে, বোধ হয় আমি 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' বলিতে কি বুঝি ও বুঝাইতে চাই তাহার কিছু আভাস দিতে পারিয়াছি। আমি যে খাঁটি সাহিত্যিক প্রমাণের উপরেই নির্ভর করিয়া ঐ শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের আত্মপরিচয় কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য; এই প্রমাণ ঘটনা বা তথ্য-প্রমাণের মত অকাট্য হইবে না—হইতে পারে না। ইংরাজীতে যাহাকে internal evidence বলে ইহা কতকটা সেইরূপ, তথাপি ইহা ততখানিও যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ—প্রমাণটা মূলে ভাবগত, চিন্তাগত নহে। পাঠক-পাঠিকাগণকে সেই ভাব-ভূমিতে একটু তুলিয়া ধরিতে পারিলেই আমাকে আর বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে না। এজন্য, আমি নিজে কেমন করিয়া, কি কারণে এ বিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছিলাম, সে কথা বলিব। সমস্ত কাহিনীর প্রায় শেষে আসিয়া সহসা বিদ্যুৎচমকের মত ঐ সত্য আমার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তখন আমার আর সন্দেহ রহিল না যে, এ কাহিনী আত্মকাহিনীই বটে; উপন্যাসের আবরণতলে একটি স্থানে সেই

আবরণ মুক্ত হইয়া গেল, আত্মার এমন একটি আর্ত্তরব এমন গভীর অথচ এমন শ্রান্তস্বরে আর কোথাও ধ্বনিত হইতে শুনি নাই। তখন বুঝিলাম, এই উপন্যাসের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকল বর্ণনা, সকল খণ্ড-কাহিনী, সকল ঘটনা ও সকল দৃশ্যের অন্তরালে একটি মানুষই দাঁড়াইয়া আছে; সে মানুষ কেবল একটি কথাই বলিতে চায়, কিন্তু কিছুতেই বলিয়া উঠিতে পারিতেছে না,—শেষপর্য্যন্ত পারেও নাই, হঠাৎ থামিয়া গিয়াছে। পরের কথা সে ভাল করিয়া বলিতে পারে—আপনার কথা তেমন করিয়া বলা যায় না; তাই উপন্যাসের ভঙ্গিতে সে সেই কথাটাই নানা ছলে বলিয়াছে—পরের কাহিনীতে নিজের প্রাণকেই মুক্ত করিয়াছে। তথাপি এই শেষ পর্ব্বে সেই আবরণ আর নাই; এখানে আত্মকথা ছাড়া আর কিছুই নাই। ইহারই একস্থানে ঐ আর্ত্তরবে আমি চমকিত হইয়াছিলাম—এক নিমেষে সমগ্র মানুষ ও তাঁহার সমগ্র জীবনকে দেখিতে পাইলাম। ইহা এমন একটা human document যে, ইহার স্বাক্ষর জাল হইতে পারে না। আমি সেই স্থানটিও উদ্ধৃত করিতেছি, জানি না, পাঠক-পাঠিকাগণ ইহাতে আমার মতই সেই চমক অনুভব করিবেন কি না। ভবঘুরের জীবনে কোথাও হৃদয়ের আশ্রয় মিলিল না; কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, অথচ একটা কিসের যেন শূন্যতা, একটা বিরাট নৈরাশ্যের বেদনা তাহাকে বিধুর করিয়া তোলে। জীবনের সর্ব্বত্রই নিষ্ফলতা, সর্ব্বত্রই ফাঁকি; ধ্বংস ও মৃত্যু, ক্ষুদ্রের আত্মপ্রবঞ্চনা এবং মহতের আত্মনিগ্রহ, স্নেহ-প্রেম-বন্ধুতার সকরুণ পরাজয়—জীবনের বাস্তব রূপ ত' ইহাই। শ্রীকান্ত একদিন হঠাৎ তাহার জীবনের সেই মূর্ত্তিকে যেন প্রত্যক্ষ করিল; একটা নূতনতর বিচ্ছেদ, দারুণতম নিষ্ফলতা সেই শূন্যতাবোধকে এমনই তীব্র তীক্ষ্ণ করিয়া তুলিল যে, সহসা তাহার চতুর্দ্দিকের সর্ব্ব-বস্তু সেই হাহাকারের প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। ব্যক্তির সেই অতিশয় ব্যক্তিগত অনুভূতি যেন বিশ্বগত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু ঐ ভাবটাই নয়, উহার যে রূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ, তাহা বাস্তব; উহাতে ভাব-কল্পনার সত্য নয়—প্রাণের সত্যই আছে। এইবার আমি সেই স্থানটি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি।

> সারি সারি অনেকগুলা বাগানের পরে একটু খোলা জায়গা, অন্যমনে হয়ত' এটুকু পার হইয়া আসিতাম, কিন্তু সহসা বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় পরিচিত ভারি একটা মিষ্ট গন্ধে চমক লাগিল—এদিকে ওদিকে চাহিতেই চোখে পড়িয়া গেল, বাঃ! এ যে আমাদের সেই বশোদা-বৈষ্ণবীর আউশ ফুলের গন্ধ!...ইহার নীচে ছিল যশোদার স্বামীর সমাধি।...এই আউশ গাছের একটা শুকনো ডালের উপর কাদা দিয়া জায়গা করিয়া যশোদা সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ দিত।...

চোখে পড়িল গাছের একধারে আর একটি ছোট মাটির ঢিপি—বোধ হয় যশোদারই হইবে,… বিছুটি ও বন-চাঁড়ালের গাছে গাছে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, যত্ন করিবার কেহ নাই।

দেখি, সন্ধ্যা-দেওয়া সেই দীপটি আছে নীচে পড়িয়া, এবং তাহারই উপরে সেই শুক্‌নো ডালটি আছে আজও তেমনি তেলে-তেলে কালো হইয়া।…

কুড়ি পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বের কত কথাই মনে পড়িল। কঞ্চির বেড়া দিয়া ঘেরা, নিকানো-মুছানো যশোদার উঠান আর সেই ঘরখানি। সে আজ এই হইয়াছে! কিন্তু এর চেয়ে ঢের বড় করুণ বস্তু তখনও দেখা বাকি ছিল। অকস্মাৎ সেই ঘরের মধ্যে হইতে ভাঙা চালের নীচ দিয়া একটি কঙ্কালসার কুকুর বাহির হইয়া আসিল।…

বলিলাম, আজও তুই এখানে আছিস? প্রত্যুত্তরে সে কেবল মলিন চোখদুটো মেলিয়া অত্যন্ত নিরুপায়ের মত আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

এ যে যশোদার কুকুর তাহাতে সন্দেহ নাই। ফুল-কাটা রাঙা পাড়ের সেলাই-করা বক্‌লস এখনও তার গলায়। নিঃসন্তান রমণীর একান্ত স্নেহের ধন এই কুকুরটা একাকী এই পরিত্যক্ত কুটিরের মধ্যে কি খাইয়া যে আজও বাঁচিয়া আছে ভাবিয়া পাইলাম না। অর্দ্ধাশনে অনশনে এইখানে পড়িয়াই এ বেচারা বোধ হয় তাহারই পথ চাহিয়া আছে—যে তাহাকে একদিন ভালবাসিত।…মনে মনে বলিলাম, এ-ই কি এম্‌নি? এ প্রত্যাশা মুছিয়া ফেলা সংসারে এতই কি সহজ?…

যাবার পূর্ব্বে চালের ফাঁক দিয়া ভিতরটা একবার দৃষ্টি দিয়া লইলাম।…পাশের কুলুঙ্গিতে তেমনি দুর্দ্দশায় পড়িয়া আছে সেই রঙ-করা হাঁড়িটি।…মনে হইল, বাড়ীর এককোণে এ যেন মৃত শিশুর পরিত্যক্ত খেলাঘর।…

কুকুরটা একটুখানি সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থামিল। যতক্ষণ দেখা গেল দেখিলাম, সে বেচারা এইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সহিত পরিচয়ও এই প্রথম শেষও এইখানে, তবু আগু বাড়াইয়া বিদায় দিতে আসিয়াছে। আমি চলিয়াছি কোন্‌ বন্ধুহীন লক্ষ্যহীন প্রবাসে, আর সে ফিরিবে তাহার অন্ধকার নিরালা ভাঙাঘরে। এ সংসারে পথ চাহিয়া প্রতীক্ষা করিতে উভয়ের কেহ নাই।

বাগানটার শেষে সে চোখের আড়ালে পড়িল, কিন্তু মিনিট-পাঁচেকের এই অভাগা সঙ্গীর জন্য বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চোখের জল আর সামলাইতে পারি না, এমনি দশা।

[শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব্ব, পৃঃ ১২৪-২৭]

এখানে আমরা কাহাকে দেখিতেছি? ঐ শ্রীকান্ত কে? ঐ বিজন বনে মনুষ্য-শিশুর ঐ পরিত্যক্ত খেলাঘর, মানুষের মত ব্যথাতুর হতভাগ্য ঐ মূক পশু —এই সকলের মধ্যে যে নিজ জীবনের প্রতিবিম্ব দেখিয়া আর আত্মগোপন করিতে পারিতেছে না, সে এখানে কাহার জবানীতে কথা কহিতেছে? ঐ দৃশ্য, ঐ ঘটনা কি একটা ভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য কবির উদ্ভাবনা মাত্র? না, ঠিক ঐ প্রতিবেশ এবং ঐ মুহূর্ত একটা পরমক্ষণের মত—অদৃষ্টের মত আবির্ভূত হইয়াছে? ঐ যে বুকের ভিতরটা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ঐ কান্নার জন্য ঘটনাটি উদ্ভাবিত হয় নাই, ঘটনাটি ঘটিয়াছিল বলিয়াই এমন কান্না সম্ভব হইয়াছে। আমি উহাই চকিতে অনুভব করিয়াছিলাম; এখানে যে একান্ত ব্যক্তিগত বেদনা ক্ষতমুখে

শোণিতের মত অনিবার্য্যবেগে নির্গত হইয়াছে তাহাকে সন্দেহ করিবার উপায় নাই ; সমগ্র 'শ্রীকান্ত' যে বিরহ-ব্যথার কাব্য, সেই বিরহ যাহার—সেই মানুষ ঐ একটি মুহূর্ত্তে, ঐ পরিবেশের মধ্যেই আপনার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছে। এই প্রসঙ্গের আরম্ভে লেখক নিজেও শ্রীকান্তের জবানীতে বলিয়াছেন—"একটা নিমেষও তীক্ষ্ণতায় তীব্রতায় সমস্ত জীবনকে অতিক্রম করিতে পারে" আমরা বলি, অতিক্রম নয়—উদ্ভাসিত করিতে পারে। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে কবি যেমন সময়ে সময়ে নায়কের মারফতে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করিয়া লন, তাহাতেও একরূপ তৃপ্তি হয়,—ইহা তেমন নয়, কারণ সেই নাটকীয় আর্ট এখানে নাই ; ইহা একান্তই আত্মনিবেদন, এবং তাহাও যেন অপরের নিকটে নয়, নিজেরই নিকটে—এ ক্রন্দন নিঃসঙ্গ আত্মার নিরুদ্দিষ্ট আর্ত্তরব।

(৩)

শরৎচন্দ্রের কৈফিয়ৎ

There are two conditions of my mental existence—the condition of a lucid reason, not to be disputed, and belonging to the memory of events forming the first epoch of my life, and a condition of shadow and doubt, appertaining to the present. Therefore, what I shall tell of the earlier period, believe; and to what I may relate of the later time, give only such credit as may seem due. —*EDGAR ALLAN POE*

উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলির একভাগ আমার, অপরভাগ শরৎচন্দ্রের—যদিও উহার সবটাই শরৎচন্দ্র মানিয়া লইতেন, যদি ঐ আত্মকাহিনীকে আমার মত, তাঁহারও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইত। শ্রীকান্তের পশ্চাতে দণ্ডায়মান শরৎচন্দ্রের কিছু কৈফিয়ৎ এই গ্রন্থে আছে, উপন্যাসখানির ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহার সেই কৈফিয়ৎ উদ্ধৃত করিব এবং সে সম্বন্ধে কিছু বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ যেন শরৎচন্দ্রের স্বপ্নদৃষ্ট আত্ম-প্রতিমূর্ত্তির কাহিনী, এখন জাগিয়া উঠিয়া তিনি সেই স্বপ্ন স্মরণ ও তাহার অর্থ সন্ধান করিতেছেন। সে যে কত দুরূহ তাহা তিনিও জানেন, বরাবর বলিতেছেন—যেমনটি দেখিয়াছি তেমনই বলিব; কোন বিচার বা সমালোচনা নয়, কেবল সেই দেখার বিস্ময় এবং তজ্জনিত জিজ্ঞাসামাত্র আছে। সে যতই বিস্ময়কর বা অবিশ্বাস্য হউক, তাহা তাঁহার নিকটে কত সত্য ইহাই তিনি পাঠকগণকে বারবার বলিয়াছেন। অবিশ্বাস করিবার কারণ যে আছে! যাহা ভাবলোক বা কল্পলোকের সত্য তাহাকে উপন্যাসের রস-সত্যরূপে পাঠক গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু তাহা যে কাহারও জীবনেরও সত্য হইতে পারে, অর্থাৎ তাহা যে 'fact'—বিশেষ করিয়া ঐ সকল ঘটনা ও কথোপকথন—ইহা বিশ্বাস করা শক্ত। এ সকল কি অর্থে কতখানি সত্য, আমি তাহা বলিয়াছি। তথাপি, হয়ত যাহা যতটুকু সত্যই ঘটিয়াছিল, আজ তাহা দূর অতীতের স্বপ্নরূপে কিছু কবিত্বময় হইয়াছে, যাহা সামান্য তাহা অসামান্য বোধ হইতেছে—তাহার যে-অর্থ ছিল না, আজ তাহাও, লেখক নিজের

প্রৌঢ় পরিপক্ব চিন্তা ও সাহিত্যিক মনোভাবের বশে, তাহাতে যুক্ত করিয়াছেন। ইহাও স্বাভাবিক; তথাপি শরৎচন্দ্র তাহা স্বীকার করেন না—ইহার কারণ ব্যক্তিগত; অতএব সেখানে সাধারণ সত্যাসত্য-বিচার চলিবে না। সন্দেহের সদুত্তর তিনিও দিতে পারেন না; কারণ, বহুস্থলে এমনই মনে হয় যে, তাঁহার ভাবালুতা ও অতিরিক্ত সহানুভূতি বাস্তবের আকার-আয়তনকে অতিক্রম করিয়াছে; একটা প্রতিক্রিয়া বা বিদ্রোহী মনোভাবের বশেও তিনি হয়ত কোথাও ছোটকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন—যেমন, এই উপন্যাসের 'অভয়া'-চরিত্র। এ সকল সেই আত্মকাহিনীর বাহিরে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার প্রাণ-মনের আদি-পরিচয়টি কোথাও হারাইয়া যায় নাই—নিজ-স্বভাবের সত্যকে তিনি আশ্চর্য্যরূপে পালন করিয়াছেন; সকল নব নব আক্ষেপ-বিক্ষেপেও যেমন, ভাবুকতাপূর্ণ তত্ত্ববিচারের অন্তরালেও তেমনি, সেই এক শ্রীকান্ত তাহার জন্মগত বা প্রকৃতিগত সংস্কারকে—তাহার স্বভাবের দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তিকে অবশে স্বীকার করিয়াছে; উহা হইতে যে কাহারও নিষ্কৃতি নাই! এই কাহিনীতে যেখানে যত সজ্ঞান বিদ্রোহ ও তত্ত্বদৃষ্টির প্রয়াস আছে, তাহা একদিকে যেমন একটি স্পর্শকাতর হৃদয়ের উত্তেজনামূলক, তেমনই পদে পদে ভিতর হইতে একটা কি-যেন কিসের প্রতিবাদ তাঁহাকে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত বা সংশয়মুক্ত হইতে দিবে না; এই দ্বন্দ্ব কখনও ঘুচে নাই। বেশ মনে হয়, তাঁহার প্রাণ যাহা বিশ্বাস করিতে উদ্‌গ্রীব, তাহাকেই তিনি বেশি করিয়া অস্বীকার করিবেন। এই প্রাণের সত্যই এ কাহিনীর প্রথম পর্ব্বে বিশেষ করিয়া ধরা দিয়াছে। সেই সত্যের আলোকে তিনি যাহা অপরোক্ষ করিয়াছিলেন, আজ এতদিন পরে, তাঁহার মন-বুদ্ধি তাহার উপরে একটা অস্বচ্ছ আবরণ টানিয়া দিয়াছে; সে সত্য তাঁহার নিকটেও আর ততখানি নিঃসংশয় নহে,—তাই তাহাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে তাঁহারও সঙ্কোচ বোধ হয়; অথচ একদিন তিনি তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন! এইজন্য আজ তাহারও কৈফিয়ৎ আবশ্যক হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বলিতেছেন—

(১) এমন করিয়া ভগবান যাহাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিত্ব সৃষ্টি করা চলে না। চলে শুধু সত্য কথা সোজা করিয়া বলা। অতএব আমি তাহাই করিব।

[প্রথম পর্ব্ব, পৃঃ ২]

(২) আমি বেশ জানি, এই যে কাহিনী আজ লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লোকে দ্বিধা ত' করিবেই, পরন্তু উদ্ভট কল্পনা বলিয়া মনে করিতেও হয় ত' ইতস্ততঃ করিবে না। তথাপি, এতটা জানিয়াও যে লিখিলাম, ইহাই অভিজ্ঞতার সত্যকার মূল্য। কারণ, সত্যের উপরে না দাঁড়াইতে পারিলে কোনমতেই এই সকল কথা মুখ দিয়া বাহির করা যায় না,

প্রতিপদেই ভয় হইতে থাকে, লোকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। জগতে বাস্তব-ঘটনা যে কল্পনাকেও অতিক্রম করিয়া যায়, এ কৈফিয়ৎ নিজেকে কোন জোরই দেয় না, বরঞ্চ হাতের কলমটাকে প্রতি হাতেই টানিয়া ধরিতে থাকে। [প্রথম পর্ব্ব, পৃঃ ৬৬]

(৩) মানুষের অন্তর জিনিষটিকে চিনিয়া লইয়া, তাহার বিচারের ভার অন্তর্যামীর উপর না দিয়া, মানুষ যখন নিজেই তাহা গ্রহণ করিয়া বলে, আমি এমন, আমি তেমন, এ কাজ আমার দ্বারা কদাচ ঘটিত না, সে কাজ আমি মরিয়া গেলেও করিতাম না—আমি শুনিয়া আর লজ্জায় বাঁচি না। আমার শুধু নিজের মনটাই নয়, পরের সম্বন্ধেও দেখি, তাহার অহঙ্কারের অন্ত নাই। একবার সমালোচকের লেখাগুলা পড়িয়া দেখ—হাসিয়া আর বাঁচিবে না। কবিকে ছাপাইয়া তাহারা কাব্যের মানুষটিকে চিনিয়া লয়! লোকে বাহবা দিয়া বলে,—"বাঃ রে বাঃ! এই ত' ক্রিটিসিজম! একেই ত' বলে চরিত্র-সমালোচনা!...মনে মনে বলি, "হারে পোড়া কপাল! মানুষের অন্তর জিনিষটা যে অনন্ত, সে কি শুধু একটা মুখেরই কথা; ...তোমার কোটী কোটী জন্মের কত অসংখ্য কোটী অদ্ভুত ব্যাপার এই অনন্তে মগ্ন থাকিতে পারে, এবং হঠাৎ জাগরিত হইয়া তোমার ভূয়োদর্শন, তোমার লেখাপড়া, তোমার মানুষ বাছাই করিবার জ্ঞানভাণ্ডটুকু এক মুহূর্ত্তে গুঁড়া করিয়া দিতে পারে...।" [ঐ, পৃঃ ১২৭-১২৮]

উপস্থিত এই কথা কয়টিই যথেষ্ট। আমরা 'শ্রীকান্ত'-লেখক শরৎচন্দ্রের কৈফিয়ৎ ইহাতেই পাইতেছি, তাহাতে লেখক যে নিজে এই কাহিনী সম্বন্ধে কতখানি সতর্ক ও সচেতন, তাহাও বুঝিতে পারি। বিশেষ করিয়া ঐ শেষের উক্তিগুলিতে আমরা একটি অতি-গভীর সাহিত্যিক তত্ত্বকথার ইঙ্গিত পাই। তাহা এই যে,—আপনাকে যেমন, পরকেও তেমনই, কে কবে সম্পূর্ণ আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক কথা, আমিও প্রথম হইতেই তাহাই বলিতেছি। যেহেতু এই কাহিনী মানুষের কাহিনী এবং মানুষের অন্তর জিনিষটা অনন্ত, সেইহেতু তাহার সত্যাসত্য-বিচার মানুষের অসাধ্য বলিয়াই তেমন দাবী সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষেও স্পর্দ্ধা মাত্র। কথাটা একটু বুঝিয়া লইতে হইবে, কারণ সাহিত্য-সৃষ্টি ও সাহিত্য-সমালোচনা—এই দুইয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। মানুষের কাহিনী যে-সাহিত্য, তাহা যেমন মনুষ্যজীবনের মতই অপার রহস্যপূর্ণ, তেমনই, সেই সাহিত্যের সমালোচনাও ঐ রহস্যকে স্বীকার করে, করে বলিয়াই সেই সমালোচনা মূল সৃষ্টির অনুবন্ধী হয়—তাহাও সৃষ্টিধর্ম্মী। সাহিত্য-সমালোচনার আধুনিক নীতি ও পদ্ধতি কাব্যের অন্তর্গত কবি-দৃষ্টিকেই প্রামাণ্য করিয়াছে, সেই দৃষ্টির সত্যকেই ধরিবার চেষ্টা করিয়াছে। শরৎচন্দ্র নিশ্চয়ই সেই সমালোচক ও সেই সমালোচনার উদ্দেশে ঐ কথাগুলি বলেন নাই; তিনি বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা-পুস্তক ও সাময়িক পত্রের সমালোচকগণকে স্মরণ করিয়াছিলেন। না করিয়া উপায় ছিল না, কারণ

ইহারাই বাংলাসাহিত্যের হট্টমন্দিরে, ও বাংলার বিদ্যাপীঠগুলিতে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ করিয়াছে। ইহাদিগের ভয়ে, তাঁহাকেও বলিতে হইয়াছে,—আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি, আমি কবিত্ব করি নাই, তোমাদের পুঁথিগত সাহিত্যিক কলাবিধি—তোমাদের সাইকোলজির শাসন মান্য করিয়া—তোমাদের ধারণা ও সংস্কার, তোমাদের পাণ্ডিত্য ও রস-বুদ্ধির ফরমায়েস মত, কিছু রচনা করি নাই। এই যে সতর্ক-বাণী ও ভৎর্সনা, বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে ইহার প্রয়োজন থাকিলেও, নিখিল-সাহিত্যবিজ্ঞানের দিক দিয়া ইহা সত্য কি না,—আমি এইখানে সে সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মনুষ্যজীবনের কাব্যকার হওয়া যে সহজ নয়, বরং, তাহার মত আর্ষ-প্রতিভা আর কিছুই হইতে পারে না—একথা যুগে যুগে নানাভাবে ও নানা অর্থে সকল দেশেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু দেশ ও কালের, বা যুগবিশেষের সংস্কার, অথবা অতিশয় অলস, অসত্যপরায়ণ মনোবিলাসীদের রুচির অনুবর্ত্তন করিয়া, যে অসংখ্য কাব্য-নাটক-উপন্যাস রচিত হইয়া থাকে, তাহাদের লেখকও যেমন আত্মকৃতিত্বের গরিমায় অন্ধ, সমালোচকেরাও তেমনি সেই সকলের উৎকর্ষ-অপকর্ষ-নির্ণয়ে নিজেদের কেতাবী বিদ্যার কসরৎ প্রদর্শন করিতে পারিলেই সাহিত্যিক সর্ব্বজ্ঞতার অধিকারী হয়। এমন ঘটনা এই দেশেই ঘটে; ঘটিলেও কোন ক্ষতি ছিল না; কিন্তু বিপদ হইয়াছে এই যে, বাংলায় কিছু সত্যকার সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিক কাল্‌চারটা এখনও সমাজগত হয় নাই, উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত; অথচ সাহিত্যের বিচার করিয়া থাকে সেই সমাজ—যাহার সাহিত্যবুদ্ধি ত পরের কথা, গত দুইপুরুষ ধরিয়া, শিক্ষার ক্ষেত্রটাও 'নাড়া'-বনে পরিণত হইয়াছে—'পুণ্যক্ষেত্রমাঝে কূপ-খনন' চলিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই সমাজের তথাকথিত সাহিত্যিক ও সমালোচকদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া জীবনকেই সাহিত্যের উপরে স্থান দিয়াছেন, অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাহিত্য-ধর্ম্মই পালন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আমার এই রচনা যদি তোমাদের ঐ পাণ্ডিত্য বা রুচিসম্মত না হয়, তাহাই বাঞ্ছনীয়। ইহা আক্ষেপ-অভিমানের কথা—আমাদের দেশের পণ্ডিতম্মন্য রুচিবাগীশ সাহিত্যাচার্য্যগণের বিরুদ্ধে মর্ম্মান্তিক অভিযোগ। কিন্তু এ অভিযোগ খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে যেমন, সত্যকার সমালোচনার বিরুদ্ধেও তেমনই অনাবশ্যক। সাহিত্য জীবনের উপরে নয়, জীবনই সাহিত্যের উপরে। কে এমন দম্ভী আছে যে, সাহিত্যের সেই জীবন-দর্শনকে, কবির সেই দিব্যদৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করিয়া, তাহার সত্যাসত্য-

বিচারে স্মৃতি-সংহিতার সূত্র আওড়াইবে? যে পুণ্যবান রসপ্রমাতা সেই সাহিত্যের সম্মুখীন হ'ন, তিনি যে কোনরূপ মাপকাঠি ব্যবহারের সুযোগই পান না! সেই অপার রহস্যের বাণীরূপটাই তিনি দৃষ্টিমাত্রে হৃদয়গোচর করেন এবং সে রহস্য ভেদ করিতে গিয়া তাহার দিগন্তকে আরও অন্তহীন করিয়া তোলেন। এই 'শ্রীকান্ত' যদি উপন্যাস না হইয়াও থাকে—কারণ, ইহা কোন বৈধ রীতির অনুসরণ করে নাই—সেজন্য, তাহার একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য হইতে বাধা নাই। তেমনই, এই কাহিনীতে পাত্র-পাত্রীগণের যে চরিত্র-চিত্র আছে তাহা সমালোচকের পুঁথিগত বিদ্যার অভিমান চরিতার্থ না করিলেও, সত্য ও অনবদ্য না হইবার হেতু নাই। কতকগুলা সমালোচনা-গ্রন্থ পড়িয়া আমরা যে জ্ঞান লাভ করি, অথবা অতিশয় নিকৃষ্ট উপন্যাস ও গল্পরাশি পাঠ করিয়া আমাদের যে রুচি ও যে সংস্কার জন্মে, জীবনকে প্রত্যক্ষ-বিচার করিবার পক্ষে তাহার মূল্য কতটুকু? তথাপি উপন্যাসের নামে যে সকল অপকৃষ্ট ও অনুৎকৃষ্ট রচনা জীবনকে দেখাইবার ভান করে, তাহাদের অন্তর্গত সেই মিথ্যার দুর্নীতিপূর্ণ চরিত্র ও উদ্ভট কাহিনীর স্বপক্ষে, এবং সমালোচকদের বিরুদ্ধে—শরৎচন্দ্রের ঐ অভিযোগ যে সত্য নয়, তিনি নিজেও তাহা নিশ্চয় স্বীকার করিতেন। এই সকল গল্প-উপন্যাস প্রভৃতির সম্বন্ধেই আমাদের সমালোচকগণের লেখনীতে খই ফুটিতে থাকে —তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও রসবোধ প্রয়োগের এমন স্থান আর নাই। যাহারা ঐ কাজ করিয়া থাকে, তাহারা মুড়ি-মিছরীকে এক করিয়া ওজন ত' করেই, পরন্তু মুড়িকেই মিছরীর উপরে স্থান দিয়া থাকে, দৃষ্টান্তের অভাব নাই। য়ুরোপীয় সাহিত্যে জীবনের অতি-গভীর, বহুবিচিত্র, জটিল বিস্তার যে অপূর্ব্ব রূপ-রসে মণ্ডিত হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যে তাহা এখনও হইবার অবকাশ ঘটে নাই। আমাদের সাহিত্য কাব্যপ্রধান, অর্থাৎ বস্তুর দিক দিয়া নয়—ভাবের দিক দিয়া—আমরা আমাদের সাহিত্যে জীবনের একটা রূপ সৃষ্টি করিয়াছি; তাহাও কয়েকটি শক্তিমান কবির দ্বারাই হইয়াছে—বাকি সব অল্পবিস্তর তাঁহাদেরই অনুকরণ। এই সাহিত্যের সমালোচনাতেও আমাদের রস-পণ্ডিতগণ পাণ্ডিত্যের যে বহর দেখাইতেছেন, তাহাতে জীবন-রস-রসিকতার ঐ দিকটাও চাপা পড়িয়া যাইতেছে। আবার, জীবনের যেটা বাস্তব দিক সেই দিকটিকে রসবৎ করিবার যে সাহিত্যিক প্রেরণা অতিশয় বর্ত্তমান কালে দেখা যাইতেছে, তাহাতে দুই এক জন শক্তিশালী লেখকের প্রাতিভ দৃষ্টির পরিচয় থাকিলেও, তাহা তেমন প্রসার লাভ করিতেছে না দুইটি কারণে; প্রথমতঃ, ঐরূপ কাব্যের যথার্থ রসবিচার এ পর্য্যন্ত হয় নাই—

সমালোচক নাই, এজন্য প্রতিভা আপন পথে নিঃসন্দিগ্ধভাবে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। দ্বিতীয়তঃ, নানাপন্থী অগণ্য তথাকথিত বাস্তববাদীর দল এমনই হট্টগোল তুলিয়াছে যে, তাহার ধমকে জীবনকে দেখিবার দৃষ্টিটাই স্থির থাকিতে পারিতেছে না। বস্তুর রসরূপ ও ভাবের রসরূপ দুইই সত্য—কবিদৃষ্টির প্রকারভেদ মাত্র। একজন জীবনের রহস্যকে ধ্যানে রূপময় করিয়া দেখেন, আর একজন সেই একই রহস্যকে প্রত্যক্ষ-বাস্তবের জবানীতে আর এক রস-রূপ দান করেন। কেহই সেই রহস্য-সমাধানের স্পর্দ্ধা করেন না—তাহার রূপ-সৃষ্টি করেন মাত্র। যিনি সেই স্পর্দ্ধা করেন, অর্থাৎ যিনি জীবনকে কোন একটা মতবাদের নজীর করিয়া—জীবনের কোন রূপসৃষ্টি নয়—তাহার একটা অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তিনি সাহিত্যস্রষ্টা নহেন—অতি ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচক মাত্র। অতএব কবির দৃষ্ট জীবন সম্বন্ধেও যেমন, তাহার সৃষ্ট মানব-মানবী সম্বন্ধেও তেমনি, সত্য-মিথ্যা, সম্ভব-অসম্ভবের কথাটাই বড় নয়; যদি সে প্রশ্ন উঠে, তবে তাহা নিরসন করাও সাহিত্য-সমালোচকের কাজ; কারণ যদি সেই রচনা খাঁটি কবিদৃষ্টি-প্রসূত হয়, তবে ঐরূপ প্রশ্নও ঠিক তর্কমূলক প্রশ্ন নয়—উহা সেই কবিকর্ম্মের গভীরতা-বোধ এবং তজ্জনিত পাঠকহৃদয়ের বিস্ময়পূর্ণ কৌতূহলের মত। কবির যদি সেই দৃষ্টি থাকে তবে জীবনের যে-রূপটি আমরা দেখিতে পাই না—তিনি সেই রূপ আমাদেরও দৃষ্টিগোচর করেন; তাহা সত্য কি মিথ্যা এমন প্রশ্ন রসিক পাঠকের চিত্তে জাগিতেই পারে না; কেবল ইহাই অনুভব হয় যে, আমরা যাহা দেখিতে পাই নাই, এখন তাহাই দেখিলাম; যাহা 'দেখিতেছি' তাহার আবার প্রমাণ কি? সত্য-মিথ্যার সন্দেহ নয়—সেই দৃষ্ট বস্তুর গভীর রহস্যময়তা আমাদের বুদ্ধির অতীত বলিয়াই, আমরা একরূপ বিস্ময় বোধ করি—তাহাও রসাস্বাদের অনুষঙ্গী। যদি সেই অনুভূতি পাঠকচিত্তে না হয়, তবে সেই কবির দৃষ্টি পূর্ণদৃষ্টি নয়, অথবা পাঠকের সংস্কার অন্যরূপ—তিনি রসিক নহেন।

তাহা হইলে কি বুঝিলাম? শরৎচন্দ্রের ঐ অভিযোগ, তাঁহার ঐ দ্বিধা-ভয়-জড়িত কৈফিয়ৎ নিতান্তই অনাবশ্যক—বাঙলার পাঠক-সমাজ তাহা প্রমাণ করিয়াছে। সমালোচকেরা প্রথম প্রথম বড় কলরব করিয়াছিল, পরে তাঁহার পক্ষেই ভোটাধিক্য দেখিয়া অগত্যা চুপ করিয়াছে; এবং আরও পরে, নব্য-সাহিত্যের নব্য-পণ্ডিতগণ, একদিকে ভক্তির আতিশয্য এবং অপরদিকে পাণ্ডিত্যের মর্য্যাদা এই দুইই রক্ষা করিতে গিয়া, একটি চমৎকার মাপকাঠি

বানাইয়া লইয়াছে—সেই মাপকাঠিকে গৌরব দিবার জন্যই শরৎচন্দ্রকেও গৌরব দিয়াছে। আমরা কোন মাপকাঠি ব্যবহার করিব না, তিনি যাহা যেমন দেখাইয়াছেন তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিব; শরৎচন্দ্রের ঐ কৈফিয়ৎ আমাদের নিকটে—কৈফিয়ৎ নহে—উৎসাহ-বাণী।

শ্রীকান্তের বাল্য-জীবন

(১)

ইন্দ্রনাথ

"The gentleman is not in your book."

—*Much Ado About Nothing.*

শ্রীকান্তের বাল্যজীবন, তাহার পিতামাতা বা ভাই-ভগিনীর কোন কথা এই কাহিনীতে নাই। আত্মীয়-সম্পর্কে পরের বাড়ীতে সে 'মানুষ' হইতেছে। সেখানে মানুষ হইবার যে পারিবারিক ব্যবস্থা, এবং লেখাপড়া শিখিবার যে পাকা বন্দোবস্ত তাহা সেকালের বাঙালী-সমাজের চক্ষে অতিশয় নির্দ্দোষ, কারণ, সে পরিবারের ভিতরে আচারনিষ্ঠা ও বাহিরের কঠিন শাসন, কোনটাতেই লেশমাত্র শৈথিল্য নাই। যে-জাতির চারিত্রিক মেরুদণ্ড বেতসধর্ম্মী, যাহার রক্তে ভাবের উদ্দীপনা সকল রীতি, নীতি ও শাসন-সংযমকে নিরন্তর লঙ্ঘন করিতেই উদ্যত; বিচার-বুদ্ধি, বিষয় বা বস্তু-জ্ঞান, এবং ব্যাবহারিক জগতে আত্মপ্রসারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—এ সকলই যাহার মেধা ও প্রতিভার অনুকূল নয়, সে জাতিকে বাঁচিতে হইলে—দ্বীপবাসিনী মোহিনী রাক্ষসীর উন্মাদকর সঙ্গীত শুনিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে—জাহাজের মাস্তলটায় নিজের দেহটা বাঁধিয়া ফেলিতে হয়। বাঙালীও সেইজন্য তাহার সেই অলস ভাববিলাসী আত্মাটাকে নৈষ্কর্ম্ম্যের সুখাস্বাদনে মুক্তি দিবার জন্য, বাহিরে সমাজের খুঁটিতে নানা আচার-অনুষ্ঠানের কঠিন বন্ধন-পাশে নিজের দেহটাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীকান্তের বাল্যজীবন আমরা জানি না, কিন্তু তাহার কৈশোর কাটিয়াছিল এমনই একটি খাঁটি শাসন-তন্ত্রের সম্রান্ত বন্ধনপাশে। কিন্তু ঐ কিশোর বালকটির স্বভাবে সেই আদিম বাঙালী-প্রকৃতি কিছু বেশী মাত্রায় প্রস্ফুরিত হইয়াছিল; তাহা যেমন জন্মগত, তেমনই হয়ত বাল্যে সেই বন্ধন-রজ্জুর অভাবে। এক্ষণে ঐ আত্মীয়-পরিবারে তাহাকে শাসনে রাখিবার রীতিমত সুব্যবস্থাই হইয়াছিল, কিন্তু যাহা গোড়ায় বিগড়াইয়া গিয়াছে তাহাকে শোধরাইবার জন্য যাহা প্রয়োজন, তাহারই একান্ত অভাব হইয়াছে—ভালবাসার অভাব; ঐরূপ অবস্থায় তাহা না হইয়া পারে না। এমন চরিত্রকে একমাত্র ভালবাসাই বশ করিতে পারে—দয়া নয়, আত্মীয়ের মঙ্গল-কামনাও নয়। তা'ছাড়া আমরা ঐ বালকের স্বভাবে তখনই একটা

প্রবৃত্তি প্রবল হইতে দেখি, বোধহয় শাসনের উগ্রতা সেই চেতনাকে আরও তীক্ষ্ণ করিয়া থাকিবে—তাহার সাধারণ নাম দেওয়া যায়—বিদ্রোহ। তখন এ বিদ্রোহ কঠিন আত্মাভিমানের বিদ্রোহ নয়—গভীরতর অনুভূতির বিদ্রোহ। ঐ বালকের প্রাণ বড়ই অনুভূতিশীল; তাহার মনও অতিশয় সক্রিয়, কিন্তু তাহার মূলে আছে প্রাণের সেই অনুভূতি। তাই সেই বয়সেই সে সমাজে ও পরিবারে সর্ব্বপ্রকার প্রাণহীন নিয়মপদ্ধতির বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা ও অস্বস্তি বোধ করিতেছে। আর একটি অনুভূতি আছে—নিঃসঙ্গতা, তাহার প্রাণের দোসর কেহ নাই। এই একাকিত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞানে তাহার চিত্তকে এমন ছাঁচে গড়িয়া তুলিতেছে যে, শেষে তাহাই যেন প্রকৃতিগত হইয়া উঠিয়াছে—তাহার আত্মা আর সমাজবাসী হইতে পারে নাই, তাহার অন্তরের সেই বিদ্রোহ কখনও ঘুচে নাই। অতঃপর সে, সমাজের বাহিরে যাহারা বাস করে, তাহাদেরই মধ্যে প্রাণের মুক্তি, মনের মুক্তির সন্ধান করিয়াছে; তাহাতেও সে নিজে কোথাও কোন বন্ধন স্বীকার করে নাই।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঐ বিদ্রোহ, ঐ মুক্তিকামনা জাগিলেও সে তখনও নিজেকে আবিষ্কার করে নাই, তখনও তাহার আত্মপ্রত্যয় জাগে নাই। যেদিন যে উপায়ে তাহা ঘটিল, সেইদিন হইতেই তাহার আত্মকাহিনীর আরম্ভ। সে যাহা চায় অথচ স্পষ্ট বুঝিতে পারে না, বালকের অবাধ বেহিসাবী কল্পনায় সে যে একটি মানস-আদর্শ খাড়া করিয়াছে, সে জানে তাহার অনুরূপ শক্তি তাহার নাই, কিন্তু তাহাই তাহার প্রাণের সত্য; সে যেন রূপকথার রাজপুত্র—এখনও জাগে নাই; তাহার অন্তরে ঘুমাইয়া আছে। একদিন সহসা সেই রাজপুত্র যেন অন্তর হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্মুখে সশরীরে দেখা দিল, সেই নিমেষেই তাহাকে জয় করিয়া লইল। শাস্ত্রে আছে, সময় হইলেই গুরুর দর্শনলাভ ঘটে; সে গুরু আমাদের সাধারণ মন্ত্রদাতা কুলগুরু নয়—সে যেন জাগরোন্মুখ আত্মার নিজ স্বরূপেরই একটা প্রতিভাস। বালকের গুরু বালকের রূপেই দেখা দিল; সেই আবির্ভাব তাহার সারাচিত্তকে মথিত অভিভূত করিয়া তাহাতে এমন একটা ধাক্কা দিল যে, সে এতদিন পরে যেন নিজেকেই আবিষ্কার করিল, আপনার শক্তি ও দুর্ব্বলতা দুয়েরই পরিচয় পাইল; জাগরে না হইলেও স্বপ্নে, স্মৃতিতে ও বিস্মৃতিতে, সেই ধাক্কার বেগ তাহাকে বহন করিতে হইয়াছে, তাহার সারাজীবনের ছন্দে সেই বেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। ইন্দ্রনাথ তাহাকে কোন্ মন্ত্রে দীক্ষিত করিল—তাহার মধ্যে মনুষ্যহৃদয়ের কোন্ মহিমা সে

প্রত্যক্ষ করিল, তাহা বুঝিয়া বুঝাইবার চেষ্টায় শ্রীকান্ত কবি হইয়া গিয়াছে—হইতে পারিয়াছে। ইন্দ্রনাথ-চরিত্র এমনই অদ্ভুত ও অনন্যসাধারণ যে, তাহাকে বর্ণনা করা যায় না, কেবল দেখানো যায়; শরৎচন্দ্র যে তাহা পারিয়াছেন, তার কারণ, তিনি ঐ বয়সেই তাহার সমগ্র রূপটাকে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই দেখাটাই আমরাও দেখিতেছি। আমরাও যখন দেখি, তখন বুদ্ধির দ্বারা দেখি না, সারা মনঃপ্রাণের দ্বারা দেখি, তাই সেই অদ্ভুতকেও অবিচারে মানিয়া লই। শরৎচন্দ্র এই দুরূহ কাজটি করিতে সক্ষম হইয়াছেন; ইহা যদি তাঁহার কবিত্বশক্তির বলেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিব, সকল কবিত্বের মূলে আছে কোন এক মহান্ সত্যের অপরোক্ষ-দর্শন; যদি না থাকে, তবে কবিত্ব একটা ভান মাত্র, তাহা মিথ্যা। সেই সত্য একটা ভাব-সত্যও হইতে পারে, দৈবী কল্পনাশক্তির বলে ভাব-সত্যও বস্তু-সত্য হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এ কবিত্ব অন্যরূপ—ইহার প্রেরণামূলে আদৌ ভাব-সত্য নাই—আছে একটা মানুষ, একটা রক্তমাংসের বাস্তব-মূর্ত্তি। ইহাতে কল্পনার লেশমাত্র নাই—যেমনটি দেখা ঠিক তেমনটি ভাষায় মূর্ত্তিমান করিয়া তোলা; তাহা না হইলে কেবল কবিশক্তির সাহায্যে ইহাকে এমন জীবন্ত করা যাইত না। কবির মনোভূমি এ চরিত্রের জন্ম-স্থান নয়। তথাপি এমন করিয়া দেখা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? ইন্দ্রনাথকে ত' কতজনে দেখিয়াছে, কিন্তু আর কেহ ত এমন করিয়া আবিষ্কার করে নাই। তাহার কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, উহার খানিকটা শ্রীকান্ত নিজেই। মানুষ আপনাকে অনুভব করে—দেখিতে পায় না, তাই দেখাইতে পারে না; কিন্তু পরের মধ্যে আপনাকে দেখিতে পাওয়া যদি সম্ভব হয়, এবং তাহাও যদি তেমন বড় কিছু হয়, তবে আপনাকে দেখার বাধা আর থাকে না—তাহার আনন্দও এমন যে, সেই দেখা সম্পূর্ণ না হইয়া পারে না। বস্তুটা বড়-কিছু হওয়া চাই বলিয়াছি—কথাটা অতি সত্য; আমার মধ্যে যদি সেই আত্মবিস্ফার না হয়, আমার বড়-আমিটা যদি পিপাসার্ত্ত না হয়, তবে আমার সেই দৃষ্টি আসিবে কোথা হইতে? এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঐ ইন্দ্রনাথ-চরিত্র সকল কল্পনার ঊর্দ্ধে; উহা অতিশয় বাস্তব, এবং বাস্তব বলিয়াই এত অদ্ভুত, এত বিস্ময়কর। উহা একটা ভাব-সত্যের রূপসৃষ্টি নয়—একটা মানবীয় সত্যের প্রত্যক্ষ প্রকাশ; শ্রীকান্তের জীবনেও উহা একটা বড় আধ্যাত্মিক ঘটনা—এইজন্যই ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্তের গুরু বলিয়াছি। এমন গুরু আরও দুইজন ছিল—অন্নদাদিদি ও কমললতা। এই উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় আধ্যাত্মিক অঙ্কুর ও

তাহার বিকাশের কাহিনী আছে। আধ্যাত্মিক বলিলাম এই জন্য যে, সাহিত্যিক প্রতিভার চেয়ে যাহা বড়—ইহা তাহারই ইতিহাস। শরৎচন্দ্র নামক যে একটি মানুষ—যে কবি নয়, ভাবুক-মনীষী নয়, খ্যাতনামা সাহিত্যিক নয়—যে-মানুষ বিধাতার ক্রীড়াপুত্তলি, তাঁহারই সৃষ্টি অথচ তাঁহারও বিস্ময়ের বস্তু—ইহা সেই একজন মানুষেরই চিররহস্যময় আত্মজিজ্ঞাসার কাহিনী,—সে জিজ্ঞাসার শেষ নাই, কখনও তাহার উত্তর মিলিবে না।

এই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের যে আত্মিক সম্বন্ধ তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বে, পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার জন্য,—শ্রীকান্ত উপন্যাসখানি পাঠ করার পরেও তাঁহাদের স্মরণশক্তিকে সাহায্য করিবার জন্য—আমি সংক্ষেপে ইন্দ্রনাথের চিত্র ও চরিত্র কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্ত দুই সম্পর্কে দেখিয়াছে—তাহার নিজের সঙ্গে যে ধরণের পরিচয় সেই এক দিক, এবং অন্নদাদিদির সহিত তাহার যে ব্যবহার বা তাঁহার প্রতি ইন্দ্রনাথের যে মনোভাব, সেই আরেক দিক; এই দুই দিক মিলাইয়া ইন্দ্রনাথের চরিত্র কতকটা বোধগম্য হইবে, নতুবা সে এমনই বিশাল যে, তাহার দিক-নির্ণয় বা গ্রন্থিমোচন সম্ভবপর নহে। কারণ, এ চরিত্রের মূলতত্ত্ব—প্রাণের মহামুক্তি; ইহা একই কালে আসক্ত ও নিরাসক্ত—কোন বন্ধনপীড়া মানিবে না, অথচ সেই মুক্ত প্রাণেরও কি প্রেম, কি করুণা! বালকের মত ইহার বিশ্বাস, যুবকের মত ইহার বীর্য্য ও অকুতোভয়, মহাস্থবিরের মত ইহার তত্ত্বজ্ঞান; যেন সকল জ্ঞান, সকল প্রেম ও সকল শক্তি একটি চির-কিশোরের রূপে লীলা করিতে নামিয়াছে। যেন বালক হইতে পারাই সাধনার শেষ সোপান, পরম-সত্যই পরম সরল! তাই যীশুও বলিয়াছিলেন—"Blessed are the children, for theirs is the Kingdom of Heaven."

আমি বলিয়াছি, ইন্দ্রনাথের চরিত্র অতিশয় অসাধারণ; কিন্তু অসাধারণ বলিয়াই তাহা অবাস্তব বা অসম্ভব নয়—হইলে ঐরূপ চরিত্র-সৃষ্টি সম্ভব হইত না। সাধারণকে আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই বলিয়াই তাহা সাধারণ বটে, কিন্তু সাধারণের মধ্যেই এমন আছে যাহা আমরা দেখিবার জন্য প্রস্তুত নই—দেখিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি নাই; তাই যখন কোন কারণে তাহা চোখে পড়ে, তখন অসাধারণ বলিয়া মনে হয়। আবার জন্ম হইতেই যে সংস্কারগুলি আমাদের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজন, তাহাই দেশ কাল সমাজ ও পরিবারের পক্ষে যতই উপযোগী হয়, ততই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। এই জন্যই মানুষকেও সেই সংস্কার-অনুযায়ী একটা সাধারণ ছাঁচে না ফেলিয়া তাহাকে বুঝিতে পারি না, সেই ছাঁচের

সহিত না মিলিলে, হয় তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, নয় তাহাকে এই অর্থে অসাধারণ বলিয়া মন হইতে বিদায় করিয়া দিই যে, তাহা normal, বা সুস্থ ও স্বাভাবিক নহে ; সে যেন স্বভাবের একটা বিকার, তাহাকে ভয় অথবা অশ্রদ্ধা করি। সত্য বটে, যাহারা কোন কীর্ত্তির দ্বারা ইতিহাসে স্মরণীয় হয় তাহারাও অসাধারণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আমরা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। কিন্তু বুঝি কি ? সে যেন নিতান্তই একটা ব্যতিক্রম। তাহাছাড়া, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, সেই সকল কীর্ত্তিমান মানবের অধিকাংশই আমাদের সেই সংস্কার-সম্মত 'সাধারণে'র একটা বর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। আমি ইন্দ্রনাথ-চরিত্রকে যে অর্থে অসাধারণ বলিয়াছি তাহা এইরূপ অসাধারণ নয় ; তাহা কোন ঐতিহাসিক কীর্ত্তিলাভের উপযুক্ত নয়—তেমন কীর্ত্তি বা খ্যাতিলাভের খেয়ালও তাহার হয় না। দ্বিতীয়তঃ, তাহা পূর্ব্বোক্ত অর্থে সাধারণ নয় বলিয়াই অসাধারণ ; নতুবা, মানুষের চরিত্রহিসাবে তাহা আদৌ বিস্ময়কর নহে। আমরা মানুষকে সেই দিক দিয়া দেখিতে অভ্যস্ত নই বলিয়াই—অতিশয় সাধারণ মানুষের ভিতরেই কতখানি শক্তি, কতখানি মহত্ব প্রচ্ছন্ন আছে, সে চিন্তা করি না বলিয়াই —যখন তাহার সেই রূপ দেখি, তখন তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ সেরূপ দেখা আমাদের সংস্কারে বাধে। কত ইন্দ্রনাথ হয় ত' আমাদের আশেপাশেই রহিয়াছে, বা ছিল—কে তাহার পরিচয় রাখে ? আমাদের সে প্রয়োজনই হয় না। অতএব ইন্দ্রনাথ-চরিত্র অদ্ভুত বা বিস্ময়কর বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অসাধারণ নয় ; তাহা অবিশ্বাস্য, এমন কি অবোধগম্য হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অসম্ভব বা অতিপ্রাকৃত নয়। বরং এইরূপ চরিত্রের সহিত পরিচয় হওয়ার ফলে, এই সাধারণ মানুষগুলাকেই আমরা আরেক চক্ষে দেখিবার শিক্ষা লাভ করিব, মানুষকে পূজা করিতে শিখিব।

তথাপি, ইন্দ্রনাথ-চরিত্রও আর এক অর্থে অসাধারণ,—কারণ, ব্যক্তিমাত্রেই অসাধারণ। এই 'ব্যক্তি'র কথাটা বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক মানুষের চরিত্রগত,—আকৃতি ও প্রকৃতিগত একটা বৈশিষ্ট্য আছে, সেই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কোন সাধারণ সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। এই ব্যক্তিত্ব, ইংরেজীতে যাহাকে 'Individuality' বলে, ইহাই পরম রহস্যময় ; এ রহস্য কোন দার্শনিক তত্ত্বের দ্বারা ভেদ করা যায় না। সৃষ্টির যতকিছু 'রূপ' তাহা অনন্তসদৃশ ; এই অনন্তসদৃশতাই বুঝি সেই 'মায়া'র লীলা—মহাবৈদান্তিকও যাহার ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া, শেষে বুদ্ধির অগম্য বলিয়াই, তাহাকে 'অসৎ'-নাম দিয়া প্রত্যাখ্যান

করিয়াছেন। ইহাই আমাদিগকে মুগ্ধ করে; ইহাই সৃষ্টির সেই রস-রূপ যাহার বহুত্বের অন্ত নাই, তাই কোন সর্ব্বনামে ধরা দেয় না। আমরা সেই সকলকে যে এক-একটা পৃথক নামে নির্দ্দিষ্ট করি, তাহাও নির্দ্দেশক মাত্র, তাহার কোন অর্থ হয় না। ইহাকে জ্ঞাপন নয়—ইহার কোন ব্যাখ্যা বা বিবৃতি নয়—একেবারে দেখাইতে হয়। এই কাজ কবির কাজ, আর কাহারও নয়। ইন্দ্রনাথকে যে কবি দেখাইয়াছেন তিনিও বলিতে পারেন না, সে কোন্ ছাঁচের কিরূপ মানুষ। কতকগুলি বিশেষণ যোগ করিয়াও সেই চরিত্রকে ধরিতে পারা যাইবে না। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে যত প্রকার নায়কের বর্ণনা আছে তাহা ত' নহেই—মানবচরিত্র-বিজ্ঞান বা মনস্তত্ত্বের কোন সূত্রই ইহার সেই ব্যক্তিত্বকে আমাদের বুদ্ধিগোচর করিবে না। যাঁহারা অলঙ্কারশাস্ত্র লইয়া মাতামাতি করেন, তাঁহারা বিশেষকে ছাড়িয়া নির্ব্বিশেষের ভজনা করেন, সৃষ্টিকে ছাড়িয়া ব্রহ্মের সন্ধান করেন, রূপকে ছাড়িয়া রসের চর্ব্বণ করেন, 'ব্যক্তি'কে ছাড়িয়া 'সাধারণে'র সংজ্ঞা মুখস্থ করেন। এইজন্য যে-কাব্য জীবনের জীবন্ত রূপকে আমাদের নেত্রগোচর করে, সেইরূপ কাব্যের সমালোচনায় তাঁহারা অনধিকারী—পাণ্ডিত্যের বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া তাঁহারা বৃথাই আধুনিক সাহিত্যের আসরে কোলাহল করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের যে মহত্ত্ব শ্রীকান্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে—শরৎচন্দ্র যাহার একটা রূপসৃষ্টি করিয়াছেন—তাহা ব্যক্তির, কোন সাধারণ সংজ্ঞা বা ধারণার অনুযায়ী নহে। শ্রীকান্তও একটা 'ব্যক্তি'কেই দেখিয়াছে, তাহার তুলনা সে কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই। সে কেবল একটিমাত্র বিশেষণ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার বেশি আবশ্যক বোধ করে নাই; বলিয়াছে—

"কত দেশ, কত প্রান্তর, কত নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত বন-জঙ্গল ঘাঁটিয়া ফিরিয়াছি, কত প্রকারের মানুষই না এই দুটো চোখে পড়িয়াছে—কিন্তু এত বড় মহাপ্রাণ ত আর কখনও দেখিতে পাই নাই।" [প্রথম পর্ব্ব; পৃঃ ২৫]

—"এত বড় মহাপ্রাণ ত' আর কখনও দেখিতে পাই নাই!"—তাহার অর্থ এই নয় যে, ইন্দ্রনাথের মহাপ্রাণতা কেবল মাত্রাহিসাবে আর সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে; শ্রীকান্তের বিস্ময়ের কারণ, মহাপ্রাণতার সহিত ঐ ব্যক্তির ঐ চরিত্র; উহাই অদ্বিতীয়, উহাই অনন্যসাধারণ। আরও একস্থানে, ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া তাহার যে ভাবাবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে শ্রীকান্ত বলিতেছে—

"...ইহার কণ্ঠস্বরেও আমার সেই দশা হইল। এই কথাগুলি লিখিলাম বটে, কিন্তু জিনিসটা আমার ব্যক্ত করিয়া পরকে বুঝানো শুধুই যে অত্যন্ত কঠিন তা' নয়, বোধ হয় অসাধ্য।" [ঐ, পৃঃ ৪৭]

তাহার কারণ, ভাষা সাধারণ অর্থ জ্ঞাপন করে—বিশেষের যে বিশেষ অনুভূতি তাহা ঐরূপ বর্ণনা দ্বারা জ্ঞাপন করা দুঃসাধ্য। তাই, এইরূপ ব্যক্তি-বিগ্রহের মুখের উপর কেবল পঞ্চপ্রদীপ দুলাইয়া আরতি করাই যায়—শঙ্খঘণ্টাধ্বনি, এমন কি স্তোত্রপাঠ করাও চলে না।

ইন্দ্রনাথের চেহারার বর্ণনাও বেশি নাই, কেবল এইটুকু আছে যে—"ছেলেটি কালো। তাহার বাঁশির মত নাক, প্রশস্ত সুডৌল কপাল, মুখে দুই চারিটা বসন্তের দাগ। মাথায় আমারই মত, কিন্তু বয়সে কিছু বড়" (শ্রীকান্তের বয়স তখন পনেরো)। আর তার, স্বভাব-চরিত্র? "সে বড় লোকের ছেলে, বাহিরে একটু বিশেষ বাবু।" কিন্তু ভিতরের মানুষটা আদৌ বাবু বা সভ্য-ভব্য নয়। সেই বয়সেই তাহার যে সব অভ্যাস জন্মিয়াছে, তাহা শুনিলে ভদ্র পিতামাতা মাত্রেই শিহরিয়া উঠিবেন। সে বাঁশি বাজায়; স্কুল ছাড়িয়া, অর্থাৎ কলম ছাড়িয়া—নৌকার হাল ধরিয়াছে; মারামারিতে ওস্তাদ, চুরি করিতেও পটু; ইহার উপর, প্রায় সব রকমের নেশায় সে লায়েক হইয়া উঠিয়াছে! এ-হেন মনুষ্য-সন্তানটিকে লইয়া উপন্যাস রচনা ত' দূরের কথা, কেহ কি ভদ্র-সমাজেও ইহাকে বাহির করিতে পারে? শ্রীকান্ত ইহার মধ্যে কি পাইয়াছিল? এই চরিত্রই বাঙলার এক বড় ঔপন্যাসিকের দিব্যচক্ষু খুলিয়া দিয়াছিল—ইহারই ছিটাফোঁটা লইয়া তিনি তাঁহার রীতিমত উপন্যাসগুলিতে কত রকমের কত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন! 'শ্রীকান্তের' পাঠক-পাঠিকারা ইহার একটা উত্তর দিবেন জানি, তাঁহারা বলিবেন,—ইন্দ্রনাথের বাহিরের চেহারা ও তাহার আচার-ব্যবহার দুর্ব্বিনীত দুশ্চরিত্র বালকের মত হইলেও, উহার অন্তরটি বড়ই মহৎ, বড়ই মধুর। কিন্তু এই উত্তরও কি ঠিক হইল? তবে কি তাহার বাহিরের ঐ আচরণগুলা বাদ দিয়া কেবল ভিতরের দিকটাই দেখিব? তেমন করিয়া দুইটাকে পৃথক করা যায় কি? ভাল আর মন্দকে কেবল নীতিশাস্ত্রেই পৃথক নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু 'মানুষ'টাকে ত' তেমন করিয়া ভাগ করা যায় না; এমন কি, ঐ দোষ ও গুণগুলারও দুইটা পৃথক তালিকা করা অসম্ভব। ইহারই নাম সেই 'ব্যক্তি' বা 'ব্যক্তি-চরিত্র', যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই 'ব্যক্তি' একটা সমগ্র-বস্তু। ইহাকে সমগ্রভাবে দেখার নামই—রস-রূপে দেখা। 'ব্যক্তি'কে এমন দেখা দেখিতে পারে দুইজন—কবি ও প্রেমিক। প্রেমিক যে, সে নিজেই দেখে, দেখাইতে পারে না। কবির দেখা অন্যরূপ, সে-দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দেখানোর শক্তিও জাগে; তাহা শিল্পীর তন্ময়তা—প্রেমিকের একাত্মতা নয়। শরৎচন্দ্র যখন

শ্রীকান্ত ছিলেন তখন প্রেমিকের মতই দেখিয়াছিলেন, দেখাইতে পারিতেন না; এখন তিনি কবি—শিল্পী, তাই দেখাইতেও পারিয়াছেন। শ্রীকান্তের সেই দেখা কেমন, এবং শরৎচন্দ্রের দেখানোই বা কেমন, এবার তাহার কিছু নমুনা দিব; আমি কেবল বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠক-পাঠিকাগণ যাহা পড়িয়াছেন আমি তাহার স্থানে স্থানে আণ্ডার-লাইন করিব মাত্র।—

"বুনো শূয়োর! কোথায় সে?"

ইন্দ্র নৌকা টানিতে টানিতে তাচ্ছল্যভরে কহিল, "আমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছি, যে বলব? আছেই কোথাও এইখানে।"

প্রায়ই দেখিতেছি, কাছাকাছি এক-একটা জনার বা ভুট্টাগাছের ডগা ভয়ানক আন্দোলিত হইয়া 'ছপাৎ' করিয়া শব্দ হইতেছে। একটা প্রায় আমার হাতের কাছেই। সশঙ্কিত হইয়া সে দিকে ইন্দ্রনাথের মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম। ধাড়ীশূয়ার না হইলেও বাচ্ছা-টাচ্ছা নয় ত?

ইন্দ্র অত্যন্ত সহজ ভাবে কহিল, "ও কিছু না—সাপ জড়িয়ে আছে; তাড়া পেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।"

কিছু না—সাপ! শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়-সড় হইয়া বসিলাম। অস্ফুটে কহিলাম, "কি সাপ, ভাই?"

ইন্দ্র কহিল "সব রকম আছে। ঢোঁড়া, বোড়া, গোখ্‌রো, করেত্‌—জলে ভেসে এসে গাছে জড়িয়ে আছে—কোথাও ডাঙা নেই, দেখ্‌চিস্‌ নে? ......কিন্তু কামড়ায় না। ওরা নিজেরাই ভয়ে মরছে।......আর কামড়ালেই বা কি করব? মরতে একদিন ত' হবেই, ভাই!" [ঐ; পৃঃ ২৩-২৪]

ইন্দ্রনাথ চলিয়াছে একটি অতি দুঃখী পরিবারের জন্য কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে, তাহাতে চুরির পাপ-ভয় নাই, নিজেরও মৃত্যু-ভয় নাই। ইহার পর পুনরায় আর এক স্থানে—

"আচ্ছা, ইন্দ্র, তুমি কখনও ঐসব দেখেচো?" (যে-সব ছায়া-মূর্ত্তি নির্জ্জন প্রান্তরে বা নদীর চরে—রাত্রিকালে মাছ চাইতে আসে)।

"কি সব?"

"ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?"

"না ভাই, দেখিনি লোকে বলে, তাই শুনেচি।"

"আচ্ছা, তুমি এখানে একলা আসতে পারো?"

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, "আমি ত' একলাই আসি।"

"ভয় করে না?"

"না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারে না।" একটু থামিয়া কহিল, "রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি নাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চলে' যাস্‌, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখ্‌বি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তা' হলেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করচে—তারা সব অন্তর্য্যামী কি না"! [ঐ; পৃঃ ৩২-৩৩]

এই শেষের কথাগুলিতে ইন্দ্রনাথের যে পরিচয় শ্রীকান্ত পাইতেছে—সমগ্র মানুষটারই সে একটা বড় পরিচয়। এই যে নির্ভীকতা, ইহা—ইংরেজীতে

যাহাকে বলে, physical বা moral courage—তাহার চেয়ে বড়; তাহা একরূপ শারীর-চেতনার সাহস,—ভয়শূন্যতা মাত্র—সে ভয় দেহটার সম্বন্ধে। যাহাকে moral courage বলে, তাহাও ধর্ম্মজ্ঞানের সাহস, তাহাতে দেহের ভয় না থাকিলেও, মনের উচ্চ অভিমান আছে। এখানে যে সাহস—যে নির্ভীকতা দেখা যায়, তাহাতে দেহ-চেতনার সম্পর্ক অবশ্যই আছে, কিন্তু মনের কোন সম্পর্ক ইহাতে নাই—ভাল-মন্দ, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বোধের বালাই নাই; তদপেক্ষাও গভীর, অবোধগম্য যেন একটা কিসের প্রত্যয় মাত্র আছে; সেই প্রত্যয় তাহাকে—কেবল ভয়শূন্য নয়, ভয়-নির্ভয়ের অতীত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ যে 'রামনাম করি'—উহার অর্থ কি? উহা কি শুধুই ভূত তাড়াইবার রামনাম? না, প্রাণের সেই প্রত্যয়রূপী একটা বৃহত্তর বস্তু? উহা একটা অন্ধ-বিশ্বাসও নহে; অন্ধ এই অর্থে বটে যে, উহাতে কোন বুদ্ধিবিচার বা তর্কযুক্তির অবকাশ নাই। দার্শনিক ভাষায় বলিতে হইলে, উহাতে কোনরূপ দ্বৈত-জ্ঞান নাই—বালকের তাহাই ঘটিয়াছে। দ্বৈত-জ্ঞানই সকল সংশয় ও সকল অবিশ্বাসের মূল—সকল 'জ্ঞান'ই দ্বৈত-জ্ঞান। যখন কোথাও 'দুই' আর থাকে না, তখন কোন সংশয় আর থাকে না, তাই ভয়ও থাকে না। সেই অদ্বৈতের—একটা বিদ্যাগত পরিচয় নয়—একেবারে উপলব্ধি—ঐ বালকের হইয়াছে (বালকেরও হইতে পারে); সে তাহারই নাম দিয়াছে, 'রাম'। সেই অদ্বৈতের ভূমিতে সাপে-মানুষে বিরোধ নাই—সবই যে এক-ধাতু। কিন্তু সে ত' কেবল মনে বা মুখে স্বীকার করিলেই হইবে না (যেমন আজকাল সকলেই অহিংসাবাদী হইয়া উঠিয়াছে); শুধুই জানিলে হইবে না, পাইতে—হইতে—হইবে। তাই ইন্দ্রনাথ বলিতেছে, শুধুই মুখে রামনাম (সকলে মিলিয়া তালি দিয়া রামধুন-গান) করিলেই হইবে না, অন্তরে বিশ্বাস থাকা চাই; না থাকিলে ভয় ঘুচিবে না; তখন ঐ নাম উচ্চারণ করিলে, ভণ্ডামীর চূড়ান্ত হইবে—"তা' হ'লেই তারা (সাপেরা) টের পাবে, এ শুধু চালাকি করচে (যেমন লীগপন্থীরা টের পায়)—তারা সব অন্তর্য্যামী কি না।"

এই শেষ কথাটা শুনিয়া আমাদের হাসি পাইবে—মনে হইবে, বালক কি নির্ব্বোধ, কি সরল! কিন্তু আসলে, উহাতে একটি পরম তত্ত্বের ইঙ্গিত রহিয়াছে, তাহার ভাষাও ঠিকই হইয়াছে। সেই অদ্বৈত-বুদ্ধি যাহার প্রাণে প্রবেশ করিয়া সমস্ত চেতনায় ব্যাপ্ত হইয়াছে, সে সর্ব্বজীবকে 'রামময়' দেখিতেছে—বিশেষ করিয়া, সেই সকলকে, যাহারা মানুষের মত বুদ্ধিসম্পন্ন নয়। এই বালক 'বেদান্তবিদ্' নয়—'বেদান্তকৃৎ'; বেদান্ত সে বোঝে না, তাহার প্রাণের স্পন্দনে বেদান্ত-সৃষ্টি

হইতেছে। বেদান্ত যখন পুঁথির ভাষা হইতে জীবনের ভাষায় ভাষান্তরিত হয়, তখন সে শঙ্করাচার্য্য না হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে দেখা দেয়—সে তখন বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী অধ্যাপক না হইয়া জ্ঞানহীন বালক হইয়া উঠে। ইহাই পরম রহস্য—ইহাই মনুষ্য-হৃদয়-মহিমারও শ্রেষ্ঠতম পরিচয়।

শ্রীকান্ত ইহাই দেখিয়াছিল; ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের ঐ দিকটা—ঐ অদ্ভুত ভয়শূন্যতা—ঐ দুপ্রধর্ষ আত্মপ্রত্যয় এবং ঐ হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের অত্যন্ত অভাব—এমন অপরোক্ষ করিয়াছিল বলিয়াই, প্রথমে সে অবাক হইয়া ভাবিয়াছিল—

"ঐ লোকটি কি! মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও?…যদি মানুষই হয় তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে সে কথা কি জানেও না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরী?" [ঐ; পৃঃ ২৪]

.. যদি তাহাই হয়—যদি পাথর দিয়া তৈরীই হয়, তবে ত' সহজেই একটা মীমাংসা হইয়া গেল। কিন্তু তাহা যে হইবার নয়। শ্রীকান্ত প্রথমে উহাই দেখিয়াছিল, কিন্তু পরে যখন আরও দেখিল, তখন বুঝিল, এ ব্যক্তি শুধু 'ব্যক্তি'ই নয়—'বিশ্ব'ও বটে! পরে যাহা দেখিল তাহা ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের সেই দ্বিতীয় প্রধান লক্ষণ—যাহা শ্রীকান্তের সকল জিজ্ঞাসাকে নিরস্ত করিয়া, মানবাত্মার একটা নূতন মহিমা-মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিল। সে লক্ষণ—ঐ পাথরের অন্তস্তল-প্রবাহিণী করুণার মন্দাকিনী-ধারা। এখানে কেবল একটাই উদ্ধৃত করিব।—

ঘাটের কাঁকরে ডিঙি ধাক্কা না খায়, এই জন্য ইন্দ্রনাথ পূর্ব্বাহ্নেই প্রস্তুত হইয়া মুখের কাছে সরিয়া আসিয়াছিল, এবং লাগিতে না লাগিতে লাফাইয়া পড়িয়াই একটা ভয়বিজড়িত স্বরে 'ঈস্' বলিয়া উঠিল।…

অকাল-মৃত্যু বোধ করি আর কখনও তেমন করুণভাবে আমার চোখে পড়ে নাই।…উভয়েই নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ হইয়া এই মহাকরুণ দৃশ্যটির পানে চাহিয়া রহিলাম। একটি গৌরবর্ণ ৬।৭ বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট বালক,—তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলে ভাসিতেছে, শুধু মাথাটি ঘাটের উপর। শৃগালেরা বোধ করি এইমাত্র তাহাকে জল হইতে তুলিতেছিল; শুধু আমাদের আকস্মিক আগমনে নিকটে কোথাও গিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে।…ঠিক যেন বিসূচিকার নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়া সে বেচারা মা-গঙ্গার কোলের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।…স্থলে-জলে বিস্তৃত এমনিভাবেই সেই ঘুমন্ত শিশু-দেহটির উপর সেদিন আমাদের চোখ পড়িয়াছিল।

মুখ তুলিয়া দেখি, ইন্দ্রর দুই চোখ বাহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতেছে। সে কহিল, "তুই একটু সরে' দাঁড়া, শ্রীকান্ত, আমি এ বেচারাকে ডিঙিতে তুলে ঐ চড়ার ঝাউবনের মধ্যে জলে রেখে আসি।"…

কুণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি জাতের মড়া—তুমি ছোঁবে?" ইন্দ্র সরিয়া আসিয়া এক হাত তাহার ঘাড়ের তলায় এবং অন্যহাত হাঁটুর নীচে দিয়া, একটা শুষ্ক তৃণখণ্ডের মত স্বচ্ছন্দে তুলিয়া লইয়া কহিল, "নইলে বেচারাকে শিয়ালে ছেঁড়াছিঁড়ি করে' খাবে। আহা! মুখে এখনও এর ওষুধের গন্ধ পর্য্যন্ত রয়েছে রে!" …কহিল, "মড়ার কি জাত থাকে রে!" [ঐ; পৃঃ ৩৫-৩৭]

আশা করি, ইহার অধিক আর উদ্ধৃত করিতে হইবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আছে। ঐ যে অপূর্ব্ব করুণা—যাহার আর এক নাম অনুকম্পা, তাহার দ্বারাও মনের সর্ব্ববন্ধন-মুক্তি হয়—যে বন্ধনমুক্তিকে পূর্ণ-জ্ঞানের অবস্থাই বলা হইয়া থাকে। তবে কি পূর্ণ-অনুকম্পাই পূর্ণ-জ্ঞান? সে জ্ঞানে কোন তত্ত্বচিন্তা নাই, সেও শিশুর মত—যেমন সরল, তেমনই অসন্দিগ্ধ। "মড়ার কি জাত থাকে রে?"—কথাটা অজ্ঞান অপণ্ডিত বালকের কথাই বটে, কিন্তু শুনিবামাত্র আমাদের মন কোথায় কতদূর গিয়া পৌঁছে! ঐ সামান্য দুইটি কথার ছিদ্রপথে যেন মুহূর্ত্তে মহাসমুদ্র আমাদের দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে! কথাটা জ্ঞানের, না প্রাণের? ঐ করুণা ঐ অনুকম্পাই কি মানুষকে এমন মহাজ্ঞানের অধিকারী করে?

শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের এই আর এক পরিচয় পাইল। সেই নির্ভীকতা আর এই করুণা—এ দুইই সে দেখিল; কিন্তু দুইটা কি একই মানুষের থাকা অসম্ভব? মূলে এ দুইটি কোথায় এক হইয়া আছে, তাহা সে বুঝিতে পারিতেছিল না। আমরা ঐ দুইটা গুণকে যে একটা নির্দ্দিষ্ট ছাঁচের চরিত্রে যুক্ত হইয়া থাকিবার কল্পনা করি, এ চরিত্র যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত! বয়সে, বিদ্যায়, বিনয়ে, সদাচারে—কোন-টাতেই সে প্রশংসার যোগ্য নয়। এ যেন একটা উন্মাদ—ইহার মতি স্থির নাই। আসলে ইহা কোন মন-গড়া আদর্শ-চরিত্র নয়—ইহাই সেই 'ব্যক্তি', সেই ব্যক্তিত্বেরই একটা দুর্দ্দান্ত প্রকাশ ইহাতে আছে। ইহার ঐ কঠিনতা ও করুণা আর কাহারও মত নয়—উহারই মত। উহা সম্ভব কি না, সামঞ্জস্য কোথায়—সে চিন্তা অনাবশ্যক; উহাকে আমরা দেখিতেছি, তাহাই যথেষ্ট, দেখার পর আর প্রশ্ন নাই। তাই শ্রীকান্ত দেখিয়াছে, বুঝাইতে পারে নাই—শরৎচন্দ্র কেবল দেখাইয়াছেন মাত্র।

কিন্তু সে চরিত্রের আরও একটা দিক আছে—সে তাহার সেই খাঁটি বালক-স্বভাব। শ্রীকান্ত নিজেও তখন বালক, ইন্দ্রনাথের সেই বালকত্বও তাহাকে কম আকৃষ্ট করে নাই। শিশু-কৃষ্ণের মুখগহবরে বিশ্বদর্শন করিলে, যশোমতীর মত শ্রীদাম-সুদামও ভয় পাইত, তাহার সেই শিশুপনা ও বালকপনাই তাঁহাদিগকে আশস্ত করিত। ইন্দ্রনাথের বালকসুলভ চাপল্য, বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্য করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, এবং নিষিদ্ধ কর্ম্ম গোপনে করিবার জন্য নানা উপায়-উদ্ভাবনের কুশলতা, এ সকলই বালক শ্রীকান্তের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। তার পর, তার সেই ভয়শূন্যতা, এবং মহাপ্রাণতা। কিন্তু তারও পরে, অন্নদাদিদির সহিত

তাহার সেই ব্যবহার,—তাহাও কি সে-বয়সে সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিয়াছিল? সেখানে আমরা কি দেখি? ঐ যে দুর্দান্ত, দুর্ললিত, অবুঝ বালক—সেই বালকের ভালবাসা। অন্নদাদিদিকে সে ভালবাসে—ইহা সর্ব্ববন্ধনমুক্তির সেই লীলা নয়। এখানে সে বালক; বালকের মতই সে তুচ্ছ বস্তুর জন্য লালায়িত; অজ্ঞতার অতি-বিশ্বাস, ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান—বোধ হয়, বালকের মত ঈর্ষ্যাও—তাহার আছে। এই বালক-চরিত্র-চিত্রণে যে রস আছে, তাহাই খাঁটি কাব্যরস; কারণ এখানে বালকের প্রাণ, বালকের প্রেম ছাড়া আর কিছুই নাই। সেই ভালবাসা—অনুকম্পা বা করুণার তত্ত্ব নয়, সে একটা রস।

যাহা মানবাত্মার মানবতার নিদান সেই ভালবাসা কি বস্তু, তাহা বাক্যে কে কবে বুঝাইতে পারিয়াছে? তাহার বৈচিত্র্যও অনন্ত। প্রণয়, প্রেম, স্নেহ, মমতা, যৌন-মোহ, বন্ধুতা—এমন সব পৃথক নাম আমরা দিই বটে, কিন্তু ইহাদের কোনটাই যেমন নিছক অবিমিশ্র একটা সেই-সেই নামের বস্তু নহে, তেমনই, উহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে একটা সাধারণ নির্ব্বিশেষ কিছু আছে; সেই নির্ব্বিশেষই, এক-একটা বিশেষ সম্বন্ধ এবং ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রকৃতির প্রকারভেদে, যে বিশেষ-রূপটি ধারণ করে, তাহাকে কোন নাম দেওয়া আরও দুরূহ। অন্নদাদিদিকে ইন্দ্রনাথ ভালবাসিয়াছে—একদিকে একটা বালক, অপর দিকে একজন বর্ষীয়সী নারী। এ যে বালকেরই ভালবাসা, তাহার প্রমাণ, এ ভালবাসা সজ্ঞান নয়। আবার ইহা ইন্দ্রনাথের মত বালকের ভালবাসা, অর্থাৎ ইহাতে দুর্ব্বল হৃদয়ের কোন আসক্তি নাই। তথাপি, এ ভালবাসার স্বরূপ বুঝিতে হইলে ইন্দ্রনাথের সেই প্রবল ব্যক্তিত্ব—তাহার সেই দুর্জ্জয় আত্ম-বল, সেই প্রাণের মুক্তি, সেই দুর্দ্দমনীয় তেজের কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে। আরও মনে রাখিতে হইবে—ইহাদের দুইজনই সমান-অসাধারণ। অতএব, এ আকর্ষণের একটা হেতুও রহিয়াছে—দুইজনেরই আত্মার গভীরে পরস্পরের সাদৃশ্য বা সমধর্ম্মিতা। বোধ হয়, সকল শ্রেষ্ঠ ভালবাসার হেতু ইহাই। যেখানে আত্মার গভীরতা নাই, সেখানে আকর্ষণও গভীর নয়; সেখানে আমরা প্রেম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা দুর্ব্বলের আত্ম-প্রবঞ্চনা, অথবা মনোবিলাস, অথবা রিপুপরতন্ত্রতা মাত্র। শ্রীকান্ত যেমন ইন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, ইন্দ্রনাথও ঠিক সেইরূপ অন্নদাদিদির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে—এই যে আকর্ষণ, ইহা একটা গভীর আত্মিক আকর্ষণ; ইন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীকান্তের আকর্ষণ কেমন, তাহা পরে বলিব; কিন্তু এ আকর্ষণ যে উভয়-হৃদয়ের শক্তিগত সাদৃশ্যের আকর্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্নদাদিদির মধ্যে যে শক্তি রহিয়াছে ইন্দ্রনাথ

সেই শক্তিরই সিদ্ধ-সাধক। তাই আকৃষ্ট না হইয়া পারে নাই—তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়িয়াছে। অন্নদাদিদির প্রতিও তাহার অনুকম্পা আছে; কিন্তু তাহা দুর্ব্বলের প্রতি শক্তিমানের, ছোটর প্রতি বড়র অনুকম্পা নয়—সে অনুকম্পায় উভয়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহাও কি প্রেম নয়? সে কেমন প্রেম? বোধ হয়, ইহাও সেই পরমবস্তুর আর এক রূপ, ব্রহ্মের মতই যাহা অনির্ব্বচনীয়—যে-রূপ মানবহৃদয়-রূপ গুণ্ঠন ধারণ করিয়া কোনক্রমে স্পর্শ্যস্পৃশ্য হইয়া থাকে। এখানে তাহাই আবার, বালক-হৃদয়ের চাপল্য ও অজ্ঞান-কাতরতায় অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে। এ ভালবাসার কি নাম দিব? নারী-মহিমার পায়ে পুরুষ-প্রাণের আত্মনিবেদন? কিন্তু ইন্দ্রনাথ ত' বালক! নারী-পুরুষ-সম্পর্কের কোন বালাই ইহাতে নাই। অন্নদাদিদি ইন্দ্রনাথের 'দিদি'—ইন্দ্রনাথ সেই 'দিদি'র ভাই। ইহাই সত্য। দুইজনে এক জনক বা জননীর সন্তান—একই গোত্রের নিকটতম আত্মীয়। সে গোত্রের নাম শক্তি-গোত্র। সেই শক্তি উভয়ের মধ্যে একই প্রকার স্ফুরিত হইয়াছে; তফাৎ এই যে, একজন বালক—তাই অজ্ঞান, আর একজন পূর্ণবয়স্কা নারী—তাই সজ্ঞান; ইন্দ্রনাথ আপনাকে জানে না; অন্নদাদিদি তাহাকে চেনে, জানে; তাহার সেই একটি কথায় সে যেন সব কথা বলিয়াছে,—

যাবার সময়ে ইন্দ্রের একটা হাত ধরিয়া বলিলেন—"ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্তকে আশীর্ব্বাদ করলাম বটে, কিন্তু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করি সে সাহস আমার হয় না।" [ঐ ; পৃঃ ৭৬]

—তাই অন্নদা ইন্দ্রের দান গ্রহণ করিয়াছিল, শ্রীকান্তের টাকা লয় নাই।

আমি ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের এই কয়টি প্রধান দিক মাত্র দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। তথাপি, তাহা কি পারিয়াছি? শরৎচন্দ্র যাহা পারিয়াছেন আমি তাহার একটু ব্যাখ্যা করিবার দুঃসাহস করিয়াছি—তিনি দেখাইয়াছেন, আমি দেখিবার জন্য অবহিত হইয়াছি। এই চরিত্রের যেটা রসের দিক, সে দিকটার বিশেষ প্রসঙ্গ আমি করিলাম না, কারণ, তাহা এমনই রূপ-সম্পন্ন যে, তাহার অনুচিত্রণ শুধুই অনাবশ্যক নয়—রীতিমত বেরসিকের কাজ। আমি যাহা করিয়াছি তাহা রস-নিবেদন নয়, ঐ রস-রূপের অন্তরালে যে একটি বড় তত্ত্বের আভাস রহিয়াছে—রস-আস্বাদনের পরেও যাহা আমাদের চিত্তকে উৎকণ্ঠিত করে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা। তথাপি এই প্রসঙ্গেও, ইন্দ্রনাথের ঐ ভালবাসার যে অপূর্ব্ব চিত্র, লেখক অতি গভীর বর্ণে ও নিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কিছু উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। অন্নদা-দিদির প্রতি ইন্দ্রনাথের সজ্ঞান আকর্ষণের হেতু—সাপের মন্ত্র শিখিয়া লইবার আকুল ইচ্ছা। যখন অন্নদাদিদি বলিলেন—

"আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি।...আমরা মন্ত্রতন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে, কড়ি চেলে সাপ ধরতে পারিনে...আমাদের কোন ক্ষমতাই নেই।" [ঐ ; পৃঃ ৬১]

তখন ইন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল,

"যদি জানো না, তবে তোমরা দু'জনে লুকোচুরি করে ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন? ঠগ জোচ্চোর সব। আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি তোমাদের মজা।" [ঐ ; পৃঃ ৬১]

তারপর কি তাহার রাগ! কি গালাগালি!

কিন্তু ইহারই কিছুক্ষণ পরে, শাহজী গাঁজার ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল, এবং সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া যখন তাহার স্বমূর্তি ধারণ করিল, তখন ইন্দ্রনাথ তাহার বল্লমের খোঁচায় আহত হইয়াও তাহাকে পাড়িয়া ফেলিল এবং উত্তমরূপে তাহার হাত পা বাঁধিয়া, পরে শাহজীর লাঠির ঘায়ে অচৈতন্য দিদির চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে বলিল—

"আমি ওকে পুলিশে দিয়ে ছাড়ব, না হ'লে দিদিকে ও খুন করে' ফেলবে, ও খুন করতে পারে।" [ঐ ; পৃঃ ৬৬]

ইহারও পরে, অন্নদাদিদি যখন তাহাদের দুইজনকে তাহার গৃহে আসিতে নিষেধ করিল, তখন ইন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া যাহা বলিয়া উঠিল, তাহার মর্ম্ম ইন্দ্রনাথ বুঝে নাই—অন্নদা বুঝিয়াছিল। বালকের গভীর অজ্ঞান ভালবাসার—এবং সকল ভালবাসারই—লক্ষণ, যে ঈর্ষ্যা, তাহার এমন ভঙ্গি আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ইন্দ্রনাথ বলিল—

"তা বটে। আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু না। আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেছি, তাতেই তোমার এত রাগ!...কি নেমকহারাম তোমরা দু'জন! আয়, শ্রীকান্ত আর না।" [ঐ ; পৃঃ ৬৭]

প্রাঙ্গণের বাহিরে আসিয়া আরও একবার চেঁচাইয়া বলিল—

হিঁদুর মেয়ে হ'য়ে যে মোচলমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার আবার ধর্ম্মকর্ম্ম। চুলোয় যাও —আর আমি খোঁজ করব না, খবরও নেব না—হারামজাদা, নচ্ছার। [ঐ ; পৃঃ ৬৮]

ইহা কি শুধুই গালি? ইহাতে কাহার মর্ম্ম বিদীর্ণ হইতেছে? ইহাই ত' মানুষের প্রাণের কাহিনী—যে-মানুষ মায়ার ঘোরে, কি এক মধুর জ্বালার নেশায়—নিজেকে নিজেই আঘাত করিয়া, কাঁদিবার জন্য আকুল হয়। এই বালকও মানুষ, যে মানুষ ভালবাসে—সে-ও বালক।

অন্নদা ও ইন্দ্রনাথের কাহিনী এইটুকুই যথেষ্ট। ইন্দ্রনাথের নতুন দা'—সেই দর্জিপাড়ার জীবটির প্রতি তাহার যে ব্যবহার, তাহাতেও ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের কোন নূতন পরিচয় নাই।

সর্ব্বশেষে, এইখানেই আমি আরও দু'একটি কথা বলিব, তাহা ঠিক এই কাহিনীর সম্পর্কেই নয়। এই যে একটি চরিত্র, ইহার যতখানি বাস্তব, এবং যতখানি কল্পনাই হোক—কবির জীবন-দর্শনের দিক দিয়া, ইহা কোন এক বিশেষ দৃষ্টি, বা সাহিত্যিক রস-সত্যের পরিচয় দিতেছে কি না? বাংলা উপন্যাসে এ পর্য্যন্ত যে কয়জন শক্তিশালী লেখক সত্যকার সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছেন—মানব-জীবনের সার্ব্বভৌমিক আলেখ্যহিসাবে, অর্থাৎ বিশ্ব-সাহিত্যের দিক দিয়া যেমনই হোক—তাহার একটা দেশ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে কি না? বঙ্কিমচন্দ্র হইতে শরৎচন্দ্র, এবং শরৎচন্দ্র হইতে তারাশঙ্কর পর্য্যন্ত, আখ্যান-কল্পনা ও চরিত্র-সৃষ্টিতে, এমন একটা কিছু আছে কি না, যাহা—আর্টহিসাবে যতই বিভিন্ন হউক —শেষ পর্য্যন্ত কোন না কোন দিক দিয়া একটা জাতির প্রাণ-মনকে আশ্রয় করিয়া আছে? বাংলা সাহিত্য বস্তুপ্রধান নয়, ভাব-প্রধানই বটে। কিন্তু এই ভাবও এক হিসাবে বাস্তব—বাঙালীর জীবনে বা চরিত্রে, ঐ ভাবই বস্তুর রূপ ধারণ করে। ইন্দ্রনাথ-চরিত্রও কি নিছক একটা ভাব-কল্পনার সৃষ্টি? না, শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় বাঙালী-চরিত্রেরই একটা বিশেষ রূপ অতিশয় প্রত্যক্ষভাবে ধরা দিয়াছে? আমরা কি ঐ চরিত্রে এমন একটা কিছু দেখি না, যাহা আমাদেরই আধ্যাত্মিক সংস্কারের পক্ষে সম্ভব? সে বস্তু কি? যাহা সাধারণ অবস্থায়, সাধারণ চরিত্রে—দুর্ব্বলতা, সেন্টিমেন্ট, এমন কি, চরিত্রহীনতার লক্ষণ, তাহাই যখন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে মাত্রাধিক্য লাভ করে—পূর্ণ প্রস্ফুরিত হয়, তখন সে একটা অদ্ভুত আতসবাজির মত আকাশ ও দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তোলে; কোথায়, কাহার ভিতর, কিরূপে তাহা প্রকাশ পাইবে, তাহার ঠিকানা নাই। কলেজের ক্লাস-রুমে সকলের পশ্চাতে বসিয়া যে শান্ত-শিষ্ট বালক মনোযোগ সহকারে অধ্যাপকের বক্তৃতা শ্রবণ করে, হয় ত' বা পরীক্ষাতেও উচ্চ স্থান অধিকার করে, —দেখিতে পাই, সে-ও হঠাৎ একদিন, বক্ষে আগুন ও চক্ষে দীপ্তি লইয়া দৃঢ়পদে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করিতেছে! গ্রামের মাঠে, বনে-জঙ্গলে, যাহারা নিশ্চিন্ত মনে, নিতান্ত গ্রাম্য আমোদ-কৌতুকে বাল্য ও কৈশোর যাপন করে, যাহারা নাগরিক বিদ্যাবুদ্ধির ধারও ধারে না, তাহাদের মধ্যেই এমন এক-একটি প্রাণ-শিখা জ্বলিয়া উঠে যে, সারা দেশ তাহাতে চমকিত হয়। ইহার জন্য কোন বিশেষ শিক্ষাবিধি, কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানে মানুষ হওয়া আবশ্যক হয় না। ঐ সকল প্রাণ সম্পূর্ণ একক, আত্মনিমগ্ন, আত্মধর্ম্মী। এই একাকিত্ব ও আত্মমুখিনতাই বাঙালী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ইহাই তাহার নিয়তি; ইহারই কারণে, তাহার যত

কিছু মহত্ত্ব ও যত কিছু ক্ষুদ্রতা। এই ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের যে কারণে যে মহত্ত্ব—ঠিক সেই কারণেই বাঙালী আর একদিকে অতিশয় ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। যে-জাতি বাহিরে এতই বন্ধন-বশীভূত, ভিতরে সে কোন নিয়ম-শাসন মানে না—ভিতরে, অর্থাৎ, হৃদয়ের প্রবৃত্তিতে; সেখানে সে 'সহজিয়া'। সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত রস-পিপাসায় —হৃদয়বৃত্তির সেই অবাধ উদ্দীপনায়—সে এক অদ্ভুত শক্তির অধিকারী হয়; সে শক্তি চরিত্র-শক্তি নয়, তাহার মূলে জ্ঞান-ক্রিয়া নাই, আছে এক তীব্র অনুভূতি; তাহারই বশে সে পঙ্গু হইয়াও গিরিলঙ্ঘন করে; যোগীর মত আত্মসাধনা করিয়া নয়—প্রেমীর মত আত্মবিসর্জ্জন করিয়া সে-ও ব্রহ্ম-সমাধি লাভ করে। সেই প্রাণ যখন পূর্ণমাত্রায় জাগিয়া ওঠে, তখন সে ঘর ছাড়িয়া, সমাজ ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইয়া যায়। যতক্ষণ সমাজবদ্ধ ততক্ষণ সে অলস, কর্ম্মবিমুখ, অতি-সহিষ্ণু ও নানা দোষের আকর। যাহার চরিত্র-শক্তি নাই, অর্থাৎ যাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প নাই, কেবল প্রাণের ওই শক্তিটুকুই সম্বল—সে যেমন স্নেহ-মমতার পিপাসায়, সমাজ-সংসারের মৃৎপ্রদীপে ক্ষীণশিখায় জ্বলিতে পারে, অথবা ধূমায়িত হয়, তেমনই, সে-ই আবার ঐ বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া এমন শিখায় জ্বলিয়া উঠে, যাহার আলোক আকাশের সূর্য্যরশ্মির সহিত এক হইয়া যায়।

ইন্দ্রনাথের চরিত্র এই কারণেও সত্য; উহাতেও একটা জাতির বিশিষ্ট প্রকৃতির পরিচয় আছে, তাহাতেও আছে প্রাণেরই এক অপূর্ব্ব প্রকাশ। যে-কবি ঐ চরিত্রকে এমন করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে পারিয়াছেন, তিনিও—বিশ্ব-সাহিত্যের না হউন—বাংলা-সাহিত্যের একজন প্রকৃত ও প্রকৃষ্ট প্রতিনিধি।

(২)

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথ

"যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" —গীতা

এইবার শ্রীকান্তের উপর ইন্দ্রনাথের যে প্রভাব, তাহার প্রতি শ্রীকান্তের যে আকর্ষণ, তাহা কিরূপ ও কি কারণে, সেই আলোচনা একটু সবিস্তারে করা প্রয়োজন; কারণ, শ্রীকান্তের জীবনে ঐ প্রভাব ক্রমে যতই ক্ষীণ হউক, কখনো সম্পূর্ণ ঘুচে নাই; বরং আমার মনে হয়, ঐ প্রভাবই তলে তলে তাহার জীবনে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই প্রভাবই তাহার অবচেতনায় বাসা বাঁধিয়া শক্তি ও অশক্তি দুইই বৃদ্ধি করিয়াছিল। আমি আগেই ইন্দ্রনাথ-চরিত্রের একরূপ পরিচয় দিয়াছি, সেটা তাহার এবং অন্নদাদিদির দিক হইতে; এবারে শ্রীকান্তের দিক হইতেও তাহাকে আর একবার দেখিয়া লইতে হইবে; উভয়ের চরিত্রগত পার্থক্য বুঝিতে পারিলে শ্রীকান্ত-চরিত্রের একটা গোড়া-পত্তন করিয়া লওয়া সম্ভব হইবে। ঐ চরিত্রের সহিত শ্রীকান্ত-চরিত্রের ব্যক্তিগত পার্থক্য কম নয়; বরং এত বেশি যে, এমনও বলা যাইতে পারে, একটা অপরের যেন বিপরীত। তবে প্রভাব বা আকর্ষণের কথা আসে কেমন করিয়া? শ্রীকান্ত যে অতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই—এমনও বলিয়াছি যে, সে ইন্দ্রনাথের মধ্যে নিজেরই গভীরতর সত্তার একটা বাস্তব প্রতিমূর্তি যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সে যাহা কামনা করে, তাহার প্রাণ যাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করে—ইন্দ্রনাথের মধ্যে সে যেন অজ্ঞানে তাহা দর্শন করিয়াছিল। এইরূপ দর্শন করিবার শক্তি যাহার আছে তাহার ভিতরে একটা 'বড়-আমি' নিশ্চয় জাগিয়াছে—এই 'আমি' কিন্তু তাহার 'ব্যক্তি-আমি' নয়; মানুষের ঐ ব্যক্তি-আমিটাই বাস্তব-আমি, তাহাকে লঙ্ঘন করিতে না পারাটাই 'বড়-আমিটা'র ট্র্যাজেডি—ইহাই মানুষের নিয়তি, ইংরেজীতে যাহাকে Fate বলে। অতএব শ্রীকান্তের উপরে ইন্দ্রনাথের প্রভাব যতই গভীর বা প্রবল হউক, ঐ একটি কথাও আমাদের মনে রাখিতে হইবে—সেই দুই 'ব্যক্তি'র কথা; একটা মানুষের আদর্শ, আর একটা তাহার বাস্তব। জীবনের যত-কিছু ভাঙা-

গড়া এই বাস্তবকে লইয়াই ; কেবল, ব্যক্তিভেদে তাহার ধাক্কা বাহির অপেক্ষা ভিতরে প্রবল হইয়া থাকে। শ্রীকান্ত বালক-বয়সেও ভাবুক এবং অতিশয় আত্ম-সচেতন ; সে সেণ্টিমেণ্টাল, অথচ চিন্তাপ্রবণ। পরে দেখা গিয়াছে, পরদুঃখকাতর হইলেও সে কোনরূপ দুঃখমোচনব্রত দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করে নাই, তার কারণ, কিছুতেই তাহার অবিচলিত আস্থা নাই ; হৃদয়ের আবেগ আছে, কিন্তু কর্ম্মনিষ্ঠা নাই ; অথচ সে কর্ম্মকুণ্ঠও নয়। সে যাহা কিছু করে, ভাবপ্রবণতার বশে— অন্তরের বিশ্বাসের বশে নয়। সে প্রেমিক নয়, উদাসীন ; আসলে সে একা, কাহারও আপন হইতে ভয় পায়।

এইরূপ চরিত্রের উপরে ইন্দ্রনাথের প্রভাব কিরূপ হইতে পারে ? ইন্দ্রনাথের সহিত ইহার সাদৃশ্য কোথায়, এবং কতটুকু ? উপরে আমি যে লক্ষণগুলির উল্লেখ করিয়াছি তাহার কতকগুলিতে সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়— প্রভাবের কারণ তাহাই বটে। কিন্তু কোন দুই ব্যক্তির চরিত্রে ঐ লক্ষণগুলির কারণ এক নয়—যদিও তৎসত্ত্বেও ঐ সাদৃশ্য গভীরতর অর্থে সত্য, অর্থাৎ সেই ভিতরকার মানুষটার পক্ষে মিথ্যা নয়। কিন্তু ব্যক্তির দিক দিয়া পার্থক্যটাই বেশি। সেই পার্থক্য সত্ত্বেও প্রভাবটা কেমন হইতে পারে তাহাই দেখিব।

সত্যকার প্রভাবের মূলে থাকে 'শ্রদ্ধা'। ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্ত যেরূপ শ্রদ্ধা করে—সে নিজে তাহার নাম দিয়াছে, ভালবাসা। ভালবাসাও যে একরূপ শ্রদ্ধা তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রে এবং অভিধানে শ্রদ্ধা অর্থে আর একটা বস্তু বুঝায়। গীতা যে বলিয়াছেন "যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ!"—তাহার সোজাসুজি অর্থ এই যদি হয়, "যে-ব্যক্তির যাহাতে শ্রদ্ধা সে নিজেও তাহাই"— তবে সে একরূপ একাত্মতার শ্রদ্ধা, তাহাই গভীরতম অর্থে ভালবাসা বটে। শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছে—

"যিনি সব জানেন, তিনিই শুধু বলিয়া দিতে পারেন—কেন এত লোক ছাড়িয়া সেই একটা হতভাগ্যের প্রতিই আমার সমস্ত প্রাণটা পড়িয়া থাকিত, এবং কেন সেই মন্দের সঙ্গে মিলিবার জন্যই আমার দেহের প্রতি কণাটি পর্য্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।" [পৃঃ ৯]

"যে আহ্বানে এই স্তব্ধ নিবিড় নিশীথে এই বাড়ীর সমস্ত কঠিন শাসনপাশ তুচ্ছ করিয়া, একাকী বাহির হইয়া আসিয়াছি, সে যে কত বড় আকর্ষণ তাহা তখন বিচার করিয়া দেখিবার আমার সাধ্যই ছিল না।" [পৃঃ ১৬]

"আমি ইন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছিলাম।" [পৃঃ ৫০]

—এই সকল খুবই সত্য, এই ভালবাসা বালকের হইলেও, ঐরূপ আকর্ষণ অর্থহীন নয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, ইহাও কি এক প্রকার শ্রদ্ধা নয়?

উত্তরে হাঁ, ও না, দুইই বলিতে হয়। হাঁ এই জন্য যে, বালক শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের মধ্যে একটা এমন ‘শক্তি’র প্রকাশ দেখিয়াছে, যাহা তাহার নাই, কিন্তু যাহা তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এইরূপ মুগ্ধ হওয়াও এক প্রকার শ্রদ্ধার লক্ষণ। কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে যে, সেইরূপ শ্রদ্ধা বালকের হৃদয়ে ভালবাসায় রূপান্তরিত হইয়াছে; ইন্দ্রনাথের চরিত্রের যে দিকটা কঠিন ও মহৎ তাহাকে সে প্রণাম করে, তাহার বড়-আমিটা সাড়া দেয়, কিন্তু ‘ব্যক্তি-আমি’টা অভিভূত হইয়া পড়ে; সেই ব্যক্তি-আমি ইন্দ্রনাথের হৃদয়টাকে চিনিয়াছে, সেই হৃদয়টাকেই ভালবাসিয়াছে, সেইখানে সে তাহার সহিত সহমর্মিতা অনুভব করিয়াছে; সেইজন্যই তাহাকে সে নিজেরই একটা ‘বড-আমি’ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে। বস্তুতঃ ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের সেই বাস্তব ব্যক্তি-আমিটার যদি কোন যোগ বা স্পর্শ ঘটিয়া থাকে, তবে তাহা এইখানেই। ইহাও যদি শ্রদ্ধার নামান্তর হয়, তবে এ শ্রদ্ধার মূলে আছে আবেগ-কাতর হৃদয়ের সমানুভূতি; ইহা সেই শ্রদ্ধা নয় যাহার মূলে আছে একটা গভীর বিশ্বাস—আত্ম-প্রত্যয়ের আশ্বাস। এখানে সে প্রশ্নই উঠে না, কারণ ইহা হৃদয়ঘটিত ব্যাপার—এখানে সত্য বা বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের কোন অবকাশই নাই। তাহা হইলে, এরূপ শ্রদ্ধার দ্বারা “স এব সঃ”—ইন্দ্রনাথের সহিত শ্রীকান্তের একাত্মতা—কতখানি সম্ভব? শ্রীকান্ত যেমন তেমনই রহিয়া গেছে—তাহার ‘ব্যক্তি-আমি’টা স্বধর্মচ্যুত হয় নাই; ইন্দ্রনাথকে সে ভালবাসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মহত্ত্বকে সে কখনও আত্মসাৎ করিতে পারে নাই, চাহে নাই বলিয়া নহে—সেই ‘শ্রদ্ধা’ শ্রীকান্ত-চরিত্রে সম্ভব নয় বলিয়া।

আমি বলিয়াছি, ঐরূপ শ্রদ্ধার মূলে আছে প্রত্যয়, বা অসংশয়; অর্থাৎ উহা একরূপ জ্ঞান ও শক্তিমূলক। ঐ শ্রদ্ধাই শ্রেষ্ঠ ভক্তি—অন্ধ ভক্তি নয়, সকল সংশয়চ্ছেদের ভক্তি। শ্রীকান্তের মত মানুষ—যাহার হৃদয় এত দুর্ব্বল বা স্পর্শকাতর, যাহার প্রাণ এত আবেগপ্রবণ, তাহার শক্তি অনুরূপ; সে বিদ্রোহ করিতে পারে, নিজ স্বার্থ অনায়াসে বিসর্জ্জন করিতে পারে, এমন কি নিজেকে নষ্ট করিবার নির্ভীকতাও তাহার আছে; কিন্তু সে কোন বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে চাহে না, পারেও না। ঐরূপ প্রকৃতি আত্মপ্রত্যয়ের পক্ষে একটা বড় বাধা। সে কোন বিষয়ে দৃঢ়চিত্ত হইতে পারে না, সেইজন্যই কোন কর্ম্মে তাহার নিষ্ঠা নাই; এমন কি, হৃদয়-ঘটিত সম্পর্কেও তাহার আত্মবিশ্বাস নাই। কাজেই তেমন শ্রদ্ধা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার

সমস্ত জীবনটাই ভাব-চিন্তা ও কর্ম্মের একটা লক্ষ্যহীন স্রোতোধারা; তাহাতে তরঙ্গবিক্ষেপ আছে—তট-বন্ধন থাকিলেও, দিক্-নিষ্ঠা নাই। তাহার কারণ, শ্রীকান্তের জীবনে কতকগুলি দৃঢ়মূল সংস্কারের দ্বন্দ্ব আছে, এজন্য আত্মপ্রত্যয়, সংশয়হীনতা বা আধ্যাত্মিক সত্য-সন্ধান ঐরূপ প্রকৃতির বিরোধী; ইহাই সে-জীবনের যতকিছু ট্র্যাজেডিরও কারণ। অতএব শ্রীকান্তের শ্রদ্ধা সেই-জাতীয় শ্রদ্ধা নহে।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের কোন সংস্কার নাই, তাহার একমাত্র সংস্কার—মুক্ত-প্রাণের অবাধ অকুণ্ঠিত আত্মানুভূতি, সকল প্রশ্ন সকল সংশয়-লোপকারী—জ্ঞানেরও অগোচর—একরূপ আত্মপ্রত্যয়। ইন্দ্রনাথ জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ জীবনকে সে বুকে ধরিয়া আলিঙ্গন করে, অথচ তাহার দ্বারা আদৌ বদ্ধ নয়; শ্রীকান্ত জীবনকে বুকে ধরিতে চায়—পারে না, জড়িত, বদ্ধ হইবার ভয় আছে। তাহার সংশয় কখন ঘোচে না—যত দেখে ততই বাড়ে, তাহার সেই অনুভূতি-কাতর প্রাণ ততই আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে। যে প্রাচীন সংস্কার তাহার রক্তগত তাহাও সে ত্যাগ করিতে পারে না, আবার আধুনিক জীবনের নানা সঙ্কট-সমস্যা তাহার সেই সংস্কারকে বার বার বিচলিত করে—তাহাকেও সে অস্বীকার করিতে পারে না। শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্রের আত্মা এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া ক্রমে যেন আরও বলহীন হইয়াছে। তথাপি সেই সর্ব্বসংস্কারমুক্ত মহাশক্তিমান্ ইন্দ্রনাথকে—জীবনের প্রভাতকালেই যে তাহার সেই অন্তরের বড়-আমিটাকে একটা অতর্কিত আঘাতে সচেতন করিয়াছিল—তাহাকে সে কখন ভুলিতে পারে নাই। সে-ই বোধ হয়, তাহার জীবনের সহজকে জটিল করিয়াছিল, তাহার কোন কোন সংস্কারকে দৃঢ়তর করিলেও, অপর কতকগুলিকে ক্রমাগত আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু সে যে ইন্দ্রনাথ নয়—কখনও হইতে পারিবে না, তাহাও জানিত; তাই বোধ হয়, শেষ পর্য্যন্ত সে সর্ব্বধর্ম্ম ও সর্ব্বনীতির একটা শূন্যবাদে আশ্বস্ত হইয়া আত্মাভিমান চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ইহার অনেকখানিই এ কাহিনীর বাহিরে, শ্রীকান্ত-জীবনে ততখানি পরিণামের অবকাশ ঘটে নাই। এখানে ইন্দ্রনাথ তাহার জীবনে একটা দূর-দীপ্যমান জ্যোতিষ্কের মত কখন দৃশ্য, কখন অদৃশ্য হইয়াছে। অতঃপর ইন্দ্রনাথের প্রতি বালক-শ্রীকান্তের সেই শ্রদ্ধা বা ভালবাসা কেমন, সে সম্বন্ধে তাহারই জবানীতে কিছু উদ্ধৃত করিব।

শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ যে-গুণে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা সেই বয়সের পক্ষে

স্বাভাবিক, সকল ক্ষেত্রেই সেইরূপ হয়। নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি বালকের লোভ নিষিদ্ধ বলিয়াই বাড়িয়া উঠে; এ জন্য যে-বালক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিবার এহেন শক্তি ধারণ করে, তাহাকে গৃহকারারুদ্ধ, শাসনভয়ভীত আরেক জন যে বীর বলিয়া পূজা করিবে, ইহাই স্বাভাবিক। তারপর, যেদিন সেই শক্তি ও সাহস, শুধু স্পর্দ্ধার বীরত্ব নয়—আর্ত্তত্রাণ-বৃত্তির এমন পরিচয় দিল, যেদিন শ্রীকান্তের মত এক সম্পূর্ণ অপরিচিত বালককে একা ও অসহায় দেখিয়া আততায়ীদের আক্রমণ হইতে এমন করিয়া উদ্ধার করিল, সেই দিন হইতে সে যে বালক-শ্রীকান্তের হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিবে, তাহাও অতিশয় স্বাভাবিক। ইন্দ্রনাথ তাহাকে স্নেহ করিয়াছে, একটি পরদুঃখকাতর বালককে কোলের কাছে টানিয়া লইয়াছে—কিন্তু তাহার দুর্ব্বলতাও বুঝিয়াছে; এজন্য তাহাকে ঠিক বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করে নাই। শ্রীকান্তও তাহা বুঝিত, অভিমান হইত, কিন্তু তেমন দুরাশাকে মনে কখনো স্থান দেয় নাই। তাহার সেই ভালবাসাতেও সঙ্কোচ কম ছিল না—দুর্ব্বল হৃদয়ের একটা সঙ্কোচ প্রথম পরিচয়ের দিনেই সে অনুভব করিয়াছিল। সেদিনের সেই ব্যাপারে ঐ দুঃসাহসী দুঃশীল বালকের করুণা তাহার হৃদয় জয় করিলেও, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব ঘুচে নাই—

"আজ আমার সেই দিনের অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। শুধু এইটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না—ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম, কিংবা, তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।" [পৃঃ ৬]

আবার যেদিন অন্ধকার দ্বিপ্রহর রাত্রে ঘরের ভিতরে শুইয়া সে নিবিড় জঙ্গলের পথে ঐ দুরন্ত বালকেরই বাঁশি-বাজানো শুনিয়াছিল, সেদিন— :

"যতক্ষণ না ঘুমাইয়া পড়িলাম, ততক্ষণ কেবলই কামনা করিতে লাগিলাম—যদি অমনি করিয়া বাঁশি বাজাইতে পারিতাম!" [পৃঃ ৭]

—ইহা শুধুই ভালবাসা নয়, গুণীর পূজাও বটে।

এইবার, উভয়ের স্বভাবে যে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যের প্রমাণ শ্রীকান্ত নিজেই দিয়াছে, তাহা হইতেও ঐ প্রভাবের রকমটা বুঝিতে পারা যাইবে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীকান্ত সেই বালক-বয়সেও অতিশয় আত্মসচেতন; ইন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় এই আত্মসচেতনতাও তাহার দুর্ব্বলতার একটা কারণ। ইন্দ্রনাথের ঠিক ঐ বস্তুটাই নাই, অতিশয় শক্তিমান চরিত্রের তাহা থাকে না। ঐরূপ সচেতনতাই আত্মাভিমানের কারণ; তাই ইংরেজীতে যাহাকে Inferiority Complex বলে ইন্দ্রনাথের তাহা নাই; শ্রীকান্তের আছে। শ্রীকান্ত, অন্ততঃ সেই বয়সে, যথেষ্ট

'ভীতু' ছিল—এই বোধটা তাহাকে পীড়িত করিত; কিন্তু ইন্দ্রনাথের নিকটে তাহা স্বীকার করিবে না বলিয়াই, ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেও সে নির্ভীকতার পরিচয় দিবে। দেখা যাইতেছে, ভয়টা একরূপ দেহগত, মনের জোর তাহার আছে; এইরূপ জোর তাহার চরিত্রে গোড়া হইতেই ছিল; ছিল না কেবল সেই আর এক প্রকার নির্ভয়তা যাহা সকল জ্ঞান-অজ্ঞানের—দেহ ও মনের সকল সংস্কারের অতীত, সেই 'রামনামে'র নির্ভয়তা। কিন্তু ইন্দ্রনাথের প্রভাবে এই ভয়টাও তাহার কাটিয়া গিয়াছিল, পরে একস্থানে সে-ই বলিতেছে—

"এ সকল বিষয়ে আমি যে-লোকের শিষ্য তাহাতে ভূতের ভয়টা আর ছিল না। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে—সেই একটি রাত্রে যখন ইন্দ্র কহিয়াছিল, "শ্রীকান্ত, মনে-মনে 'রামনাম' কর; ছেলেটি আমার পিছনে বসিয়া আছে", সেইদিনই শুধু ভয়ে চৈতন্য হারাইয়াছিলাম, আর না। সুতরাং সে ভয় ছিল না। কিন্তু আজিকার গল্পটা যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে এটাই বা কি? ইন্দ্র নিজে ভূত বিশ্বাস করিত, কিন্তু সেও কখনো চোখে দেখে নাই।" [পৃঃ ১০৬-১০৭]

এখানে আরেকটা খুব বড় কথা রহিয়াছে, তাহাতেও ইন্দ্রনাথের ভয়শূন্যতা যে কেমন ও কি কারণে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের অনেকেই ভূত বিশ্বাস না করিলেও ভয় পাই, ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিত কিন্তু ভয় পাইত না। এখানে ভয়ের সঙ্গে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের যে সম্পর্ক দেখা যাইতেছে তাহাতেই বিশ্বাস বস্তুটা আসলে কি, তাহাও বুঝিয়া লইবার সুবিধা হইবে। আমরা যাহাকে সাধারণ ভাষায় বিশ্বাস-অবিশ্বাস বলি তাহা মনেরই একটা অভিমান মাত্র—তাহাতে প্রাণের সত্য বা আত্মার প্রত্যয় নাই। আমরা ভয় পাই, অর্থাৎ অবিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস করি; ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিয়াও ভয় পায় না, অর্থাৎ তাহার ঐ বিশ্বাসও একটা বড় বিশ্বাসের অধীন। সে কোন-কিছু আছে বলিয়া বিচলিত হয় না, অর্থাৎ মনের আপত্তি উত্থাপন করে না; এমন একটা বস্তুতে তাহার বিশ্বাস আছে যাহার জন্য অবিশ্বাস তাহার কিছুতেই নাই, ভয় করিবারও কিছু নাই। আমাদের তেমন কোন বস্তুতে বিশ্বাস নাই, কোন-কিছুতে প্রাণের বা আত্মার প্রত্যয় নাই; সে শক্তি নাই বলিয়াই ভয়-সংশয়েরও অন্ত নাই। কেবল, মনের অভিমান বজায় থাকিলেই হইল; সত্য কি তাহা জানি না, জানিবার প্রয়োজন-বোধও নাই; বরং মিথ্যাই মর্ম্মমূলে বাসা বাঁধিয়াছে। তাই বাহিরেও মিথ্যার ভয়ে সদা-সতর্ক থাকি; 'আছে' নয়—'নাই' বলিবার সৎসাহসকে উদ্ধত করিয়া নিজেদের সেই 'নাস্তি'টাকেই ঢাকিবার চেষ্টা করি। ইহাও একপ্রকার Complex।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। বালক-শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথ ঐ একমন্ত্রে দীক্ষিত

করিয়াছিল, সেও সামান্য নহে; কারণ, দেহের সঙ্গে মনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। ভূতের ভয় যে করে না—বিশ্বাস-অবিশ্বাস নয়, যে সত্যই ঐ ভয়কে জয় করিয়াছে, সেও একপ্রকার শক্তি লাভ করিয়াছে। সে হয় ত' আরও অনেক বস্তুর ভয় করে, ঐ একটা ভয় না-করা চরিত্র-বলের লক্ষণ না হইতে পারে, তথাপি, ঐরূপ একটা দৈহিক ভয়-সংস্কার যাহার থাকে না সে একটা বড় শক্তির অধিকারী হয়—অন্তরেও যেমন বাহিরেও তেমনই নিঃসঙ্গ থাকিবার শক্তি; প্রকৃতি-বিশেষে এই শক্তিই মুক্তি-সাধনার সহায় হয়। অতএব শ্রীকান্ত-চরিত্রের একটা দিক ইহার দ্বারা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই নির্ভয়তা যে ইন্দ্রনাথের তুলনায় পূর্ণ-নির্ভয়তা নয়, সে কথাও শ্রীকান্ত জানে; এই কাহিনীতে সেইরূপ আত্ম-সমালোচনা—স্ব-প্রকৃতিকে একটু দূরে ধরিয়া দেখিবার প্রয়াস—অনেক স্থলে আছে; এবং যদিও তাহা সর্ব্বত্র অভ্রান্ত নহে, তথাপি মাঝে মাঝে তাহা এমনই সত্য ও অকপট যে আমার পক্ষে সে সকল বড়ই মূল্যবান হইয়াছে। এই নির্ভয়তার সম্বন্ধেই সে আরেক স্থলে বলিয়াছে—

"এরূপ ভয়ানক জায়গায় আমি ইতিপূর্ব্বে আর কখনো একাকী আসি নাই। একাকী যে স্বচ্ছন্দে আসিতে পারিত সে ইন্দ্র, আমি নয়।...আমার সে চওড়া বুক কই? সে বিশ্বাস কোথায়? আমার সেই 'রাম'-নামের অভেদ্য কবচ কই?" [পৃঃ ১২১-২২]

—এই যে confession বা স্বীকৃতি, দুই চরিত্রের মূলগত প্রভেদ এখানেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রভেদ আমাদের এ কালের সংস্কারে বুঝা বা বুঝানো কিছু কঠিন, তাই আমাকে বার বার একই কথা বলিতে হইতেছে, অথচ কথাটা যে বেশ পরিষ্কার হইতেছে না, তাহা আমিও বুঝিতেছি। ইন্দ্রনাথ-চরিত্রকে আমাদের পরে আর প্রয়োজন হইবে না; এ চরিত্র সাধারণ চরিত্র নয়, সেই-জন্যই সাধারণ নর-নারীর জীবন-কথায় ইহাকে বেশি দূর অনুসরণ করা যায় না। যিনি এই কাহিনী লিখিয়াছেন, তিনিও যদি ঐ-চরিত্রের মানুষ হইতেন, তবে এই কাহিনী এমন সাহিত্যিক কাব্য-কাহিনী হইয়া উঠিত না। আমি যে বিশ্বাস, বা শক্তি বা দুর্জ্জয় আত্ম-চৈতন্যের কথা বলিয়াছি, তাহা শ্রীকান্তের নাই; নাই বলিয়াই সে দুর্ব্বল মানুষেরই একজন হইয়া এমন মমতা সহকারে, মানুষের সর্ব্ববিধ অক্ষমতা—তাহার পিপাসা ও পরাজয়, লাঞ্ছনা ও আত্মাবমাননা, মূঢ়তা ও দুষ্কৃতির চির-দুর্ভেদ্য রহস্যকে এমন রস-রূপ দান করিতে পারিয়াছে। তথাপি ইন্দ্রনাথকেও বুঝিয়া লইতে হইবে, কারণ সে-ও মানবাত্মারই আর একটা স্বাভাবিক বিকাশ; জীবনের যে-দিকটায় কোন প্রশ্ন নাই, তাই উত্তরও নাই—

যে-মুখে দাঁড়াইলে ঝড়-ঝঞ্ঝা, আলো-আঁধার প্রাণের গতিরোধ করে না—সেই দিকও আছে; সাধারণ মানুষ আমরা—সে দিক আমাদেরও দিক নয় বটে, তথাপি তাহার একটা আভাস পাইলেও কতকটা আশ্বস্ত হই। শ্রীকান্তের ঐ যে দীর্ঘনিঃশ্বাস—ইন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করিয়া তাহার ঐ যে আক্ষেপ—উহাও এমন অন্তর ভেদ করিয়া উঠিত না, হয় ত' বা সে তাহার জীবনে সে চিন্তাই কখনো করিত না, যদি না সে তাহাকে দেখিত। সে যে ইন্দ্রনাথকে দেখিয়াছিল—দেখিতে পারিয়াছিল, তাহাও শুধু সৌভাগ্য নয়, তাহার নিজেরই একটা চরিত্র-গুণে; কয়জন এমন করিয়া তাহাকে দেখিতে পারিত? অতএব, উভয় চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য যেমনই হোক—কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে বলিতে হইবে। আমি এই জন্যই 'বড় আমি' ও 'ব্যক্তি-আমি' নামে দুই-টা 'আমি'র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছি।

প্রভাবের আর এক কারণ শ্রীকান্তের আর একটি কথায় ধরা দিয়াছে। শ্রীকান্তের চরিত্রে হয় ত' একটা আত্ম-নির্ম্মম নিঃসঙ্গতার নেশা কোন কারণে পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, সে কথা প্রথমেই বলিয়াছি; পরে ইহা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু 'ভবঘুরে'-বৃত্তির সজ্ঞান আকাঙ্ক্ষা ইন্দ্রনাথকে দেখিয়াই নাকি আরও গভীর হইয়া উঠিয়াছিল, যথা—

"কিন্তু কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সে কথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ।" [পৃঃ ৩]

—যেন কেবল এই জন্যই ইন্দ্রনাথের কথা এই কাহিনীতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর আর এক স্থানে—

"ইন্দ্র কলম ফেলিয়া দিয়া নৌকায় দাঁড় হাতে তুলিল। তখন হইতে সে সারাদিন নৌকার উপর।...হঠাৎ হয় ত' একদিন সে পশ্চিমের গঙ্গার একটানা স্রোতে পান্‌সি ভাসাইয়া দিয়া, হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল...।"

এই একটানা স্রোতে হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া-থাকা—ইহাই ত' সর্ব্ববন্ধন-মুক্তির পরম লোভনীয় একটি চিত্র; এ যেন সেই "অকূল শান্তি সেথায়, বিপুল বিরতি", কিংবা সেই আর একজনের পরিপূর্ণ মুক্তি-সুখের নিঃশ্বাস—

"প্রসাদ বলে, বসে' আছি ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা।"

ইহার পরেই শ্রীকান্ত বলিতেছে—

"এমনি একদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাসিয়া-যাওয়ার মুখেই তাহার সহিত আমার একান্ত বাঞ্ছিত মিলনের গ্রন্থি সুদৃঢ় হইবার অবকাশ ঘটিয়াছিল।" [পৃঃ ৮]

—এই একটা জায়গায় উভয়ের প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ মিল ছিল, তাই শ্রীকান্তের জীবনে ইন্দ্রনাথের প্রভাব যদি কোথাও ফলিয়া থাকে তবে তাহা এইখানে। কিন্তু ইহাও চরিত্রগত মিল নয়, কারণ, অতিশয় বিপরীত চরিত্রের মানুষও সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে ঐরূপ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে—যেমন, অতিশয় শক্তিমান, বা অতিশয় দুর্ব্বল। ঐ যে "উদ্দেশ্যহীন ভাসিয়া যাওয়া," উহার প্রথম মন্ত্র-দীক্ষা সে ইন্দ্রনাথের নিকটেই পাইয়াছিল। ইন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিয়াছিল—কি কারণে, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি মাত্র; সংসারের প্রতি বিরাগ বা বিদ্বেষ যে সেই কারণ নহে, ইহাও বিশ্বাস করিতে পারি; সে চরিত্র তেমন দুর্ব্বল নহে। হয়ত' সে একটা আধ্যাত্মিক পিপাসার বশেই গৃহত্যাগ করিয়াছিল—মহাপ্রেমিকের পক্ষেও সন্ন্যাসগ্রহণ অস্বাভাবিক নহে। যে বীর সে যেমন পরের উপরে জয়ী হইবার বাসনা ত্যাগ করিতেও পারে, তেমনই যে প্রেমিক তাহার পক্ষেও সংসারের হিতসাধন চেষ্টা ত্যাগ করা অসম্ভব নহে; সেই ত্যাগ করার কারণ, ভয়, দুর্ব্বলতা, বিদ্বেষ বা বৈরাগ্য না হইতেও পারে। আত্মার সেই মুক্তি, সেই পূর্ণ-স্বাধীনতা—সেই 'উদ্দেশ্যহীনতা'র অধিকার সাধারণ মানুষের নাই, তাই আমরা ঐরূপ 'নিরুদ্দেশ' হইয়া যাওয়াকে দুর্ব্বল বা স্বার্থপরের 'পলায়ন' বলিয়া নিন্দা করি। ইন্দ্রনাথকেও সেই শ্রেণীভুক্ত করা যায় কি না, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, আমি জোর করিয়া কিছু বলিব না। কিন্তু শ্রীকান্ত যে সেই আদর্শকে বরণ করিয়াছে তাহার কারণ, সে ঐরূপ জীবনের দুইটা সাফাই ইন্দ্রনাথের চরিত্রে পাইয়াছে—তাহার সেই স্বাধীন-চিত্তের নির্ভয়তা, এবং সেই করুণা। প্রথমটির নাম পৌরুষ, দ্বিতীয়টির নাম নিঃস্বার্থতা। এই দুই যদি থাকে তবে ঐরূপ সংসারত্যাগী ভবঘুরের মত মহাপুরুষ কে আছে? ইন্দ্রনাথের মত 'মহাপ্রাণ' সে আর কোথায় দেখিয়াছে? অতএব ইন্দ্রনাথের আত্মনির্ম্মমতার সেই ঔদাসীন্য এবং তাহার সেই অপার করুণা, এই দুইয়ে মিলিয়া শ্রীকান্তকে এমন একটি আশ্বাসে আশ্বস্ত করিয়াছে—যাহা পরবর্ত্তী জীবনে, তাহার দুর্ব্বলতা বা অন্তরের শূন্যতাকে ঢাকিবার একটা উপায় হইয়াছে; বন্ধন না মানিবার আসল কারণটা সে একরূপ আত্মাভিমানের বশে নিজের কাছে অস্বীকার করিয়াছে, ইন্দ্রনাথের শিষ্য বলিয়া সে গৌরব বোধ করিয়াছে।

শ্রীকান্ত-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে আমার এই বিস্তারিত—হয় ত' বা অতিরিক্ত—আলোচনা পরে কাজে লাগিবে; আলোচনার এই আদিপর্ব্বেই আমি কয়েকটা মূলসূত্র একটু শক্ত করিয়া গুছাইয়া লইতেছি। কাহারও চরিত্রে বাহিরের প্রভাব,

এবং তদনুযায়ী সে-চরিত্রের বিকাশ যদি বা বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে একটা কথা স্মরণ রাখিতেই হইবে—মানুষ নিজ-স্বভাব কখন অতিক্রম করিতে পারে না; গুরু, বা আদর্শ, বা ভূয়োদর্শন—এ সকলের একটা গৌণ ক্রিয়া তাহার জীবনে অল্পবিস্তর ঘটিতে পারিলেও, যাহারা নিতান্ত গড্ডলিকা নয়—ইংরেজীতে যাহাকে common herd বলে তাহা নয়, অর্থাৎ যাহাদের character বলিয়া কিছু আছে—তাহাদের নিয়তি সত্যই অখণ্ডনীয়; আমরা যাহাকে ট্র্যাজেডি বলি তাহা এইরূপ চরিত্রের পক্ষেই সম্ভব; ঐ character যতই শক্ত ও অনন্যসাধারণ হয়, ট্র্যাজেডিও তত ঘনঘোর হইয়া উঠে। মানুষের স্বভাব যত স্বতন্ত্র, তাহার পরিণামও তেমনই স্বতন্ত্র হইতে বাধ্য। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের পরিণাম যে একরূপ হইতে পারে না, তাহার কারণ—ঐ দুয়ের চরিত্র আসলে স্বতন্ত্র। আমি পার্থক্যের দিকটাই বেশি করিয়া দেখিয়াছি; এখনও যদি তেমন স্পষ্ট না হইয়া থাকে, আরও দুই-একটি প্রমাণ দিতেছি। ঐ করুণার কথাই ধরা যাক। এখানেও দুই জনের স্বভাবে প্রধান পার্থক্য এই যে, শ্রীকান্ত অতিশয় আত্মসচেতন, তাহার হৃদয়বৃত্তির সহিত ভাবুকতা বা চিন্তাশীলতাও আছে—সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে; আবার কতকগুলি সংস্কারও তাহার আছে, এজন্য অনেক বিষয়ে তাহার সংশয়-সঙ্কোচও কম নয়। যাহারা অতিমাত্রায় আত্মসচেন (self-conscious) এবং তদুপরি ভাবুকতা বা কল্পনাশক্তির অধিকারী, তাহারা একরূপ আদর্শবাদী না হইয়া পারে না; এই আদর্শবাদ—ব্যক্তি-হৃদয়ের এই Idealism-ও—এক প্রকার দুর্ব্বলতা, তাহাতে অতি প্রচ্ছন্ন আত্মাভিমান আছে। তাই ইন্দ্রনাথের করুণা যেমন অবশ, অজ্ঞান, বিচার-বিতর্কহীন—কোন আদর্শ-বোধ বা সেন্টিমেণ্ট তাহাতে নাই, শ্রীকান্তের করুণা তেমন নয়, ততখানি আত্মহারা নয়; তাহার দয়া আছে, কিন্তু কোথাও সে তাহার আত্মচেতনার বিরুদ্ধে কিছু করে না, তাহার সহানুভূতির মধ্যেও কোন-না-কোন অবিচার-বোধের উত্তেজনা আছে। ইহার একটা দৃষ্টান্ত ইন্দ্রনাথের সেই নতুন-দা'র কাহিনীতে পাওয়া যাইবে। সেই অতিশয় অপদার্থ, অতি দুর্ব্বল স্বার্থপর জীবটির প্রতি ইন্দ্রনাথ আর যে-কোন কারণে যতই ক্ষমাপরবশ হউক না কেন, সেরূপ ক্ষমারও একটা সীমা আছে; শ্রীকান্ত যে কোন কারণেই উহাকে এক মুহূর্ত্তও সহ্য করিত না, ইহা নিশ্চিত। সে তখন ইন্দ্রনাথের মুখ চাহিয়াই সব সহ্য করিতেছিল। তাহার ইহাই মনে হইয়া থাকিবে যে, ইন্দ্রনাথও কম লজ্জা পাইতেছে না, সে যেন তাহার আত্মীয়ের ইজ্জত ও নিজের আভিজাত্যবোধ বজায় রাখিবার জন্যই প্রাণপণ করিতেছে, নতুবা তাহার মত মানুষ এতখানি সহ্য করে কেমন

করিয়া? ইহা যে কতকটা সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি শ্রীকান্তের ঐ যে বিবৃতি তাহাতে আমরা শ্রীকান্তের জবানীতে তাহারই মনোভাব বুঝিতে পারি, ঘটনার একটা দিকই দেখি; কিন্তু শ্রীকান্ত যে দিকটি দেখে নাই, বা দেখায় নাই—আমাদের চিত্তে তাহাও উঁকি দেয়। ইন্দ্রনাথের এই দুর্ব্বলতায় আমরা যেমন বিস্ময়-বোধ করি, তেমনই ঐ জীবটির প্রতি তাহার শুধু সৌজন্যই নয়, করুণার মাত্রাটিও লক্ষ্য করি। মনে হয়, সে যেন ঐ 'কৃষ্ণের জীব'টার প্রতিও কৃপাপরবশ হইয়াছে; শ্রীকান্ত যাহাকে করুণার অযোগ্য মনে করে—সাধারণ মানবধর্ম্মে তাহাই উচিত ও স্বাভাবিক—ইন্দ্রনাথ তাহাকে শিশু অপেক্ষা নির্ব্বোধ, দুর্ব্বল ও অসহায় বুঝিয়া যে-করুণায় কাতর হইতেছে তাহার মূলে আছে সেই বৃহত্তর বেদনা—যাহাকে শক্তিমান আত্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। "ক্ষীণা নরা নিষ্করুণাঃ"—এই সাধারণ উক্তিটিও যে কত বড় সত্য তাহা ইন্দ্রনাথের ঐ আচরণে আমরা বুঝিতে পারি। যে মানুষ ক্ষীণ বা দুর্ব্বল সেই নিষ্করুণ হয়; যে যত শক্তিমান তাহার করুণাও তত অধিক। আবার এই করুণাও যখন সর্ব্বব্যাপী হয় তখন সে-ও যেন পূর্ণজ্ঞানেরই একটা রূপ—এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই যে আরেকটি বাক্য আছে—"To know all is to pardon all" (যে সব জানে সে সবই ক্ষমা করে)—ইহাও বড় সত্য। অতএব ঐ নতুন-দার কাহিনীও এই দুই চরিত্রের পার্থক্য বুঝিবার পক্ষে একটা সহজ দৃষ্টান্ত।

ইন্দ্রনাথের বিশ্বাসের কথা বলিয়াছি, সে বিশ্বাস কেমন, এবং শ্রীকান্তের বিশ্বাস কি কারণে আরও সহজ, তাহারও একটা দৃষ্টান্ত দিব। অন্নদাদিদি ইন্দ্রনাথকে একটা মিথ্যা আশা দিয়াছিল—অবস্থার বশে না দিয়া পারে নাই। ইন্দ্রনাথ তাহাকে বিশ্বাস করিয়াছিল, সে বিশ্বাস এমনই সরল এমনই সম্পূর্ণ যে, পরে সেই মিথ্যার সংশোধনকে সে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, অর্থাৎ অন্নদাদিদি যে কোন কারণে কোনও মিথ্যা বলিতে পারে ইহা মনে করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। অন্নদাদিদির স্বীকারোক্তি শুধুই তাহার আশাভঙ্গ করে নাই; প্রাণের গভীরে আঘাত করিয়াছে। বালকের মতই সে তাহার বিশ্বাস ত্যাগ করিবে না। শ্রীকান্তের ঐরূপ বালকসুলভ বিশ্বাস নাই, সে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের স্থান-কাল-পাত্র বোঝে, অন্নদাদিদির কথা সে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিল—

> "কি জানি কেন, আমি এই অত্যল্প কালের পরিচয়ে তাঁহার প্রত্যেক কথাটি অসংশয়ে বিশ্বাস করিলাম; কিন্তু এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও ইন্দ্র পারিল না।" [পৃঃ ৬১]

—'পারিল না', তাহার একমাত্র কারণ, সে সত্যই বালক, শ্রীকান্ত তাহার

তুলনায় বৃদ্ধ। শ্রীকান্ত আশ্চর্য্য হইয়াছে,—কেন ইন্দ্রনাথ পারিল না! যাহার এত বুদ্ধি, যে এত কৌশল জানে, শ্রীকান্তের তুলনায় যে এত বহুদর্শী—সে বিশ্বাসে বালক; বালকের বিশ্বাসভঙ্গ—জগৎ অন্ধকার হইয়া যাওয়ার মত; সে ধাক্কা সামলাইতে হইলে, তারও চেয়ে বড় একটা শক্তি চাই; ইন্দ্রনাথ পারিয়াছিল—কোন্ শক্তিতে তাহাও আমরা দেখিয়াছি। আমরা অনেক কিছু বুঝিয়া সকল ব্যাপারে সংসারের সঙ্গে রফা করিয়া চলি, আমাদের অনেক জিনিষ সহজেই বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস করিতে হয়। আমরা নিজেরা দুর্ব্বল, তাই দুর্ব্বলকে ক্ষমা করি, নিজেরাও ক্ষমার আশা রাখি। আমাদের নিকটে বিশ্বাস বা সত্যজ্ঞান অপেক্ষা ঐরূপ বুদ্ধিই মূল্যবান। কিন্তু বিশ্বাসের যে নিঃসংশয় অবস্থা তাহাতে ভাবুকতা সেণ্টিমেণ্ট প্রভৃতি মনোবিলাসের প্রশ্রয় নাই, সহানুভূতির আত্মপ্রসাদও নাই; তাহাতে আছে আত্মার সাক্ষাৎ স্বীকৃতি। সেই 'হাঁ' বা 'না' এমনই যে, তাহাতে কোন দ্বন্দ্ব নাই, যুক্তিতর্কের মধ্যস্থতা নাই। সেইরূপ বিশ্বাস যাহার, সে হয় 'না' বলিয়া সকলই ত্যাগ করে, নয়—'হাঁ' বলিয়া সবটাই গ্রহণ করে; বিচার করে না, বিবাদ করে না—যাহা করে তাহাতে আত্মার পূর্ণ সম্মতি আছে বলিয়া পূর্ণশক্তিও অনুভব করে। যে জ্ঞান থাকিলে ঐরূপ সহানুভূতিমূলক বিশ্বাস সহজেই হয় সে জ্ঞান শ্রীকান্তের আছে, তাহাতে একরূপ বিচারবুদ্ধিও আছে; কিন্তু তাহা সংসার-নিরপেক্ষ, সংসারমুক্ত নয়, তাই অভ্রান্তও নয়। পরে দেখা যাইবে, শ্রীকান্ত এমন অনেক কিছু বিশ্বাস করে যাহা অসন্দিগ্ধ সত্য নহে; তাহাতে জ্ঞান অপেক্ষা সহানুভূতির প্ররোচনাই অধিক। ইন্দ্রনাথের জ্ঞান-বিশ্বাস যে কিরূপ, তাহা যে কত সহজ ও অভ্রান্ত, সে সম্বন্ধে শ্রীকান্ত নিজেই একস্থানে কয়েকটি বড় গভীর উক্তি করিয়াছে—তাহার বিশ্বাসের মূল কোথায়, সে যে কেন মিথ্যাকে কিছুতে বরদাস্ত করিতে পারে না, এই কথাগুলিতে তাহাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাহিয়াছে—

"তাই আমি অনেক সময় ভাবিয়াছি, ঐ বয়সে কাহারও কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া, বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা-সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এই সকল তত্ত্ব সে পাইত কোথায়? এখন কিন্তু বয়সের সঙ্গে ইহার উত্তরটাও যেন পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়। কপটতা ইন্দ্রের মধ্যে ছিল না। ...সেই জন্যই বোধ হয়, তাহার সেই হৃদয়ের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন সত্য কোন অজ্ঞাত নিয়মের বশে সেই বিশ্বব্যাপী অবিচ্ছিন্ন নিখিল সত্যের দেখা পাইয়া অনায়াসে অতি সহজেই তাহাকে নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারিত। ...মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে তবে সে মনুষ্যের মন ছাড়া আর কোথাও নয়। সুতরাং এই অসত্যকে ইন্দ্র যখন তাহার অন্তরের মধ্যে, জানিয়া হউক, না জানিয়া হউক, কোনদিন স্থান দেয় নাই, তখন তাহার বিশুদ্ধ বুদ্ধি যে মঙ্গল এবং সত্যকেই পাইবে, তাহা ত' বিচিত্র নয়।" [পৃঃ ৩৭-৩৮]

শ্রীকান্ত নিজের সম্বন্ধে এমন কথা নিশ্চয় বলিতে পারে না; 'ইন্দ্র আর আমি কি এক ধাতুর প্রস্তুত···?' (পৃঃ ৮১)—এ জ্ঞান তাহার প্রথম হইতে ছিল।

ইন্দ্রনাথকে শ্রীকান্ত ভাল বাসিয়াছে, পূজা করিয়াছে, ইন্দ্রনাথ হইবার দুরাশা কখনও করে নাই—ইহাই সত্য। কেবল ইহাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইন্দ্রনাথ ঐটুকুর দ্বারা সেই বয়সেই তাহাকে তাহার স্বভাবের পথেই কতকটা ঠেলিয়া দিয়াছিল; ভয়কে জয় করা, পরদুঃখকাতরতা, ভবঘুরে-জীবন যাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা—এ সকলই ঐ ইন্দ্রনাথকে দেখিয়াই যে তাহার চিত্তে ও চরিত্রে একটা ধর্ম্মের মত দৃঢ়মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রভাবই শেষে আরও প্রচ্ছন্ন ও রূপান্তরিত হইয়া শরৎচন্দ্রের যে আধ্যাত্মিক সঙ্কট ঘটাইয়াছিল তাহার ইঙ্গিত ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি, সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত। শ্রীকান্তের কাহিনীতে অতঃপর আমরা যে দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করিব তাহাতে, একদিকে আছে কতকগুলি প্রাচীন সংস্কারের দৃঢ়বন্ধন এবং অপরদিকে সুগভীর মানবীয় সহানুভূতি; এই দ্বন্দ্বের দুই দিকেই ইন্দ্রনাথ সমান বল সঞ্চার করিয়াছে; ত্যাগ ও আত্মনিগ্রহের সম্মুখেও সেই শক্তির আদর্শ, আবার মানুষের দুঃখদুর্গতিকেই সকল সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার উপরে স্থান দেওয়ার যে ভ্রূক্ষেপহীন দুঃসাহস, তাহার সম্মুখেও সেই এক আদর্শ। এই অদ্ভুত দ্বন্দ্ব—একই প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ স্ব-বিরোধী প্রবৃত্তির লুকাচুরি, ইহাই শ্রীকান্তের জীবনকে এমন ছন্নছাড়া করিয়াছে। এই ইন্দ্রনাথ যেমন অন্নদাদিদির পাশেও দাঁড়াইয়া আছে, তেমনই অভয়া হইতেও খুব দূরে নাই। শ্রীকান্তের দুর্ব্বলতা যেখানে সেইখানেই ইন্দ্রনাথকে প্রয়োজন; শ্রীকান্তের সেই আত্মাভিমান—সে যে কোথাও হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করিবে না—এই অভিমান বজায় রাখিবার জন্য সে অন্তরের অন্তরে ইন্দ্রনাথকেই স্মরণ করে। ইন্দ্রনাথের মত প্রেম-শক্তি তাহার নাই, তাহা সে জানে; কিন্তু সেই শক্তিহীনতাকে—সেই বন্ধনভীরুতার ঔদাসীন্যকে, সে যে ইন্দ্রনাথের অনাসক্ত জীবনের উচ্চ আদর্শ দ্বারা মণ্ডিত করিয়া আশ্বস্ত হইতে চায়, এরূপ মনে করিবার কারণ আছে।

শ্রীকান্তের জীবনে ইন্দ্রনাথের যে প্রভাব তাহা যতদূর সাধ্য সবিস্তারে নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিলাম—সে প্রভাব কত রকমের হইতে পারে তাহাই দেখাইলাম। মানুষের চরিত্র বা হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে কোন যুক্তি, কোন বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক

তত্ত্ব কাজে লাগিবে না ; এরূপ আলোচনায় কোন শেষ সিদ্ধান্ত নাই, কেবল এক-রূপ ব্যাখ্যা করা যায় মাত্র—তাহাও মূল কাহিনীর সামঞ্জস্যবিধায়ক হওয়া চাই ; আমি উপস্থিত যাহা বলিতেছি পরে সমগ্র কাহিনীর দ্বারা তাহার যতটুকু প্রমাণিত হয়, ততটুকুই যথার্থ।

(৩)

অন্নদাদিদি

She pays the debt of life not by what she does but by what she suffers. —*SCHOPENHAUER.*

আমাদের দেশে, আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই, নারীর প্রকৃতিতে বা চরিত্রে এমন একটা কিছু আছে যাহা পুরুষ-প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত; এইজন্যই পুরুষ কখনো নারীকে বুঝিতে পারিল না—পারিবার প্রয়োজনও তাহার হয় নাই তাহাতে সাধারণ জীবন-যাত্রায় বাধে না। বুঝিতে যে পারে নাই তাহার প্রমাণ, সকল দেশের কাব্যসাহিত্যে কবিরা নারীকে যেমন দেবীর আসনে বসাইয়াছে, তেমনই আবার, ধর্ম্মশাস্ত্রে শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই "নরকের দ্বার" বলিয়া পুরুষকে সাবধান হইতে বলিয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, পুরুষ নারীকে তাহার নিজেরই ধর্ম্ম বা সংস্কার-অনুযায়ী, অর্থাৎ আত্মানুরূপ—গুণসম্পন্ন করিয়া, নিজের মত করিয়া দেখিতে চায়, পারে না। উপরে যে মহামনীষীর উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছি তিনিও নারীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই; ঐ উক্তিটির মধ্যে যে সত্য আছে তাহার গভীর অর্থ তিনিও বুঝিতে চাহেন নাই, বা পারেন নাই; উহাতে নারী-ভাগ্যের কঠোরতা স্মরণ করিয়া পুরুষোচিত অনুকম্পাই প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি ঐ বাক্যটি সত্য; নারীজীবনের যে সাধারণ নিয়তি আমরা দৃষ্টিগোচর করি, তাহাতে ঐরূপ ধারণাই যথার্থ। পুরুষ নারীকে অতিশয় দুর্ব্বল ও অসহায় বুঝিয়া তাহাকে রক্ষা করা, তাহার সেই দুর্ব্বলতাকেই পছন্দ করা—এমন কি, সেই জন্যই তাহাকে একটু বিশেষ যত্ন ও সেবা করাকেই পৌরুষের লক্ষণ বলিয়া মনে করে। যে কয়েকটি কারণে, সে তাহার জীবনে নারীর নিকটে ঋণী হইতে বাধ্য হইয়াছে—প্রাকৃতিক নিয়মেই যে ঋণ হইতে তাহার অব্যাহতি নাই—সেই ঋণ স্বীকার করিয়া সে একটা বড় রকমের আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; নারীর প্রতি তাহার সেই পুরুষ-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিলেই কর্ত্তব্য শেষ হইল। নারীর ধর্ম্ম যে তাহার ধর্ম্ম নয়, এই জ্ঞানটাই যথেষ্ট; নারী-প্রকৃতি যে স্বতন্ত্র ইহা সে বোঝে, কিন্তু সে প্রকৃতি কেমন, তাহার নিজের সহিত তুলনায়

তাহাতে এমন-কিছু আছে কিনা যাহা বিপরীত হইয়াও তুচ্ছ নয়, যাহা ছোট বা নিকৃষ্ট নয়, কেবল বিপরীত মাত্র—এমন প্রশ্ন সে কখনো করে না; তার কারণ, বিপরীত বলিয়াই সে-প্রকৃতি তাহার নিকটে যেমন দুর্ব্বোধ্য, তেমনই অসার। এই আত্মাভিমান পুরুষ-প্রকৃতির মজ্জাগত, উহাই নারীর প্রতি তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

এই প্রবন্ধের শিরোদেশে ঐ যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহার অর্থ যদি ইহাই হয় যে, "নারী তাহার জীবনে কোন কর্ম্মশক্তির অধিকারী নয়, কিছু করা তাহার ধর্ম্ম নয়; সে কিছু করে না, কেবল দুঃখভোগের দ্বারা সে জীবনের ঋণ পরিশোধ করে"—তবে কথাটার আরেক অর্থ এই হইতে পারে যে—পুরুষের কর্ত্তৃত্ব প্রয়োগের জন্য, তাহার সেই শক্তি-অভিমান চরিতার্থ করিবার জন্য, যে একটি সর্ব্ব-সহিষ্ণু ধাত্রীরূপিণী ধরণীর প্রয়োজন, নারী সেই ধরণীস্থানীয়া; অর্থাৎ, পুরুষের দৌরাত্ম্য সহ্য করিবার জন্য সেই যে আরেক শক্তির প্রয়োজন—নারী সেই শক্তি। আত্মাভিমানী পুরুষ যে-শক্তির গর্ব্ব করে সেই শক্তি ঐরূপ আশ্রয় না পাইলে নিষ্ফল হইয়া যাইত; নারীর ঐ শক্তি আপনাকে তাহার অনুকূল ও অধীন করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই, পুরুষ আত্মপ্রতিষ্ঠার অবকাশ পাইয়াছে। অতএব শক্তিটা মূলে পুরুষের নয়—নারীরই। পুরুষের ঐ আত্মাভিমান এবং নারীর ঐ আত্ম-বিলোপ, এই দুইয়ের অন্যোন্যসাপেক্ষতাই যদি সংসার বা সৃষ্টিযন্ত্রকে গতিমান করিয়া থাকে, তবে ইহাই সত্য যে, নারীর ঐ আত্মবিলোপ-শক্তিই প্রধান শক্তি। পুরুষ সেই শক্তিকে জানে না—ইহাই যেমন তাহার মূঢ়তার নিদান, তেমনই, ঐ মূঢ়তাই তাহার সেই আত্মাভিমান বা কর্ত্তৃত্ববোধের হেতু—যাহা না থাকিলে সে কোন কর্ম্মই করিত না। অতএব, সকল কর্ম্মের মূল-কর্ত্রী ঐ নারী; পুরুষ তাহারই সেই অ-কর্ত্তৃত্বের—সেই আত্মবিলোপের যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, যেন তাহারই কোন ভাব বা অভাবের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। অথচ ঐ পুরুষই "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে!"

কিন্তু গীতার ঐ বচনটিতে প্রকৃতি ও পুরুষের যে সম্বন্ধ নির্ণীত হইয়াছে, আমি তাহা ঐ এক অর্থে স্বীকার করিলেও, নারীকে ঐরূপ বৈদান্তিক দৃষ্টিতে দেখিতে রাজি নই; তার কারণ, আমি বাঙালী, আমার রক্তে প্রকৃতির প্রভাব বড় বেশি; তা' ছাড়া আমি এখানে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতেছি না, নর-নারীর জীবন-রহস্য, অর্থাৎ প্রকৃতিরই লীলা-রস একটু উজ্জ্বল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—আমি কাব্য-সমালোচনা করিতেছি। শ্রীকান্তও বাঙালী, তাহার দৃষ্টিও বাঙালীর দৃষ্টি; অতএব এ কাব্যের

নারীচরিত্রগুলি যে একটু বিশেষ রকম অ-বৈদান্তিক হইবে, তাহাও নিশ্চিত; এ জন্য সেই বাঙালী-সুলভ ভাব-সাধনার দিক দিয়াই নারী-প্রকৃতির আলোচনা করিব, তাহাতেই অন্নদাদিদির চরিত্রটিকে বুঝিবার সুবিধা হইবে। এক্ষণে ঐ নারীপ্রকৃতির সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব, পাঠক—এবং পাঠিকারাও—অবহিত হউন।

আমাদের দেশে নারী ও পুরুষ সম্বন্ধে সাধারণ দার্শনিক চিন্তা এইরূপ—আমি অবশ্য একটু মার্জ্জিত ও স্পষ্টতর করিয়া দিতেছি। সৃষ্টির মূলে আছে কাম, এই কামের উচ্ছেদ করিতে পারিলে সৃষ্টির, তথা ভবযন্ত্রণার উচ্ছেদ হয়। এই উচ্ছেদের জন্য যে জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেরা সেই জ্ঞানকেই পুরুষের বিশেষ শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাহাই আত্মার ধাতু, সেই আত্মাই দেহধারী খাঁটি পুরুষের আত্মা। ঐ যে কাম উহাই প্রকৃতির শক্তি; নারীই দেহধারিণী প্রকৃতি-রূপা কামিনী। পুরুষ তাহার প্রতিভাবলে এই দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছে; কামহীন, অর্থাৎ জ্ঞানময় সেই আত্মার নিঃসঙ্গ আত্মমহিমা উপভোগ করিতে হইলে, প্রকৃতিকে—সৃষ্টিকে, এবং ঐ নারীকে—'Give the dog a bad name and hang him' করিতে হইবে। যে নিরন্তর আত্মোৎসর্গের অহেতুক (অতএব পুরুষের অবোধগম্য) উল্লাসে মহাশূন্য অফুরন্ত সৃষ্টিধারায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে—সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ্লাদিনী-শক্তির নাম কাম। নারী-প্রকৃতিও যদি সেই প্রকৃতির সহিত অভিন্ন হয়, নারী যদি সেই কামেরই প্রতীক-বিগ্রহ হয়, এবং পুরুষ যদি ঐ কামের বন্ধনে বদ্ধ, মুক্তিপ্রয়াসী, অধঃপতিত আত্মাই হয়, তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, যতদিন সে এই সৃষ্টির—প্রকৃতির—নারীর—সংসারে বিচরণ করিতেছে ততদিন সে-ই স্বধর্ম্মভ্রষ্ট; যেহেতু ঐ জ্ঞানই তাহার স্বরূপ-লক্ষণ, অতএব ততদিন সে অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত, দুর্ব্বৃত্ত ও দুরাচার; এবং যেহেতু নারী স্বধর্ম্মভ্রষ্ট নয়, ঐ কামই তাহার প্রকৃতিসুলভ, অতএব, পুরুষের তুলনায় সে সুস্থ, সাধ্বী ও নিষ্পাপ; সে দুর্ব্বল নহে, সবল; কারণ, যাহার যাহা ধর্ম্ম তাহাই তাহার সত্য, এবং তাহাই তাহার শক্তি। তুমি পুরুষ, জ্ঞানের দম্ভ কর, স্বর্গভ্রষ্ট আত্মা বলিয়া প্রকৃতির প্রতি তোমার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অন্ত নাই, তবু সেই প্রকৃতির দেওয়া দেহ—তাহারই স্তন্যরসে পুষ্ট ঐ স্নায়ু-শিরাময় যন্ত্রটিই তোমার সেই আত্ম-সাধনার একমাত্র সম্বল; তোমার ঐ দেহের মধ্যে আত্মা যেখানেই থাকুক,—যে-মন তোমার একমাত্র অস্ত্র, যাহার দ্বারা তুমিই এই সৃষ্টিকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছ—তাহাও ঐ প্রকৃতিই গড়িয়া দিয়াছে, এবং তোমারই স্বভাব-দোষে তাহা এমন মারণাস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে!

সেই আত্মারূপী তুমি এমনই কৃতঘ্ন যে, ঐ প্রকৃতিকে ও তাহার সেই শক্তি-রূপিণী নারীদেহধারিণীকে দায়ী করিয়া, তোমার পাপের শাস্তি তাহার উপরে চাপাইয়া দিয়া পুরুষাভিমান চরিতার্থ করিতে চাও! কিন্তু ইহাও সত্য নয়; মোক্ষকামী তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ যাহাই বলুন না কেন, এবং দুর্ব্বল পুরুষের—সাধারণ কাপুরুষের—জীবনযাত্রা-নীতি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা যাহাই উপদেশ করুন না কেন, কবি ও ঋষি এবং বীরগণের দৃষ্টিতে নারীর সত্যকার রূপ চিরদিন ধরা দিয়াছে। এই সৃষ্টি যদি নারীরূপা হয়, তবে সেই নারীও ব্রহ্মের অপরা প্রকৃতি,—যে প্রকৃতির বশে সেই 'এক' পুরুষ যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া, নিজকে 'বহু'-বিভক্ত করিয়া, সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সেই আত্মাহুতির মূলে যে কাম ছিল, তাহার প্রকৃত নাম কি? ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয় করা বরং সহজ, কিন্তু এই কামের অপার রহস্য, মানব-চৈতন্যের গোচর হইলেও—মানব-বুদ্ধির অগোচর। ইহার কোন তত্ত্ব নাই। ঐ যে আত্মাহুতি—প্রকৃতি তথা নারী, তাহারই বিরাট এবং ব্যক্তি-রূপ; নারীও ব্রহ্মের সেই অপরা প্রকৃতি; অর্থাৎ, সেই যজ্ঞের কর্ত্তা—ঐ আহুতির হোতা যিনি, আহুতির দ্রব্যও তিনি; হোম-কর্ত্তাও যিনি, হোম-কর্ম্মও তিনি। ইহাও সেই doing ও suffering-এর কথা; পুরুষ যদি doing এর অধিকারী হয়, এবং নারী যদি suffering-এর পাত্রী হয়, তবে ঐ পুরুষ এবং ঐ প্রকৃতি, সেই একই ব্রহ্মের দুই রূপ বুঝিতে হইবে। একেরই স্বগত-বিরোধের এই যে লীলা-রহস্য, তাহাই রস; মানুষের জীবনে ইহার যে অনন্ত নাট্য-রূপ, তাহাই সকল কাব্যের একমাত্র উপজীব্য। আমরা এমনই এক অতি বিচিত্র জীবন-কাহিনীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

শ্রীকান্ত তাহার জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে ঐ নারীর এমন এক মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, যাহার অর্থ সে কখনো খুঁজিয়া পায় নাই; তাহার সেই আত্মনিগ্রহশক্তির অসীমতা তাহাকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল—সে মূর্ত্তি তাহার দুই চক্ষুকে এমনই ঝলসিয়া দিয়াছিল যে, অতঃপর নারীমাত্রেরই মাথায় সে সেই মহিমার মুকুট-ছায়া দেখিয়াছে। এই উপন্যাসের নায়ক সে নিজেই বটে, কিন্তু তাহাতে সেই পুরুষ-নায়কের কোন পৃথক মহিমা নাই, কয়েকটি নারীই প্রধান হইয়া আছে; সেই নারীগুলির চরিত্র-কলকেই নায়কের চরিত্র মাঝে মাঝে কথিত হইয়া আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই অন্নদাদিদিই তাহার পুরুষ-অভিমানকে সেই যে ধিক্কার দিয়াছে, তাহার জীবনে সে ধিক্কার যেন আর ঘুচে নাই। প্রায় একই লগ্নে, একই ঘটনা-সূত্রে, সে দুইটি বড় ধাক্কা পাইয়াছে; পুরুষ ইন্দ্রনাথ ও নারী অন্নদা, দুই

জনে দুই দিক দিয়া তাহার মন এত বড় করিয়া দিয়াছে যে, তাহার পর সাধারণ নারী বা পুরুষকে সে আর শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই,—কাহাকেও সমকক্ষ বা সমপ্রাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার বাধিয়াছে। তথাপি পুরুষ সম্বন্ধে তাহার ভাবনার কারণ ঘটে নাই, কারণ এ সমাজে পুরুষের বালাই নাই। কিন্তু নারীকে তেমন অগ্রাহ্য করে কেমন করিয়া? শ্রীকান্ত যে বাঙালী, তাই অন্নদা-চরিত্রের সেই নারী-মন্ত্র ইন্দ্রনাথের পুরুষ-মন্ত্রকেও পরাভূত করিয়াছে। ইন্দ্রনাথের স্মৃতি তাহার পুরুষ-অভিমানকে ভিতরে ভিতরে যেটুকু উন্নত রাখিয়াছিল, পর পর দুই জন নারীর সম্পর্কে তাহা বজায় রাখিতে গিয়া, সে নিজের দুর্ব্বলতারই পরিচয় দিয়াছে, নারীর নারীত্ব-গৌরবই বৃদ্ধি পাইয়াছে,—এ কাহিনী 'মহীয়সী মহিমা মোহিনী মহিলা'র কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে অন্নদাদিদির সেই নারীত্ব-মহিমা একটু ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার জন্য, আমি পাঠক-পাঠিকাগণকে আমাদের সমাজে জীবনযাত্রা-বিধি, এবং তৎসংক্রান্ত নানা সংস্কার ও আচারগত নিয়ম বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতে বলি।

এই নারীকে আমরা সহসা একটা অতিশয় অনভ্যস্ত, সংস্কারবিরুদ্ধ প্রতিবেশের মধ্যেই দেখি; সমাজের বহির্ভাগে, জীবনযাত্রার এমন নগ্ন, বীভৎস আবেষ্টনীতে তাহার আবির্ভাব যে, আমাদের সভ্য ও ভদ্র সংস্কার তাহাতে শিহরিয়া উঠে। অথচ ঐ আবেষ্টনী না হইলে ঐরূপ চরিত্র এমন চমকিত করিত না, তাহার আগুন এমন করিয়া জ্বলিত না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাংলার আর একজন শক্তিমান কথাশিল্পী তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাকাব্যে নারীর আত্মাকে যেন খুলিয়া দেখাইবার জন্য, আরও বীভৎস ও অমেধ্য আবেষ্টনীর মধ্যে তাহাকে স্থাপন করিয়াছেন—আমি তারাশঙ্করের 'কবি'-নামক গল্পটির কথা বলিতেছি। কিন্তু সেখানে তাহা চমক সৃষ্টি করে না, তার কারণ, সেখানে সে-চরিত্রে ও সেই জীবনে আচারগত কোন বৈষম্য নাই, তাই সে কাহিনী অতিশয় বাস্তবও বটে। সেখানে নারী-চরিত্রের যে পরিচয় আছে তাহা আরও মূলগত; সেখানে তাহার মহিমা নয়—তাহার সত্য-স্বরূপের বিকৃতিই একটা ট্র্যাজেডি-রস ঘনাইয়া তুলিয়াছে। এখানে ঠিক তাহার বিপরীত; তথাপি একটা বড় সাদৃশ্যও আছে, সে ঐ অবস্থার সাদৃশ্য—যেন নারীচরিত্রের শক্তির দিক, তা' সে যেমনই হোক, ঐরূপ দুর্গতি-দুর্দ্দশার মধ্যেই প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠে। যেন এক অর্থে, ঐ 'suffering'-এর কথাটা বড় সত্য। নারীর যে মূর্ত্তি রাজ-রাজেশ্বরী-মূর্ত্তি—সেই শ্রী-সৌন্দর্য্যের কমলাসনা-মূর্ত্তি ইহা নয়; কবিগণ এবং শ্রীমান ও কীর্ত্তিমান পুরুষেরা নারীর এই মূর্ত্তিরই উপাসনা

করেন ; ইহাই সামাজিক তথা সাহিত্যিক আদর্শও বটে। কিন্তু অন্নদাদিদির ঐ মূর্ত্তি এমন অ-পূর্ব্বপরিচিত এবং সংস্কারবিরুদ্ধ যে, শ্রীকান্ত ঐখানে ঐ রূপে তাহাকে না দেখিলে, আমরা উহা কল্পনা করিতে পারিতাম না; অথচ ঐ আদর্শেরই আমরা পূজা করি—কত ঘরে উহারই ছদ্ম-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে! —অন্ততঃ কিছুদিন পূর্ব্বেও আমাদের সমাজে করিত। আসলে, গৃহসংসারের সেই কমলা-মূর্ত্তি এবং এই ভৈরবীমূর্ত্তি—দুইই সেই এক নারীর দুই-রূপ মাত্র। পুরুষ তাহার দৈন্য ও ঐশ্বর্য্য—তাহার নিজেরই সুকৃতি ও দুষ্কৃতির সজ্জায় তাহাকে যখন যেমন সাজায় সেও তখন সেই রূপ ধারণ করে—তাহাতেই তাহার শক্তির স্ফূর্ত্তি, তাহাতেই তাহার প্রকৃতির চরিতার্থতা। পুরুষের প্রেম, পুরুষের সেবা, পুরুষের যত্ন-সংগৃহীত বেশভূষা ও অলঙ্কার তাহার যে-রূপকে রমণীয় করিয়া তোলে, সে-রূপ পুরুষের দেওয়া রূপ; সে তাহার আকাঙ্ক্ষা ও তাহার সাধ্যমত নারীকে সুখ-সাধনার সামগ্রী করিয়া তোলে, শক্তিরূপিণী নারীকে দুর্ব্বলা ও কোমলা করিয়া না দেখিলে তাহার ভোগবাসনা ও পৌরুষাভিমান তৃপ্ত হয় না। কিন্তু পুরুষের সহচরী-রূপে সেই ভোগসুখে সমবিভোরতা, অথবা, পৌরুষ-বীর্য্যের সাধনায় সহধর্ম্মিণীরূপে তাহার সেই সহযোগিতা, ইহার কোনটাতেই নারীর নিজস্ব পৃথক শক্তির সম্যক ধারণা হয় না; সে ধারণা হয় তখনই—যখন নারী পুরুষের সর্ব্ব-প্রকার সেবা ও সাহচর্য্যে বঞ্চিত হয়; অর্থাৎ, যখন ব্যক্তি-পুরুষ বা সমাজ-পুরুষ এমনই দুর্ব্বল ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে যে, তাহার পাপ ও শাস্তি নারীকেই বহন করিতে হয়। তখন নারীর শক্তি সেই আদি-প্রকৃতিতে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহার সেই রাজ-রাজেশ্বরী-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মহাভৈরবী-মূর্ত্তি দেখিয়া আমরা ত্রস্ত হই। এই মূর্ত্তি অবস্থাভেদে দুইরূপ হইতে পারে—মহাশাস্তিরূপিণী, ও অনন্ত ক্ষমা বা করুণারূপিণী। অন্নদাদিদির মূর্ত্তি ঐ দ্বিতীয় মূর্ত্তি; তথাপি তাহাতেও একটা গুণ্ঠন আছে, অন্নদার নারী-স্বভাবে একটা কঠিন বন্ধন আছে—তাহার পশ্চাতে জাতিগত সংস্কার ও সংস্কৃতির একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নারীর প্রকৃতিই এমন যে তাহাতে পুরুষের মত আত্মাভিমান বা আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নাই; তাহার শক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত, এবং তুলনায় তাহা মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর—আমি ভূমিকায় সেই তত্ত্বের স্থাপনা করিয়াছি। প্রত্যেক সমাজ নারীকে যে ছাঁচে ফেলিয়া তাহার ইষ্টসাধন করিয়াছে, নারীও সেই ছাঁচ গ্রহণ করিয়া, সেই একই নারীত্বের এক-একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বাঙালী-সমাজ যে-পুরুষের সমাজ, সে-পুরুষ অতিশয় অলস—কর্ম্ম-

শক্তি অপেক্ষা ভাবুকতা ও কল্পনা, ভোগপিপাসার অস্থিরতা অপেক্ষা স্বল্পসুখের শান্তিই তাহার অধিকতর কাম্য। নারীকে সে নিজ চরিত্রের উপযোগী ছাঁচে গড়িয়া লইয়াছিল; তাহাকে মুখ্যত ভোগসহচরী না করিয়া, মাতা, পত্নী ও কন্যারূপে স্নেহসেবার অধিকারিণী করিয়া, সে তাহার শক্তিকে ভিন্ন পথে প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। নারীর সহিত পুরুষের যে সাক্ষাৎ প্রাকৃতিক সম্পর্ক—যে সম্পর্কে সে পত্নীরূপেই পুরুষের সমশক্তিভাগিনী, সেই সম্পর্কের গূঢ় ও প্রবল পিপাসা সে—হয় ভাবসাধনার মার্গে, নয় সমাজবহির্ভূত আচারে—চরিতার্থ করিয়াছে; এমন কি, গুহ্যতর ধর্ম্মসাধনায় তাহাকে রূপান্তরিত করিয়াছে। আমরা জানি, ঐ মাতার স্থান এই সমাজে কত বড়, ঠিক সেই অনুপাতে পত্নীর স্থান কোথায়। ইহার কারণ, এই অলস পৌরুষ-বিমুখ জাতি নারীর স্নেহ-সেবার সেই যে মাতৃশক্তি তাহা দ্বারাই নিজের দুর্ব্বলতা পূরণ করিতে চাহিয়াছে। আর, এ দিকে ঐ পত্নীরূপিণী নারী? তাহাকে হৃদয়ের স্বাভাবিক পিপাসা রুদ্ধ করিয়া এমন একটি তপশ্চর্য্যা করিতে হইবে, যাহাতে স্বামীর ঐ অবহেলা সে একপ্রকার স্নেহের দ্বারা সহনীয় করিতে পারে, এবং একটি দুর্জ্জয় আত্মমর্য্যাদাবোধ তাহাতে যুক্ত হইয়া তাহার পতিপ্রেমকে একরূপ ধর্ম্মসাধনায় রূপান্তরিত করে। এই সতীধর্ম্ম স্নেহহীন নহে—ইহা সতীত্বমাত্র নয়, তাহার প্রমাণ একালে বিরল হইলেও পূর্ব্বকালে যথেষ্টই পাওয়া যাইত। ভালবাসা বা প্রেম বলিতে আমরা একালে যাহা বুঝি উহা ঠিক তাহা নহে; দাম্পত্যপ্রেম যে ছিল না তাহা নহে—অন্য সমাজের মত এ সমাজেও তাহা নর-নারীর অতিদুর্ল্লভ সৌভাগ্যের মত, দেবতার প্রসাদের মতই ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবে পতি-পত্নীর যে সম্পর্ক এ সমাজে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে পুরুষের পক্ষে কোন উচ্চতর দায়িত্ব অথবা আত্মিক নিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু নারীকে একটা কঠিন সংস্কার-বন্ধন স্বীকার করিয়া একরূপ শক্তিসাধনা করিতে হইত, এবং তাহাতেও এক অদ্ভুত স্নেহ—প্রতিদান-নিরপেক্ষ একটি অপূর্ব্ব হৃদয়বৃত্তি বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

আমার মনে হয়, ইহা সাধারণ হিন্দু-সংস্কার নয়, সেই হিন্দু-সংস্কার ছাড়াও একটি বিশেষ বাঙালী-সংস্কার ঐ নারীকে এমন ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছে। কেমন করিয়া তাহা জানি না—কত ভাব ও অভাবের সাধনা, কত তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব এই সমাজে হইয়া গিয়াছে, যাহার ফলে, এদেশের নারীপ্রকৃতি একটি বিশেষ-ভাবের আধার হইয়াছে,—নারীর সেই স্বাভাবিক প্রেম-পিপাসা পত্নী-জীবনে এক অস্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির উন্মেষ করিয়াছে। অস্বাভাবিক বলিতেছি এই জন্য যে,

তাহার পত্নীকে মাতৃত্বই এমন সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত করিয়াছে। বাঙালীর সংসার ও পরিবার এমন একটি নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে, বাঙালীর মেয়ে মা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে নাই, তাহার জীবনে ঐ এক স্বভাবের চরমোৎকর্ষ হইয়াছে। স্বামীর সহিত ব্যবহারেও তাহার সেই সর্ব্বংসহা প্রকৃতিই—মাতৃত্বের মধ্যে যাহার পূর্ণবিকাশ হইয়া থাকে—যৌন-সম্বন্ধকেও অতিক্রম করিয়া অতি কঠোর আত্মবিসর্জ্জনের উপায় করিয়া লয়। এইজন্যই বাঙালীর সমাজে পত্নীরূপিণী নারীও, শত অত্যাচার সহ্য করিয়া পুরুষকে রক্ষা করিবার, পালন করিবার ঐ মমতা ত্যাগ করিতে পারে না। ইহা শুধুই সতীত্ব নামক সেই বিশিষ্ট হিন্দু-সংস্কারই নয়, আরও বেশি; কেবল, সেই সংস্কার ঐ হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনকে, ঐ আত্মবিসর্জ্জন-ধর্ম্মের সাধনাকে সহজ করিয়াছে। বাঙালী পুরুষের চরিত্র, বাঙালীর সমাজ-ব্যবস্থা, এবং বাঙালীর পারিবারিক জীবন—এই তিনের কারণে, বাঙালী নারীর যে একটি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার সিঁদুরে ও শাড়ীতে যে আয়তি-গৌরব প্রকাশ পায়, তাহা একাধারে জননী ও পত্নীর। তথাপি, আমার কথা শেষ হইল না; আমি পত্নীত্বের মধ্যেও মাতৃত্বের যে প্রচ্ছন্ন প্ররোচনার কথা বলিয়াছি তাহাতে কেহ যেন মনে না করেন, ঐ পত্নীত্ব মাতৃত্বের দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকে,—আমাদের সংসারে পত্নী-প্রেম ঠিক পতি-প্রেম নয়, অর্থাৎ, তাহাতে নারী-পুরুষের যে আদিম সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের কোন গভীরতর আকুতি নাই। এ কথার উত্তরে কেবল একটি প্রমাণমাত্র উদ্ধৃত করিতে পারি, যুক্তি-তর্ক বৃথা। সেকালে যাহারা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইত, তাহারা, আবশ্যক হইলে, বুক হইতে স্তন্যপানরত শিশুকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিত। না, নারীর হৃদয়-রহস্য ভেদ করা সত্যই সহজ নয়, আমি কেবল পুরুষ-সুলভ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ছলে একটা ব্যাখ্যার চেষ্টামাত্র করিয়াছি, নহিলে, আমার দৃষ্টি রহিয়াছে কেবল একদিকে—পত্নীত্বও নয়, মাতৃত্ব নয়—প্রেমও নয়, স্নেহও নয়,—নারীশক্তির সেই আদি-রূপটির দিকে।

এই শক্তি সমাজ, ব্যক্তি ও শিক্ষা-সংস্কার-ভেদে নারী-চরিত্রে নানারূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু আদি প্রকৃতি সেই একই। আমাদের সংস্কার ও জীবযাত্রার প্রয়োজনে, আমরা তাহার চরিত্র-ভেদই লক্ষ্য করি—সেই প্রকৃতির নানা বিকৃতিকেই বিশ্বাস করি। তথাপি একটা ধাঁধা কখনো ঘোচে না, কু—সু—যত চরিত্রই দেখি না কেন, সকলেরই মূলে কি যেন একটা রহিয়াছে বলিয়া অনুভব করি, তাহার অর্থ বুঝি না; কোন ন্যায়শাস্ত্র তাহাব সেই জটিলতা মোচন করিতে

পারে না। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে—"এই বিড়ালই বনে গেলে বন-বিড়াল হয়"; তাহার অর্থ, যাহাকে এমন শিষ্ট শান্ত পোষ-মানা দেখিতেছ, সেই যদি ছাড়া পায়—যদি গৃহে বাস না করিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে তাহারই স্বভাব ভীষণ হইয়া উঠে। কথাটা নারী-চরিত্র সম্বন্ধে পুরুষের বিমূঢ়তার প্রমাণ। নারী যেমন রক্ষণশীল, সংস্কার-ভীরু, পরাশ্রয়ী ও একনিষ্ঠাবতী, তেমনই আবার এ সকলের যাহা বিপরীত তাহাও নারীতেই সম্ভব। অতএব, এখানে পুরুষের নীতিশাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্র হার মানিয়া যায়। আমি 'শ্রীকান্তের' অন্নদাদিদির ব্যক্তি-চরিত্র সম্মুখে রাখিয়াই এত কথা বলিতেছি; অন্নদাদিদির চরিত্রেও একটা দিকই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে বটে, তথাপি তাহারও অন্তরালে সেই নারী-প্রকৃতির আদিম রূপ উঁকি দিতেছে, যথাস্থানে সে আলোচনা করিব। সমাজ যেমনই হোক, সংস্কার যেমনই হোক, সেই সংস্কার-বন্ধনের বশ্যতা-স্বীকার, অথবা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া, নারী তাহার সেই এক প্রকৃতিধর্ম্মই পালন করে। আমরা বুঝি না, ভুল করি; তার কারণ, ঐখানেই পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, সবচেয়ে মোহগ্রস্ত; তাই ওখানে সে কোন তত্ত্বকে আমোল দেয় না, দিলে তাহার ভোগলালসাই বাধা পায়। তাই সেখানে সে লোকধর্ম্ম ও নীতি-ধর্ম্মকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরে; নীতি-শাস্ত্র ত' আর কিছুই নয়—ভোগকে নিরাপদ করিবার শাস্ত্র। নারীকে স্বরূপে দেখিবার জন্য চিত্তের যে দৃঢ়তা চাই, সাধারণ মানুষের তাহা নাই—আছে বীরাচারী তান্ত্রিকের। তন্ত্রমতে ঐ সাধারণ মানুষের নাম 'পশু', তাহাদের আচারকে 'পশ্বাচার' বলে। 'পশু' অর্থে কোন গালি নয়—স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসম্পন্ন জ্ঞানহীন মানুষ। তান্ত্রিক নারীর সেই ভিতরকার রূপ দেখিয়াছে—সেই রূপ দেখিবার জন্য সে সমাজের বাহিরে শ্মশানে তাহার আস্তানা করিয়াছে। আমাদের ত' তাহা করা চলিবে না, আমরা সে-রূপ দেখিতেও চাই না।

কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাও একটা বড় রহস্য যে, আমরা নারী-শক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখি—সেই শক্তিকে পূর্ণ উদ্বুদ্ধ হইতে দেখি—দুঃখে, দুর্দ্দশায়—সুখে বা সমৃদ্ধিতে নয়; যেন আগুনের মতই তাহার যত জ্বালা তত দীপ্তি। ইহার কারণ কি? আত্মনিগ্রহের একটা অদ্ভুত নেশা কি নারীর প্রকৃতিগত? কোন কোন স্থলে তাহাই সত্য বলিয়া মনে হয়,—মনে হয়, একটা দুরন্ত আত্মাভিমানের বশে নারী তাহার দুর্ভাগ্যকেও স্বীকার করিতে চায় না; যে দুর্দ্দশা যে দুঃখের জন্য পুরুষই দায়ী—সেই পুরুষকে স্নেহ করিয়া বা মার্জ্জনা করিয়া নহে, যেন তাহাকে

সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিবার জন্যই সে ঐ কঠিন আত্মনিগ্রহের সাধনা করে। কিন্তু ইহাও নারীপ্রকৃতির বিকৃতি—সুস্থ নয়, অসুস্থতার লক্ষণ। এমন বিকৃতি আরও অনেকরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। আজ যে নারী-বিদ্রোহ সর্ব্বসমাজে দেখা যাইতেছে, তাহাও সেইরূপ বিকৃতি। নারী পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র, তাহার শক্তি পুরুষের শক্তি নয়; তথাপি সে যে পুরুষের সহিত সমধর্ম্মিতার দাবীতে, তাহারই অস্ত্রে তাহাকে সায়েস্তা করিতে চায়, ইহাও একটা বিপ্লব-লক্ষণ—প্রাকৃতিক লক্ষণ নয়। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। ঐ যে আত্মনিগ্রহ, উহা প্রকৃতপক্ষে আত্ম-শক্তিরই বিলাস, উহাতেই নারীর সেই স্বকীয় প্রকৃতি যেন প্রাণের নিগূঢ় পিপাসা নিবৃত্তি করে। পুরুষ আমরা কিছুতেই তাহা বুঝিব না, বুঝিলে—আমাদেরই কারণে উহা হইয়া থাকে বলিয়া, আমাদের পৌরুষ আহত হয়। কিন্তু যদি আমরা সংস্কারমুক্ত হইয়া, নারীকে নারীরই দিক দিয়া দেখিতে পারিতাম, তাহা হইলে—কথাটা নিষ্ঠুর হইলেও—স্বীকার করিতে বাধিত না যে, ঐ দারুণ দুঃখভোগেই নারীর যেন একটা পূর্ণতর আত্মস্ফূর্ত্তি হয়। এই স্ফূর্ত্তিকে সে অবশ্য তাহার বহিশ্চেতনায় জানে না, মানেও না; কিন্তু অন্তশ্চেতনায় সে যে ইহাকে অনুভব করে তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ, উহাও আত্মোৎসর্গ, এবং আনন্দই সে শক্তির নিদান।

এইবার এ আলোচনা শেষ করি। উপরে খণ্ড খণ্ড ভাবে অনেক কথা বলিয়াছি—তত্ত্ব একই, কিন্তু তথ্যের অরণ্যে তত্ত্বটি কেবলই হারাইয়া যায়। তথাপি, বাংলা গল্পে ও উপন্যাসে এই নারী-চরিত্রই শ্রেষ্ঠ কবি-কল্পনার উপজীব্য ও পরীক্ষাস্থল হইয়াছে, বাঙালী কথাশিল্পী এই নারীকেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন; এই নারীর স্ব-প্রকৃতিকে যিনি যতটুকু ধরিতে পারিয়াছেন, তিনি ততখানি প্রতিভার দাবী করিতে পারিয়াছেন। এইরূপ দেখিবার কালে, কেহ বা নিকটে, কেহ বা দূরে ধরিয়া সেই শক্তিকে অসীম দুঃখ সহ্য করিবার শক্তিরূপে চিনিয়াছেন, ইহাও সত্য। সাহিত্যের অপর বিভাগে যে ট্র্যাজেডি-জাতীয় নাটক বা নাটকধর্ম্মী কাব্যপ্রধান উপন্যাসের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে পুরুষ নায়ক হইলেও পুরুষের পৌরুষ-বীর্য্যের পরিণাম—স্বকর্ম্মরূপ নিয়তির হস্তে তাহার সেই শাস্তিলাভই—সে ট্র্যাজেডির মূল মর্ম্ম; কিন্তু পুরুষের সেই আত্মনাশ ঐ ট্র্যাজেডিরই অন্তর্ভুক্ত নায়িকা-নারীর আত্মোৎসর্গ হইতে স্বতন্ত্র। পুরুষের জন্য যে দুঃখ তাহা পরাজয়ের দুঃখ, অধঃপতনের দুঃখ; কিন্তু নারীর জন্য যে দুঃখ তাহাতে শোকের মধ্যেও একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধ থাকে—ক্ষতির

পরিমাণ যেমনই হোক্, শক্তিরই জয়লাভ হইয়া থাকে; যেন তাহাতেই নারী-প্রকৃতির কোন্ একটা মূল সুর পূর্ণসঙ্গীতে নিঃশেষিত হইতে দেখি। সুখ, সম্পদ, ঐশ্বর্য্যের আবেষ্টনীতেও নারী যেন দুঃখের অনলদাহ হাসিমুখে সহ্য করিয়া তাহার নারীত্বের পূর্ণ-মহিমা লাভ করে; তাহার কত নাম—দেস্‌দিমোনা, কর্ডেলিয়া, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী! শুধু তাহাই নয়, রাণীও তাহার রাণী-অভিমান ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিজের সেই নারীত্বই উপলব্ধি করে, সেও তখন বলিয়া উঠে—

"No more but e'en a woman and commanded by such poor passion as the maid that milks and does the meanest chare."

কিন্তু তাহার কারণস্বরূপ ঐ কবিগণ যাহা ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাও নারী-প্রকৃতির পূর্ণপরিচয় নহে; আরও ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইবে। প্রেম বা স্নেহ বা পরদুঃখকাতরতা নারী-চরিত্রের লক্ষণ বটে, কিন্তু নারী-প্রকৃতি তাহারও উপরে। আমাদের দেশে সেই প্রকৃতির প্রকাশ যে-রূপে হইতে দেখা যায়, অপর কোন সমাজে, সাধারণভাবে তেমন হয় না, তাই সে সাহিত্যে নারীর পরিচয় অন্যরূপ। সেখানে পুরুষের গৌরবই অধিক; পুরুষের পৌরুষ-সেবা লাভ করিয়া, এবং সেই পৌরুষের সহচরী হইয়া, নারী আরেক রূপে তাহার ধর্ম্ম-পালন করিতেছে—পুরুষ তাহার পৌরুষের দ্বারা নারীর নগ্নরূপটিকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; অথবা, নারী সেই পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করিয়া পুরুষ-শক্তির আশ্রয় হইয়াছে।

এখানে, এই বাঙালী-জীবনে, নারীর সে আশ্রয় বা আবরণ নাই; তাই তাহার সেই পূর্ণশক্তির আদিম রূপ কত মুহূর্ত্তে কত স্থানে ঝলসিয়া উঠে, অন্ধ পুরুষ তাহা দেখিয়াও দেখিতে পায় না। সেইরূপ একটি নারী—ঐ অন্নদাদিদি; শ্রীকান্ত তাহার কোন্ রূপ দেখিয়া মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়াছিল, এবং নারী-পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাহাকেই নিবেদন করিয়াছিল, সেকথা এইবার বলিব,—আমরা ঐ তত্ত্বটির দিক দিয়াই সে চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া কি পাই দেখিব; এবং তাহা হইতে—শ্রীকান্তের ঐ আদর্শ হইতেই—শ্রীকান্ত-চরিত্রের আরও ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিব।

অন্নদাদিদির যেটুকু পরিচয় শ্রীকান্তের এই কাহিনীতে আছে, তাহা অতিশয় সংক্ষিপ্ত, অর্থাৎ তাহা উপন্যাসের নায়িকা বা প্রধান চরিত্রহিসাবে নয়; তথাপি তাহাতেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে। সেই জীবনের আদি ও মধ্য, এবং এক অর্থে

অন্ত্য কাহিনীও ঐ কয়খানি পৃষ্ঠায় কথিত হইয়াছে—অন্ত্য অংশটি শেষ হয় নাই বটে কিন্তু সে যে কেন, তাহাও আমরা অনুমান করিতে পারি। আদি-পর্ব্বটা অন্নদা নিজেই তাহার চিঠিতে লিখিয়া দিয়াছে, মধ্য-পর্ব্ব ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের অনেক পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে; সেই মধ্য-পর্ব্বের শেষে ও অন্ত্য-পর্ব্বের আরম্ভেই আমরা অন্নদাকে দেখিতেছি। কাহিনীটি আরও সংক্ষেপ এবং আর একটু সুবিন্যস্ত করিয়া লইলে ভাল হয়—আলোচনার সুবিধা হয়। অন্নদা তাহার সেই চিঠিতে লিখিয়াছে—

"আমার বাবা বড়লোক। তাঁর ছেলে ছিল না। আমরা দুটি বোন। সেইজন্য বাবা দরিদ্রের গৃহ হইতে স্বামীকে আনাইয়া নিজের কাছে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন।...আমার বড় বোন বিধবা হইয়া বাড়ীতেই ছিলেন — ইঁহাকে হত্যা করিয়া স্বামী নিরুদ্দেশ হন। এ দুষ্কর্ম্ম কেন করিয়াছিলেন, তাহার হেতু তুমি ছেলেমানুষ, আজ না বুঝলেও একদিন বুঝবে। ...

"এ লজ্জা কি মর্ম্মান্তিক! তবুও তোমার দিদি সব সহিয়াছিল। কিন্তু স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন তিনি তাঁহার স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিলেন সে জ্বালা আজও তোমার দিদির যায়ে নাই। ... তার পর সাত বৎসর পরে দেখা পাই। যেমন বেশে তোমরা তাঁকে দেখিয়াছিলে, তেমনি বেশে আমাদেরই বাটির সম্মুখে তিনি সাপ খেলাইতেছিলেন। তাঁকে আর কেহ চিনিতে পারে নাই, কিন্তু আমি পারিয়াছিলাম। ... এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্যই করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছে কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে খিড়কীর দ্বার খুলিয়া আমি স্বামীর জন্য গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম।" [পৃঃ ৭৮-৭৯]

ইহাই এ কাহিনীর প্রথম পর্ব্ব। মধ্য-পর্ব্বের যেটুকু আমরা শ্রীকান্তের জবানীতে পাই তাহাই যথেষ্ট। অন্নদাদিদি তাহার জাতিভ্রষ্ট ধর্ম্মত্যাগী সাপুড়িয়া স্বামীর সঙ্গে কি অবস্থায় ঘর করিতেছে, লেখক দুই একটি চিত্রে তাহা আমাদের মনোগোচর নয়—একেবারে চক্ষুগোচর করিয়াছেন। কথা খুব সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু এত বড় কথাশিল্পীর জাদু-তূলিকার স্পর্শে তাহাতেই—ঐ ক্ষুদ্র পট-পরিসরেই যোজন-সীমাকে অঙ্গন-বদ্ধ করা হইয়াছে। সেই চিত্র এইরূপ—

"আমি তেমন বাসস্থান কখনো জীবনে দেখি নাই! একে ত চতুর্দ্দিকে নিবিড় জঙ্গল, তাহাতে মাথার উপর একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছ ও পাকুড় গাছে সমস্ত জায়গাটা যেন অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সাড়া পাইয়া একপাল মুরগী এবং ছানাগুলা চীৎকার করিয়া উঠিল। একধারে বাঁধা গোটাদুই ছাগল ম্যাঁ ম্যাঁ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুমুখে চাহিয়া দেখি — ওরে বাবা! একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রায় সমস্ত উঠান জুড়িয়া আছে।" [পৃঃ ৫৩]

অন্নদার স্বামীমহাশয়টিকে একবার মাত্র দেখিলেই, তাহার সেই চিঠির কথাগুলিতে আর সন্দেহ থাকে না। —

"ডানদিকে চাহিয়া দেখিলাম সেই পর্ণকুটীরের বারান্দার উপরে বিস্তর ছেঁড়া চাটাই ও ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় বসিয়া একটা দীর্ঘকায় পাতলা গোছের লোক প্রবল কাশির পরে হাঁপাইতেছে।

তাহার মাথায় জটা উঁচু করিয়া বাঁধা, গলায় বিবিধ প্রকারের ছোট-বড় মালা। ... তাহার লম্বা দাড়ি বস্ত্রখণ্ড দিয়া জটার সহিত বাঁধা ছিল বলিয়াই প্রথমটা চিনিতে পারি নাই, কিন্তু কাছে আসিয়া চিনিলাম সে সাপুড়ে। মাস পাঁচ ছয় আগে তাহাকে প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতাম। ... ইন্দ্র তাহাকে শাহজী সম্বোধন করিল, এবং সে আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, হাত তুলিয়া ইন্দ্রকে গাঁজার সাজ-সরঞ্জাম দেখাইয়া দিল।' [পৃঃ ৫৩-৫৪]

তারপর অন্নদাদিদির আবির্ভাব। সেই আবির্ভাব এমন সময়ে এমন ভাবে হইয়াছে যে, তাহার উপরে যেন একটা ফ্ল্যাশ-লাইট পড়িয়াছে —তীব্র আলোকের এক ঝলকেই সেই মূর্ত্তির সর্ব্বাবয়ব এবং তাহার দেহের অধিষ্ঠান-ভঙ্গিটি যুগপৎ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। —

"ইন্দ্র উঠিয়া গিয়া ঘরে ঢুকিয়া একটা ছোট ঝাঁপি এবং সাপুড়ের বাঁশি বাহির করিয়া আনিল। ... এবং পরক্ষণেই মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বাঁশি বাজাইয়া ডালাটা তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড গোখরো একহাত উঁচু হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া উঠিল; এবং মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া ইন্দ্রের হাতের ডালায় একটা তীব্র ছোবল মারিয়া ঝাঁপি হইতে বাহির হইয়া পড়িল। 'বাপ্ রে' বলিয়া ইন্দ্র উঠানে লাফাইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ সর্পরাজ বাঁশির লাউয়ের উপরে আর একটা কামড় দিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল। ইন্দ্র মুখ কালি করিয়া কহিল 'এটা একেবারে বুনো। আমি যাকে খেলাই সে নয়'।... ইন্দ্র এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল 'কামড়াক্ ব্যাটাকে! বুনো-সাপ ধরে' রাখে!... এই যে দিদি! এসো না, ঐখানে দাঁড়িয়ে থাকো — ।' আমি ঘাড় ফিরাইয়া ইন্দ্রর দিদিকে দেখিলাম।"

[পৃঃ ৫৬]

এমনই সেই আবির্ভাব। শ্রীকান্ত দেখিল —

"যেন ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। যেন যুগযুগান্তরব্যাপী কঠোর তপস্যা সাঙ্গ করিয়া তিনি এইমাত্র আসন হইতে উঠিয়া আসিলেন। বাঁ-কাঁকালে আঁটি-বাঁধা কতকগুলি শুকনো কাঠ, এবং ডান হাতে ফুলের সাজির মত একখানা ডালার মধ্যে কতকগুলি শাকসব্জি। পরণে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামা কাপড়— গেরুয়া রঙে ছোপানো, কিন্তু মলিন নয়। হাতে দু'গাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দুস্থানীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন।

"......ইন্দ্র ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, 'তুমি যেয়ো না দিদি, তোমাকে খেয়ে ফেলবে!' ......তাহার এই ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে যে ভালবাসা প্রকাশ পাইল, তাহা তিনি টের পাইলেন। ...হাসিয়া বলিলেন, 'ওরে পাগলা, অত পুণ্যি তোর এই দিদির নেই। আমাকে খাবে না রে, — এখ্খুনি ধ'রে দিচ্ছি ভাখ্ —' বলিয়া বাঁশের মাচা হইতে একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঢুকিলেন, এবং এক মিনিটের মধ্যে সাপটাকে ধরিয়া আনিয়া ঝাঁপিতে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন।" [পৃঃ ৫৬-৫৭]

ইন্দ্রনাথের দিদির পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি — সে পরিচয় চরিত্র-পরিচয় হিসাবে লক্ষণীয় বটে; একণে আমরা তাহার নারী-আত্মার পরিচয় করিতেছি। তাহার ঐ পত্রে পরোক্ষভাবে যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, সেখানে যাহার ইঙ্গিতমাত্র আছে, অতঃপর—আমি যাহাকে তাহার কাহিনীর অন্ত্যপর্ব্ব বলিয়াছি—তাহাতেই, একটা চরম ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া সেই পরিচয় অতি-তীব্র বিদ্যুৎশিখার মত আমাদের চক্ষু যেন ধাঁধিয়া দেয়। বালক শ্রীকান্তও তেমনই হতবুদ্ধি হইয়াছিল,

সেই সঙ্গে তাহার ভাবপ্রবণ স্পর্শকাতর চিত্তে সে একটা কি মহিমা অনুভব করিয়াছিল। সে মহিমা কিসের মহিমা? —নারীর প্রেম, না সতীধর্ম, না দারুণ দুঃখ বহন করিবার অত্যাশ্চর্য্য শক্তি? এই তিনই যদি সেই মহিমার উপাদান হয়, ইহাদের মধ্যে প্রধান কোন্‌টা? অন্নদা-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে ইহাই মূল প্রশ্ন — ইহারই সমাধানের উপরে আমার এই আলোচনার সার্থকতা নির্ভর করিতেছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এই অন্ত্যপর্ব্বটি একটু ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

ঘটনাটি শাহজীর মৃত্যু — হঠাৎ সর্পদংশনে তাহার ভবলীলা সাঙ্গ হইল। সংবাদ পাইয়া বালক দুইটি অন্নদার কুটীরে ছুটিয়া আসিয়াছে।—

"একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বালাইয়া দিদি বসিয়া আছেন। তাঁহার ক্রোড়ের উপর শাহজীর মাথা। তাহার পায়ের কাছে একটা প্রকাণ্ড গোখ্‌রো সাপ লম্বা হইয়া আছে।......

"মদের ঝোঁকে মুখের কাছে মুখ আনিয়া চুমকুড়ি দিয়া আদর করিতে গেলে, সেও আদর করিয়া শাহজীর গলার উপরে তীব্র চুম্বন দিয়াছে"। [পৃঃ ৭১-৭২]

তারপর —

"তিন জনে ধরাধরি করিয়া শাহজীর মৃতদেহটা সমাহিত করিলাম......হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন 'মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই' ......মূর্চ্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনি ভাবে পড়িয়া থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তারপর উঠিয়া তিনজনে গঙ্গাস্নান করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, গালার চুড়ী ভাঙিয়া ফেলিলেন; মাটি দিয়া সিঁথির সিঁদুর তুলিয়া ফেলিয়া সদ্য-বিধবার সাজে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটীরে ফিরিয়া আসিলেন।" [পৃঃ ৭৩-৭৪]

ইহার পর, অতি সামান্য শেষ সম্বল যাহা ছিল তাহাই বিক্রয় করিয়া অন্নদা স্বামীর ঋণ শোধ করিল — শেষে হাতে কয়েকটি মাত্র পয়সা লইয়া এবং বালক-দুইটির জন্য ঐ চিঠিখানি লিখিয়া রাখিয়া সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, শ্রীকান্তের পক্ষে এবং পাঠকের পক্ষেও, তাহাই অন্নদার মহাযাত্রা — পৃথিবী হইতে বিদায়গ্রহণ।

অন্নদা ও শ্রীকান্ত

"Everything to be true must become a religion. It has sown its martyrs, it should reap its saints". —*OSCAR WILDE* : *De Profundis*

অন্নদার মধ্যে শ্রীকান্ত এক মহা-তপস্বিনীকে দেখিয়াছিল, লেখক শরৎচন্দ্র সেই দিকটার উপরেই জোর দিয়াছেন। এ তপস্যা কিসের তপস্যা? উহা কি কেবলই একটা কৃচ্ছ্রসাধন—দুরন্ত আত্মনিগ্রহ? নিশ্চয়ই নয়। শ্রীকান্ত দেখিয়াছিল—সতীত্বের তপস্যা; আশ্চর্য্য হইয়াছিল এই ভাবিয়া যে, সেই সতীধর্ম্ম-পালনে নারীর আত্মোৎসর্গ কোন্ সীমায় পৌঁছিতে পারে। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সেই সতীধর্ম্মকে সে মানিয়া লইয়াছে—কিন্তু বিশ্বাস করিলেও বুঝিতে পারে নাই, এবং বুঝিতে পারে নাই বলিয়া সে রহস্য যেন তাহাকে আরও অধিক বিচলিত করিয়াছে। সেই স্বামীকেও অন্নদা এমন ভালবাসে! আমরা তাহার চিঠির আত্মকথা পূর্ব্বেই পড়িয়াছি, পরে শ্রীকান্ত যে একটি কথা—আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই লিপিবদ্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়—তাহাতে অন্নদার শুধুই পতিভক্তি নয়, তাহার সুগভীর প্রেমও সূচিত হইয়াছে। শ্রীকান্ত নারী-হৃদয়ের সেই অপার রহস্য ভেদ করিতে পারে নাই, এজন্য অন্নদার প্রতি তাহার ভক্তিই বৃদ্ধি পাইয়াছে। সে কথাটি এই—

"তিনি ডান হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহ্জীর মুখাবরণ উন্মোচিত করিয়া গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যাক্, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিই নে।" [পৃঃ ৭২]

অন্নদার এই যে অন্তিম প্রেম-কৃত্য—ঐ একটি আচরণ, এবং তাহার সেই ভঙ্গিতে আমরা যে বস্তুটির নিঃসংশয় প্রমাণ পাই, তাহার নাম কি? তাহা কেমন প্রেম? উহা কি সতীর পতিপ্রেম? না ঐ সম্পর্কঘটিত নর-নারীর স্বাভাবিক প্রেম? আমি পূর্ব্বে, আমাদের দেশে পতি-পত্নী-সম্পর্কের মধ্যেও নারীর যে একটি অস্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তির কথা বলিয়াছি—তাহাতে সতীত্ব-সংস্কার ছাড়াও যে এক প্রকার অদ্ভুত স্নেহের উল্লেখ করিয়াছি, এইখানে তাহা স্মরণ করিতে

বলি। অবশ্য, ইহাও সেই আদি নর-নারী-সম্পর্কের প্রেম হইতে কোন বাধা নাই, কারণ প্রেমমাত্রেই অহেতুক—এত বড় অবুঝ, অবিচারিত, অন্ধ আসক্তি ত' আর নাই। ইংরেজ কবির একটি শ্লোক-পংক্তি মনে পড়িতেছে—

"But Fate is the name of her ; and his name is Death."

—ইহা আমাদের বুদ্ধিসম্মত না হইলেও অতিশয় সত্য। কবি বলিয়াছেন —ঐ প্রেমের এক পক্ষ যে নারী সে যেন নিজেই নিজের নিয়তি-রূপিণী ; আর ঐ পুরুষ, তাহার প্রাণসম সেই প্রিয়জনই—তাহার 'যম', অর্থাৎ, সর্ব্বনাশের হেতু। অন্নদা ঐ পুরুষটাকে ভালবাসিয়াছিল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় ; তারপর সেই ভালবাসা যে এত গভীর ও অবিচলিত হইয়াছে, তার কারণ, অন্নদার—নারী-চরিত্রই বলিব না—নারী-আত্মারও একটা লক্ষণ। এমন পুরুষের প্রতিও নারী-অন্নদার ঐ যে প্রাণান্তিক আকর্ষণ, উহার বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণয় করিতে হইলে, ফ্রয়েডীয় যৌনতত্ব সে বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারে, কিন্তু তাহাতেও রহস্যের পূর্ণ-সমাধান হয় না। নরনারীর দেহধর্ম্মকে কোথাও সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার উপায় নাই বটে, কিন্তু সে কাম সর্ব্বত্র দেহের সীমাতেই আবদ্ধ থাকে না ; অন্নদা-দিদির ঐ যে ত্যাগ, ঐ কঠোর তপশ্চর্য্যা—যাহাতে স্থূল দেহ-সংস্কার লোপ পাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়—তাহার কারণ ফ্রয়েডীয় মনো-বিজ্ঞানে যদি ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ হইয়া থাকে, তথাপি তাহাই কি সব? শেষ কারণ ত' একরূপ দুর্জ্ঞেয় হইয়াই থাকে। শেষ পর্য্যন্ত দেহ-মন এবং আত্মা—এইরূপ একটা ভেদ মানিতেই হয় ; হয় তো প্রকৃতই কোন ভেদ নাই—সকলই একটা পরম তত্ত্বের আশ্রয়ে অভেদ হইয়া আছে ; তথাপি আমাদের বুদ্ধিতে এইরূপ একটা ভেদ স্থাপন করিয়া না লইলে, জীবনের যে প্রত্যক্ষ বা ব্যাবহারিক রূপ আমরা দেখিয়া থাকি তাহার অর্থ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এইজন্য, যেখানে স্থূল ভোগ-পিপাসা, স্বার্থ-সুখ, লাভ-ক্ষতির হিসাব প্রভৃতির লেশমাত্র আছে, সেইখানে তাহা আমরা দেহ-মনের ধর্ম্ম বলিয়াই বুঝি, এবং যেখানে ঐগুলির ঐকান্তিক অভাব লক্ষ্য করি, সেইখানেই আত্মার সাক্ষাৎ পাই। সোজাসুজি এইরূপ বিচারই যথেষ্ট, সূক্ষ্মতর দার্শনিক তত্ত্বের প্রয়োজন নাই। ইংরেজীতে 'spiritual' বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আর কিছু নয়, ঐরূপ একটা আত্মিক ব্যাপার—সাংসারিক দেনা-পাওনার শুভঙ্করীতে, বা তর্কশাস্ত্রের 'এইজন্য এই'-নিয়মের প্রমাণে তাহার হিসাব মেলে না। কিন্তু অন্নদার প্রেম কি সেইরূপ বিশুদ্ধ প্রেম মাত্র? তাহার ঐ আত্মত্যাগ বা

দেহ-দমনের মূলে আছে ঐরূপ একটা দেহজাত বা মনোজাত প্রবৃত্তিরই অতিরিক্ত বিকাশ? আর কিছু কি নাই?

শ্রীকান্ত অন্নদার পতিভক্তিকে, তাহার সেই সতীত্বের শক্তিকেই খুব বড় করিয়া দেখিয়াছে; যে পতিভক্তি হিন্দুনারীর একটি বিশিষ্ট সংস্কার ও আত্মিক শক্তিহিসাবে অমূল্য সম্পদ, অন্নদা তাহা লাভ করিয়াছে—এই দেশ ও জাতির যুগযুগান্তরাগত সাধনার সহজ উত্তরাধিকারে। রবীন্দ্রনাথ একদা ইহার একটা হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, হিন্দু-স্ত্রীর পতিপ্রেমে মানুষ-পতির স্থানে একটা আইডিয়াল-পতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ, হিন্দু-স্ত্রী তাহার স্বামীকে যে স্নেহ-প্রেম ও ভক্তি করে—তাহা সেই ব্যক্তিটাকে নয়; স্বামী একটা আইডিয়াল; ঐ ব্যক্তি যেমনই হোক, তাহার মধ্যে সে একটা আদর্শ-পতিকে দেখিয়া থাকে—ব্যক্তিটা মুছিয়া যায়। এই যে ব্যক্তিটাকে মুছিয়া ফেলিয়া, একটা নৈর্ব্যক্তিক 'স্বামী'-বিগ্রহকে সর্ব্বদা মনের মধ্যে বসাইয়া রাখা—ইহার জন্য সাধনা করিতে হয় না, হিন্দু-স্ত্রীর উহা সংস্কারগত,—অতএব একটা সহজ শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার অধিক বলেন নাই; কিন্তু ঐ যে কথাটার ইঙ্গিত করিয়াছেন, উহাতেই ঐ শক্তি ও তাহার সাধনার আভাস রহিয়াছে। যে পৌরাণিক প্রতীক-উপাসনা আমাদের ধর্ম্মসাধনার প্রধান অঙ্গ হইয়াছে, তাহাই নারীর নারীধর্ম্ম-সাধনাতেও ঐরূপ প্রতীক-উপাসনায় পরিণত হইয়াছে। উহাকেই অ-হিন্দু সমাজ 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া থাকে, কিন্তু আসলে উহা একটা 'আইডিয়া'কে—ঠিক মূর্ত্তি নয়, মূর্ত্তির সংকেতে—'রিয়ালাইজ' বা হৃদয়-লভ্য করা। ঐ স্বামী-ব্যক্তিটাকেও নারী তাহার 'আইডিয়ালে'র প্রতীক-স্বরূপ করিয়া, দুরূহকে সহজসাধ্য করিয়াছে। তাহার হৃদয় যাহাকে চায়, প্রাণের গভীরতম উৎকণ্ঠা যাহার দ্বারা নিবারণ করিতে পারে—বিবাহিত পুরুষ-মাত্রেই ত' সেই ব্যক্তি নয়। এ সমাজে স্বয়ম্বর-প্রথাও নাই, থাকিলেও—'পূর্ব্বরাগ' মাত্রেই হৃদয়ের অভ্রান্ত 'রাগ' নয়। তার উপর, আর একটা কথাও আছে; বহুকালের কর্ষণ ও সাধনার দ্বারা এ দেশে মানুষের জীবনকে একটা বিশেষ আদর্শ বা নিঃশ্রেয়সের অভিমুখী করা হইয়াছে, সেই সাধনার সেই 'কালচার' একটা সার্ব্বজনীন সংস্কারে পরিণত হইয়াছে; জগৎ ও জীবনের গায়ে এমন একটা রং লাগাইয়া দিয়াছে যে, প্রকৃতিও যেন তাহাই আপন রং বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। অতএব, নর-নারীর যৌন-পিপাসার উপরে সেই নিঃশ্রেয়সকে স্থাপন করিয়া নারীও যে ঐরূপ নৈর্ব্যক্তিক পতি-ভক্তির সাধনা করিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়—

নারীর ঐ প্রকৃতি; পুরুষের পক্ষে, ঐ সম্পর্কেও ঐরূপ প্রতীক-উপাসনা কখনই সম্ভবপর নহে। পুরুষের ব্যক্তি-অভিমান অতিশয় উগ্র, নারী সে বিষয়ে ঠিক বিপরীত—ভূমিকায় সে কথা বলিয়াছি।

কিন্তু তথাপি, উহাও কি প্রেম? প্রেম বলিতে ঐরূপ আইডিয়াল-পূজা নিশ্চয়ই নহে, কারণ প্রেমে ব্যক্তিটাই বড়, নির্ব্বিশেষ নয়—বিশেষই তাহার অবিচ্ছেদ্য আশ্রয়। আইডিয়াল-পূজায় প্রকৃতির নিগ্রহ আছে; তাহাতেও স্বাধীন হৃদয়বৃত্তির শাসন বা সংকোচ আছে, তাহাতেও একটা বৃহত্তর বন্ধন-পাশ স্বেচ্ছায় স্বীকার করা আছে। কিন্তু আমরা প্রেম বলিতে যে অবুঝ, অন্ধ আত্মবিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা বুঝি, সে প্রবৃত্তি মুখ্যত দেহ-মনের প্রবৃত্তি; তাহা এই কারণে spiritual বা আত্মিক নয় যে, আত্মবিসর্জ্জন-মূলক হইলেও তাহাতে একরূপ ভোগপিপাসাই প্রবল—ইংরেজীতে ইহাকেই 'passion' বলে। এই প্রেম কোন সংস্কার, কোন বিধিনিষেধ মানে না, এবং—পূর্ব্বে বলিয়াছি—ইহা একান্তই ব্যক্তিমুখী; ঐ মনোহরণের মূলে আছে—ব্যক্তিটিরই রূপ-গুণ; তাহার কুরূপও রূপ, তাহার দোষও গুণ; কারণ উহা যে তাহারই। সুন্দর-কুৎসিত নাই, সাধু-অসাধু নাই, জ্ঞানী-মূর্খ নাই—আছে কেবল সেই ব্যক্তির ঠিক তেমনটি হওয়া। অন্নদার প্রেম কি তেমনই? লেখক তাহার ঐ যে একটি আচরণের উল্লেখ করিয়াছেন—'গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে' ইত্যাদি, তাহাতে অন্নদার প্রেম কতকটা সেইরূপ বলিয়াই মনে হয়। সে যে-ভাবে ঐ পুরুষটার সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতেও এ প্রেম প্রায় পুরাপুরি তেমন প্রেম হইয়াই দাঁড়ায়। কিন্তু এই কাহিনীতেই একটা স্পষ্ট প্রতিবাদ আছে;—অন্নদার চিঠিতে, এবং তাহার কোন কোন কথায়, তাহার সেই প্রেমের মূলে যে একটা প্রবল সতীধর্ম্ম-নিষ্ঠাও আছে, ইহাই মনে হয়। কিন্তু শ্রীকান্ত-রূপী শরৎচন্দ্র ঐ যে একটি আচরণের উল্লেখ যেন একটু আবেগ সহকারে করিয়াছেন—উহা ত' কেবল সতীধর্ম্মের লক্ষণ নয়। উহাতে গভীর হৃদয়-ধর্ম্মের পরিচয় রহিয়াছে। তবে কি লেখক একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন? অন্নদা-চরিত্রের ঐ মহিমাতেও একটু রোমান্স যুক্ত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই? তাহাও মনে হয় না, কারণ, এ কাহিনীতে, যেখানে কোন অবস্থায় বা ঘটনায় চরিত্রগত আলোকপাত আছে—এবং সেই চরিত্র যদি এমন হয় যে, তাহা শ্রীকান্তের সারাচিত্ত চমকিত বা অভিভূত করিয়াছে, তবে সে যেন দিব্যদর্শনের মতই অভ্রান্ত—সে সম্বন্ধে শ্রীকান্তের একটি কথাও অযথার্থ মনে হয় না; এই দৃষ্টিশক্তিই

শ্রীকান্তকে শরৎচন্দ্র করিয়া তুলিয়াছে। তাই মনে হয়, শ্রীকান্ত অন্নদাকে দেখিয়াছে ঠিকই, সে তাহার সম্বন্ধে যাহা মনে করিয়াছে তাহাও মিথ্যা নহে। কিন্তু সেই দৃষ্টিও তাহারই—সে আপনার ভাবে, আপনার সংস্কার বা জন্মগত মনোভঙ্গির দৃষ্টিতেই অন্নদাকে দেখিয়াছে; এই প্রেমকে সে সতীধর্ম্মেরই অনুষঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু আমরা প্রেমকে একটু পৃথক করিয়া দেখিতেছি।

এখানে এই প্রসঙ্গে কেবল একটা প্রশ্ন করিলেই, কথাটা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। অন্নদা যদি ঐ পুরুষটার বিবাহিত পত্নী না হইত, যদি, কোন সংস্কার বা ধর্ম্মবিশ্বাসের বশে নয়—কেবল প্রেমেরই প্রবল আবেগে সে উহার সহিত গৃহত্যাগ করিয়া আসিত, তবে কি সে তাহার জন্য ঠিক এমনই সর্ব্বত্যাগের কঠিন দুঃখ বরণ করিত না? সেও কি একপ্রকার সতীত্ব-নিষ্ঠা নয়? কুলটা নারীও কি এমন একনিষ্ঠার—এমন তপশ্চর্য্যার—অধিকারিণী হইতে পারে না? এমন দৃষ্টান্ত কি বিরল? সমাজের বাহিরে, কুলবতী রমণী অপেক্ষা প্রেমে গরীয়সী বহু নারী এমনই করিয়া কি তাহাদের জীবন উৎসর্গ করে নাই? পাঠক-পাঠিকাগণ হয়তো এইরূপ অবৈধ বা সমাজ-বিরুদ্ধ প্রেমের পূর্ণ-সমর্থন করিবেন একটা সর্ত্তে,—ঐ প্রেম এক-তরফা হইতে পারিবে না, পরস্পরের মধ্যে সমান আদানপ্রদান থাকিবে; অর্থাৎ ইহাও একটা business-এর মত হওয়া চাই, তবেই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু আমি সেরূপ প্রেমের কথা বলিতেছি না; এ প্রেম এক-তরফা ও আত্মঘাতী, এই জন্যই সতীধর্ম্মের সহিত তাহার সেই ত্যাগ ও তপস্যার একটা সাদৃশ্য আছে। এই প্রেমের ট্র্যাজেডিও কাব্যসাহিত্যের উপজীব্য হইয়াছে। অতএব, অন্নদার প্রেম, ঠিক ঐরূপ ত্যাগ বা আত্মনিগ্রহে মহীয়ান হইবার জন্য, ঐ পুরুষটা তাহার স্বামী হইবার প্রয়োজন ছিল না।

তথাপি, ইহাও সত্য যে, তাহার ঐ সতীত্ব—স্বামী বলিয়াই ঐ পুরুষের প্রতি তাহার অদ্ভুত মমতা, যদি আমরা বাদ দিই, তবে অন্নদাকে আর চিনিতেই পারিব না; তাহা হইলে অন্নদার ব্যক্তি-চরিত্র লোপ পাইবে—সে চরিত্রের যতকিছু গুণ, তাহার সেই অসামান্যতা ঘুচিয়া যাইবে। আসল কথা সেই একই,—কোন চরিত্রই একটা বিশেষ আদর্শ বা ফরমুলার অনুরূপ নয়; প্রত্যেকটি তাহারই মত, এবং সেই কারণেই তাহারা এক-একটি 'চরিত্র'। ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই 'ব্যক্তি'র কথাই আসিয়া পড়িল। অতএব অন্নদা-চরিত্রে যে সকল বিপরীত বা সদৃশ গুণের সমাবেশ হইয়াছে, আমরা তাহার সেই সমষ্টিগত রূপটাই স্বীকার করিব—পৃথকভাবে কোনটার যথোপযোগিতা লইয়া মাথা ঘামাইব না। অন্নদাও নারীমাত্র;

শিক্ষা, সমাজ ও পারিবারিক অবস্থার বশে তাহার ভিতরকার সেই নারীত্ব একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; অথচ, ঠিক সেই সেই কারণে, ঠিক সেইরূপ অবস্থার বশে আর কোন নারী 'অন্নদা' হইয়া উঠিত না, তার কারণ, অন্নদার ব্যক্তি-আত্মাটা তাহারই—সেই ব্যক্তিত্বও ঐ চরিত্রবিকাশের মূলে একটা বড় কারণ হইয়া আছে।

কিন্তু অন্নদার শক্তি কোথায়? সেই আদি নারীপ্রকৃতির পরিচয় তাহার চরিত্রে কেমন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে? আমি ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে তাহা কাজে লাগিবে। অন্নদার প্রেম ও তাহার সতীত্ব, এই দুই যদি এক হয়,—অন্ততঃ এই দুইয়ের মধ্যে যদি কোন যোগ বা সম্বন্ধ থাকে, তবে সেই আদি-নারীপ্রকৃতির সেই শক্তির বলেই সে যোগ ঘটিয়াছে; শ্রীকান্ত এমন করিয়া চিন্তা করে নাই, তেমন চিন্তাবৃত্তি তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। উহা যে নিছক প্রেম নয় তাহার প্রমাণ—অন্নদার নিজেরই এই উক্তিগুলিতে পাওয়া যায়।—

(১) "আমার কথা শুধু আমার কথাই নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তা'ও ভাল কথা নয়।" [পৃঃ ৭৮]

(২) "শুনি, এ দুঃসাহসের কাজ নাকি তিনি আমার জন্য করিয়াছিলেন। কিন্তু সে মিছা কথা। তবুও একদিন গভীর রাত্রে.........স্বামীর জন্যই গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম।" [পৃঃ ৭৯]

(৩) "তিনি যখন জাত দিলেন তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্ম্মিণী বই ত' নয়।" [পৃঃ ৭৫]

(৪) "যে আমাকে আটক রাখবে সে যে আমার নিজেরই ধর্ম্ম। স্বামীর ঋণ যে আমার নিজেরই ঋণ।" [পৃঃ ৭৫]

এই সকল উক্তির মধ্যে প্রেম অপেক্ষা হিন্দু-স্ত্রীর মজ্জাগত সংস্কারের প্রভাবই অধিক। তাহার ঐ সহধর্ম্মিণীত্বও প্রেমের নয়, অর্থাৎ যদি প্রেমের অনুরোধেই স্বামীর অনুগামিনী হইয়া থাকে—তাহার সহিত ঐ ম্লেচ্ছ-জীবন যাপন করিতে দ্বিধা করিয়া থাকে, তথাপি, সেই প্রেমেরও একটা ধর্ম্মবন্ধন সে কিছুতেই অস্বীকার করিবে না; বরং অন্তরের অন্তরে সে ঐ বন্ধনটাকেই শক্ত করিয়া ধরিয়াছে; ঐ দুর্ব্বৃত্ত, কদাচার পুরুষটার সেবা সে যে-ধর্ম্মের বশে করিতেছে, সেই ধর্ম্মকে সে কিছুতেই ত্যাগ করিবে না, কারণ, ঐ ধর্ম্মই তাহার প্রেমকে ধরিয়া রাখিয়াছে। তাই সে হিন্দু-স্ত্রীর আয়তি-চিহ্ন—সিঁথির সিঁদুর ও হাতের লৌহকঙ্কণ—কখনো মোচন করে নাই, এবং সেইজন্যই সে এমন অদ্ভুত উক্তি করিয়াছে যে—

"আমি নিজে হ'তে জাত দিই নি—কোনদিন কোনো অনাচারও করি নি।" [পৃঃ ৭৬]

—অর্থাৎ, জাত দিয়াছে তাহার স্বামী, সে জন্য সে দায়ী নয়; তৎসত্ত্বেও সে তাহার ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে—"কোনদিন কোনো অনাচার করিনি।" তাহার যে ধর্ম্মান্তর ঘটিয়াছে তাহাও হিন্দু-স্ত্রী বলিয়াই ঘটিয়াছে, কারণ সে যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী। অতএব, কায়মনোবাক্যে হিন্দু বলিয়াই সে—হিন্দুপত্নী হিসাবেই—মুসলমানী। ইহা যেন ইন্দ্রনাথের সেই গালিরই উত্তর—"হিঁদুর মেয়ে হয়ে যে মোচনমানের সঙ্গে বেরিয়ে আসে তার আবার ধর্ম্মকর্ম্ম!"

আসল কথা, অন্নদা-চরিত্রে হিন্দু-স্ত্রীর ঐ পাতিব্রত্য-সংস্কার অতিশয় প্রবল; তাহার ঐ প্রেম সত্য হইলেও, সতীত্ব-সংস্কার তাহাকে গৌণ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু আমার কথা তাহাও নয়—সংস্কার বা ধর্ম্মবিশ্বাসের বশেও ঠিক ঐ ধরণের আত্মনিগ্রহ পুরুষের পক্ষে সম্ভব বা স্বাভাবিক নয়; ঐ শক্তি পুরুষের চক্ষে বিস্ময়কর এবং সমবেদনাযোগ্য হইলেও—উহা যেন দুর্ব্বলতারই বল। পুরুষ মনে করে, নারী আমাদের মত শক্তিশালী না হইয়াও—তাহার সেই অশক্তির কারণেই, কি কাণ্ড না করিয়া বসে! কি অপূর্ব্ব-সুন্দর তাহার সেই আত্মোৎসর্গের—সেই আত্মহত্যার—উন্মাদনা! বোধ হয়, কতকটা এই অর্থেই একদা এক কবি এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন—

> "In general it may be apprehended, we like women little the better for excelling us even moderately in our own acquirements and capacities. But what energy springs from her weakness! What poetry is the fruit of her passions!"—*W. S. LANDOR*

—নারী সম্বন্ধে পুরুষের ইহাই সার্ব্বজনীন ধারণা, এই কথাই আমি প্রথম হইতে বলিয়াছি। নারীকে লইয়া এত যে কবিত্ব, এত যে উচ্ছ্বাস—তাহা এইজন্যই। কিন্তু নারীর শক্তিই স্বতন্ত্র—তাহা পুরুষ-শক্তির বিপরীত, এবং বিপরীত বলিয়াই তাহা দুর্ব্বলতা নহে; এখানেও ঐ অন্নদা-চরিত্র একটু ভালো করিয়া বুঝিয়া দেখিলে তাহাই সত্য মনে হইবে। অন্নদা যখন বলে—

> "মনে করিও, তোমার দিদি যেখানেই থাকুক ভাল থাকিবে; কেন না, দুঃখ সহিয়া এখন কোন দুঃখই আর তার গায়ে লাগে না। তাহাকে কিছুতেই আর ব্যথা দিতে পারে না।" [পৃঃ ৭৯-৮০]

—তাহা শুনিয়া মনে হয় বটে, এ যেন তাহার একটা মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ; কিন্তু ইহার মধ্যেও যে একটা জয়ের উল্লাস আছে, আত্মস্থতার আত্মপ্রসাদ আছে—কোন ব্রত-উদ্‌যাপনের কঠিন স্বস্তি-বোধ আছে, তাহা আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। ঐ অবস্থায়—ঐ কারণে, ঐরূপ দুঃখ ভোগ করিয়া—ঐরূপ উক্তি যদি কোন পুরুষে করিত, তবে তাহার প্রতি, শ্রদ্ধা দূরের কথা, আমাদের সহানুভূতিও

রূপার আকার ধারণ করিত; এমন কথা নারীর মুখেই মানায়, পুরুষের মুখে মানায় না। কিন্তু কেন?—অন্নদার ঐ যে martyrdom বা আত্মবলিদান—উহা পুরুষের ধর্ম্ম নয়, উহা নারীরই স্বভাবধর্ম্ম। এখানে সেই নারী-প্রকৃতিই একটি বিশেষ সমাজের বিশেষ সংস্কারকে সহায় করিয়া পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে—এমন পূর্ণ-স্ফূর্ত্তি অন্য সমাজেও হইয়া থাকে, কিন্তু ঠিক এমন রূপে এমন ভঙ্গিতে নয়।

সাধারণ নারী-চরিত্রে আমরা ইহার বিকাশ দেখি না, নারী-প্রকৃতির বহু বিকৃতিই সচরাচর লক্ষ্য করি। শুধু দেহযন্ত্রটার নানা বিকৃত গঠনের জন্যই নয়—সমাজ ও শিক্ষার প্রকৃতিভেদেও নারীর সেই আদি-প্রকৃতির বিকাশ অনেক প্রকারে বাধাগ্রস্ত হইয়া থাকে। আমি নারীপ্রকৃতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহাতেও সব বলা হয় নাই—সেরূপ বিস্তারিত আলোচনার অবকাশও নাই। তথাপি সাধারণ নারী-চরিত্রের দৃষ্টান্তে আমার ঐ মূলতত্ত্বটির খণ্ডন হয় না; কারণ, যেমন পুরুষমাত্রেরই যে পৌরুষ থাকিবে এমন কথা নাই, তেমনই নারীমাত্রেই যে ঐরূপ খাঁটি নারীত্বের দৃষ্টান্তস্থল হইবে, এমন কথাও যথার্থ হইতে পারে না। কেবল তফাৎ এই যে, পুরুষ যতটা পুরুষত্বহীন হইতে পারে, নারী ততটা নারীত্ব-হীন হইতে পারে না—নারীর পক্ষে সেরূপ হওয়া অনৈসর্গিক; যেখানে সেইরূপ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেখানে নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অসম্পূর্ণ ধারণাই তাহার জন্য দায়ী। কিন্তু পুরুষের ঐরূপ কোন 'প্রকৃতি' নাই—তাই তাহার 'আত্মা' স্বতঃই আত্মভ্রষ্ট হয়।

এতক্ষণে অন্নদা-দিদির প্রতি শ্রীকান্তের সেই বিস্ময়-বিমূঢ় ভক্তির সম্বন্ধে কিছু বলিবার সময় আসিয়াছে। এই অন্নদাদিদিই, নারীচরিত্রের মাহাত্ম্য এবং সেই মাহাত্ম্যের একটি বিশেষ কারণ সম্বন্ধে তাহাকে নিঃসংশয় করিয়াছিল। আমরা অন্নদা-চরিত্রকে যেমন বুঝিয়াছি সে তেমন বুঝে নাই—সে যেমন বুঝিয়াছে তাহাতে তাহার নিজেরই চরিত্রের দুই একটি লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। অন্নদার স্বামীর প্রতি তাহার ঐ প্রেম সে নিশ্চয় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারিত না, যদি না সেই সঙ্গে সে অন্নদার অসীম আত্ম-নিগ্রহ—তাহার সেই সুকঠোর তপস্যা চাক্ষুষ করিত। তাহার কাছে প্রেমের কোন পৃথক নিজস্ব মূল্য নাই, সে উহা কখনও ভাল বুঝিতে পারে নাই; স্নেহ-দয়া, ভক্তি-প্রীতি সে বুঝে; অসহায় দুর্ব্বল যে তাহার প্রতি জননীর মত স্নেহ এবং নারীর প্রকৃতিসুলভ সুকোমল সেবা সে অন্তরের সহিত উপলব্ধি করে; কিন্তু অন্নদা যে ঐ পুরুষটার প্রতি কোন প্রকার

প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া এমন করিয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়াছে, এমন চিন্তা তাহার পক্ষে অস্বস্তিকর; প্রেমকে সে এতখানি মূল্য দিতে পারে না বলিয়াই অন্নদার অতখানি আত্ম-নির্য্যাতন তাহার হৃদয়ে এমন আঘাত করিয়াছে। প্রেমকে না বুঝিলেও একটা কারণে তাহাকে সে শ্রদ্ধা করিতে পারে—সে শ্রদ্ধাও ঠিক প্রেমকে নয়, প্রেমের কবলে পতিত সেই নারীকে,—যদি তাহার ফলে ঐরূপ তপশ্চর্য্যা আবশ্যক হয়। অর্থাৎ, প্রবল হৃদয়বৃত্তি নয়, প্রেমের সাক্ষাৎ তৃপ্তিসুখও নয়—সে প্রেম অন্নদাদিদির প্রেমের মত বঞ্চিত-প্রেম হওয়া চাই; মিলন নয়—বিয়োগ চাই, বিরহ চাই—চাই অসীম দুঃখভোগ। শ্রীকান্ত নিজে স্বভাব-উদাসীন—কোনরূপ হৃদয়-বন্ধন তাহার রুচিকর নয়, ঐরূপ প্রেমকে সে ভয় করে। তথাপি তাহার হৃদয় বড়ই স্পর্শকাতর—সে কল্পনাপ্রবণও বটে। তাই অন্নদাদিদির মত একটি অসাধারণ দুঃখব্রতধারিণী নারীকে দেখিয়া সে হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছে তাহা হইতেই নারীচরিত্র ও নারীভাগ্য সম্বন্ধে সে একটা ধারণা করিয়া লইয়াছে, নারী-পুরুষ-ঘটিত সমস্যার একটা বাস্তব-রূপ সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে; সম্ভবতঃ তাহার নিজ জীবনের একটা উৎকণ্ঠাও তদ্দ্বারা নিবারণ করিতে পারিয়াছে। নারীর প্রেম একটা অদ্ভুত মোহই বটে, কিন্তু তাহার মহিমাও কম নয়। উহার মূলে আছে কতকগুলি সংস্কার, নারীর জীবনে তাহা এমন দৃঢ় হইয়া থাকে যে, তাহারই বশে সে এতখানি পীড়ন কঠোর তপশ্চরণের মতই সহ্য করে। হিন্দু-স্ত্রীরূপে নারীর এই যে আত্মত্যাগ—নরনারী-ঘটিত প্রেমের উহাই শ্রেষ্ঠ গৌরব; সে গৌরব নারীর পক্ষে যেমন সুলভ, পুরুষের পক্ষে তেমন নহে। নারীর ঐ শক্তি পুরুষের নাই—প্রেমেরও কোন পৃথক মূল্য নাই। অন্নদার মত একজন সাধারণ অশিক্ষিতা নারীর মধ্যে সে ঐ যে আত্মাহুতির হোমাগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছে, তাহাতেই বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ শক্তি নারীমাত্রেরই অল্পবিস্তর আছে। শাস্ত্রের কঠিন শাসন এবং সমাজের অন্যায় উৎপীড়ন সহ্য করিবার এই যে অসীম মনোবল—নিরুপায় বলিয়াই তাহার এই যে আত্মসংহরণের শক্তি—পুরুষের পক্ষে যাহা অসম্ভব—তাহারই কারণে, নারীর একটি স্বভাব-শুচিতা আছে, শ্রীকান্ত তাহা বিশ্বাস না করিয়া পারিল না, তাই বলিতেছে—

"আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি। পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি, নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এমন এত বড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন, সংসারে পারে না কি? ......তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।"
[পৃঃ ৮২]

ইহাও শ্রীকান্তের ভাবালুতা বা ভাবাবেগমূলক আদর্শ-পরায়ণতার প্রমাণ। অন্নদাদিদি কত বড় সতী, তাহাই ভাবিয়া, অন্নদাকে সে প্রায় দেবীর আসনে বসাইয়াছে।—

"তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখন এই একটা কথা আমার কেবল মনে হয়, ভগবান্! এ তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্ম্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ, তাহা জানি।······কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এত বড় বিড়ম্বনা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এত বড় সতীর কপালে অসতীর গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে?" [পৃঃ ৮১]

অথচ এই সতীত্ব একটা সংস্কার মাত্র; অতিশয় দৃঢ় বলিয়াই ইহাকে লঙ্ঘন করা কোন বিবাহিত নারীর—হিন্দু-নারীর—পক্ষে সহজ নয়। যে নারী গুরুতর কারণ সত্ত্বেও তাহা লঙ্ঘন করে না—সে দুর্ব্বল, না শক্তিমতী? দুই-ই হইতে পারে। কিন্তু শ্রীকান্ত ঐ সংস্কার এবং শক্তিকে ভিন্ন মনে করে নাই,—এ বিষয়ে তাহার নিজের হিন্দু-সংস্কারও কম প্রবল নহে। তাহা হইলে অধিকাংশ কলঙ্কিনী নারীকে মিথ্যা-অপবাদভাগিনী মনে করিবার কালে সে কি তাহাদের ঠিক ঐরূপ পতিভক্তিও দাবী করে? নারীকে, কেবল তাহার হৃদয়-বল, তাহার অপার সহিষ্ণুতার জন্যই শ্রদ্ধা করা চলিবে না? নতুবা, শ্রীকান্ত নারীজাতির সম্পর্কে ঐ কলঙ্কের কথা বার বার বলে কেন? আসল কথা, তাহার নিজের মনেও সামাজিক নীতি-সংস্কার অতিশয় দৃঢ়মূল; সতীত্বের ঐ শুচিতা, এবং তজ্জন্য নারীর ঐরূপ আত্মনিগ্রহ তাহাকে যেমন ব্যথিত তেমনই মুগ্ধ করে। তাহার কাছে কলঙ্কিনী হওয়া না-হওয়া এক কথা, কিন্তু ঐরূপ সতী হওয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অন্নদা-দিদি হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁহার সহিত তুলনা করিয়া অপর সকল নারীর বিচার করা অতীব অন্যায়; কিন্তু তাই বলিয়া নারী-হৃদয়ের মর্য্যাদা, নারী-চরিত্রের স্বাভাবিক মহত্ত্ব অস্বীকার করার মত অপরাধ আর নাই। ইহাতে যুক্তির অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু শ্রীকান্ত-চরিত্রে যুক্তি অপেক্ষা হৃদয়াবেগের প্রভুত্বই অধিক। তথাপি এখানে তাহার চরিত্রের একটা লক্ষণ আমরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিব, তাহা এই যে, সে যতই মুক্ত-স্বাধীন হৃদয়-ধর্ম্মী হউক, সমাজের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে যতই দৃঢ়-মত পোষণ করুক—সেই অতি-গভীর সহানুভূতি সত্ত্বেও, সে তাহার মজ্জাগত হিন্দু-সংস্কার ত্যাগ করিতে পারে নাই—ঐ সতী-পূজাই তাহার প্রমাণ। হিন্দু-সমাজের নারীচরিত্রে সে এমন একটা শক্তির পরিচয় পাইয়াছিল, যাহা বহু-প্রাচীন সাধনা ও সংস্কৃতির ফল; ঐ সমাজের

বাহিরে তাহা নাই। তাহার স্বাধীন হৃদয়-ধর্ম্ম সমাজ-ধর্ম্মের যুক্তিকে স্বীকার করিবে না বটে, তথাপি ঐ একটা সংস্কার সে কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারে নাই —অন্নদার ঐ ত্যাগ-শক্তির মূলে যে সংস্কার রহিয়াছে, তাহার পূজা করিয়া সে যেন ধন্য হইয়াছে।

এত কথার পর, বোধ হয়, বলা বাহুল্য যে, আমি নারীর প্রকৃতিগত শক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, শ্রীকান্ত নারীকে সে দিক দিয়া কখনো দেখে নাই, তাহার দৃষ্টিই সেরূপ নয়। সে অন্নদার ঐ আত্মোৎসর্গকে প্রেমের মহিমা দ্বারা মণ্ডিত হইতে দেয় নাই, একটা অন্যায় দুঃখভোগ বলিয়াই মনে করিয়াছে। নারী যে স্বেচ্ছায়, স্বপ্রকৃতির বশে, ঐরূপ দুঃখভোগ করে না, এই সহজ বিশ্বাস, তাহার হৃদয় মথিত করিয়া সমাজের প্রতি তাহাকে বিরূপ করিয়াছে। নারীর মধ্যে ততখানি শক্তির সম্ভাব্যতা কল্পনা করিতেও সে বিমুখ; চিত্তের এই দুর্ব্বলতা না থাকিলে সে ঐ দুঃখেরই এতবড় কবি-উপাসক হইতে পারিত না। নারী যে ঐরূপ দুঃখভোগের দ্বারাই জীবনের ঋণ পরিশোধ করিয়া একটি অদ্ভুত মুক্তি-সুখ লাভ করে, সে তাহা বিশ্বাস করে না; বরং সমাজের যূপকাষ্ঠে উৎসর্গিত বলির পশুর ন্যায় নিরুপায়ভাবে সহ্য করে—ইহাই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। শাহজীর ঐরূপ মৃত্যু-ঘটনায় অন্নদাদিদি যখন বলিয়া উঠিল "যাক্, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি একটুও দোষ দিই নে।"—তখন শ্রীকান্ত নিশ্চয় তাহার ভিতরকার সেই নারীটাকে দেখিতে পায় নাই; সে কেবল তাহার সহ্য-শক্তিটাই দেখিয়াছে; বিশ্ববিধানকে স্বীকার করিয়া লওয়ার পরিপূর্ণ প্রশান্তি, যাহা ঐ অবস্থাতেও কেবল নারীর পক্ষেই সম্ভব, তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই। শ্রীকান্তের দৃষ্টিই সে দৃষ্টি নয়; সে যেমন প্রেমকে কোন পৃথক মর্য্যাদা দেয় না, তেমনই শক্তির ঐরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও স্বয়ংপূর্ণ মহিমাও স্বীকার করে না। তাই নারীকে সে যতখানি শ্রদ্ধা করে, তাহার অনেক অধিক তাহার সহানুভূতি। আমরা এই কাহিনীতে যতই অগ্রসর হইব ততই শ্রীকান্ত-চরিত্রের এই দিকটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেখিব। এখানে কেবল একটি প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না, তাহাও এই উপন্যাস হইতে নয়—যে উপন্যাসে শরৎচন্দ্র তাঁহার পরিণত মানসের শেষ সিদ্ধান্ত, কবি-হৃদয়ের সহিত নৈয়ায়িক বুদ্ধি যুক্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি। সেখানে নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সুস্পষ্ট উক্তিটি আছে—

"মনে আছে, সেদিনও তাহাদের কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলুম, কিন্তু কমল

স্বীকার করলে না, বললে—মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশি জানি। ও প্রবৃত্তি তো তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শুধু শূন্যতা থেকে—ওঠে বুক খালি করে' দিয়ে। ও তো স্বভাব নয়—অভাব।" [শেষ প্রশ্ন; পৃঃ ৩১১]

একটি মনের মতন স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার জবানীতে শরৎচন্দ্রের এই যে একটি উক্তি, ইহাই শ্রীকান্তের অস্পষ্ট মনোভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। প্রেমকে এবং সতীত্ব-সংস্কারকে বাদ দিলে অন্নদার মত শক্তিমতী ও বুদ্ধিমতী নারী যে দৃপ্ত তেজস্বিনী মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে—এই উপন্যাসের নায়িকা কমল সেইরূপ নারী-মূর্ত্তি। শ্রীকান্ত যে শেষ পর্য্যন্ত ঐ সংস্কারগুলাকেই অন্নদা-চরিত্রে সবচেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; তাই সে ঐ সংস্কারগুলাকে উচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছে, এবং সেই শক্তিকেই নারী-শক্তির পরাকাষ্ঠা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছে। এ কাহিনীতে ঐ শরৎচন্দ্র নাই, শ্রীকান্তই আছে; তথাপি কথাটার উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, শ্রীকান্ত-চরিত্রে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত যে একটি দ্বন্দ্ব আছে তাহা বুঝিবার পক্ষে ঐ ইঙ্গিতটুকু কাজে লাগিতে পারে।

নারীর প্রেম

(১)

পরিচয়

"Her sins are forgiven her because she loved much"

—*NEW TESTAMENT*

এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছি তাহা এই কাহিনীর একরূপ বহির্ভাগের কথা বলিলেও হয়—সেই পর্ব্ব শেষ করিয়া এখন আমরা ইহার প্রকৃত উপন্যাসভাগের মধ্যে প্রবেশ করিতেছি। সেই উপন্যাসের নায়িকা রাজলক্ষ্মীর কাহিনীই ইহার মূল কাহিনী, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। শ্রীকান্ত নিজেই তাহার নায়ক বটে, কিন্তু নায়ক-চরিত্র হিসাবে নয়, সে ঐ প্রেম-কাহিনীর লিপিকার হিসাবেই যে আত্মপরিচয় দিয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যেটুকু নায়ক-লীলা করিয়াছে, তাহাতেই নায়িকা রাজলক্ষ্মীর চিত্র এমন গভীর বর্ণে ও রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি পূর্ব্বেও শ্রীকান্তের এই আত্মকাহিনী-রচনায় একটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার সেই আত্মনিরপেক্ষ দৃষ্টি। এখানে সেই কাজ আরও দুরূহ হইলেও—তাহার নিজের সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়া উঠা সত্ত্বেও, সেই ব্যবধান রক্ষা করিতে পারিয়াছে—একটি নারীর চরিত্র ও তাহার মর্ম্মস্থলটিকে কবিহৃদয়ের গভীর স্নেহদৃষ্টি ও অপক্ষপাত সহকারে সে যতদূর সম্ভব সমূলক করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। ইহার কারণ অবশ্য এই যে, শ্রীকান্ত তত বড় প্রেমিক নয় যতবড় কবিশিল্পী; এতবড় প্রেমের পাত্র হইয়াও সে তাহাতে মজে নাই,—তাহার সেই শোভা ও মাধুর্য্য এবং সৌরভ উপভোগ করিয়াছে। শ্রীকান্ত-চরিত্র আমরা এপর্য্যন্ত যতটুকু বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহাতে প্রেমবস্তুটি তাহার পক্ষে কেমন উপাদেয় হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারি। সেই শ্রীকান্তের উপরে অতিশয় অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রেমের এক অদ্ভুত আক্রমণ ঘটিল—বেচারী শ্রীকান্ত যেন অপদস্থ হইয়া পড়িল। তাহাকে বাধ্য হইয়াই যে প্রেমিকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এবং তাহাতেও সে মাঝে মাঝে যেরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত স্ব-প্রকৃতি লঙ্ঘন করে নাই, আমরা পরে সেই বেদনাময় অথচ কৌতুককর কাহিনী অনুসরণ করিব। এখন আর-একটি নারীচরিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে

হইবে; উপস্থিত সবিস্তার আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া তাহার সেই জীবনকে একবার এক পলকে দেখিয়া লইব। এ কাহিনী কিছু বড়, তাই আমি এমনই একটা উপক্রমণিকা করিতেছি। তাহাতেও কোন অসুবিধা হইবে-না, কারণ উপন্যাসখানি ত' সকলেই একবার পাঠ করিয়াছেন।

এ নারী অন্নদা নয়। নারীর সেই আদি শক্তিমূর্ত্তির নিরাবরণ প্রকাশ ইহাতে নাই—সংসার হইতে দূরে, প্রায় শ্মশানে সর্ব্বত্যাগের সাধনা এ নয়। সংসার-রঙ্গমঞ্চ হইতে একটু দূরে—তাহারি পুরোভাগে যে পরম-সুন্দর রসিক-শেখরের দেউলখানি দাঁড়াইয়া আছে, এই নারী তাহারই প্রাঙ্গণে পিছনের দুয়ার খুলিয়া প্রবেশ করিয়াছে; সেইখানে সকলের অগোচরে সে এক অপূর্ব্ব রসের আবেশে কীর্ত্তন করে; দয়িতের দর্শনলাভ ঘটিলে সারাদেহে আরতির দীপ জ্বালাইয়া সে যখন নৃত্য করিতে থাকে, তখন তাহার অঙ্গের মণিভূষণ সেই দীপরশ্মিতে ঝলকিয়া উঠে, মহার্ঘ দুকূল-বসনে অতি-পিনদ্ধ কটিতট ও উরস-চূড়া সেই নৃত্যচ্ছন্দে গুমরিয়া উঠে, কণ্ঠের রুদ্ধ রাগিণী চরণের মঞ্জীর-ঝঙ্কারে মুখরিত হয়। নারীর এ আরেক রূপ, সেই এক নারীই এখানে এক পরম রসের পিপাসায় জীবনের খর-কণ্টক-কাননে ক্ষত বিক্ষত হইয়াও বিষপুষ্প হইতে মধুপানের দুঃসাধ্য-সাধন করে।

হৃদয়ের এই ভিখারিণী-বৃত্তি সত্ত্বেও আমরা সেই শক্তিরূপিণী নারীকে এখানেও আর এক যুদ্ধে বিজয়িনীরূপে দেখিতে পাই। দেহের রূপ-যৌবন, বাসনা-কামনার নির্ব্বন্ধ, বুদ্ধির দীপ্তি ও ক্ষমতা, এ সকলই তাহার অন্তর-তীর্থের পাথেয় হইয়াছে—তাহাকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করিয়াছে; জীবনের ঋণশোধ নয়—তাহার এলাকায় বাস করিবার জন্য যে রাজকর দিতে হয়, তাহা চুকাইয়া দিবার সামর্থ্য সে লাভ করিয়াছে। সেজন্য তাহাকে কোন পুরুষের মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই—পুরুষের সমাজ তাহার সেই ভার লইত না। কিন্তু সমাজে স্থান না হইলেও সেই সমাজ তাহার রক্তে যাহা ধরাইয়া দিয়াছে, জন্মজন্মান্তরের অপূর্ণ কামনা, উপবাস ও কৃচ্ছ্র-সাধন তাহার হৃদয়খানিকে যে ছাঁচে গড়িয়া দিয়াছে—সেই কুসুম-পেলব অথচ নিগ্রহ-কঠিন প্রকৃতি হইতে তাহার মুক্তি ঘটে নাই। অতঃপর আমি এই প্রসঙ্গে, নর-নারীঘটিত প্রেম সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনা করিব, পাঠক-পাঠিকাগণ অবহিত হউন। কেহ মনে করিবেন না যে, আমি সেই অতি-পুরাতন এবং "Too often profaned" বস্তুটির নূতন করিয়া ব্যাখ্যা করিব। আমি কেবল এই উপন্যাসে প্রেমের যে একটি বিশেষ তত্ত্ব উঁকি দিতেছে, তাহারই দিকে

আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, এবং সেই সঙ্গে বাঙালী-সমাজ ও বাঙালী-মেয়ের যেটুকু পরিচয় অত্যাবশ্যক, তাহাও দিব।

প্রেমের এমন সাধনা নারীই করিতে পারে বটে—কিন্তু তাহার রস দেশভেদে জাতিভেদে ভিন্ন। আর কোথাও, আর কোন সমাজে প্রেমের এমন ভিখারী-রূপ, পিপাসার এমন উপবাস-ব্রত, দাতার এমন দীনতা-বোধ, যাচিয়া এমন সর্ব্বস্ব-দান এবং তাহাতেই পূর্ণ পরিতৃপ্তি—সর্ব্বত্যাগের এমন রস-সম্ভোগ কবি-কল্পনাতেও ধরা দেয় নাই। আমাদের দেশে এই প্রেমের বিস্তর ব্যাখ্যা ও তত্ত্ববিচার বৈষ্ণবশাস্ত্রে হইয়াছে—তাহাকে লৌকিক না বলিয়া অলৌকিক বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন, সে প্রতিবাদ অতিশয় সত্য ও সঙ্গত। বৈষ্ণব সাধক ও তত্ত্বদর্শীরা যাহার এমন গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের ঐ নারীর দেহলতায় মুঞ্জরিয়া উঠে, সেই মাটির ফুলই শেষে সাধনার কল্পবৃক্ষে পারিজাত হইয়া উঠে। এদেশের প্রকৃতিতে, অর্থাৎ নারীর দেহভূমিতে, ঐ রস যেখানেই গাঢ় ও গূঢ়সঞ্চারী হয়, সেইখানেই সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ ঘটে, অর্থাৎ প্রেমেও আধুনিক কালে আমরা যে ব্যক্তির আত্মাভিমানকে মর্য্যাদা দিয়া থাকি, আমাদের দেশের নারী প্রথম হইতে তাহাই ত্যাগ করে, একপ্রকার রসে বিগলিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। আমি এই রসের নাম দিব 'স্নেহ'—সাধারণ ও বিশেষ দুই অর্থেই। ঐ স্নেহ যে কি বস্তু তাহা নারী-প্রেমের ঐ বিশিষ্ট লক্ষণ হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। আমাদের সাহিত্যে ও কাব্যে প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা যে প্রেমের গান গাহিয়াছি—কীর্ত্তনের আঁখোরে আঁখোরে আমাদিগকে যাহা উন্মাদিত করিয়াছে, তাহা আর কিছু নয়—প্রেমকে ছানিয়া তাহার ঐ অমৃত-নবনীর আস্বাদ। তাহাই স্নেহ, তাহাই সেই প্রেমের সারভূত। রাধাকৃষ্ণের প্রেমে রাধার প্রেমই গরীয়ান, সেই রাধা-প্রেমের গুণ গাহিয়া বাঙালী এই পাঁচশত বৎসরেও শেষ করিতে পারিল না। পুরুষ ঐ নারী-প্রেমের মর্য্যাদা রাখিতে অসমর্থ বলিয়াই নারীকেই সকল অভাব পূরণ করিয়া লইতে হইয়াছে; পুরুষের উপরে তাহার প্রেমের অভিমান ব্যর্থ হয় বলিয়াই, সেই প্রেমের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য নারী-হৃদয়ে যে একটি অপূর্ব্ব গুণের বিকাশ হয় তাহাকেই আমি স্নেহ বলিয়াছি—বৈষ্ণব-কবি বোধ হয় ইহাকেই 'লেহা' বলিয়াছেন। সকল অভিমান সকল অধিকার ত্যাগ করিয়া, অ-প্রতিদান ও অকৃতজ্ঞতার সকল দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও প্রণয়াস্পদের সুখকামনায় যে অকাতর আত্মনিবেদন তাহার

মূলে আছে ঐ স্নেহ। প্রেম বলিতে যে সাধারণ হৃদয়বৃত্তি বুঝায় সেই অত্যুগ্র কামনা বা স্বপ্নাতুর চিত্তবিকারের মধ্যে ওই বস্তু নাই। বৈষ্ণবের মধুর রসের ত' কথাই নাই;—সে রসের শ্রেষ্ঠত্ব এই হেতু যে, তাহাতে—সখ্য, বাৎসল্য, দাস্য প্রভৃতি সকল রসের লুকাচুরী আছে। তথাপি আমার মনে হয়, বাঙালী সাধকের প্রেম-বৃন্দাবনে গোপিনী-প্রেমের যে আরতি করা হয়, তাহার মূলে ঐ স্নেহই মাত্রাপূর্ণ হইয়া আছে। এই যে প্রেম ইহা পুরুষের নিকটে একটি তত্ত্ববস্তু হইয়া আছে—সেই তত্ত্বের অতিসূক্ষ্ম বিচারণায় পুরুষের কি উৎসাহ! নারী কিন্তু কোন তত্ত্বের ধারই ধারে না—তাহার প্রেম রাধার প্রেম, কি ললিতার প্রেম, কি সাধারণ গোপীদের প্রেম, সে জিজ্ঞাসা, সে ভাবনাই তাহাদের নাই।

আমাদের দেশের পুরুষ নারীহৃদয়াশ্রিত ঐ প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ প্রেমরূপে বন্দনা করিয়াছে। তাহার কারণ, প্রেমের অন্য কোন রূপ—পুরুষের পৌরুষযুক্ত রূপ—তাহার চেতনায় পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। গুরুভারবহনক্ষম যে প্রেম, যে-প্রেম ঐরূপ স্নেহের অপেক্ষা রাখে না, পুরুষের পৌরুষ হইতেই যাহার উদ্ভব, সেই প্রেম তাহার পক্ষে সুলভ নহে। এইজন্যই বোধ হয় আমরা প্রেমের প্রকৃষ্ট প্রকাশ দেখাইতে হইলে নারীর শরণাপন্ন হই। আমাদের সাহিত্যে যে একজন কবি প্রেমের এই শক্তি-মূর্ত্তিকে কাব্যে মহিমান্বিত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিমচন্দ্রও ঐ নারীকে তাহার আশ্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং নারী-প্রেমের ঐ স্নেহের দিকটাই তিনিও বিশেষ করিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার কাব্যের পুরুষ-নায়কগুলার একজনও এই প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারে নাই—সকলেই উহার অগ্নিজ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত হইয়াছে,—আপনাকে ও পরকে ভস্মীভূত করিয়াছে। সেই নির্ব্বোধ, দুরন্ত, আত্মঘাতী পুরুষকে নারীই তাহার অসীম স্নেহের অঞ্চলাবরণে রক্ষা করিয়াছে, বা করিতে গিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। পুরুষের প্রেম যেন একটা রিপু—সে যেন একটা অগ্ন্যুৎপাত; নারীর প্রেম একটা স্থির-রশ্মি—স্নেহরসপুষ্ট দীপবর্ত্তিকা। এইজন্য বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্যে, তাহার সাধনায় ও ভাবকল্পনায়, যে প্রেমস্বপ্ন আছে আমি যাহাকে স্নেহ বলিয়াছি সেই স্নেহই তাহাকে মহনীয় করিয়াছে; সেই স্নেহ নারীর। অতএব আমাদের জীবনে প্রেমও পুরুষের দায় নয়, নারীরই দায়; ঐ স্নেহযুক্ত না হইলে আমরা প্রেমেরও রসাস্বাদন করিতে পারিতাম না। কিন্তু বাঙালী-মেয়ের প্রেমে ঐ স্নেহের এমন আতিশয্য ঘটে কেমন করিয়া? যৌন-পিপাসা হইতেই যাহার আদি প্রবৃত্তি সেই রসের এমন রূপান্তর ঘটে

কোন্ কারণে? ঐ রূপান্তরের মূলে যাহা আছে আমি পূর্ব্বে সে বস্তুর উল্লেখ করিয়াছি; তাহার স্থূল অভিব্যক্তি হয় বাৎসল্য বা মাতৃ-ভাবের মধ্য দিয়া। বাঙালী-মেয়ের সেই সহজ মাতৃত্ব-সংস্কারের কথা আমি বলিয়াছি; এখানে তাহারই সম্পর্কে আরও কিছু বলিবার আছে। ঐ যে স্নেহের কথা বলিয়াছি—উহা আরও গভীর, আরও সূক্ষ্ম ও ব্যাপক; উহাই নিম্নতর ভূমিতে—নারী-জীবনের সহজ চরিতার্থতায় মাতৃভাবকেই আশ্রয় করে। পুরুষকে প্রেমের বন্ধনে ধরিতে পায় না বলিয়াই, সে যেন গর্ভের সন্তানরূপে তাহাকে সেই সুধার পাত্র করিয়া লয়—সেখানেও বাৎসল্যরসের সহিত সেই স্নেহ প্রচুর মাত্রায় মিশিয়া থাকে—যে-স্নেহ কেবল মায়ের স্নেহ নয়, যাহাকে আমি নারী-প্রেমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়াছি। এতক্ষণে, বোধ হয়, ঐ 'স্নেহ' কথাটার অর্থ—খুব স্পষ্ট করিতে না পারিলেও, তাহা যে একটা পৃথক বস্তু, অন্ততঃ সাধারণ অর্থের স্নেহ নয়—ইহা আমি বুঝাইতে পারিয়াছি। সকল জাতিই নারীর মাতৃত্বকে সম্মান করিয়া থাকে; সেই মাতৃত্ব নারীর প্রকৃতিসুলভ—একটা দেহঘটিত সংস্কারও বটে। কিন্তু বাংলাদেশে নারীর ঐ স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিও যে কারণে মাত্রাতিরিক্ত হইতে দেখা যায়, তাহার মূলে আছে যে আর একটি বস্তু তাহাকেই আমি স্নেহ নাম দিয়াছি। ঐ স্নেহ প্রেমেরই গভীরতর স্বরূপ, বাংলাদেশের নারী-প্রকৃতিতেই উহার উদ্ভব ও বিকাশ হইয়াছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই, কারণ, সকলই প্রকৃতিজ, এবং প্রকৃতিও দেশভেদে বহুরূপ হইয়া থাকে। প্রেমের রহস্য অতিশয় গভীর তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি, আমি এই একান্ত বাঙালী-জীবনের অন্তরঙ্গ কাহিনীটি ধ্যান করিয়া—এ সমাজে নারীর সেই অবগুণ্ঠিত, অবজ্ঞাত ও অবহেলিত হৃদয়-রহস্যের যবনিকা অপসারিত করিতে গিয়া—ঐ একটি তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছি; তত্ত্বটিকে আরও ভাল করিয়া পাঠক-পাঠিকাদিগের বুদ্ধিগোচর করিতে হয়তো পারিলাম না, কিন্তু কিঞ্চিৎ হৃদয়গোচর করিতে পারি নাই কি?

পূর্ব্বে বলিয়াছি, এ নারী আত্মার নিঃসঙ্গ-নির্জ্জনে আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে নির্ব্বাসিত রাখিয়া, কঠিন আত্ম-নির্ম্মমতার সাধনা করে না—ইহার সাধনাও ত্যাগের বটে, কিন্তু তাহাতে রস-সম্ভোগ আছে, অতএব সেই ত্যাগ ভোগেরই অনুষঙ্গী! সে তাহার সেই প্রকৃতিসুলভ শক্তিকেই ভাঙাইয়া—সেই মূলধনকেই জীবনের হাটে বিকিকিনিতে খাটাইতেছে। এ চরিত্রে সেই কঠিন শক্তিই তরল হইয়া অতি গভীর স্রোতোবেগে হৃদয়ের দুই কূলে প্রহত হইতেছে। এ কাহিনী

খাঁটি প্রেমের কাহিনীই বটে—কিন্তু সে প্রেম এক বিচিত্র জীবনের বিচিত্র প্রেম। প্রেমের সহস্র লক্ষ কাহিনী কাব্যে ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, তবু কি তাহার বৈচিত্র্যের শেষ আছে? জীবন-যাদুকরের সেই মায়াদণ্ডের ঘূর্ণনে স্থান-কাল ও পাত্রের কি অফুরন্ত অপূর্ব্বতা! রস সেই একই,—অভিনবত্ব কেবল রূপের; রূপ বলিতে সেই এক রসেরই স্থান-কাল-পাত্রঘটিত অতিশয় বিশিষ্ট ও বিলক্ষণ যে প্রকাশ-ভঙ্গি, তাহাই। রাজলক্ষ্মীও সেই এক নারী, তাহার প্রেমও নারী-জীবনের সেই এক পিপাসা; কিন্তু তাহার জীবনের গ্রন্থিবন্ধনটি কি অভিনব! —সেই এক মূলগ্রন্থি হইতেই কত নূতন গ্রন্থি পড়িয়াছে! তথাপি, তাহার জীবন সে নিজেই গড়িয়া লইয়াছে, সে নিজেই সেই গ্রন্থিগুলাকে আপন প্রয়োজনের অনুকূল করিয়া লইয়াছে—জীবনের একটি ডিজাইন বা প্যাটার্ণ নিজেই স্থির করিয়া লইয়াছে। সেই মূলগ্রন্থি মোচন করিবার শক্তি তাহার ছিল না; সে নারী—সমাজ-পরিত্যক্তা; রক্ষা পাইবার সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত (যেমন শত শত নারী এখনও হইতেছে), সম্পূর্ণ অসহায় এক নারী। এই অবস্থায় সে তাহার নারীপ্রকৃতি-সুলভ শক্তির দ্বারাই আত্মরক্ষা করিয়াছে; যে আঘাত রুখিবার শক্তি তাহার ছিল না, সে তাহাই যতদূর সম্ভব মানিয়া লইয়া, বাহিরে তাহাকেই সহ্য করিয়া, নিজ-জীবনের প্রেয় যাহা তাহাকে ভিতরে অক্ষত রাখিয়াছে—অন্তরবাসী সেই ইষ্টদেবতার ভোগরাগ সংগ্রহ করিয়াছে। তথাপি বাহিরের সহিত ভিতরের সেই যে দ্বন্দ্ব—সেই যে ভোগের মধ্যেই ত্যাগের সাধনা—কবির ভাষায় সেই যে—

মণিহর্ম্ম্যে অসীম সম্পদে নিমগনা।
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা॥

—তাহাকেই বাস্তবে অনুবাদ করিলে যাহা হয়—এ কাহিনীর অপূর্ব্বত্বের নিদান তাহাই। এই উপন্যাসের আদ্যন্ত ব্যাপিয়া যে একটি রস প্রধান হইয়া আছে তাহা যে একরূপ অভাবনীয়তা বা অভূতপূর্ব্বতার রস, তাহাতে সন্দেহ নাই—ইহার প্রায় সকল ঘটনা ও চরিত্রেই যেন তাহা কিছু বেশি বা অতিরিক্ত আছে বলিয়া মনে হয়; অথচ তাহারা এমনই একটা সাক্ষাৎ অনুভূতি ও আন্তরিকতার রসে সমুজ্জ্বল যে, আমরা সেগুলিকে কবিকল্পনার কৃতিত্ব বলিয়াই উপভোগ করি না। সে যেন নিত্য-পরিচিতের পরিচয়সাধন; যাহা সাধারণই বটে, অর্থাৎ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে বা ঘটিতে বাধা নাই—কিন্তু আমরা দেখিয়াও দেখি না, এ যেন তাহাকেই টানিয়া আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করা; এক কথায়, ইহা নূতন কিছু সৃষ্টি-করা নয়, যাহা আছে তাহারই আবিষ্কার।

তথাপি রাজলক্ষীর এই কাহিনীটির একটা ভাগ—উহার উপরিভাগ—অতিশয় সম্ভব বা বাস্তব বলিয়া মনে হইলেও; ভিতরের কাহিনীটি এমন অ-সাধারণ, এমন অতিরিক্ত রোমান্সগন্ধী বলিয়া মনে হয় কেন? তাহার কারণ অনেক। প্রথমতঃ, জীবনের যে দিকটা আমরা সচরাচর দেখিয়া থাকি তাহাতে কাব্য-মাত্রই তিরস্কৃত হইয়া থাকে; যদি তাহা না হইত, যদি আমাদের সহৃদয়তা বাস্তব-বুদ্ধিকে পদে পদে পরাহত করিত, তবে সংসার ও সমাজ টিকিত না; জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে আমাদের দৃষ্টিকে অতিশয় সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। কোথায় কি হেতু কোন্ মানবক বা মানবিকার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, কাহার হৃদয়ের একমাত্র কামনা বাল্যে বা যৌবনে অত্যাহত হইয়া কোন্ অদৃশ্য অন্ধকার পথে ঘুরিয়া শেষে শুকাইয়া মরিয়া গেল, অথবা সে নিজেই নিজের কি ব্যবস্থা করিয়া লইল—সমাজ তাহার সংবাদ রাখিতে পারে না; ব্যক্তির জীবনের যেটুকু তাহার শাসনাধিকার-ভুক্ত সে কেবল সেইটুকুর সুব্যবস্থা করে—তাহাও অতি সরল ও সহজ উপায়ে করিয়া থাকে। আমরাও সেই সমাজের চক্ষু দিয়া সকলকে দেখিয়া থাকি, সমাজের বিচার শিরোধার্য্য করি; এবং মানুষকে কয়েকটা সাধারণ শ্রেণীতে ফেলিয়া এমনই চিনিয়া লইয়াছি যে, তাহা হইতে ভিন্ন কিছু দেখিলেই অবিশ্বাস করি, নিন্দা করি, নয় তো কাব্য-কল্পনা হিসাবে তাহার রসমাত্র উপভোগ করি। দ্বিতীয়তঃ, এই উপন্যাসে যে-সমাজের চিত্র মাঝে মাঝে উঁকি দিয়াছে—নব্যসমাজের বাঙালীর পক্ষে তাহা কিছু দূর, কিছু অপরিচিত, একটু বা অ-প্রকৃত। এ সমাজকে আমরা এখন পল্লীসমাজ বলিয়া থাকি, এবং তাহা সাপ ও ম্যালেরিয়ার মত যে সব সাংঘাতিক প্রথা ও পদ্ধতির দ্বারা সমাকীর্ণ তাহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠি। সেইরূপ জীবনযাত্রায় কত কি ঘটিয়া থাকে, বাস্তব কল্পনাকেও ছাড়াইয়া যায়। তাহারই দুই-চারিটা উপন্যাসের কাজে লাগিলে মন্দ কি? বড় অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু সে যেন কোন্ দূর কালের, দূর দেশের কাহিনী, তাহার বাস্তবতাও রোমান্সে পরিণত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে এই সমাজের কাহিনীই আছে, কিন্তু তাহা অতীত ইতিহাসের কাহিনীরূপে নয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও, অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের বাল্য ও যৌবনকালে, বাংলার ভদ্রতম বা কুলীনতম পল্লীসমাজের রীতিনীতি ঐরূপই ছিল; শরৎচন্দ্র যে সমাজের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বাংলার হিন্দুসংস্কৃতির শেষ পীঠস্থান। রাজলক্ষ্মী এই সমাজের ব্রাহ্মণকন্যা। সে সমাজ এক্ষণে ভাঙিয়া গিয়াছে—তাহার সেই ভগ্ন পরিখা-প্রাচীরের উপরে দাঁড়াইয়া কেবল ইহাই মনে হয়,

যাহা এত মন্দ ছিল তাহা গেল—ভালই হইল; কিন্তু তাহার স্থলে গড়িলাম কি? দাঁড়াইব কোথায়? বেশ বুঝিতেছি, কোন ন্যায়-অন্যায়ের মনুষ্যত্ব-সংস্কার তাহাতে আর ছিল না, কতকগুলি চিরাচরিত প্রথার অন্ধ অনুবর্ত্তনই ছিল তাহার একমাত্র ধর্ম—অর্থাৎ টিকিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়। স্নেহ, দয়া প্রভৃতি হৃদয়-ধর্মকেও বাধ্য হইয়া বলি দিতে হইবে, নতুবা সেই জীর্ণ আটচালার বাঁধনগুলি খসিয়া যাইবে। অথচ কাঠপাথর ত' ইহারা নয়, বরং প্রাণটা কিছু বেশিমাত্রায় অনুভব-কাতর; হৃদয়াবেগের প্রবলতা কম নয়, আত্মাভিমানও অতিশয় প্রখর। তাই এ জাতির ঐ অবস্থা দেখিয়া অনেক কিছুই মনে হয়। আমরা এই যে কাহিনী পাঠ করিতেছি—এ নারীর জীবনেতিহাসের সেই আদিপর্ব্ব আজিকার দিনে কোন্ বাঙালীর মুখ হেঁট করিয়া দেয় না? এখন কেবল অধঃপতন ও অবসন্ন অবস্থাই দেখিতেছি। কবে ইহার আরম্ভ? বাঙালী হিন্দু কি কোন এক কালে কেবল জাতিকুল-রক্ষার জন্য সমাজকে এমন যূপবন্ধনে বাঁধিয়াছিল যে, তখন আর কোন ভাবনাই ভাবিতে পারে নাই? বাংলার ইতিহাস নাই, তাই সে যুগের সেই মহাসঙ্কটের কথা আমরা জানি না, কেবল অনুমান করিতে পারি। তখন ধর্ম্মের উদারতর সত্য, মানব-হৃদয়ের সত্য—এ সকলের দিকে চাহিবার উপায় ছিল না, কেবল জাতিটাকে বাঁচাইতে হইবে, অস্থি-কঙ্কালটাকে সমগ্র রাখিতে হইবে। উহাই বুঝি নব্যস্মৃতি ও রঘুনন্দনের যুগ? সেই বোধ হয় বাঙালী প্রথম তাহার তান্ত্রিক, সহজিয়া—স্বাধীন আত্ম-চর্চ্চাকে সবলে দমন করিয়া অতি কঠিন ব্রাহ্মণ্য বিধি-নিয়মের পাশে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তাহার জাতি ও জন্মগত স্বাতন্ত্র্য-পিপাসাকে সমাজের হিতার্থে সংকুচিত করিয়াছিল। গত যুদ্ধে বৃটিশ-জাতি যেমন করিয়া সকল ব্যক্তিগত অধিকার—বুদ্ধি ও বিশ্বাস—এক নেতা ও নীতির পদতলে সমর্পণ করিয়া মহাসঙ্কটে আত্মরক্ষা করিয়াছে, আমার মনে হয়, বাংলার ইতিহাসে একদা অনুরূপ মহাসঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল এবং সমগ্র বাঙালীজাতি তেমনি করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য, এক নেতা ও নীতির বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তারপর শাক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গোস্বামীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে, এবং দীর্ঘকাল পরধর্ম্মের অধীনতা ও আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নব নব উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়াসে, তাহার ধর্ম্ম ও সমাজনীতি ক্রমে কিরূপ কলুষিত হইয়াছিল, সমাজের ঐ কাঠামোখানাই বজায় রাখিতে গিয়া মনুষ্যত্বে ঘুণ ধরিয়াছিল—সেই দীর্ঘ ও জটিল কাহিনী ঐতিহাসিকের জন্য রাখিয়া, আমরা উপস্থিত এ সমাজের ঐটুকু কোষ্ঠী না

উল্টাইয়া পারিলাম না, কারণ, রাজলক্ষ্মীর জীবন ও চরিত্র ঐ সমাজকে বাদ দিয়া নহে; সেই সমাজের অপরাধও অল্প নহে।

কিন্তু সমাজ যেমনই হোক, যত উদার বা ধর্ম্মনিষ্ঠ হউক, পুরুষের তুলনায় নারীর অধিকার সর্ব্বত্রই সীমাবদ্ধ, পুরুষ তাহার অনেকখানি ভার নারীকে দিয়া বহাইয়াছে। পুরুষ নারীকে রক্ষা করিবে, তাহার ভর্ত্তা বা ভরণপোষণের কর্ত্তা হইবে; নারী তাহার সেবা করিবে, তাহার আরামের উপচার রচনা করিবে, ইহাই যুক্তি ও ন্যায়সঙ্গত। পুরুষ লড়াই করিতে পারে, নারী পারে না, তাই পুরুষ নারীকে বুঝাইয়া দিয়াছে—ভার দুইজনেরই সমান, কাহারও কম নহে। পুরুষ যাহা স্কন্ধে ধারণ করে, নারী তাহাই বক্ষে বহন করে; পীড়ন একই, কেবল অঙ্গের পার্থক্য মাত্র; কিন্তু তাহার জন্য প্রকৃতিই দায়ী—অঙ্গটা ঐরূপ পৃথক বলিয়াই ব্যাপারটা মাঝে মাঝে দৃষ্টিকটু হইয়া পড়ে। কথাটার মূলে যে একটা সত্য আছে আমরা পূর্ব্বে সে আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু পুরুষের স্কন্ধ বলীবর্দ্দের মত আয়ত এবং স্থূল হইলেও, তাহার মস্তিষ্কটা আদৌ প্রকৃতির সুনিয়ম মানিয়া চলে না; উহা যেমন দেবতার আসন হইতেও পারে, তেমনই ছুঁচা-শয়তান হইতে কাল-ভৈরব পর্য্যন্ত সকলেই ওখানে আস্তানা করিয়া থাকে। কাল-ভৈরবকে শায়েস্তা করিবার মত দুই একটা কাল-ভৈরবী যে দেখা দেয় না এমন নহে, কিন্তু সাধারণ পুরুষের মধ্যে ঐরূপ ছুঁচা-শয়তান যেমন উৎপাত করিয়া থাকে, সাধারণ নারীর মধ্যে তেমন কিছুর সাক্ষাৎ মেলে না; মিলিলেও মস্তিষ্কের শয়তানীর সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন? নারীর যাহা স্বপ্রকৃতির বিকৃতি, পুরুষের তাহাই স্বপ্রকৃতির পূর্ণতর বিকাশ।

এ আলোচনা এই পর্য্যন্ত, আমি পুনরায় আমার মূল প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিব। রাজলক্ষ্মীর কাহিনী আগাগোড়া একটি অপূর্ব্ব প্রেমের কাহিনী—বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে তাহাকে একটি বিশেষ নায়িকার পদবীতে বসাইয়া উজ্জ্বল রসের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ এই প্রেমের ব্যাখ্যানে আমার কেবলই দুইটি কথা মনে হইতেছে; প্রথম,—বাংলার প্রাণগত সেই প্রেমগীতি,—বৈষ্ণব পদাবলীর গান; দ্বিতীয়, রাজলক্ষ্মীর প্রেমে তাহার সেই কিশোরী-হৃদয়ের পূর্ব্বরাগ। তাহার কথা পরে আরও বলিব, কিন্তু এখানে সাধারণ ভাবে একটা তত্ত্বকথার অবতারণা না করিয়া পারিলাম না। আমি পূর্ব্বে এই প্রেমের প্রসঙ্গে আর একটা তত্ত্বের সাধ্যমত উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছি; এক্ষণে ঐ প্রেমের কোমলতা ও মাধুর্য্যের সহিত ঐ বয়সের কথাটাও ভুলিতে পারিতেছি না, এবং

উহা যে এই দেশের মেয়েদের সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া সত্য, বৈষ্ণব কবিদের গানে যেন তাহারই সাক্ষ্য পাই। ঐ মাধুর্য্য যদিও উষার রক্তিমাভার মত ক্ষণস্থায়ী হয়, তথাপি উহাকেই বৈষ্ণব সাধকেরা তাঁহাদের ভাব-বৃন্দাবনে চিরস্থির করিয়া উহারই মাধুরী-পানে বিভোর। কিশোরীর পক্ষেও এমন প্রেম যে সম্ভব, শুধুই সম্ভব নয়, আমরণ তাহাকে হৃদয়ে পোষণ করা এবং তাহা হইতেই পরম পিপাসার পরিতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব—রাজলক্ষ্মীর কাহিনীতে তাহাই আছে। আমার বিশ্বাস, এখানেও বাঙালীর মেয়ের হৃদয় একটা বিশেষ প্রকৃতিসম্পন্ন বলিয়াই মনে হয়—যেন সে এমনই স্বচ্ছ ও কোমল-নির্ম্মল যে, তাহাতে রং ধরিতে বিলম্ব হয় না। প্রশ্ন উঠিবে, সে রঙ কি পরিপক্ক প্রেমের রং? না, তাহা নয়। তাহাতে বুদ্ধির লেশমাত্র নাই—তাহা সেই মিষ্টিক প্রেমাবেশ, যাহা মনকে আড়াল করিয়া দেহপদ্মে মধুর মত ভরিয়া উঠে—তাহা অতনু নয়, তাহা মনসিজ নয়; তাহা আত্মহারা, তাই তনুতেই তন্ময় হইয়া থাকে। ঐ তনু যদি বাঙালী-মেয়ের তনু হয়, তবে তাহা কি দিয়া নির্ম্মিত? এই বাংলার মাটিতে কোন্ রস আছে? সেই মাটি ছানিয়া কোন্ নবীন নবনীত প্রস্তুত হয়, যাহাতে এমন ছাঁচের এমন হৃদয় গড়িয়া উঠে!

আমি, বাঙালীর মেয়ের প্রেমিকা-চরিত্র কিরূপ, এখানে সেই বিচার করিতেছি না—তাহার প্রাণের একটা বিশিষ্ট ধর্ম্ম বা প্রকৃতির কথা বলিতেছি। প্রেম বলিতে আমরা আজকাল যাহা বুঝিতে শিখিয়াছি তাহা ঐরূপ প্রাণের ধর্ম্ম নহে। আবার, অতি-আধুনিক বাংলা গল্পে-উপন্যাসে তাহার যে রাগরক্ত মূর্ত্তি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া থাকে, অথবা লালসা মিটাইয়া তৃপ্তিভরে শীৎকার করে, আমি সেই প্রেমের কথাও বলিতেছি না। প্রথমতঃ, তাহা বাস্তব হইলেও সুস্থ প্রকৃতির লক্ষণ নহে—প্রকৃতির বিকৃতি; দ্বিতীয়তঃ, তাহা এই দেশের জল-মাটি, সমাজ, ও রক্তগত সংস্কৃতির বিরোধী। সে-প্রেম অপর জাতি ও অপর সমাজের স্বভাব-ধর্ম্ম হইতে পারে,—সেখানেও তাহা সুস্থ ও অসুস্থ দুইরূপই হইতে পারে; এ দেশে তাহা ব্যাধি ভিন্ন আর কিছুই নয়। মদ্য যেমন এ দেশে পানীয় নয়, ঐ প্রেমও তেমনই এ দেশের পথ্য নয়। আমাদের দেশেও সমাজের বাহিরে, শাস্ত্রশাসনের অগোচরে, প্রেম যেখানে আপন অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখে, সেখানেও তাহার প্রকৃতি একই—যদি তাহা সেই প্রাণের বস্তুই হয়। ঐ প্রেমের অন্তস্তলে তাহার সারভূত হইয়া আছে যাহা—তাহার নাম—স্নেহ, সেই স্নেহ সম্ভব হইয়াছে বাঙালীর মেয়ের বুকের ঐ গঠনে—দেহের ঐ ছাঁচে, ঐ মাটিতে। আমি এই

যে বিষয়ের আলোচনা করিলাম—বাঙালীর মেয়েকে বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে এক করিয়া যে একটি তত্ত্বের ইঙ্গিতমাত্র করিলাম, পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা কেবল তর্ককুশল নয়—ভাবুক, সহৃদয় ও জিজ্ঞাসু—তাঁহারা যেন, এ বিষয়ের শ্রুতি ও স্মৃতি, এবং যাঁহার যেমন অভিজ্ঞতা, তাহা হইতে একটা পূর্ণতর তত্ত্ব উদ্ধার করিবার প্রয়াস করেন, কারণ, বিষয়টি যেমন গূঢ়-গভীর, তেমনই মূল্যবান।

বাঙালীর মেয়ের কথা উপস্থিত এই পর্য্যন্ত। এখন আর একবার বাঙালী-সমাজের অর্থাৎ পুরুষের কথা বলিতে হইবে। আমাদের সমাজে ঐরূপ কোমল-হৃদয়া, স্নেহশালিনী, চিরকিশোরী-প্রাণা নারী তাহার জীবনে পুরুষের নিকট হইতে কেমন আদর, কেমন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি পাইয়াছে? আমি এমন কথা বলি না যে, আমাদের শিক্ষায় বা সংস্কারে আমরা নারীকে হীন ও হেয় মনে করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি; বরং ঠিক তাহার উল্টাই অতিশয় গর্ব্ব সহকারে সর্ব্বদা ঘোষণা করিয়া থাকি। শাক্ত বাঙালী নারীকে তাহার ইষ্টদেবতার আসনে বসাইয়াছে, তাহার মাতৃপূজায় হৃদয়ের গভীরতম ভক্তি সে ঐ নারী-দেবতার পায়ে উজাড় করিয়া দিয়াছে। এমন কি, সমাজ-জীবনে ও গৃহজীবনে নারী যে তাহাকে কতখানি ঋণী করিয়াছে, তাহার কথা যে সকল সংস্কৃত শ্লোকে নিবদ্ধ আছে, সেই সকল শ্লোক শাস্ত্রবচনের মত উদ্ধৃত করিয়া সে তাহার নারী-ভক্তি চরিতার্থ করে—অথবা ভক্তির অভাব তদ্দ্বারা পূরণ করে। এ সকলই সত্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও গত দুই তিন শত বৎসরের (আরও পূর্ব্বের কথা তেমন স্মরণসাধ্য নয়) যে ইতিহাস এখনও লুপ্ত হয় নাই—বহুস্থানে তাহার জের চলিতেছে, তাহাতে দেখা যায়, বাঙালী তাহার এই সর্ব্বোত্তম নারী-সন্ততিগুলিকে—তাহার বংশশাখার ঐ মৃদুতম পুষ্পমঞ্জরীগুলিকে—বানর-নখরাঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া পথের পঙ্কে, নদীর জলে, জঞ্জাল-চুল্লীতে নিক্ষেপ করিয়াছে; সে তাহার সমাজ-সমস্যার সহজ সমাধান, কিংবা সংসারের কণ্টক-উদ্ধারের জন্য, নারী সম্বন্ধে তাহার দায়িত্ব প্রায় দেবতাদের উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছে,—ধর্ম্মশাস্ত্রের উপরে মনুষ্যত্বকে প্রশ্রয় দেয় নাই। শুধু শাস্ত্রই নয়, দেশাচার ও কুলাচার নারীর ভাগ্যলিপি নির্দ্ধারিত করিয়াছে। ইহার ফলে সারা বাংলাদেশ জুড়িয়া যে নারীমেধ-যজ্ঞ চলিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। অপহৃতা ও ধর্ষিতা নারী, নিরাশ্রয়া বিধবা নারী, বহুপত্নীক ভর্ত্তার নামমাত্র বিবাহিতা নারী, শ্বশুর-গৃহে নিদারুণ নির্য্যাতন-কাতর অসহায় নারী,—এমনই নিত্য নৈমিত্তিক নারী-নিগ্রহের অন্ত ছিল না! আমাদের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন তাঁহারা অবশ্যই এমন দুই একটি ঘটনা

স্মরণ করিবেন, যাহাতে অবাঞ্ছিত বধূকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া পুত্রের জন্য নূতন বধূ সংগ্রহ করা হইয়াছে। এরূপ ঘটনা এখনও বিরল নহে, একদা ইহা বিরল ত' নহেই, বরং একরূপ প্রচলিত ছিল বলিয়াই মনে হয়। এমন বধূহন্তার ঘরে কন্যাদান করিতে দায়গ্রস্ত পিতার অভাব হইত না, কন্যা এমনই সস্তা ছিল। রাজলক্ষ্মীর কাহিনীতে কন্যাদানের যে প্রহসন আছে তাহা আর এক কারণে; সেই কারণেও বাংলার ঘরে ঘরে বিবাহিতা কুমারীগণের যে রুদ্ধ আর্ত্তশ্বাস গুমরিয়া উঠিত, এবং পতিহস্তে সেই সব সাধ্বী কুলকন্যাদের যে দুর্দ্দশাও ঘটিত, তাহার কাহিনী এখনও লুপ্ত হয় নাই। অন্ততঃ দুইশত বৎসর ধরিয়া বাঙালী এই নারী-মেধযজ্ঞ করিয়াছে—সমাজের বুকের উপরে, তাহার সমর্থন ও সম্মতিক্রমে। এখানে এই প্রসঙ্গে, আজিকার দিনেও এই পাপের কথা এমন করিয়া স্মরণ করিবার কারণ আছে।

এতকাল ধরিয়া এই পাপ যে জাতি করিয়াছে—এবং ধর্ম্মের—শাস্ত্রের দোহাই দিয়া করিয়াছে, সে জাতির পৌরুষ, চরিত্র বা ধর্ম্মজ্ঞান যে শেষে একেবারে লোপ পাইবে—ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? সে জাতি যে নির্ব্বংশ হইবে তাহাই ত' সুনিশ্চিত! আজ যখন সেই মহামৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, তখন বিধাতাকে ফাঁকি দিবার আশায় সে হঠাৎ ভয়ানক সাধু বনিয়া গিয়াছে। তাহার চরিত্র ঠিক তেমনই আছে, কেবল যুগসঙ্কটের তাড়নায় সে এক নূতন গুরু ভজিয়া বিছানার চাদরটা পর্য্যন্ত গেরুয়া করিয়া লইয়াছে। নারীকে সে এখনও পূর্ব্বের মতই সম্মান ও স্নেহ করে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার পুরুষ-প্রাণ তেমনই আকুল। সেই পুরাতন দাম্পত্যের অধিকার বজায় রাখিবার সাধ্য আর নাই, প্রয়োজনও নাই; যাহারা নির্ধন তাহারা এখন প্রবৃত্তির বশে নারীকে পত্নী-নাম দিয়া গৃহের দাসীরূপে গ্রহণ করে; যাহারা ধনী তাহারা তাহাকে বিলাস-সঙ্গিনী করিয়া, নূতন সভ্যতার পালিশ দিয়া, পরকীয়া-পিপাসা স্বকীয়াতেই মিটাইতেছে। নারী-সম্বন্ধে তাহার সেই প্রাচীন ধর্ম্ম-মনোভাব—সে যে তৈজস নয়, মৃৎ-কলস মাত্র, বাজারে রাশি রাশি পাওয়া যায়, আনিতেও যেমন ফেলিতেও তেমন বাধে না—এই মনোভাব যে এখনও, শত বক্তৃতাসত্ত্বেও, তাহার অস্থিমজ্জা-গত হইয়া আছে, তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ একালেও পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বের সেই সমাজবিধির দোহাই দেওয়া আর যায় না, সেই পুরাতন শাস্ত্রবচন তাহার শিক্ষিত রুচির তেমন উপযোগী নয়, তাই একটা নূতন ধর্ম্মমন্ত্র তাহার বড় কাজে লাগিয়াছে—তাহার নাম অহিংসা-মন্ত্র। ঐ এক মন্ত্রে সে সকল সঙ্কট হইতে

উদ্ধার পাইয়াছে; যেটুকু লজ্জা হয় ত' অবশিষ্ট ছিল তাহাও আর রহিল না। ঐ মন্ত্রের বলে সে এক মুহূর্ত্তে দিব্যশক্তি ও দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছে—নারী-সম্বন্ধে তাহার যে দায়িত্ব ছিল তাহাও সে নিমেষে মোচন করিতে পারিয়াছে। যখন হাজার হাজার নারী ধর্ষিত, অপহৃত বা নিহত হইতেছে, তখন সে গুরু-মহাত্মার ভজন-মণ্ডলীতে বসিয়া মহাভাবে বিভোর হইয়া 'রামধুন' গাহিতেছে! আমি ঐ ভজন-সভা বা মহাত্মার ঐ মন্ত্রবাণীর নিন্দা করিতেছি না, আমি কেবল বাঙালীকে দেখিতেছি—তাহার সেই মনুষ্যত্বের নবতম ভঙ্গিমা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। জগতে এমন দৃশ্য দুর্লভ বটে। যে জাতি বাঁচিয়া থাকিতে চায়—অন্ততঃ এখনও বলে নাই যে, বাঁচিতে চাই না, বরং স্বাধীন জীবন লাভ করিয়াছে বলিয়া হর্ষধ্বনিতে আকাশ ফাটাইতেছে,—যে জাতি সন্তান কামনা করে, বংশধারা রক্ষা করিতে চায় (মানুষমাত্রেরই যাহা সহজাত আকাঙ্ক্ষা,) সেই জাতি—নারীঘটিত ইজ্জতের কথা ছাড়িয়া দিই—সেই একটা কারণেও, তাহার নারীগুলাকে, সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র এইরূপ হত্যা, অপহরণ ও ধর্ষণের মুখে ঠেলিয়া দিয়া কেমন নিশ্চিন্ত নিদ্রা উপভোগ করে! ভারতরাষ্ট্রের গৌরবে সে মদমত্ত হইয়া উঠে; অহিংসার ধর্ম্মবক্তৃতা করে; দিবারাত্রি শিশ্নোদর-সেবার উপকরণ-সংগ্রহে ছুটাছুটি করিয়া তাহারই ফাঁকে ফাঁকে পথে-ঘাটে থিয়েটারী সুর-ভাঁজার মত একটি অপরূপ ভজন গাহিয়া নিজের ঐ দুর্ব্বল ও কুৎসিত লালসার স্বস্ত্যয়ন করে!

আসল কথা, ইহাও সেই পুরুষানুক্রমিক মহাপাপের শেষ দশা। এত পাপের তো প্রায়শ্চিত্ত চাই। ভগবান ক্ষমা করেন বটে, কিন্তু বিধাতার ক্ষমা নাই। ভগবানের ক্ষমা সে চাহিবে না, কারণ, সেই নির্য্যাতিত নারীকুলের অভিশাপে তাহার মনুষ্যত্বের শেষ কণাটুকুও লোপ পাইয়াছে। পাপ সে স্বীকার করে না, তাহার বুকে এতটুকু ভয় বা অনুশোচনা নাই; পৌরুষের যে শেষতম সম্ভাবনাও ছিল তাহা ঐ ধর্ম্ম-ভণ্ডামীর দ্বারা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সে বাঙালী হইতেও চাহে না—বাংলাদেশটা উৎখাত, খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া আর কোন দেশের সহিত মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলেও তাহার অন্তরের অন্তরে বাজিবে না—মুখে এখনও যাহাই বলুক। কিন্তু ইহাই ত নিদান কালের চরম লক্ষণ; সে যখন নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে, তখন তাহার বাসভূমির কি প্রয়োজন? দেখিতেছ না, জাতির জননী যাহারা তাহাদিগকেও সে এখন স্বচ্ছন্দচিত্তে পরের ঘরে বাঁদী হইবার জন্য ছাড়িয়া দিতেছে; পাছে কিছু করিতে হয়—তাহার পৌরুষে কেহ সন্দেহ করে—তাই ক্ষুদ্র-পৌরুষের নিন্দা করিয়া সে অহিংসা-নামক মহা-পৌরুষের জয়গান করিতেছে।

একদা একখানি বিচিত্র তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ পুস্তকে আমি একটি নির্ম্মম সত্যবাণী পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম—বড় ভয়ও পাইয়াছিলাম, তার কারণ, ঐরূপ আশঙ্কা তৎপূর্ব্বেই আমার হইয়াছিল। গ্রন্থকার নব্য-শিক্ষিত সমাজের বাহিরে, আমাদের দেশের অতিশয় অশিক্ষিত সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করিয়া তাহাদের মুখ হইতে অনেক তত্ত্বকথা সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একস্থানে এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে—

"আসলে দেশের পুরুষ নিজেরাই ত' সমাজকে গড়ছেন ভাঙছেন। স্ত্রী অথবা শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েই ত' এক একটি পূর্ণ জীবন, আর সেই জীবনের সমষ্টিই ত' সমাজ বা দেশ। পুরুষেরা ইন্দ্রিয়-সুখটাকে বড় করে' নারী বলতে যে শক্তি সেটাকে ভুলে' সমাজে যথেচ্ছা শক্তির অপব্যবহারে গা ভাসিয়ে দিলেন। আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করলেন। তার ফল যা' হয়—পুড়ে গেল তাদের বলবীর্য্য, সদ্বৃত্তি, উদার ভাব তাদের সেই আগুনে। তখন বাইরের কোন শক্তিশালী জাত এসে সেই বিকৃত সমাজকে পদানত করে—সেটা কি বেশি আশ্চর্য্যের কথা? ...নারীর মধ্যে শক্তির আবিষ্কার এই দেশেই হয়েছিল, আর তার ব্যভিচারও এইখানেই চরম সীমায় উঠেছিল, এখনও তার জের পুরো দমে চলেছে।...

আমি বলিলাম, আমাদের এই হিন্দুসমাজ কি এই ভাবে ধ্বংসের পথেই যাবে?...

তিনি—আত্ম-প্রবঞ্চনা আর শঠতাই যে এখন সর্ব্বস্তরে প্রবল হ'য়ে উঠেছে। ...সর্ব্বনাশের সকল লক্ষণই ত বর্ত্তমান, আর ধ্বংসের বাকি কি?" [তন্ত্রাভিলাসীর সাধুসঙ্গ, পৃঃ ১৯৫, ২১২]

সেদিন এই কথাগুলা সাধারণ ভাবেই বুঝিয়াছিলাম, ভয়ের কারণ থাকিলেও নিরাশ হই নাই, তখনও বাঙালীর ভাগ্য এমন স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ হইয়া পড়ে নাই —ধ্বংসের সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ "আত্মপ্রবঞ্চনা ও শঠতা" এমন সর্ব্বস্তরে ব্যাপ্ত হইতে দেখি নাই। হিংসা, দ্বেষ, লোভ—দারুণ অন্নাভাবের যতকিছু দুর্নীতি, ক্লৈব্যের দর্প, রিরংসার আক্ষেপ—এই সকলের মধ্যেও ভগবৎ-প্রেমের কি সৌখীন অভিনয়! এমন মিথ্যা, আত্মার এমন অবমাননা পূর্ব্বে কল্পনা করিতেও পারি নাই। চাহিয়া দেখ, আজ এ জাতির মধ্যে, প্রত্যেক সমাজে, যে যত বড় পদগৌরব লাভ করিয়াছে সে-ই তত বড় মিথ্যাচারী; যে যত অযোগ্য সেই যোগ্যতম হইয়াছে; যে-বস্তু যত অসার তাহার মূল্য তত বেশি—প্রকাশ্যে জনসভা ডাকিয়া তাহাকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করা হয়! লম্পট নীতি-শিক্ষার গুরু হইয়াছে; অর্থলোলুপ বণিকধর্ম্মী শঠচূড়ামণি দিকে দিকে সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া সাহিত্য, সংস্কৃতি, এমন কি বিদ্যাবিভাগেরও পরিচালক হইয়াছে। যাহার সাহিত্যিক প্রতিভা ছিল—সেও অহিংসা-মন্ত্র—অর্থাৎ বাড়ী, গাড়ী ও নগদ-নারায়ণের সাধনায়, দেশকে মহামুক্তির আশ্বাস দিবার পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে। যে দিকে তাকাও ঐ এক দৃশ্য। তাই আজ ঐ কথাগুলি আর সাধারণ অর্থে লইবার উপায় নাই—নিদারুণ ভবিষ্যৎবাণী বলিয়াই মনে হইতেছে।

আমার প্রসঙ্গ হইতে কিছুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, হয় তো কিছু অপ্রাসঙ্গিক আলোচনাও করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু সাহিত্য যে জীবন হইতে কোনরূপেই এবং কোন কালেই পৃথক নয়, আমার এই অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা তাহাই প্রমাণ করিতেছে। আমি শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে যাইতেছি, তজ্জন্য আমি তাহাকে যে ভাবে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছি—এবং তেমন দেখিবার কারণ কি—তাহাই আপনাদিগকে পূর্ব্বাহ্লে সবিস্তারে জানাইয়া রাখিলাম। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানিরও প্রথম হইতে প্রায় শেষ পর্য্যন্ত লেখক হিন্দুসমাজ ও নারীর জীবন এই দুইয়ের সম্পর্কে তাঁহার অনেক কথা হৃদয়ের রক্তাক্ষরে লিখিয়াছেন—এবং নারীর সেই জীবনের যত কিছু দুর্গতিই এই উপন্যাসকে এমন করুণ করিয়া তুলিয়াছে। শরৎচন্দ্র এই সকলের মধ্যে ঐ রাজলক্ষ্মীর ছবিখানিই একটু বড় করিয়া একটু সম্পূর্ণ করিয়া আঁকিয়াছেন; সে চরিত্রের বিকাশ আছে, পরিণতি আছে। আবার, এই চরিত্রের সম্পর্কেই শ্রীকান্ত নিজের আত্ম-পরিচয় অজ্ঞানে একটু বেশি করিয়াই দিয়াছে। আমি কিন্তু এই রাজলক্ষ্মীর মধ্যে বাঙালী-মেয়ের অতিশয় সুস্থ ও সবল হৃদয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ দেখিয়াছি; তাহার শক্তি ও দুর্ব্বলতা, তাহার সহজ হৃদয়বৃত্তি, জন্মগত সংস্কার, তাহার প্রেমে মধুর ও বাৎসল্যরসের সমান পিপাসা, এবং সর্ব্বশেষে, যে-বুদ্ধি নারীর সহজাত—যাহা মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, হৃদয়জাত, যাহার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে পুরুষ একটা শিশুর মতই তুচ্ছ ও নগণ্য হইয়া যায়—এবং যে-বুদ্ধি নারীকে এমন আত্মজয়ী ও ত্যাগে মহীয়সী করিয়া তোলে, আমি এই গ্রাম্যসমাজ-সম্ভূতা বাঙালী দুহিতার মধ্যে তাহার যে পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছি তাহাতে মুগ্ধ হইলেও বিস্মিত হই নাই। কিন্তু তথাপি আমি সেই একটি কথা কদাপি বিস্মৃত হইতে পারি না যে, এ হেন নারীহৃদয়, বাঙালী জাতির এ হেন 'প্রকৃতি-শক্তি'—যাহার তুল্য সম্পদ আর কোন জাতির ছিল বা আছে বলিয়া মনে হয় না—সেই দুর্ল্লভ এমন সুলভ ছিল বলিয়াই, আমরা তাহার কি দুর্গতিই না করিয়াছি! ইহা 'tragic waste' নয়—বর্ব্বরের হস্তে মহার্ঘ বস্তুর অপচয় ও অবমাননা। শরৎচন্দ্র যে-সমাজের বিরুদ্ধে কেবল অবিচার ও অত্যাচারের অভিযোগ করিয়াছেন, আমি সেই সমাজের শতাব্দীব্যাপী আত্মহত্যার শেষ অবস্থা দেখিতেছি। উপরে ঐ যে সন্ন্যাসিনীর কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছি, উহা বর্ণে বর্ণে সত্য। শরৎচন্দ্র আজ বাঁচিয়া নাই, তিনি সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, ভগবান তাঁহাকে সে দুঃখ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন; কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে তিনিও তাঁহার এই

কাহিনীগুলি পুনরায় স্মরণ করিয়া আমার মতই বলিতেন, ঐ পাপেই এ জাতি ধ্বংস হইয়া গেল—ধ্বংস হইবে বলিয়াই তাহার সেই 'আত্মপ্রবঞ্চনা ও শঠতা' আজ চরমে পৌঁছিয়াছে, কাপুরুষতারও সীমা নাই। আজও সেই নারীকুল তেমনই হাহাকার করিতেছে, বাঁচাইবার কেহ নাই, বাঁচিবেই বা কে?

(২)

প্রাক্তন

I hold it ture, whate'er befall,
I feel it when I sorrow most,
'Tis better to have loved and lost
Than never to have loved at all.
IN MEMORIAM.

রাজলক্ষ্মীর দীর্ঘ কাহিনী আমি সংক্ষেপ করিয়া লইব, কাহিনীর সর্ব্বাঙ্গীণ আলোচনা আমার অভিপ্রায় নয়। আমি কেবল ঐ নারীর জীবনে প্রাণের ধর্ম্ম ও মনের ধর্ম্ম, বা কতকগুলা সংস্কারের যে বিরোধ, এবং তাহার ফলে, নর-নারীর প্রেমে যে একটি অভিনব রস-রূপের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহারই সবিশেষ আলোচনা করিব। যে জীবন ব্যর্থ ই হইয়াছে, তাহাকে কোনরূপে—বাহিরে না হউক, নিজের অন্তরে একটু ফিরাইয়া পাইবার, আংশিকভাবেও সার্থক করিয়া তুলিবার—যে অবুঝ আকিঞ্চন; যে-বাধা শুধুই বাহিরের নয়, অন্তরেও জন্মগত সংস্কাররূপে বিরাজ করিতেছে; জীবনের যে আদি-স্রোতোমুখ কিছুতেই ফিরাইবার নয়—সেই যাহা হইতে পারিত, কিন্তু কিছুতেই আর হইবে না, সেই চির-দীর্ঘশ্বাসময় 'might have been'—রাজলক্ষ্মীর মত প্রখরবুদ্ধিমতী নারী সব জানিয়াও, সেই অসম্ভবের দুয়ারে মাথা কুটিতেছে,—ইহাই এ কাহিনীর মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি; এমন করুণ-কোমল, এমন অনুভূতি-গভীর গীতিকাব্যপ্রধান ট্র্যাজেডি সাহিত্যে অতিশয় বিরল—ইহাও বাংলা সাহিত্যেই সম্ভব।

আমি উপন্যাসের সত্যাসত্য-বিচারের কথা ভূমিকায় বলিয়াছি; এইরূপ চরিত্রের বাস্তব-ভিত্তি কতটুকু তাহার আলোচনাও করিয়াছি। এখানে পুনরায় বলি, এই যে চরিত্র ইহার একটা রক্তমাংসময় বাস্তব সত্তা আছে। শ্রীকান্ত এই যে নারীকে দেখিয়াছে ও দেখাইয়াছে, তাহাতে কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবের অংশই অধিক, ইহার প্রমাণ—ঐরূপ নারী-চরিত্র কোন পুরুষের নিছক কল্পনায় এতখানি বাস্তব হইয়া উঠিতে পারে না; নারী-প্রকৃতির যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি উহাতে আছে তাহা কোন পুরুষের বুদ্ধিগম্য নহে; তাই শ্রীকান্তের বুদ্ধিও বারবার পরাস্ত

হইয়াছে। উহার ঐ নারী-প্রকৃতি এমনই অকৃত্রিম যে, পুরুষের চক্ষে তাহা একটা প্রহেলিকা—তাহাকে সে দেখে মাত্র, বুঝিতে পারে না, মন দিয়া গড়িতে পারা ত' দূরের কথা। শ্রীকান্ত তাহার প্রেমের পাত্র পাইয়া যে-রূপ আচরণ করিয়াছে, তাহাতেও রমণীর হৃদয় ও পুরুষের আত্মাভিমান, এই দুইয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া আছে; তাহাতেই প্রতীতি হয় যে, শ্রীকান্ত এই নারীকে—ষোল-আনা না হউক, বারো-আনাও—সংসারের জনারণ্য হইতেই আবিষ্কার করিয়াছে, এবং ভালো করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর জীবন এতই নীতিবিগর্হিত ও সমাজবিরুদ্ধ যে, তাহাকে নারীর সম্মান দেওয়াই—কি সাহিত্যিক কি সামাজিক সুনীতির দিক দিয়া—একরূপ অপরাধ বলিলেই হয়। শ্রীকান্ত তাহা জানে, তাই তাহার প্রথম পরিচয়-কালে, সে তাহাকে যথাযথ রূপেই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। আমাদের দেশে ঐরূপ কুলহীনা স্বৈরিণীরও, কলাবতী কামিনী হিসাবে, এক প্রকার প্রতিষ্ঠা আছে; কিন্তু সেই বৃত্তিটার প্রতিও কিছুমাত্র সম্ভ্রম উদ্রেক না করিয়া, এমন স্থানে ও এমন উপলক্ষ্যে এবং এমন শ্রেণীর রসিক-সংসর্গে তাহাকে সে টানিয়া আনিয়াছে যে, ঐ শ্রেণীর স্ত্রীলোকের প্রতি পাঠকের যতটুকু শ্রদ্ধা হইতে পারে সে যেন তাহার বেশি আবশ্যক মনে করে না। ঐ সঙ্গে পাঠকের মনে আরও একটা ধাক্কা, সে অতিশয় অসঙ্কোচে, একরূপ বেপরোয়া ভাবে দিয়াছে—সেই বালক শ্রীকান্তের এই অভিনব চরিত্র-বিকাশ! স্থান, কাল, পাত্রের কি অপূর্ব্ব যোজনা! পিয়ারী-নাম্নী বাইজী ও তাহার অনুগ্রাহক ধনী জমিদার, অথবা তাহার সেই সাঙ্গোপাঙ্গ আমাদিগকে ততটা চমকিত করে না, যতটা করে শ্রীকান্তের এই যুবক-জীবন। তথাপি, শ্রীকান্ত সেই ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির শ্রীকান্তই বটে, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না, তাহার কথা পরে বলিব। এখন কেবল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার হঠাৎ মুখামুখি হওয়ার ঘটনাটা সবদিক দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব। শ্রীকান্ত ঐ কুলহীনা গীতবাদ্যব্যবসায়িনী রমণীকে, প্রথম দর্শনে, তাহার মনের যথাস্থানেই বসাইয়াছে; আমাদিগের নিকটেও সে নিজের বা দলের—কাহারও জন্ম এতটুকু খাতির চায় না। ইহাই হইল এ নাটকের প্রস্তাবনা ও প্রথম দৃশ্য।

কিন্তু ঐরূপ ভূমিকা যে নিপুণ শিল্পীর কতখানি শিল্পচাতুর্য্যের পরিচায়ক একটু পরেই আমরা তাহা বুঝিতে পারি। ঐরূপ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সে যে সাধারণী নারীকে অবতীর্ণ করিয়াছে, তাহার মধ্যেও যে একটা অসাধারণত্ব আছে—

শ্রীকান্তের নিজেরই সেই বিস্ময়-বিমূঢ়তা এমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং তাহার বিবরণ এমনই যে, আমরাও যেমন চকিত তেমনই কৌতূহলাক্রান্ত হই—অতিশীঘ্রই পিয়ারী বাইজী রহস্যময়ী হইয়া উঠে; সে যে শুধুই বাইজী নয়, আরও কিছু, এ সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হয়। শেষে, তাহার মধ্যে যে এক হৃদয়বতী ও উচ্চাশয়া নারী স্ব-মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হই। কিন্তু সেই নারী কি সতী? অর্থাৎ তাহার চরিত্র যতই দৃঢ় হউক, ঐরূপ জীবন-যাপন সত্বেও, তাহার দেহ-মন কি এমনই সংস্কারমুক্ত যে, সে সম্পূর্ণ স্বস্থ হইতে পারে? কল্পনায়, ভাব-চিন্তার উদার-উর্দ্ধগ মার্গে সকলই সম্ভব; কিন্তু দেহের ক্ষেত্রে—বাস্তবে? এই প্রশ্নও প্রথম হইতেই উদ্যত হইয়া উঠে—ইহাই যেন এ কাহিনীর একটা মূল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের উত্তর রাজলক্ষ্মী তাহার সমগ্র জীবন দিয়াও দিতে পারে নাই; শ্রীকান্ত নিজে সে বিষয়ে একটা কঠিন মৌন রক্ষা করিয়াই, প্রশ্নটাকে যেমন জটিল, কাহিনীকেও তেমনই রস-ঘন করিয়া

শ্রীকান্ত তাহার সেই বাইজী-জীবনের ইতিহাস মাঝে মাঝে ইঙ্গিতে আভাসে ব্যক্ত করিয়াছে। যে কালে তাহার সহিত শ্রীকান্তের ঐ আকস্মিক পুনঃপরিচয় ঘটিয়াছিল, তখন সে অনেকটা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে; তার কারণ বোধহয় এই যে, তখন সে আত্মবিক্রয়ের প্রয়োজন বা বাধ্যতা হইতে প্রায় মুক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তাহার জীবন যে পঙ্কিল স্রোতে বহিয়াছিল, সেই অভ্যস্ত জীবনের কতকগুলি বাহ্যিক আচার সে এখনও ত্যাগ করে নাই। তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই; সে যে এখনও তাহার বৃত্তিগত সেই গীতবাদ্যের রস-চর্চ্চা ত্যাগ করে নাই, তাহার একাধিক কারণ ছিল। একটা বড় কারণ এই যে, ঐ সঙ্গীতকলার অনুশীলনই রূপোপজীবিনী বাইজীর জীবনে আত্মমর্য্যাদাবোধের একমাত্র সহায়—ঐ সঙ্গীতই ছিল তাহার প্রাণের ভাষা; সে প্রয়োজন শুধুই হাহাকার-নিবারণের নয়—পরম-সুন্দরের আরাধনায় আত্মার পিপাসা-তৃপ্তি ও পরিপুষ্টির জন্যও বটে।

কাহিনীর ভিতরে আর একটু অগ্রসর হইলেই আমরা দেখিতে পাই, এতদিনে রাজলক্ষ্মী একটা সংসার পাতিবার আয়োজন করিয়াছে; সেই সংসারের সে যেমন গৃহিণী, তেমনই উপার্জ্জনকারী পুরুষের কাজও তাহারই। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সে জীবনটাকে এক রকম গুছাইয়া লইয়াছে। পতিতা নারী—সমাজে তাহার স্থান নাই; তথাপি সে যে ধনসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছে (বোধ হয়,

এই জন্যই ঐ বৃত্তিটা এখনও ত্যাগ করে নাই)—সে জানে যৌবন একটা শক্তি; সেই শক্তির অতিসতর্ক ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহারে সে সমাজকে বশীভূত করিয়া, তাহারই এক কোণে একটুখানি সংসার গড়িয়া লইবে—নারীজীবনের একটা স্বাভাবিক পিপাসা মিটাইবে। তাই সে তাহার বহুবিবাহকারী কুলীন স্বামীর অন্যতমা এক বিধবার পুত্রকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া, শাস্ত্র ও হৃদয় দুইয়েরই সমর্থনে, তাহার উপরে মাতৃত্বের অধিকার সাব্যস্ত করিয়া, তাহাকে লইয়াই সংসার পাতিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর মত অবস্থায়, নারীত্ব-গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার—ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কি হইতে পারে? ঐ একটিতেই তাহার বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় মিলিবে। জীবনের একটা ভাগ সে ক্রীতদাসীর মত পণ্যরূপে বিলাইয়া দিয়াছে, তাহার দেহের রূপ ও মনের কলাকুশলতা পরের সেবায় উৎসর্গ করিয়াছে; তখন আত্মবিস্মৃতিই ছিল তাহার একমাত্র সম্বল। সে জীবন যে কি, তাহা সে জানিত; বোধ হয়, সেই নিদারুণ সত্য ঐ শ্রেণীর সকল নারীই অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব করে, শেষে সেই চেতনাকে রুদ্ধ করিয়া বা একেবারে হত্যা করিয়াই পরিত্রাণ পায়। রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যদেবতা এ বিষয়ে তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন—সেই আত্মচেতনা সুপ্ত হইলেও লুপ্ত হয় নাই। অতঃপর রাজলক্ষ্মী তাহার ভাঙা জীবনটাকে কোনরকমে জোড়া দিয়া বাকিটার জন্য একটা ছক তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে। সে প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে; সে বিশ্বাস করে, পুরুষের মত নারীর পদস্খলনেও ক্ষমা আছে; নিজের আত্মাকে সে নিজেই উদ্ধার করিবে।

কিন্তু সে কাজ ত সহজ নয়—সহজ হয়, যদি হৃদয়ের ভিতরে কোন উৎপাতের কারণ না থাকে। অতি কঠিন মনোবল বা আত্মশক্তির দ্বারা, একটা সুনির্ব্বাচিত নীতিমার্গে জীবনকে জয় করা দুঃসাধ্য নয়; কিন্তু প্রাণ যে বাদ সাধে। ঐ প্রাণকে যাহারা হত্যা করিতে পারে না—সেই প্রাণের প্রাক্তন ব্যাধি যদি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দুশ্চিকিৎস্য হয়—তাহা হইলে জীবনের জমা-খরচ এমন নির্ভুলভাবে হিসাব করিতে গেলে, অলক্ষ্যে বিধাতা হাসিয়া উঠে। রাজলক্ষ্মী পুরুষের চেয়েও বুদ্ধিমতী, তথাপি সে নারী; সেই নারী-প্রকৃতিতে ঐরূপ একটা কিছু যদি না-ই থাকিবে, তবে এমন কাহিনীর সৃষ্টি হয় কেমন করিয়া? পিয়ারী বাইজীর সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া এতদিন যে বহ্নি চতুর্দ্দিকে স্ফুলিঙ্গ বিকিরণ করিতেছিল, তাহাকে সে যে আরেক অগ্নিতে শীতল করিয়াছিল! সেই অগ্নি অনির্ব্বাণ হইয়া আছে। দেহে যখন যৌবন অনাগত তখন তাহার কিশোরী-হৃদয়ে সেই যে আগুনের পরশ

লাগিয়াছিল—সে যে চির-যৌবনের অমৃত-পরশ। সে অগ্নির পরশ এমনই গোপনে ঘটিয়াছিল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তিও তাহা জানিতে পারে নাই। সে যেন একান্তই তাহার নিজের; সংসার নয়, সমাজ নয়, বোধ হয় ভগবানও নয়—কেহই তাহার সাক্ষী ছিল না। সেই প্রেম এমনই যে, তাহার মন্ত্রটাই রাজলক্ষীর গুরু হইয়াছে, আর কোন গুরুর আবশ্যক হয় নাই। তাই সে এমন নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। ভিতরের সেই গুরু এবং বাহিরের ঐ সংসার, এই দুইয়ের পৃথক দাবী এক নূতনতর সাধনায় সে মিলাইয়া লইয়াছে। অন্তরে কোন অভাব নাই, কোন বন্ধন নাই, কাহারও মুখাপেক্ষা নাই; বাহিরের ঐ কর্ম্মবন্ধনও একরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান; সেই যজ্ঞকালীন যে নিত্য-স্নান, তাহাতেই সে তাহার দেহজাত যত কিছু অশুচিতা ধৌত করিয়া ফেলিবে; রাজলক্ষী তাহাই মনে করিয়াছিল।

কিন্তু রাজলক্ষী ভুল করিয়াছিল—সে তাহার হিসাবে প্রাক্তনকে বাদ দিয়াছিল। কাব্যে নাটকে যেমন, জীবনেও তেমনই, দৈবের মত শক্তিমান আর কিছুই নয়; হিন্দু যাহাকে প্রারব্ধের দুর্ল্লঙ্ঘ্য ও যথাকাল-সমাগত পরিণাম বলে—দৈব তাহাই। রাজলক্ষীর জীবনে দৈবের লীলা অল্প নহে। তাহার কিশোরী-বয়সে যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও যেমন অতিদূর প্রাক্তনের ফল, তেমনই এতকাল পরে আবার যাহা ঘটিল তাহাও সেই নিয়মের বহির্ভূত নহে। এমন ঘটনা দৈব বলিয়া মনে হইলেও, তাহা অতিশয় সুনিয়ত, তাই আমরা তাহাকে নিয়তি বলি। তাহার সেই অপ্রবুদ্ধ যৌবনের অতিপ্রবুদ্ধ প্রেম যে নিয়তির মতই অভ্রান্ত ও দুর্ল্লঙ্ঘ্য, তাহা সে তখনই বুঝিয়াছিল, পরে একদিনের জন্যও তাহা বিস্মৃত হয় নাই। কেবল একটা বড় ভুল সে করিয়াছিল,—যাহার মত সত্য ও জীবন্ত তাহার জীবনে আর কিছুই নহে, এবং যাহা প্রাক্তনের মতই বলবান, তাহাকে সে পোষা-পাখীর মতই আপনার হৃদ্‌পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে; সে আর ডানা মেলিবে না, অন্ধকার আকাশের তলে ঝড়-বিদ্যুতের ঝাপটে-গর্জ্জনে তাহাকে আর দিক্‌হারা হইতে হইবে না; তাহার ডানা ভাঙিবে না, বক্ষে আর আঘাত লাগিবে না। এমন করিয়া নিষ্কৃতিলাভের উপায় যে নাই! তাই এতদিন যাহাকে সে মনের আড়ালে রাখিয়াছিল, যাহার অস্তিত্বও সে ভুলিয়াছিল, সহসা সে একেবারে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। শ্রীকান্তের সহিত রাজলক্ষীর ঐ কালে ঐরূপ সাক্ষাৎ মানুষের জীবন লইয়া বিধাতার লীলা বই আর কি!

তথাপি বাহিরের ঘটনা যতই বিস্ময়কর হউক, ভিতরের ঘটনা আরও অভূতপূর্ব্ব। যে তাহার জীবনের এতখানি অধিকার করিয়া আছে, যে তাহার

পরম সুখ ও চরম দুঃখের উৎস, সে তাহাকে জানে না! প্রেমের সেই মন্ত্র-দীক্ষা তাহার দান নয়—সে ছিল নিমিত্ত মাত্র। রাজলক্ষ্মী তাহাকে জানে—তেমন জানা আর কেহ তাহাকে জানে না; জানিয়াও সেই উদাসীন সর্ব্বস্বার্থ-বিমুখ দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতির মানুষটিকে সারাপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল; ভালবাসা এমনই আশ্চর্য্যজনক বটে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর প্রেম অন্ধ বলিয়া মনে হয় না,—শ্রীকান্ত সম্বন্ধে সে কিছুমাত্র ভুল করে নাই। তাই এ ভালবাসার একটা হেতু নির্ণয় করিতে ইচ্ছা হয়। এমন বলা যাইতে পারে, ঠিক ঐ চরিত্রের ঐ মানুষটিই তাহার হৃদয় জয় করিবার উপযুক্ত; এই অর্থে ঐ প্রেম উহারই দান—সে তাহা জানুক, বা নাই জানুক। রহস্য যতই গভীর মনে হউক, ইহার মূলেও একটা সত্য আছে। রাজলক্ষ্মী কি তাহাকে শুধুই বুদ্ধি দিয়া চিনিয়াছিল?—তাহার সেই চরিত্র সে ঠিকই বুঝিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাই ত সব নয়। প্রেমের দিব্য-দৃষ্টিতে আরও যাহা ধরা দেয় তাহা কেবল সেই একজনই জানে, ঐ মানুষটাও তাহা জানে না। সমগ্র মানুষটাকে এমন করিয়া দেখিতে পারাই ভালবাসা। শ্রীকান্তের স্বভাবে রাজলক্ষ্মী এমন একটা কিছুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিল যাহা বুঝাইবার নয়—বুঝিবার বা বুঝাইবার আবশ্যকতাও নাই, প্রাণের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। সাধারণতঃ প্রেম বলিতে আমরা যুগল-প্রীতিই বুঝি, তাহাই দম্পতি-প্রেমের রূপে সাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাও সত্য যে, বিবাহিতই হউক, বা বিবাহের বাহিরেই হউক, পারস্পরিক প্রীতি বা সামঞ্জস্যই শ্রেষ্ঠ প্রেমের আদর্শ। কিন্তু এমন প্রেম বড়ই বিরল, আধখানা বা এক-তরফা প্রেমই অধিকতর বাস্তব। সেই প্রেমের ভার, পুরুষ অথবা নারী, একজনেই বহন করে; অপর পক্ষ যেন নিমিত্ত মাত্র,—সেই প্রেমের উদ্দীপক। প্রেম জিনিষটা যেন নিতান্তই একটা আত্মগত ব্যাপার—অপরের অপেক্ষা রাখে না। ইহাও সর্ব্বত্র সত্য নহে। আমরা অন্নদার যে পতি-প্রেম দেখিয়াছি, তাহা যেন ঐ নারীরই একার তপস্যা, পুরুষটা সেই তপস্যার অবলম্বন মাত্র। সেখানে ঐ প্রেম—যদি তাহা প্রেমই হয়—সম্পূর্ণ আত্মগত বটে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর প্রেমও কি অন্নদার মত? তুলনা করিলে দেখা যাইবে, এই প্রেমও আধখানা, বা একতরফা হইলেও, এবং অপর পক্ষ নিমিত্তমাত্র হইলেও, এখানে একটা বড় পার্থক্য রহিয়াছে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে জানিয়া শুনিয়াই বরণ করিয়াছে—দোষগুণ সমেত তাহার সেই ব্যক্তিত্বটার অনুরাগিণী হইয়াছে। এক্ষেত্রে, প্রেম যদি একতরফাও হয়, অপর পক্ষের একটা গৌণ, এমন কি, মূল্যবান্ সাহচর্য্য রহিয়াছে। অতএব আমি পূর্ব্বে বাস্তব জীবনে প্রেমের যে

একটা নিয়মের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সাধারণ অর্থেই সত্য—সর্ব্বাংশে সত্য নয়। ঐরূপ একতরফা প্রেমে সর্ব্বত্র এতটা উচ্চতর ও গভীরতর আকর্ষণ-হেতু না থাকিলেও, অনেক ক্ষেত্রে একরূপ নিম্নতর বা স্থূলতর আকর্ষণ থাকাই সম্ভব; পুরুষ ও নারীর অতিশয় ব্যক্তিগত যৌন-প্রকৃতিতে সেই কারণ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। রাজলক্ষ্মী তাহার আত্মগত গভীর পিপাসাকে, নিজ অন্তরে ধারণ করিয়া, চিত্তকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছিল। সেই প্রেম একটা শক্তিরূপে—রক্ষাকবচের মতই—সকল অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও তাহাকে শ্রেয়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই। সেই প্রেমই তাহার গুরু, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই; তাহার প্রাণ সেই গুরুর চরণে, 'একটি নমস্কারে' চির-প্রণত হইয়া আছে। আমি সেই পুনঃ-সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বাবস্থার কথাই বলিতেছি—সেই অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিয়া না লইলে, ঐ সঙ্কট ও তাহার পরিণাম সুপরিদৃষ্ট হইবে না। আমি বলিয়াছি, সমাজ ও সংসারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া সে করিয়া লইয়াছে। গুরুকে সে মাথার উপরে রাখিয়াছে, কিন্তু সংসারও তাহার চাই—নারীর জন্মগত সংস্কার যাইবে কোথায়? আর একটা বড় সংস্কার তাহাকে পীড়িত করিয়াছে—নারীজাতির পক্ষে তাহা দুর্জ্জয়—দৈহিক শুচিতার সংস্কার; হিন্দুসমাজে উহাই নারীর সতীত্ব-সংস্কার। রাজলক্ষ্মী অসতী; তাহার যে চরিত্রের পরিচয় ইতিমধ্যে আমরা করিয়াছি, তাহাতে ঐরূপ শুচিতার প্রতি তাহার লোভ যে কত প্রবল হওয়া স্বাভাবিক তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। আমি এ বিষয়ে তাহার মনোভাবের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এমনই যখন অবস্থা, তখন রাজলক্ষ্মী, বিধাতার পরিহাসের মতই, তাহার সেই অন্তরবাসী মূর্চ্ছিত মদনকে—সেই ভস্মীভূত অনঙ্গকে—সশরীরে পূর্ণজাগ্রতরূপে সহসা বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিল। এ সেই কিশোর-কিশোরীর সাক্ষাৎ নয়; তখন দুইটি মুকুলই পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। নারী চিনিল, পুরুষ চিনিল না। পিয়ারী বাইজী তাহাকে দেখিবামাত্র এক অদ্ভুত স্নেহে অভিভূত হইল; সেই জন্মান্তরসৌহৃদ নয়—যেন তাহারও বেশি। ইহার কারণ, দুইজনেই এখন পূর্ণ-বয়স্ক হইলেও—একজন নারী, আরেক জন যুবাবয়সী বালক। রাজলক্ষ্মী যে তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিল, তাহার কারণ উহাই। সেই কিশোর শ্রীকান্ত তেমনই আছে, রাজলক্ষ্মী তাহার অন্তরটা নিমেষে দেখিতে পাইল; যৌবনের আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতা কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই দুরন্ত বালক ঠিক তেমনই

আছে। রাজলক্ষ্মী বুঝিতে পারিল, বয়সে ও বুদ্ধিতে সে-ই এখন জ্যেষ্ঠ; তাহার সেই ঠাকুরটির বয়স কখনও বাড়িবে না, দুর্ব্বুদ্ধি ঘুচিবে না—সে তেমনই আত্মরক্ষায় উদাসীন, তেমনই অসহায়। সে যেন আবার তাহার সেই কিশোরী-জীবনে ফিরিয়া গেল—তাহার যৌবন, তাহার বাইজী-জীবন অতিক্রম করিয়া, অতীতের সেই বৃন্দাবনে, বনে-বনে, আবার তেমনি করিয়া মালা গাঁথিবার জন্য বৈঁচি তুলিতে লাগিল, কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হইয়া তেমনই আনন্দে অধীর হইল। প্রেমের সেই এক বিগ্রহকে—তাহার অন্তরের সেই ভাবমূর্ত্তিটিকে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিয়া—তেমনই দুর্ল্লভ, তেমনই নির্দ্দয়কে—সে তেমনই আশাহীন ভাষাহীন অর্চ্চনা করিল। স্বপ্নান্তে সে আবার বাস্তবে ফিরিয়া আসিল, তখন সেই প্রেম আরেক রূপ ধারণ করিল—সে যেন দুর্বিনীত বালকের প্রতি বয়োজ্যেষ্ঠা নারীর প্রেম, রাজলক্ষ্মী একেবারে তাহার অভিভাবিকার আসন গ্রহণ করিল। প্রেমের, স্নেহের, সেবার বশ সে নহে—কোন বন্ধন সে মানিবে না। তাহার অবস্থা ভাবিয়া প্রাণ যে কাঁদিয়া উঠে; যে এমন আত্মচিন্তাশূন্য, অথচ এমন অবাধ্য, সে আজ তেমনই ভাবে তাহার পথে দেখা দিয়াছে। কিছুই চাহে না সে, তথাপি সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় একি বন্ধন সে আরেক জনের উপর চাপাইতেছে! রাজলক্ষ্মীর প্রাক্তন আবার তাহাকে পাইয়া বসিল—তাহার এত চিন্তার এত যত্নের এমন সুব্যবস্থিত জীবনে এ কোন দুর্গ্রহ কোথা হইতে আসিয়া উদয় হইল! অতীত যদি সত্যই অতীত হইয়া যাইত, তবে মানুষ কত দুঃখ হইতেই না পরিত্রাণ পাইত! রাজলক্ষ্মীর অতীত তাহার বর্ত্তমানকে ঘোরান্ধকার করিয়া তুলিল; হতভাগিনী যে আশা করিয়াছিল তাহা ঘুচিল; পিয়ারী বাইজীকে আবার রাজলক্ষ্মী হইতে হইল। তাহাই বুঝিয়া সে বড় ভয় পাইল। অতঃপর, সেই ব্যর্থপ্রেমের বিষ-রসকেই শোধন করিয়া, তাহাতেই অমৃতপান করিবার দুরাকাঙ্ক্ষায়—কখনো বা সেই বিষপাত্র সরাইয়া দিবার নিষ্ফল চেষ্টায়, এই ভাগ্যহীনা, প্রেম-বিড়ম্বিতা নারীর হৃদয়-মনের যে অতুলনীয় শোভা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই আমরা নিরীক্ষণ করিব।

(৩)

ব্যাখ্যা-সুত্র—নাটক-রূপ

"Never trust the artist, trust the tale."

—D. H. LAWRENCE

রাজলক্ষ্মীর কথা আমি এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি তাহাতে সাধারণভাবে তাহার জীবনেতিহাস ও তাহার নারী-হৃদয়ের একটা পূর্ব্বাভাস দিয়াছি। কাহিনীটি হৃদয়ের কাহিনী বলিয়া বেশ একটু জটিল, বাহিরের ঘটনাগুলিও নাটকের মত সুসম্বদ্ধ নয়—বিক্ষিপ্ত; সেইগুলিকে বাছিয়া গুছাইয়া অতঃপর একটা সহজ-দৃশ্য নাটকের আকারে গড়িয়া না লইলে এই চরিত্র ও তাহার জীবনের বিধিলিপি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে না। পাঠক-পাঠিকাগণ নিশ্চয় ইতিমধ্যে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই উপন্যাস আমি শুধু উপন্যাস হিসাবেই পাঠ করিতেছি না, আমার অভিপ্রায় আরও ব্যাপক ও গভীর। এই উপন্যাস এক হিসাবে একটি উৎকৃষ্ট 'human document'—বা মানুষের সম্বন্ধে মানুষের হৃদয়ের সাক্ষ্য; অবশ্য মানুষ বলিতে এখানে একটি বিশেষ সমাজের বিশেষ জীবনযাত্রার মানুষ; এবং তাহাতেও পুরুষ অপেক্ষা নারীর জীবনই অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহাতেও একটা বড় সুবিধা হইয়াছে এই যে, যে পুরুষটি এই নারী-কাহিনী লিখিয়াছে, ও তাহাতে পুরুষের ভূমিকা লইয়াছে, সেও এক হিসাবে খাঁটি পুরুষ বটে; যাহাকে আমরা পোষ-মানা সামাজিক পুরুষ বলি সে তাহা নয়; আসলে সে সংসার-বিদ্রোহী; কবির ভাষায় 'কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত'-ও নয়, একেবারে মুক্ত। এ পুরুষ কিছুই গ্রহণ করিবে না, নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া অতিশয় স্বচ্ছন্দে যাহা দান করিতে পারে তাহাই করিবে। এই যে পুরুষ-চরিত্র, ইহা নারী-চরিত্রের বিপরীত; এইজন্যই উহার ঐ কঠিন নিকষ-পাথরে নারী-স্বর্ণ যেরূপ ঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই—পাথর সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়াই—স্বর্ণের স্বর্ণত্ব অধিকতর ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যেহেতু এই উপন্যাস প্রধানতঃ নারীহৃদয়েরই কাহিনী, এবং সেইজন্য তাহাতে প্রেমেরই গভীরতর রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে, এবং যেহেতু ঐ প্রেম যেমন মানবজীবনের একটি দুশ্ছেদ্য নিয়তি—কতরূপে কত ছলে ও ছদ্মবেশে উহার দৌরাত্ম্যের শেষ নাই—ভাবে-অভাবে, স্ব-ভাবে ও বি-ভাবে, উহা প্রত্যেক

নর-নারীর সুখ-দুঃখের নিয়ন্তা হইয়া আছে, এবং সেইহেতু উহাকে একটা কাব্যগত রস-সামগ্রী বলিয়া আলস্যের সুখনিঃশ্বাস ফেলিয়াই তৃপ্ত হওয়া যায় না,—অতএব, এই উপন্যাস-পাঠে ঐ প্রেমের রহস্য-চিন্তাই প্রধান হইবার কথা। আমিও তাহাই করিতেছি, এবং করিতে গিয়া কিরূপ নাস্তানাবুদ হইতেছি, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা দেখিতে পাইতেছেন।

অতএব, আমি যে এই উপন্যাসখানির প্রসঙ্গে সেই প্রেমের তত্ত্বটি লইয়া এত সরু কাটিতেছি, তাহাতে কেহ অধৈর্য্য হইবেন না; এই উপন্যাসখানিতে ঐ তত্ত্ববিচারের যে সুযোগ মিলিয়াছে তেমন কচিৎ মিলিয়া থাকে। রাজলক্ষ্মী এবং অপর দুই একটি নারীর যে কাহিনী এই গ্রন্থে কথিত হইয়াছে, তেমন করিয়া বাংলা-উপন্যাসে আর কোথাও নারীহৃদয়ের অন্তস্তল উন্মোচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না; তার কারণ, অন্যত্র উপন্যাসের প্রয়োজনটাই বড় হইয়াছে, এখানে সেই প্রয়োজন গৌণ। নারীহৃদয় বলিতেও বিশেষ করিয়া এই দেশের, এই জাতির, এই সমাজের নারী-হৃদয় বটে, ইহাও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এইজন্য প্রেমের সার্ব্বভৌমিক তত্ত্বও যেমন, তেমনই তাহার ঐ বিশেষ ভঙ্গিটিও বারবার স্মরণ করিয়া আমাকে একই কথা দুইবার করিয়া বলিতে হয়।

এখন রাজলক্ষ্মীর কথা। ইতিপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতে রাজলক্ষ্মীর জীবনকাহিনীর কয়েকটি মূলসূত্র নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকার মনোগত হইয়াছে। কিন্তু আমার এই আলোচনা ত' কেবল সিদ্ধান্তমূলক নয়, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাখ্যার পর আর কিছুই বলিবার থাকিত না। আমার কাজ এক হিসাবে অতিশয় দুরূহ। উপন্যাসটি আপনারা সকলেই পাঠ করিয়াছেন—কাহিনী ও ঘটনা সকলেরই জানা আছে। লেখক রাজলক্ষ্মীর চরিত্র-চিত্রণে কিছুই বাকী রাখেন নাই বস্তুতঃ কাব্য-হিসাবে সেই চিত্র অতুলনীয়। তথাপি উপরকার ঐ বর্ণ ও রেখাগুলির অন্তরালে একটি যে রহস্য ঘনীভূত হইয়া আছে, তাহা পাঠক-পাঠিকার অন্তরকে অতিসূক্ষ্ম ভাবেই স্পর্শ করে, একটা কি বস্তু যেন ধরা দিয়াও দেয় না; আমাকে তাহাই যথাসাধ্য ধরিয়া দিতে হইবে। তজ্জন্য এই রহস্যটিকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় ঐ কাহিনীকে নিজের মত করিয়া সাজাইতে হইবে। কেমন করিয়া সাজাইলে সেই রহস্য এবং কাব্যরস, দুইই—একটি অপরকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে, ইহাই ভাবিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, রাজলক্ষ্মীর জীবন, চরিত্র এবং তাহার ঐ প্রেম—এই তিনের সংঘাতে, যে নাটক দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে প্রকটিত হইয়া চলিয়াছে, আমি সূত্রধাররূপে, হয়তো বা গ্রীক নাটকের 'কোরাস'-রূপে,

তাহার প্রযোজনা ও রস-প্রকটন—দুই কার্য্যই করিব। ঐ কাহিনীর প্রবাহ হইতে কয়েকটি ধারা ও তরঙ্গ-ভঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া এমন ভাবে সাজাইয়া দিব, যাহাতে তাহার অন্তঃস্রোত সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, ভিতরের যে কারণে বাহিরে নব নব ভাববিকাশ বা ভাবান্তর ঘটিতেছে তাহা সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়। একদিকে প্রখর বুদ্ধি, অপরদিকে অতিকঠিন সংযম, এই দুই গুণের অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও, যে বেদনা, সংশয়, সম্মোহ এবং আশা-নিরাশার সংকল্প-বিকল্প রাজলক্ষ্মীর হৃদয় মথিত করিতেছে—বন্দিনী বাঘিনীর মতই তাহাকে অতি অসহায় ভাবে যাতনা ভোগ করাইতেছে, সেই শক্তি ও সেই অশক্তির যে নিরন্তর নিগ্রহ, তাহারই কালানুক্রমিক দৃশ্য-পরম্পরা আমি ঐ কাহিনী হইতে সংকলন করিব—ঐ কাহিনীর জবানীতেই। অতএব, এখন হইতে আমার কাজ হইবে—মুখ্যত তাহাই; অবশ্য সেই সঙ্গে সূত্রধার-রূপে প্রচুর টীকাভাষ্যও যোজনা করিতে হইবে—না করিলে রহস্যটির কিনারা করা যাইবে না। এ কাজ যে কত দুরূহ তাহা জানি — আরও দুরূহ এইজন্য যে, ঐরূপ টীকাভাষ্য পাঠক-পাঠিকাগণের সুখপাঠ্য হইতেছে না বুঝিয়াও তাহা করিয়া যাইতে হইবে।

এইখানে আর একটা কথা বলিয়া রাখি, আর কেহ বলিয়াছেন কিনা জানি না — তাহা এই যে, শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত'-কথা শেষ করেন নাই। শেষ করিবার ইচ্ছা ছিল না, বা সময় হইয়া উঠে নাই, অথবা উহাই শেষ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহা অনুমান-সাপেক্ষ। হয়তো এরূপ কাহিনী শেষ না করিলেও ক্ষতি নাই, ইহার রস বা সাহিত্যিক অভিপ্রায় স্বতন্ত্র, এমন একটা ধারণা তাঁহার ছিল। এ যেন একটা 'Journal' বা 'মানস-লিপি'; একটা মানুষ তাহার জীবনে স্মরণীয়, এবং গভীরভাবে অনুভব করিবার মত যাহা কিছু দেখিয়াছিল, তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছে। কাহিনীর সূত্র সে নিজে। সেই জীবনের একটা ধারা — যে-ধারা তাহার নিকটে সবচেয়ে গভীর ও মূল্যবান — তাহারও যতটুকু লিখিয়া রাখার যোগ্য সে তাহাই লিখিয়াছে; তাহার পরের কথা তেমন মূল্যবান বলিয়া মনে করে নাই। এ যেন স্মৃতির একটা জাল-বয়ন; সেই জাল দিয়া কতকগুলি পরিচিত নর-নারী — কতকগুলি ঘটনা, এবং কয়েকটি চরিত্রের চমকপ্রদ চিত্র — টানিয়া তুলিয়া লেখক আমাদের সম্মুখে ঢালিয়া দিয়াছেন। তিনি কেবল গল্প করিয়া চলিয়াছেন, যতক্ষণ তাহা চলে তিনিও চলিয়াছেন, ফুরাইলে তিনিও চুপ করিবেন। তথাপি, কি অর্থে এইরূপ গল্পেরও একটা বিন্যাস-গ্রন্থি আছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখানে বিশেষ করিয়া এই রাজলক্ষ্মীর প্রসঙ্গে কথাটা আরও সত্য

হইয়া উঠে। 'শ্রীকান্ত'-কথার যে একটু আখ্যান-ধর্ম্ম আছে সে ঐ রাজলক্ষ্মীর জন্য — শ্রীকান্তের আত্মকথাকে এই রাজলক্ষ্মীই একটা গল্পের গাঁথনি দিয়াছে। অতএব রাজলক্ষ্মীর জীবনের পরিণাম, কিংবা সেই পরিণামের একটা স্পষ্ট আভাস ইহাতে থাকিবার কথা; কিন্তু তাহা নাই, নাই বলিয়াই উহা অসমাপ্ত মনে হয়। আমরা আর সকলের শেষ না চাহিলেও, রাজলক্ষ্মীর একটা শেষ চাই; সেই শেষ যে একটা আছেই — ঐ কাহিনী পাঠ-কালে এমন ধারণা ক্রমে দৃঢ় হইয়া উঠে; যেন রাজলক্ষ্মীর শেষ না হইলে এ কাহিনী শেষ হইতে পারে না। এরূপ বিশ্বাস বা প্রত্যাশার একটা কারণ এই যে, 'শ্রীকান্তে'র ঐ পর্ব্বগুলি এমন ভাবে পর-পর প্রকাশিত হইয়াছিল যে, প্রত্যেক পর্ব্বের পর আরও আছে, ইহাই মনে করা স্বাভাবিক। যখন শেষ-পর্ব্ব প্রকাশিত হইল, তখন অন্য পর্ব্বগুলির মতই তাহাতে সমাপ্তির কোন চিহ্ন ছিল না। উহাই যে শেষ নয়, এমন বিশ্বাসের আরও কারণ — যে-স্থানে ঐ পর্ব্ব শেষ হইয়াছে, তাহার পরে শ্রীকান্তের জীবনেও যেমন, রাজ-লক্ষ্মীর জীবনেও তেমনই, একটা আকস্মিক পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে; সেই পরিবর্ত্তনেই রাজলক্ষ্মীর সকল আশা-নিরাশা চিরবিশ্রাম লাভ করিবে। যবনিকাপাত আর যেখানেই হোক, এখানে হইতে পারে না। এ যেন ঘাটে আসিয়া তরী ভিড়িল না; যেন রবি অস্তে যাইবার কালে আকাশপ্রান্তে তাহার সেই অস্তচ্ছটার পূর্ণগরিমা উদ্ভাসিত হইবার পূর্ব্বেই সহসা ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসিল। শ্রীকান্ত তাহার নিজের কথা ইহার পরেও আর টানিয়া চলিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই, সম্ভবতঃ ঐ খানেই যবনিকাপাত করা অনেক কারণে উচিত মনে করিয়াছিল। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কথা ঐখানে কিছুতেই ফুরায় না — তাহার সহিত চির-বিচ্ছেদ বা তাহার মৃত্যু না-হওয়া পর্য্যন্ত উহা শেষ হইতে পারে না; কারণ, ইহাও ঠিক যে, অভয়া-রোহিণীর মত রাজলক্ষ্মীকে লইয়া সংসার পাতা অসম্ভব। এই পরিণামটা ইঙ্গিতে আভাসে আমরা যেটুকু বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করি, তাহা নির্ভুল বা নিশ্চিত হইতে পারে না, সাধারণ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সে চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। এইজন্ত আমার মনে হয়, শরৎচন্দ্র ঐখানে শেষ করিতে চাহেন নাই — কোন একটা কারণে লেখা আর হইয়া উঠে নাই। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যু পর্য্যন্তই এ কাহিনীর সীমা, এবং আর একটি পর্ব্বে তাহা আসিয়া যাইত, কাহিনীও সুসমাপ্ত হইত।

অথচ, রাজলক্ষ্মীর প্রকৃত-পরিচয় ছাড়া, তাহার জীবিতাবস্থা সম্বন্ধেও ইতিমধ্যে কিম্বদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ হয়তো — মিথিলায় জনকপুরে পাওয়ারা যেমন

দ্বিখণ্ডিত হৃদয়টা এখনও দেখাইয়া দেয় — তেমনই একজন জীবিতা রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া দিবে। কিন্তু আমি এ সকল কিম্বদন্তী অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করি। রাজলক্ষ্মীর যে মৃত্যু হইয়াছিল — সেই বেদনাই শ্রীকান্তের হৃদয়ে অতি গভীর হইয়া আছে; তাহার প্রমাণ শ্রীকান্তের কথার ভঙ্গিতেই পাওয়া যায়। মানুষকে তাহার জীবনে আমরা যত ভাল করিয়া, যত অন্তর্দৃষ্টি দিয়াই দেখিনা কেন, সেই অতি-ঘনিষ্ঠ, অতি-পরিচিত, অতি-আদরের প্রিয়জনকেও — অতি-নিকট বলিয়াই — তেমন করিয়া দেখিতে পারি না, যেমন দেখি মৃত্যুর অমৃত-রশ্মির আলোকে। নিকটে যতখানি দেখি তাহা সব নয়—ঐ দূরত্বই তাহা পূরণ করিয়া দেয়। এমন কি, জীবনে যে নিকটে থাকিয়াও দূরে থাকে, মৃত্যুতে সে দূরে গিয়াও নিকটে সরিয়া আসে। এই কাহিনীতে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে যে-রূপে, যে-দৃষ্টিতে দেখিতেছে তাহাতে সেই দূরত্বের আভাস আছে, ঐ দূরত্বই রাজলক্ষ্মীর মূর্ত্তিটিকে এমন মহিমময় করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ইঙ্গিতও স্থানে স্থানে আছে — অবশ্য ইঙ্গিত মাত্র, আমি তাহার কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি।—

(১) শ্রীকান্ত বলিতেছে —

"এক-একটা কথা দেখিয়াছি সারাজীবনে ভুলিতে পারা যায় না। যখনই মনে পড়ে — তাহার শব্দগুলা পর্য্যন্ত কানের মধ্যে বাজিয়া উঠে। পিয়ারীর শেষ কথাগুলাও তেম্নি। আজও আমি তাহার রেশ শুনিতে পাই!" [২য় পর্ব্ব, পৃঃ ২২]

এখনকার ঐ "শেষ কথাগুলা" অবশ্য শেষ-বিদায়ের কথা নয়, ইহার পরে আরও অনেক বিদায় ঘটিয়াছে। তথাপি মনে হয়, শ্রীকান্তের এখানকার ঐ কথাগুলিতে একটা গভীরতর সুর—পরবর্ত্তীকালের চির-বিদায়ের সুরও শোনা যাইতেছে; শ্রীকান্ত যখন এ-কাহিনী লিখিতেছে তখন ঐ বিদায়ের প্রসঙ্গে সে যেন একটা বড়-বিদায়ের ব্যথাও স্মরণ করিতেছে।

(২) রাজলক্ষ্মী বলিতেছে—

"এ জীবনে তোমাকে অসুখী করব না আমি কখনো।

বলিয়াই সে কেমন—এক প্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, শ্বাস-প্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে,—সহসা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল!

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম—ও কি? রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না,—কিছু তো নয়।

তাহার হাসিটাও আজ যেন আমার কেমন ধারা লাগিল!" [৪র্থ পর্ব্ব, পৃঃ ১৬১]

এখানে আমরা শ্রীকান্তের ঐ কথার ধরনে বুঝিতে পারি, সে রাজলক্ষ্মীর সেদিনের সেই আচরণে ভয় পাইয়াছিল—সে যেন একটা presentiment, অর্থাৎ হৃদয়-দর্পণে ভবিষ্যতের ছায়াপাত।

(৩) এক স্থানে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর জবানীতে নিজেকেই যেন ধিক্কার দিতেছে। একের মৃত্যুতে অপরে কি করিবে সেই কথা হইতেছিল; রাজলক্ষ্মী তাহার নিজের ভালবাসার গর্ব্ব করিয়া বলিল, সে যাহা পারিবে, শ্রীকান্ত তাহা পারিবে না—সে বড় জোর কবিত্ব করিয়া একখানা বই লিখিবে।—

"রাজলক্ষ্মী বলিল, এ তো শুধু কথা গেঁথে ছবি নয় গোসাঁই, এ যে সত্যি। তফাৎ ঐখানে। আমি পারবো তুমি পারবে না! তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হ'য়েই থাকবে।" [ঐ, পৃঃ ২০৬]

—এই পারাটা কিন্তু মৃত্যুর পর। শ্রীকান্ত সেই কথার ছবিই আঁকিতেছে; রাজলক্ষ্মীর কথা যে সত্য হইয়াছে, শ্রীকান্ত যেন গভীর দীর্ঘশ্বাসের সহিত তাহা স্বীকার করিতেছে।

(৪) শ্রীকান্ত বলিতেছে,

"সর্ব্বপ্রকার হাস্য-পরিহাসের অন্তরালেও কি একটা অজানা কঠিন দণ্ডের আশঙ্কা তাহার (রাজলক্ষ্মীর) মন হইতে কিছুতে ঘুচিতেছে না। সেইটা শান্ত করার অভিপ্রায়ে বলিলাম, আগে তুমি না মরলে আমি মরচি নে, এ নিশ্চয়—

কথাটা সে শেষ করিতে দিল না, খপ্ করিয়া আমার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, আমাকে ছুঁয়ে এঁদের সামনে তবে তুমি তিন সত্যি করো! বলো, একথা কখনো মিথ্যে হবে না! বলিতে বলিতে উদ্গত অশ্রুতে তাহার দুই চক্ষু উপচাইয়া উঠিল।" [ঐ, পৃঃ ১৯১-৯২]

রাজলক্ষ্মীর এই প্রাণময় প্রার্থনা পূর্ণ হইবারই কথা। শ্রীকান্তও এই ঘটনার এমন উল্লেখ করিত না, যদি তাহা ঐ কাহিনী লিখিবার পূর্ব্বে সত্য হইয়া না উঠিত।

(৫) আর এক জায়গায় সে শ্রীকান্তের নিকটে একটি ভিক্ষা চাহিতেছে, সেই ভিক্ষার কথাগুলিকে শ্রীকান্ত যে এমন মর্ম্মান্তিক করিয়া তুলিতে পারিয়াছে, তাহাতেই প্রমাণ হয়, লিখিবার কালে তাহার বুকের ভিতরটা কি কারণে এমন বেদনাতুর হইয়াছিল। রাজলক্ষ্মী বলিতেছে—

"এবার যেদিন সত্যি সত্যিই মরব, সেদিন কিন্তু দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলো। বোলো পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালা বদল করেছে, তাদের প্রেমে জগৎ পবিত্র, পরিপূর্ণ হয়ে আছে; কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন'বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত ভালবেসেছে, এ সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন বাসে নি। আমার কানে-কানে তখন বলবে বলো এই কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাবো।" [ঐ, পৃঃ ১৯৯-২০০]

(৬) আরও একটা স্থান উদ্ধৃত করি; শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী বলিতেছে—

"এখন থেকে একটি-একটি করে' আমিই তোমাকে সমস্ত দেখাবো।

—আমি দেখবো না, চোখ বুজে থাকবো।

—পারবে না। আমার কাজের ভার একদিন ফেলে যাবো তোমার উপর। সব ভুলবে, কিন্তু সে ভুলতে পারবে না কখনো।" [ঐ, পৃঃ ২১৫]

তাই বলিয়াছি, এ কাহিনীতে রাজলক্ষ্মীর কথাটা সমাপ্ত হয় নাই—হওয়া খুবই আবশ্যক ছিল। আমি যে বলিয়াছি, আর একটা পর্ব্বেই তাহা হইবার কথা, তাহারও প্রমাণ, রাজলক্ষ্মীর জীবনের ঐ শেষ ঘটনার ইঙ্গিত এই শেষ-পর্ব্বেই বার বার পাওয়া যাইতেছে, যেন সেই শেষের আর বেশি বিলম্ব নাই। সেই অসমাপ্ত কথা আমাকেই যথাসাধ্য পূরণ করিয়া লইতে হইবে, তাই প্রথমেই একটা কৈফিয়ৎ দিয়া রাখিলাম।

প্রস্তাবনা—বাল্যপ্রণয়

"বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে"

—বঙ্কিমচন্দ্র

এইবার আমার কাজ আরম্ভ করি। এ নাটকের প্রথম অঙ্ক বড়ই সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্টও নহে। তাই ইহাকে প্রথম অঙ্ক না বলিয়া Prelude বা 'প্রস্তাবনা' বলাই ভালো। গ্রামের মনসা-পণ্ডিতের পাঠশালায় দুইটি কিশোর-কিশোরী একসঙ্গে পড়িত। একজন সর্দ্দার-পড়ুয়া বা senior class-এর ছাত্র, আরেক জন বয়সেও ছোট—বোধহয় শিশুবোধক ও ধারাপাত তখনও পার হয় নাই। বালিকাটির বয়স ৮।৯ বৎসরের বেশি নয়; দরিদ্রের কন্যা, রোগশীর্ণা,—তাই কুরূপা বলিলেও হয়। ছেলেটির নাম শ্রীকান্ত, মেয়েটির নাম রাজলক্ষ্মী। বালিকা তাহার সেই তরুণ সঙ্গীকে সেই বয়সেই কি চক্ষে দেখিয়াছিল, তাহা তখন কেবল তাহার অন্তর্য্যামীই জানিত; সেই বয়সেই সে তাহাকে সারা মনঃপ্রাণ দিয়া ফেলিয়াছিল। তরুণ শ্রীকান্ত তাহাকে স্নেহ করা দূরে থাক, তাহার প্রতি বালিকার ঐরূপ মমতার লক্ষণ দেখিয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও রুষ্ট হইত, তাহার বয়স-সুলভ উচ্চাভিমানে আঘাত লাগিত; ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু আরও কারণ ছিল, ঐ বালক সর্ব্ববন্ধন-অসহিষ্ণু, স্নেহ-প্রেম-মমতাকে সে ভয় করে। বালিকা তাহা বুঝিত, যেন সেই কারণেই তাহাকে আরও প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল। এ রহস্য রহস্যই বটে—ইহারই নাম আত্মঘাতী প্রেম; সকল দেশেই এই প্রেমকে সকলে ভয় করে, এবং ভক্তিও করে। তথাপি রাজলক্ষ্মীর প্রেম যে অহেতুক নয়, রাজলক্ষ্মীও পরে বারবার তাহা বলিয়াছে—যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব। কিন্তু ঐ বয়সে এমন প্রেম কি সম্ভব? এ আলোচনা ইতিপূর্ব্বে একবার করিয়াছি—এমন কথাও বলিয়াছি যে, বাল্যপ্রণয় হইলেও তাহাতে জাতি ও সমাজঘটিত একটু বিশেষত্ব আছে। তথাপি, এইখানে এই প্রেমের সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব, বলিলে রহস্যটা যে আরও বোধগম্য হইবে তাহা নয়, কেবল—উহার কারণ যতই দুর্ব্বোধ্য হউক, ঘটনাটা যে অনৈসর্গিক নয়,

কবিকল্পিত একটা রসবস্তুই নয়—উহা যে বাস্তব, তাহাই প্রমাণ করা যাইবে। প্রথমতঃ রাজলক্ষ্মীর জীবনে ঐ ঘটনা যতই ভিন্নরূপ বা বিশিষ্ট ধরণের হউক, এমন ঘটনা যে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ঘটিয়া থাকে,—দুইজনের মধ্যে ঐরূপ ব্যবধান এবং একজনের ঘোরতর বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও, এমন প্রেম—এবং, প্রায় ঐরূপ বালিকাবয়সেই—আদৌ অপ্রকৃত নয়, তাহার একটা প্রমাণ বিদেশী সাহিত্য হইতেই দিব; এমন প্রমাণ আরও কত মিলিবে। ফরাসী লেখক মোপাসাঁ, যিনি ছিলেন কঠোর প্রকৃতিপন্থী (Naturalist), অর্থাৎ বাস্তব জীবন-সত্যের উপাসক—তিনিও তাঁহার একাধিক গল্পে এইরূপ প্রেমের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন; নিছক প্রেম হিসাবে, অর্থাৎ নারী-প্রকৃতিরই একটা সার্ব্বভৌমিক প্রণয়-মোহ হিসাবে, তাঁহার একটি গল্পের সহিত এ কাহিনীর হুবহু মিল আছে—সূক্ষ্মতর প্রভেদ যেমনই থাক। ইংরেজী অনুবাদে গল্পটির নাম—A Strange Fancy; পাঠক-পাঠিকাগণ Masterpiece Library-নামক সংগ্রহে এই গল্পটি পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন। ভিক্টর হুগো তাঁহার Les Miserables-নামক উপন্যাসে এইরূপ একটি ঘটনা যুক্ত করিয়াছেন—মেয়েটির নাম Eponine; যদিও তাহার বয়স আরও বেশি, এবং রোমান্সের অতিরিক্ত প্রভাবে সেখানে বাস্তবের সাক্ষ্য কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। অতএব আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। যদি ইহার দার্শনিক কারণ-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হয়, তবে আমি তাঁহাদিগকে Schopenhauer-এর "Metaphysics of Love"—প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিতে বলি। কিন্তু কারণ-জিজ্ঞাসা বা তত্ত্বঘটিত সত্যাসত্য-নির্ণয় কাব্য-বিচারের পক্ষে অবান্তর। আমি পাঠকগণের কৌতূহল উদ্রিক্ত করিবার জন্য কিঞ্চিৎ তথ্য ও তত্ত্বের অবতারণা করিলাম।

আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিকের বিস্ময়-দৃষ্টিও এই বাল্যপ্রণয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কবি-বঙ্কিমই প্রথম, বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের সেই কিশোরী-প্রেমকে, বৃন্দাবনের বাহিরে, মানব-জীবন-কাব্যের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তিনিও ইহার সাংঘাতিক পরিণাম বা ট্র্যাজেডি অস্বীকার করেন নাই। যে-প্রেম বৃন্দাবনে একটা আধ্যাত্মিক সাধন বা পরম কল্যাণের সহায়, সমাজ-জীবনে তিনি তাহার সম্ভাবনা দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম সম্বন্ধে ভয়ে ও সংশয়ে অভিভূত হইয়াছিলেন; প্রতাপ-শৈবলিনীর পরিণাম ঐরূপ প্রেমের যেমন গভীরতা, তেমনই বিষময়তা প্রমাণ করিয়াছে। বিষময় বলিয়াই তো তাহার এমন কাব্য-গৌরব! সেখানেও "ষোল বৎসরের নায়ক, আট বৎসরের নায়িকা"। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয়

নিজ জীবনে ঐরূপ প্রেমের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতেই এমন একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়াছিল—

"বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।......বালকমাত্রেই কোন সময়ে না কোন সময়ে অনুভূত করিয়াছে যে, ঐ বালিকার মুখমণ্ডল অতি মধুর। উহার চক্ষের কোন বোধাতীত গুণ আছে।......কখনো বুঝিতে পারে নাই, অথচ ভালবাসিয়াছে। তাহার পর সেই মধুর মুখ—সেই সরল কটাক্ষ—কোথায় কাল-প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে। তাহার জন্ম পৃথিবী খুঁজিয়া দেখি—কেবল স্মৃতিমাত্র আছে। বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।"

[চন্দ্রশেখর, উপক্রমণিকা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ]

—ইহা শৈবলিনী-প্রতাপের কথা নয়, লেখকের নিজের কথা। সে মুখ 'কালপ্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে'; সে বয়সও নাই, সেই ব্যক্তিও আর নাই; কেবল মধুর স্মৃতিটুকু মাত্র আছে; এবং ইহাও মনে হয় যে, বাল্য-প্রণয়ের মত মধুর আর কিছু নাই! বঙ্কিম তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

ইহার পর, এই শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর পরেও, একালের আরেকজন শক্তিমান কথাশিল্পী, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু—তাঁহার 'মাথুর'-নামক বড়-গল্পটিতে এই বাল্য-প্রণয়ের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যেমন বাস্তব-অনুসারী, তেমনই উৎকৃষ্ট কাব্যরসে সমুজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, এখানে বাস্তব জীবনেই, সেই বৈষ্ণব ভাব-সম্মিলনের অপরূপ কমেডিতে পরিণত হইয়াছে। সে যেমন মধুর তেমনই নির্ম্মল; কোন ভয় নাই, অকল্যাণের অভিশাপ নাই—বৈষ্ণব-সাধকের সেই কিশোরী-প্রেম সমাজ-ধর্ম্মকে অক্ষত রাখিয়াই, নিষ্কলুষ ও চিরজীবী হইয়া আছে। ইতিপূর্ব্বে একখানি বাংলা উপন্যাসের পরিচয়-প্রসঙ্গে, বাঙালী তাহার স্বকীয় সাধনা ও সংস্কৃতিকে, তাহার গূঢ়তর পিপাসাকে—সমাজ-জীবনের বাহিরে কি উপায়ে চরিতার্থ করিয়া থাকে, তাহার সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।* এই গল্পটিতে সেই এক পিপাসা—গৃহের মধ্যেই বাস করিয়া, হৃদয়ের কোন্ গভীরতর উৎস হইতে সঞ্জীবন-বারি আহরণ করিতেছে, লেখক একটি অতি সূক্ষ্ম ও সুকুমার কথা-শিল্পের কৌশলে তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। বস্তুতঃ, বাংলা গল্প-সাহিত্যে, ইহারও জুড়ি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এ প্রসঙ্গে আমি ইহাও বলিয়া রাখিতে চাই যে, ঐ গ্রন্থের ঐ দুইটি গল্প যিনি লিখিয়াছেন, তিনি আর যাহাই লিখুন বা না লিখুন, কেবল ঐ দুইটির জন্য (আরেকটির নাম, 'নরবাঁধ') বাংলার শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের চত্বরে একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; সে আসন অতি অল্প-কয়েক জনই দাবী করিতে পারেন। কিন্তু

* তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' উপন্যাস।

যাহা বলিতেছিলাম। ঐ গল্পে বাল্যপ্রণয়ের এমন একটি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ভয়-সংশয় অকারণ বলিয়াই মনে হয়, এবং বাঙালীর জীবনেও ঐ প্রেম যে একটা বাস্তবজীবন-ঘটিত ব্যাপার হইতে পারে, তাহাতেও সন্দেহ থাকে না। 'শ্রীকান্তে'র এই কাহিনীর সহিত তাহার তফাৎ এই যে, সেখানে প্রেমের প্রবাহিণী চিরদিন অন্তঃশীলা হইয়া বহিয়াছে—তাহাতে খরস্রোত নাই, সে স্রোত উপলাহত হইয়া কলধ্বনি করে না, তাহার গীতিস্বর বড়ই মৃদু-গুঞ্জিত, তাহাতে কীর্ত্তন-পদাবলীর উচ্ছ্বসিত সুর-ঝঙ্কার নাই। উহাই তাহার অপূর্ব্বত্ব। তথাপি, রাজলক্ষ্মী ও জগদ্ধাত্রী—দুই নারীর মধ্যে, হৃদয়গত—এমন কি পরিণামেরও—একটা মিল আছে; কেবল চরিত্র ভিন্ন, নিয়তিও ভিন্ন, বাহিরের ইতিহাস এক নহে। বাল্যপ্রণয়ের কথা এই পর্য্যন্ত; শুধুই বাস্তব জীবনের দিক দিয়াই নয়—আমি এই বাঙালী-সমাজেও, বাল্যপ্রণয়ের কেবল বাস্তবতাই নয়, তাহার একটা বিশিষ্ট রস-সত্যের কিঞ্চিৎ আভাস দিলাম।

প্রথম অঙ্ক—পিয়ারী বাইজী

"You may break, you may shatter the vase, if you will,
But the scent of the roses will hang round it still."

—*THOMAS MOORE*

নাটকের প্রস্তাবনায় ঐরূপ দুই একটি দৃশ্য মনে মনে গড়িয়া লওয়া ছাড়া উপায় নাই। উহাতেই সমগ্র নাটকখানির বীজ উপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমি সেই বীজের টীকা ভাষ্য একটু বিস্তারিত ভাবেই করিলাম। কারণ, এ নাটক ঐ প্রেমেরই ট্র্যাজেডি। এইবার আমরা প্রথম অঙ্কের দৃশ্যগুলি সংকলন করিয়া লইব, আশা করি, তাহা নাটক-হিসাবেই দর্শনীয় হইবে।

প্রথম দৃশ্য—পিয়ারী বাইজীর তাঁবু। বাইজী শ্রীকান্তকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার সহিত কথা কহিতেছে—

"...বাবা ভালো আছেন?"

"বাবা মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন! মা?"

"তিনি আগেই গেছেন।"

"ওঃ—তাইতেই" বলিয়া বাইজী একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল। পরক্ষণেই যখন সে কথা কহিল, তখন আর ভুল রহিল না যে, এই মুখরা নারীর চটুল ও পরিহাস-লঘু কণ্ঠস্বর সত্য সত্যই মৃদু এবং আর্দ্র হইয়া গিয়াছে। কহিল, "তা" হলে যত্নটত্ন করবার আর কেউ নেই, বল। পিসীমার ওখানেই আছ ত? নইলে আর থাক্‌বেই বা কোথায়? বিয়ে হয়নি, সে ত দেখ্‌তেই পাচ্চি। পড়াশুনা কর্‌চ? না, তাও ঐ সঙ্গে শেষ ক'রে দিয়েচ?"

একেবারে গুরুঠাকরুণ!—'সমর্থা নায়িকা'—প্রেমের অকুণ্ঠিত অধিকার। মধুর রসে আর সকল রসই থাকে, বাৎসল্য-রসও থাকা আশ্চর্য্য নয়।

বিরক্ত এবং রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "আচ্ছা, কে তুমি? আমাকে চিন্‌লে কি ক'রে?"

পিয়ারী আমার মনের ভাব লক্ষ্য করিয়া আবার মুখ টিপিয়া হাসিল।

কহিল, "তোমাকে চিনেছিলাম, ঠাকুর, দুর্ব্বুদ্ধির তাড়ায়—আর কিসের? তুমি যত চোখের জল আমায় ফেলেছিলে, ভাগ্যি সূর্য্যিদেব তা শুকিয়ে নিয়েচেন; নইলে চোখের জলের একটা পুকুর হয়ে থাকতো।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া এবার সত্য সত্যই হাসিয়া উঠিল।

সহাস্যে কহিল, "না, ঠাকুর, তোমাকে যত বোকা ভেবেছিলুম, তুমি তা নও।

তা' এতই যদি বুদ্ধিমান্, তবে মোসাহেবী ব্যবসাটা ধরা হ'ল কেন? এ চাকরী ত তোমাদের মত মানুষ দিয়ে হয় না! যাও, চট্‌পট্ স'রে পড়।"

ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলাম না। সহজভাবে বলিলাম,—"চাক্‌রি যতদিন হয়, ততদিনই ভাল। বোসে না থাকি ব্যাগার খাটি—জান ত? আচ্ছা, এখন উঠি। বাইরের লোক হয় ত বা কিছু মনে ক'রে বস্‌বে।"

পিয়ারী কহিল, "কর্‌লে সে তোমার সৌভাগ্য, ঠাকুর! একি আর একটা আপশোষের কথা?"

উত্তর না দিয়া যখন আমি দ্বারের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন সে অকস্মাৎ হাসির লহর তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "কিন্তু দেখো ভাই, আমার সেই চোখের জলের গল্পটা যেন ভুলে যেয়ো না। বন্ধুমহলে, কুমার-সাহেবের দরবারে, প্রকাশ কর্‌লে—চাই কি তোমার নসিবটাই হয় ত ফিরে যেতে পারে।"

আমি নিরুত্তরে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই নির্লজ্জার হাসি এবং কদর্য্য পরিহাস আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন বিছার কামড়ের মত জ্বলিতে লাগিল। [প্রথম পর্ব্ব, পৃঃ ৯৯-১০১]

বাইজীর ভাষায় ও ভঙ্গীতে যে তীব্র শ্লেষ রহিয়াছে তাহাতে বাইজীর মধ্যে যে আর একটা নারী উঁকি দিতেছে—সে সেই বালিকা রাজলক্ষ্মীরই পূর্ণ-বিকশিত রূপ; কিন্তু বাহিরে তাহা সম্পূর্ণ গোপন আছে। বাইজী রাজলক্ষ্মী, তাহার বাইজী-রূপেই শ্রীকান্তকে বাক্যবাণে জর্জ্জরিত করিতেছে। সে শ্রীকান্তকে ভালরূপই চেনে, সে যে কত স্বাধীনচেতা ও নিস্পৃহ, অথচ আত্মরক্ষায় তেমনই দুর্ব্বল ও অসহায়, বালকের মতই নির্ব্বোধ এবং বালকের মতই ভবিষ্যৎ-চিন্তাহীন, তাহা সে জানে; তাই একমাত্র যেখানে আঘাত দিলে সে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে, সেইখানেই আঘাত করিতেছে। শ্রীকান্তের এই চরিত্রই সম্ভবতঃ রাজলক্ষ্মীকে চিরদিনের মত জয় করিয়াছিল—তাই একদিকে স্নেহ-মমতা এবং অপরদিকে শ্রদ্ধা-ভক্তিতে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া আছে। কিন্তু ইহাও কার্য্যকারণ-তত্ত্বের কথা—প্রেমের বহিরঙ্গমাত্র; ঐ হেতুগুলা পরে মনই আবিষ্কার করে। যে-প্রেমে মানব-মানবী এমন আত্মহারা হয়, সে প্রেমের হেতু দুর্জ্ঞেয়, তাই তাহা অহেতুক বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সেই হেতুটা হয়তো আত্মাই জানে, কিন্তু বাক্যে বুঝাইতে পারে না। চণ্ডীদাসের রাধা যখন বলে—

দেখিতে দেখিতে হরে,
তনু-মন চুরি করে,
না চিনি যে—কালা কিম্বা গোরা!

—তখন তাহার সেই প্রেমের হেতু সে জানিতেও চায় না, না জানিয়াই যেন আরও আনন্দ! ইহাকেই বলে 'মনোহরণ', অর্থাৎ মনকে ভুলাইয়া, তাহার পাহারা

এড়াইয়া, প্রাণের পিপাসা-নিবারণ। রাজলক্ষীও ঐ হেতুর কথা মাঝে মাঝে বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ভালো করিয়া বুঝাইতে পারে নাই।

কিন্তু এখানকার এই কথাগুলিতে রাজলক্ষীর বাইজী-জীবনের অভিজ্ঞতা ও তিক্ততা, এবং সেই সঙ্গে অতিশয় ক্ষুদ্রসুখ-পিপাসু পশুবৎ পুরুষের প্রতি কি ঘৃণা ফুটিয়া উঠিয়াছে! নিজের সেই বাইজীবৃত্তিকেও সে যেন দুই পায়ে দলিত করিতেছে, সেটাকে শ্রীকান্তের চক্ষে ঘৃণ্য করিতে তাহার এতটুকু আত্ম-মমতা নাই, নিজেকেও কুৎসিত করিয়া তুলিতেছে; ঐ যে—"কিন্তু দেখো ভাই—"ঐ কথা এবং ঐ ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা করিয়াই কুৎসিত বিদ্রূপে ভরিয়া দিয়াছে। শ্রীকান্তের এতটুকু শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সে চায় না। সেই প্রথম-দর্শনে সে নিজের প্রাণের ক্ষুধাকে সম্পূর্ণ দমন করিয়াছে—শ্রীকান্তের হিতাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন আর কোন আকাঙ্ক্ষা তাহার নাই, ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য—সেই একস্থান। পিয়ারী শ্রীকান্তকে অমাবস্যার রাত্রে একা শ্মশানে যাইতে দিবে না, তাহার সেই ভূতে অবিশ্বাস, এবং সাহসিকতার দম্ভ এমন করিয়া প্রমাণ করিতে দিবে না।

পিয়ারী সুমুখেই দাঁড়াইয়া ছিল। আমার আপাদমস্তক বার-বার নিরীক্ষণ করিয়া, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই, ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল—"শ্মশানে-টশানে তোমার কোনমতেই যাওয়া হবে না—কোন মতেই না।"

ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—"কেন?"

"কেন আবার কি? ভূত প্রেত কি নেই যে, এই শনিবারের অমাবস্যায় তুমি যাবে শ্মশানে? প্রাণ নিয়ে কি তা'হ'লে আর ফিরে আসতে হবে!" বলিয়াই পিয়ারী অকস্মাৎ ঝর্-ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বিহ্বলের মত নিঃশব্দে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আমার জবাব না পাইয়া পিয়ারী চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "তুমি কি কোনদিন শান্ত সুবোধ হবে না? তেমনি একগুঁয়ে হয়ে চিরকালটা কাটাবে? কই, যাও দিকি কেমন করে যাবে—আমিও তা হ'লে সঙ্গে যাবো" বলিয়া সে শালখানা কুড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইবার উপক্রম করিল।

আমি সংক্ষেপে কহিলাম, "বেশ, চল!"

আমার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে জ্বলিয়া উঠিয়া পিয়ারী বলিল—"আহা! দেশ-বিদেশে তা হ'লে সুখ্যাতির আর সীমা-পরিসীমা থাক্‌বে না! বাবু শিকারে এসে একটা বাইউলি সঙ্গে ক'রে দুপুর-রাত্রে ভূত দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। বলি, বাড়ীতে কি একেবারে আউট্ হয়ে গেছ নাকি? ঘেন্নাপিত্তি-লজ্জা-সরম আর কিছু দেহতে নেই?" বলিতে বলিতেই তাহার তীব্র কণ্ঠ ভিজিয়া যেন ভারি হইয়া উঠিল; কহিল, "কখনো ত এমন ছিলে না। এত অধঃপথে তুমি যেতে পারো, কেউ ত কোন দিন ভাবেনি।"

পিয়ারী বিদ্যুৎগতিতে পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল "যদি যেতে না দিই, জোর করে যেতে পার?"

"কিন্তু যেতেই যা দেবে না কেন?"

পিয়ারী কহিল,—"দেবই বা কেন? সত্যিকারের ভূত কি নেই যে, তুমি যাবে বল্লেই যেতে দেব? যাইরি, আমি চেঁচিয়ে হাট বাধাব—তা' বলে দিচ্চি", বলিয়াই আমার বন্দুকটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। আমি এক পা পিছাইয়া গেলাম। এবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিলাম, "সত্যিকারের ভূত আছে কি না জানি না, কিন্তু মিথ্যাকারের ভূত আছে, জানি। পিয়ারী মলিন হইয়া গেল; এবং ক্ষণকালের জন্ম বোধ করি বা কথা খুঁজিয়া পাইল না। তারপরে বলিল—"আমাকে তা' হলে তুমি চিনেচ বল!" আমি পুনরায় সহাস্যে প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু তুমি কি ভূত?"

পিয়ারী কহিল—"ভূত বই কি। যারা মরে' গিয়েও মরে না, তারাই ভূত; এই ত তোমার বল্‌বার কথা?" ঠিক চিনিতে পারিলাম—এ সেই রাজলক্ষ্মী।

বাইজী কহিল, "তুমি কি ভাব্‌ছ, বোল্‌ব?"

"কি ভাব্‌চি?"

"তুমি ভাব্‌চ, আহা! ছেলেবেলায় একে কত কষ্ট দিয়েচি। কাঁটার বনে পাঠিয়ে রোজ-রোজ বঁইচি তুলিয়েচি, আর তার বদলে শুধু মার-ধোর করেছি। মার খেয়ে চুপ কোরে কেবল কেঁদেচে, কিন্তু কখনো কিছু চায়নি। আজ যদি একটা কথা বল্‌চে, ত শুনিই না। না হয়, নাই গেলাম শ্মশানে। এই না? হাস্‌চ যে?"

"হাস্‌চি, কি ক'রে তোমরা মানুষ ভুলিয়ে বশ করে, তাই দেখে।"

পিয়ারীও হাসিল; কহিল, "তাই বই কি। পরকে কথায় ভুলিয়ে বশ করা যায়; কিন্তু, জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত নিজেই যার বশ হয়ে আছি, তাকেও কি কথায় ভুলানো যায়?" [ঐ, পৃঃ ১১৫]

এ দৃশ্যে শ্রীকান্তের প্রতি রাজলক্ষ্মীর সেই মমতার কোন অধিক পরিচয় নাই। কিন্তু তাহার নারী-চরিত্রের মাধুর্য্য—প্রেমাস্পদের নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যান বা ঔদাসীন্য সত্ত্বেও সেই স্নেহ-কাতরতা, যাহা নারীস্বভাবেই সম্ভব (সেই নারী যদি আবার বাঙালী হয়)—তাহারই মাধুর্য্য একটি বড় সুন্দর ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। "তুমি ভাবছ—" এই কথাগুলিতে নিরুপায়ের উপায়হিসাবে সে যে কলা-কৌশল অবলম্বন করিয়াছে, তাহার ঐ ছলনাটুকু কি করুণ! আর ঐ যে শেষের বাক্যটি —'তাকেও কি কথায় ভুলানো যায়?' উহার অর্থও কি গভীর! রাজলক্ষ্মীর প্রেম যে কত সত্য তাহা সে অন্তরের অন্তরে জানে—তাই তো তাহার মুক্তি নাই; পরকে ভুলানোই যদি তাহার সেই প্রেমের সমস্যা হইত (সাধারণ প্রেমে তাহাই হইয়া থাকে), তবে তো সে বাঁচিয়া যাইত; হয় তাহা পারিয়া কৃতার্থ হইত, নয়, ব্যর্থ হইয়া ছাড়িয়া দিত, কিম্বা আত্মসুখে বঞ্চিত হইয়া হা-হুতাশ করিত। পিয়ারীর ভালোবাসা তো সেইরূপ পরকে ভুলাইয়া বশীভূত করার আকাঙ্ক্ষা নয়, তাই পরক্ষণেই সে বলিতেছে—'নিজেই যাহার বশ হইয়া আছি' ইত্যাদি। এমন কথা—এমন সরল, অথচ গভীর কথা, কেবল ভাবের আবেগেই বাহির হয় না, ইহা মুখস্থ-কথা বা রচা-কথা নয়; ইহার জন্ম 'শিক্ষিত' হইতে হয় না, নাটক-নভেল পড়িতেও হয় না। ইহা সেই সত্য যাহা—মনে নয়, অন্তরে স্ফুরিত হইয়া

থাকে। হঠাৎ মনে হয়, কথাটা বড়ই সাধারণ, ইহার তেমন অর্থ-গৌরব নাই। কিন্তু এইরূপ সামান্য কথা বলিতে পারাই দুরূহ; কবি ও নাট্যকার যখন দিব্যদৃষ্টির প্রেরণায় নর-নারী-হৃদয়ের অন্তস্তল যেন আকস্মিক বিদ্যুতালোকে দেখিতে পান, তখনই পাত্র-পাত্রীর মুখে অবস্থাবিশেষে এমন কথা উচ্চারণ করাইয়া থাকেন, সেই কাব্যও জীবন-সত্যে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এখানে সেই কবিদৃষ্টির প্রয়োজন হয় নাই—কল্পনা করিতে হয় নাই; কেবল প্রত্যক্ষকে অনুভব করিবার যে শক্তি তাহারই সাহায্যে ঐ চরিত্রের, তথা নারী-প্রেমের একটি জীবন্ত-চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কিন্তু ছিঃ! আমাকে তুমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে—দে'খে চিনতেও পারোনি!"

আমি বলিলাম, "তোমাকে মনেই বা কবে করেছিলাম যে, ভুলে যাবো না? বরং, আজ চিনতে পেরেছি দে'খে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। আচ্ছা, বারোটা বাজে—চল্লুম।"

পিয়ারীর হাসিমুখ এক নিমেষেই একেবারে বিবর্ণ, ম্লান হইয়া গেল।

আমাকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আচ্ছা, যাও—পেছু ডেকে আর অমঙ্গল করব না।"

তাঁবুর ভিতর হইতে অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে "দুর্গা! দুর্গা!"-নামের সকাতর ডাক কানে আসিয়া পৌঁছিল। আমি দ্রুতপদে শ্মশানের পথে প্রস্থান করিলাম। [ঐ, পৃঃ ১১৫-১৭]

তৃতীয় দৃশ্য। শ্মশান ও তাহার সম্মুখস্থ পথ। শ্রীকান্ত তাহার শ্মশান-অভিযান ইতিপূর্ব্বে একবার সফল করিয়া আসিয়াছে; দ্বিতীয়বার কেমন একটা অদ্ভুত, অজ্ঞেয়—যেন একপ্রকার Psychic শক্তির দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হইয়া, সে পুনরায় ঘোর অন্ধকারে সেই শ্মশানে আসিয়া বসিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী এবারকার কথা জানিত না। সে সেই রাত্রির প্রভাতেই তাহার লোকজন সহ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। তখন ভোর হয়-হয়, সেই শ্মশানের সম্মুখ দিয়া তাহার গোরুর গাড়ী ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছে।

রাত্রি আর বেশি বাকি নাই অনুভব করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমনি সময়ে সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে সু-উচ্চ কণ্ঠের ডাক কানে গেল, "শ্রীকান্ত বাবু—"

দ্রুতপদে বাঁধের উপরে উঠিয়া ডাকিলাম, "রতন, তোরা কি বাড়ী যাচ্ছিস্?"

রতন উত্তর দিল, "হাঁ বাবু, বাড়ী যাচ্ছি—মা গাড়ীতে আছেন।"

অদূরে উপস্থিত হইতেই, পিয়ারী পর্দ্দার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিল, "এ যে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়, তা আমি দরোয়ানের কথা শুনেই বুঝতে পেরেচি। গাড়ীতে উঠে এসো, কথা আছে।"

আমি সন্নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা?"

"উঠে এসো, বলচি।"

তাহার অস্বাভাবিক উত্তেজনায় কতকটা যেন হতবুদ্ধি হইয়াই গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। পিয়ারী গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিয়া দিয়া কহিল "আজ আবার এখানে তুমি কেন এলে?"

আমি সত্য কথাই বলিলাম। কহিলাম, "জানি না।"

এই বলিয়া আমি সমস্ত ঘটনাটা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলাম।

শুনিতে শুনিতে তাহার শরীর বারংবার শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু সে একটা কথাও কহিল না। পর্দা তোলা ছিল, পিছনে চাহিয়া দেখিলাম, আকাশ ফর্সা হইয়া গেছে। বলিলাম, "এইবার আমি যাই"।

পিয়ারী স্বপ্নাবিষ্টের মত কহিল, "না।"

"না কি রকম? এমন ভাবে চ'লে যাবার অর্থ কি হবে জান?"

"জানি—সব জানি। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না, কিন্তু সেখানেও আর ফিরে যেতে দেব না। তোমার টিকিট কিনে দিচ্ছি, তুমি বাড়ী চলে যাও, কিংবা যেখানে খুসি যাও, কিন্তু ওখানে আর এক দণ্ডও না।"

"কিন্তু, যে মিথ্যা কুৎসার রটনা হবে, তার দাম ত কম নয়!"

পিয়ারী আমার পা ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। গাড়ী এই সময়ে মোড় ফিরিতেই পিছনটা আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। হঠাৎ মনে হইল, সম্মুখের ঐ পূর্ব্ব-আকাশটার সঙ্গে এই পতিতার মুখের কি যেন একটা নিগূঢ় সাদৃশ্য রহিয়াছে। উভয়ের মধ্য দিয়াই যেন একটা বিরাট অগ্নিপিণ্ড অন্ধকার ভেদ করিয়া আসিতেছে,—তাহারই আভাস দেখা দিয়াছে। কহিলাম, "চুপ করে' রইলে যে?"

পিয়ারী একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "যাবে? আচ্ছা যাও। কিন্তু কথা দাও—আজ বেলা বারোটার আগেই বেরিয়ে পড়বে?"

পিয়ারী হাতের আঙ্‌টি খুলিয়া আমার পায়ের উপর রাখিয়া গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল; এবং ধূলা মাথায় লইয়া আঙ্‌টিটা আমার পকেটে ফেলিয়া দিল। বলিল, "তবে যাও—বোধ করি, ক্রোশ-দেড়েক পথ তোমাকে বেশী হাঁটতে হবে।"

গোযান হইতে অবতরণ করিলাম। তখন প্রভাত হইয়াছিল। পিয়ারী অনুনয় করিয়া কহিল, "আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখ্‌তে হবে। বাড়ী ফিরে গিয়ে একখানি চিঠি দেবে।"

[ঐ, পৃঃ ১৪১-৪৪]

উপরি-উদ্ধৃত দৃশ্য ও কথোপকথনে একটা বিষয়, এই প্রথম, বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার আছে। শ্রীকান্ত যতই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করুক, তাহার চরিত্রে একটা বড় রকমের আত্মাভিমান বা আত্মসম্মানের সংস্কার দৃঢ়মূল হইয়া আছে। ইহার উল্লেখ পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ করিয়াছি। তাহার একটা নিজস্ব ব্যক্তিগত নীতিনিষ্ঠা আছে, একটা নিজস্ব আদর্শ আছে—ইন্দ্রনাথ ও অন্নদা-দিদিকে সে ভুলিতে পারে না। তাই সর্ব্বপ্রকার পঙ্কিলতা ও অশুচি সংসর্গের মধ্যেও, সে আপনাকে একটা গণ্ডির দ্বারা পৃথক রাখিয়াছে। পতিতা নারীর সম্বন্ধে বাহিরে তাহার কোন নৈতিক কুসংস্কার নাই বটে, কিন্তু ঐরূপ রমণীকে সে এতখানি প্রশ্রয় দিতে কখনও রাজী হইবে না—যাহাতে তাহার সেই আত্মমর্য্যাদার হানি হয়; অর্থাৎ সে তাহার ভিতরকার 'আমি'টার সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ঘটিতে দিবে না। পিয়ারী বাইজীর মধ্যে রাজলক্ষ্মীকে দেখিতে ও চিনিতে পারিয়াও তাহার ঐ বাইজী-জীবনের জাত্যন্তর-প্রাপ্তি সে কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারে না। এই

দৃশ্যে তাহারই যে আভাস পাওয়া গেল, এবং রাজলক্ষ্মীও তাহা যেরূপ বুঝিল—পরে সমস্ত নাটকখানিতে তাহাই কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের এই নূতনতর সম্বন্ধ নানা নূতন ঘটনা ও সূক্ষ্মতর ভাবের বিকাশে উত্তরোত্তর যতই জটিল হইয়া উঠুক, শেষ পর্য্যন্ত এই একটি দুশ্ছেদ্য সংস্কার—শ্রীকান্তের ঐ দুর্জ্জয় আত্মাভিমান—ট্র্যাজিডির কারণ হইয়াছে।

এইখানেই প্রথম অঙ্ক শেষ করা যাক। ইহার পর যে দৃশ্যগুলি আমরা দেখিব তাহাতে রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের নূতন সম্বন্ধটি আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ ট্র্যাজিডির গ্রন্থিবন্ধন সুরু হইয়াছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক—নিয়মচারিণী

"এবারের মত বসন্ত গত জীবনে"

—রবীন্দ্রনাথ

ইতিমধ্যে শ্রীকান্তের শ্রীকান্ত-পনা আর এক ধাপ উঠিয়াছে,—সে শিকার-পার্টির রস-সম্ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া, আর একপ্রকার রসের আস্বাদনে ঘটনাক্রমে বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে এক সন্ন্যাসীর চেলা হইয়া—কৌপীন, তরুতলবাস, ভিক্ষা, এবং সাধুসেবায়-উপহৃত নানা ভোগ্য ও সেব্য বস্তুর রস-আস্বাদনে পরম তৃপ্তিলাভ করিতেছিল। কিন্তু দৈব-নিগ্রহে একদা একস্থানে বসন্ত-মহামারীর মধ্যে পড়িয়া, নিজে রোগাক্রান্ত হইয়া, পথিমধ্যে পরিত্যক্ত ও আসন্ন-মৃত্যুর অবস্থায়, কোনক্রমে পিয়ারী বাইজীকে তাহার পাটনার ঠিকানায় একটা সংবাদ পাঠাইতে পারিয়াছিল। বাইজী তাহাকে রেল-ষ্টশনের একটা চালাঘরে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখে; সেইখানেই তাহাকে একটা বাসায় তুলিয়া আনিয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষার দ্বারা কতকটা খাড়া করিয়া, পরে তাহার পাটনার বাড়ীতে তাহাকে লইয়া আসে। এই দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যটি আমরা দুইভাগ করিয়া লইলাম, কারণ, দৃশ্য একই, কেবল স্থান দুইটা; প্রথম, সেই রোগাক্রান্ত হওয়ার স্থান—আরা-শহরের একটা বাসাবাড়ী; দ্বিতীয়, পাটনা—পিয়ারী বাইজীর অট্টালিকা।

"আমি ভাবছি এখন যেমন আছি, তাতে তিন-চার দিনেই বোধ হয় এক রকম সেরে যাবো। তোমরা বরঞ্চ এই কয়টা দিন অপেক্ষা ক'রে বাড়ী যাও।"

"তখন তুমি কি করবে শুনি?"

"সে যা হয় একটা হবে।"

"তা হবে" বলিয়া পিয়ারী একটুখানি হাসিল। "তিন চার দিনে না হোক্ দশ বারো দিনে এ রোগ সারবে তা জানি, কিন্তু আসল রোগটা কতদিনে সারবে, আমাকে বলতে পারো?"

"আসল রোগ আবার কি?"

পিয়ারী কহিল, "ভাববে একরকম, বলবে একরকম করবে আর একরকম—চিরকাল ঐ এক রোগ। ওগো দয়াময়! আমার উপর যদি তোমার এত দরদ—তবে যাই হোক্ গে—সন্ন্যাসী নও, সন্ন্যাসী সেজে কি হাঙ্গামাই বাধালে! এসে দেখি, মাটির উপর ছেঁড়া-কাঁথার প'ড়ে অঘোর অচৈতন্য! মাথাটা ধূলা-কাদায় জট পাকিয়েছে, সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রাক্ষি বাঁধা; হাতে দু'গাছা পেতলের বালা। মা গো মা! চেহারা দেখে আর কেঁদে বাঁচিনে!" বলিতে বলিতেই উদ্বেল অশ্রুজল তাহার দুই চোখ

ভরিয়া টলটল করিয়া উঠিল। হাত দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল,—বঙ্কু বলে, 'ইনি কে মা?' মনে-মনে বললাম, তুই ছেলে, তোর কাছে সে কথা আর কি বল্‌ব, বাবা।"

[প্রথম পর্ব্ব, পৃঃ ১৬৫]

ইহার পর—

পাটনায় পৌছিয়া বারো-তেরো দিনের মধ্যেই একপ্রকার সারিয়া উঠিলাম। একদিন সকালে পিয়ারীর বাড়ী একলা ঘরে ঘরে ঘুরিয়া আসবাবপত্র দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। দোতলার একটা কোণের ঘরের দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এটি যে বাইজীর নিজের শয়নমন্দির, তাহা ভিতরে চাহিবামাত্রই টের পাইলাম, কিন্তু আমার কল্পনার সহিত ইহার কতই না প্রভেদ! যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার কিছুই নাই। মেজেটি সাদা পাথরের, দেয়ালগুলি দুধের মত সাদা, ঝক্ ঝক্ করিতেছে। ঘরের একধারে একটি ছোট তক্তপোষের উপরে বিছানা পাতা ; একটি কাঠের আল্‌নায় খানকয়েক বস্ত্র এবং তাহারই পিছনে একটি লোহার আলমারি। আর কোথাও কিছু নাই ; একটা মিষ্ট শব্দে চমকিত হইয়া দেখিলাম গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে-গাহিতে পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়াছে। সে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে ভিজা-কাপড় ছাড়িতে আসিয়াছে। আমি ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিলাম—"ঘাটে কাপড় নিয়ে যাওনা কেন?"

পিয়ারী চমকিয়া চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল। কহিল "অ্যাঁ!—চোরের মত আমার ঘরে ঢুকে বসে' আছ?"

আমি বলিলাম, "আমাকে এমনি অকৃতজ্ঞ পেয়েছ? তুমি আমার এত করলে আর শেষে তোমাকেই চুরি করব? এত লোভী নই।"

পিয়ারীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। বেফাঁস্ কথাটা সারিয়া লইবার জন্য জোর করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "নিজের জিনিষ বুঝি কেউ চুরি করতে আসে? এই বুঝি তোমার বুদ্ধি?"

কিন্তু এত সহজে তাকে ভুলানো গেল না। মলিন মুখে কহিল, "তোমাকে আর কৃতজ্ঞ হতে হবে না ;—দয়া করে সে সময়ে যে একটা খবর পাঠিয়েছিলে এই আমার ঢের।"

তাহার শুভ্র স্নাত প্রফুল্ল হাসি-মুখখানি এই রৌদ্রোজ্জ্বল সকালবেলাটাতেই ম্লান করিয়া দিলাম দেখিয়া বেদনার মত বুকের মধ্যে বাজিতে লাগিল। অনুতপ্ত স্বরে বলিয়া উঠিলাম, "লক্ষ্মী, তোমার কাছে ত লুকানো কিছু নেই—সবই ত জান। তুমি না গেলে আমাকে সেই ধূলোবালির উপরেই ম'রে থাকতে হোত।"

"তা হ'লে আমার জন্যেই প্রাণটা ফিরে পেয়েছ বল?"

"তাতে আমার কোন সন্দেহই নেই।"

"তাহ'লে ওটা দাবী করতে পারি বল?'

কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল "তামাসা থাক্—অসুখ ত একরকম ভাল হ'ল, এখন যাবে কবে মনে করচ?"

তাহার প্রশ্ন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। গম্ভীর হইয়া কহিলাম, "কোথাও যাবার ত এখন আমার তাড়া নেই। তাই আরও কিছুদিন থাকব ভাবছি।"

পিয়ারী কহিল "কিন্তু আমার ছেলে প্রায়ই আজকাল বাঁকিপুর থেকে আসছে। বেশীদিন থাক্‌লে সে হয় ত কিছু ভাব্‌তে পারে।"

আমি বলিলাম, "ভাবলেই বা। তাকে ত ভয় ক'রে চলতে হয় না। এমন আরাম ছেড়ে শীঘ্র কোথাও আমি নড়চিনে।"

পিয়ারী বিরস মুখে বলিল—"তা কি হয়!" হঠাৎ উঠিয়া গেল।

পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়। তাহার অসংবদ্ধ

কামনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যত অধঃপথেই তাহারে ঠেলিতে চাহুক, কিন্তু এ কথাও সে ভুলিতে পারে না—সে একজনের মা! এবং সেই সন্তানের ভক্তিনত দৃষ্টির সম্মুখে তাহার মাকে ত সে কোনমতেই অপমানিত করিতে পারে না। হঠাৎ বঙ্কুর মা অভ্রভেদী হিমাচলের ন্যায় পথ রুদ্ধ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও আমার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। [ঐ, পৃঃ ১৬৬-৭৪]

ঐ পাটনার বাড়ীতে আর দুইটি দৃশ্য দেখাইলেই এই দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়িবে। দৃশ্য দুইটি বড়ই অর্থপূর্ণ—দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সন্ধ্যার সময় ধুনোচিতে ধূপ-ধুনা দিয়া, সেটা হাতে করিয়া রাজলক্ষ্মী এই বারান্দা দিয়াই আর এক ঘরে যাইতেছিল; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "মাথা ধরেচে, হিমে ব'সে কেন, ঘরে যাও।"

হাসি পাইল। বলিলাম, "অবাক করলে লক্ষ্মী! হিম এখানে কোথায়?"

রাজলক্ষ্মী কহিল, "হিম না থাক, ঠাণ্ডা বাতাস ত বইছে। সেইটাই কোন্ ভাল?, ঘরে গিয়ে একটু শুয়েই পড় না? রতন কি করচে? সে কি একটু ওডিকলোন দিয়ে দিতে পারে না? এ বাড়ীর চাকরগুলোর মত 'বাবু' চাকর আর পৃথিবীতে নেই।" বলিয়া রাজলক্ষ্মী নিজের কাজে চলিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাল সকালেই না কি বাড়ী যাবে?" "হাঁ কাল সকালেই যাব। সকালেই বেরিয়ে পড়ব—তাতে যে গাড়ী জোটে।"

"আচ্ছা। একখানা টাইম-টেবলের জন্য কাউকে না হয় ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিইগে।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

আমার কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে?

অনেক রাত্রে হঠাৎ এক সময়ে তন্দ্রা ভাঙিয়া চোখ মেলিলাম। দেখিলাম রাজলক্ষ্মী নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া, সুমুখের জানালাটা খোলা ছিল—তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া, আমার শয্যার কাছে আসিয়া এক মুহূর্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিয়া লইল। তার পরে মশারির ভিতরে হাত দিয়া প্রথমে আমার কপালের উত্তাপ অনুভব করিল; পরে আমার বোতাম খুলিয়া বুকের উত্তাপ বারংবার অনুভব করিতে লাগিল। তাহার পরে সে বোতাম বন্ধ করিল; গায়ের কাপড়টা সরিয়া গিয়াছিল, গলা পর্য্যন্ত টানিয়া দিল; শেষে মশারির ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া অত্যন্ত সাবধানে কপাট বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া গেল। [ঐ, পৃঃ ১৭৪-৭৭]

তারপর—

সকালে প্রস্ফুট জ্বর লইয়াই ঘুম ভাঙিল। চোখ মুখ জ্বালা করিতেছে; মাথা এত ভারি যে, শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তবুও যাইতেই হইবে।

পিয়ারী ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "এখন দেহটা কেমন আছে?"

বলিলাম, "খুব মন্দ নয়। যেতে পারব।"

"আজ না গেলেই কি নয়?"

"হাঁ, আজই যাওয়া চাই।"

"তা'হলে বাড়ী পৌঁছেই একটা খবর দিয়ো। নইলে আমাদের বড় ভাবনা হবে।"

* * * *

মনে মনে বারংবার বলিতে লাগিলাম, লক্ষ্মি, দুঃখ করিয়ো না ভাই, এ ভালই হইল যে, আমি চলিলাম। তোমার ঋণ ইহ-জীবনে শোধ করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু যে-জীবন তুমি দান

করিলে, সে জীবনের অপব্যবহার করিয়া আর না তোমার অপমান করি—দূরে থাকিলেও এ সঙ্কল্প আমি চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিব।" [ঐ, পৃঃ ১৭৭-৭৮]

এই দৃশ্যগুলি হইতে কেবল একটি কথাই আমাদের মনে বিশেষ করিয়া জাগে, তাহা এই যে, এত কাণ্ডের পর—শ্রীকান্তকে বাঁচাইয়া তুলিয়া, এত যত্ন ও এত শুশ্রূষার পর—রাজলক্ষ্মী তাহাকে এমন ভাবে বিদায় করিয়া দিল কেন? শ্রীকান্ত ইহার একটা কারণ অনুমান করিয়াছে, অনুমান কেন, প্রায় দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছে, এবং সেইজন্য সে রাজলক্ষ্মীর প্রতি হঠাৎ বড় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছে; এই বোধ হয়, তাহার প্রথম শ্রদ্ধা। কেবল রাজলক্ষ্মীর ঐ ব্যবহারই শুধু নয়—শ্রীকান্তের এই ভাবাবেগটিও বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। শ্রীকান্তের দিকটাই প্রথমে বুঝিয়া লওয়া যাক। শ্রীকান্ত প্রেমকে বরদাস্ত করিতে পারে না; তার উপর, পতিতা-নারীর প্রেম—তাহা তো রীতিমত আশঙ্কাজনক; যদি কোন কারণে তাহা অতিশয় গভীরও হয়, তবুও সেই এক মোহের বশে সেও একটা অনর্থক আত্মনিগ্রহ বই তো নয়,—অন্নদাদিদির সেই দারুণ শাস্তিভোগ দেখিয়া সে প্রেমের উপরে আরও চটিয়া গিয়াছে। এই পতিতা-নারীও সেই প্রেমের ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে—এ ব্যাধি আরও ঘৃণ্য—পতিতার প্রেম। এজন্য তাহার সঙ্কোচের অবধি নাই। তাই এতদিনে সে তাহার ঐ একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণী, উপকারিণী নারীর প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধা বোধ করিতে পারিয়া যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে। তাহার ঐ প্রেমের লক্ষণ দেখিয়া শ্রীকান্ত বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেছিল—কৃতজ্ঞ হইলেও, শ্রদ্ধা বোধ করিতে পারে নাই। এক্ষণে ঐ শ্রদ্ধার কারণ অবশ্য—রাজলক্ষ্মীর মাতৃত্ব-মহিমা। রাজলক্ষ্মীকেও সে নিজের সেই আত্মগত আদর্শে যাচাই করিয়া লইবে; তাহার নারী-হৃদয়ের যে গভীরতর বেদনা—তাহার সেই একপ্রকার আধ্যাত্মিক সঙ্কট—সে বুঝিতে পারে না; কিম্বা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না। এই যে বুঝিয়াও বুঝিতে চাহে না—বলিয়াছি, ইহার কারণ, শ্রীকান্তের সেই চরিত্র; নহিলে বুঝিয়াও বুঝেনা কেন? আমি পূর্ব্বে ইহাই একবার বিশেষ করিয়া বলিয়াছি, পুনরায় বলি; কারণ, এই কাহিনী বুঝিবার পক্ষে ঐ একটা প্রশ্ন বড় মূল্যবান। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর যে-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, তাহার মত নিখুঁত, বাস্তব ও জীবন্ত আর কি হইতে পারে? কিন্তু সেই চিত্র আমরা যেমন বুঝিতে পারি, সে তেমন বুঝিতে পারে না,—অথচ তাহারই প্রদর্শিত! এমন হয় কি করিয়া? তবেই, শ্রীকান্তের ব্যক্তি-চরিত্র ও তাহার শিল্পী-চরিত্র, এই দুইয়ের মধ্যে একটা কোন

রহস্যময় বিরোধ আছে। এই যে দেখাইতেছে অথচ নিজে দেখিতেছে না, ইহার কারণ কি? কারণ, শ্রীকান্তের নিজেরই অতি বিশিষ্ট ও অ-সাধারণ চরিত্র। সে অতিশয় সত্যনিষ্ঠ; সেই সত্যনিষ্ঠা এমনই যে, পরের সম্বন্ধে তাহার দৃষ্টিকে সে একরূপ মুক্ত রাখিতে পারিয়াছে; পর যতক্ষণ পর, ততক্ষণ সে তাহাকে দূরে রাখিয়া, তাহার প্রত্যেক ভঙ্গি, তাহার কথা ও কণ্ঠস্বর, তাহার ব্যবহারে সর্ব্ববিধ ভাবান্তর—আত্মসংস্কারমুক্ত হইয়া দেখিতে ও দেখাইতে পারে; ইহাই শিল্পীর সত্যনিষ্ঠা; এই শিল্পী-প্রতিভারও মূলে আছে তাহার অতি তীক্ষ্ণ হৃদয়বত্তা—যাহার নাম সমবেদনা, বা আরও বড় অর্থে—অনুকম্পা; ইহারই কারণে সে এমন দুঃখের কবি হইতে পারিয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার নিজের সম্বন্ধেও একটি কঠিন সত্যনিষ্ঠা আছে—তাহার কতকগুলি আত্মগত বিশ্বাস ও সংস্কার আছে; এই আত্ম-সত্যের প্রতিও তাহার নিষ্ঠা অতিশয় দৃঢ়। এইজন্যই এই কাহিনীতে সে যে আত্মকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহা এমন অকপট; সেই পরিচয়কে সে কোনরূপ সমাজ-বুদ্ধি বা সমাজ-নীতি, বা সাধারণ ভাল-মন্দ-বোধের দ্বারা এতটুকু মার্জ্জিত বা ভদ্র করিবার চেষ্টা করে নাই; সে যেন নিজেকে নিজেই দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ দিয়াছে—"Speak of me as I am; nothing extenuate, nor set down aught in malice"। এইজন্যই—আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি—এই আত্মকাহিনী এমন সত্যকার আত্ম-চরিত-কাহিনী হইয়া উঠিয়াছে; আপনাকে আপনি দেখার এমন নিঃসঙ্কোচ, নির্ম্মল দৃষ্টি প্রায় দেখা যায় না। ইহার কারণ কিন্তু ঐ সত্যনিষ্ঠা, এবং তাহাও একরূপ আত্মনিষ্ঠা; বাহিরের কোন সত্যাসত্য নয়, কোন নীতি বা ধর্ম্মের বশ্যতা নয়—সে নিজে যাহা জানে ও বিশ্বাস করে তাহাই যথেষ্ট, তাহাই তাহার সত্য।

ঠিক এই কারণেই পরের দিক দিয়া পরকে দেখা, পরের শুধু বাহিরটাই নয়—ভিতরে প্রবেশ করা—তাহার পক্ষে অসাধ্য; ঐ কঠিন আত্মধর্ম্মনিষ্ঠাই একটা বড় বাধা হইয়া দাঁড়ায়। পরের সম্বন্ধে তাহার অনুকম্পাই আছে, অর্থাৎ দুঃখে সহানুভূতি আছে, কিন্তু মর্ম্মের সহমর্ম্মিতা নাই। সেই সহানুভূতির তুলিকায় সে যে বর্ণচিত্র আঁকিয়া তোলে, তাহা অতি সুন্দর এবং সাদৃশ্যযুক্ত হইলেও, সে-চিত্র এক-ভূমিকার চিত্র, তাহাতে পশ্চাৎ-দৃশ্য নাই। ঐ যে কঠিন আত্মতান্ত্রিক মনোভাব, উহারই কারণে সে প্রেমের বশ নয়; যে-জ্ঞান একমাত্র প্রেমের পক্ষেই সম্ভব তাহা শ্রীকান্তের নাই; রাজলক্ষ্মীর আছে। শ্রীকান্ত মানুষের দুঃখটাকে যেমন দেখিতে পায়, মানুষের সুখটাকে তেমন দেখিতে পায় না—দুঃখের মধ্যেও

যে কত সুখ থাকিতে পারে, সে তাহা বুঝে না, বিশ্বাস করে না। তাই তাহার জীবন-দর্শন এমন সেন্টিমেণ্ট-প্রধান ও একদেশদর্শী হইয়া পড়িয়াছে। রাজলক্ষ্মীকে সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না, যতবার বুঝিবার অভিমান করিয়াছে ততবারই ভুল বুঝিয়াছে।

উপরের ঐ দৃশ্যগুলিতে আমরা দেখিয়াছি, সে রাজলক্ষ্মীর ঐ আচরণে প্রথমে বিস্মিত, পরে আপনারই মনোমত একটা ব্যাখ্যা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে, —রাজলক্ষ্মীকে শ্রদ্ধা করিতে পারিয়া বড় তৃপ্তিলাভ করিয়াছে। আমরা জানি, শ্রীকান্তের দুইটি হৃদয়বৃত্তি অতিশয় প্রবল; একটি—পরদুঃখকাতরতা, অপরটি—আত্মনিগ্রহ বা কৃচ্ছ্র-সাধনের যে শক্তি, সেই শক্তির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। রাজলক্ষ্মীর প্রতি তাহার এইরূপ শ্রদ্ধা হওয়ার কারণ—সে দেখিতে পাইল, রাজলক্ষ্মী প্রেমের উপরে এমন একটি ধর্ম্মকে স্থান দিয়াছে যাহা মহান্ ও পবিত্র; এবং তাহাতে সে একটা আত্মনিগ্রহই করিতেছে, সেই প্রবল প্রেমকে রুদ্ধ করিয়া সে যেন একটি কৃচ্ছ্র-সাধনের তপস্যায় রত হইয়াছে। সেইসঙ্গে সে নিজেও একটু সেন্টিমেণ্ট-সুখ ভোগ করিয়া লইতেছে; রাজলক্ষ্মীর স্নেহ ও সেবার প্রতি তাহার যে একটা লোভ জন্মিতেছিল, সে এক্ষণে রাজলক্ষ্মীর হিতার্থেই তাহা ত্যাগ করিবে; ইহাও কি একটা ত্যাগ নয়? এই ত্যাগের বেদনাও কত মধুর!

আর রাজলক্ষ্মী? যে ভ্রান্তি ঘুচিয়াও ঘোচে না তাহার সেই ভ্রান্তি এবার যেন সত্যই ঘুচিয়াছে। যে কারণে সে শ্রীকান্তের চিন্তাকে মন হইতে একরূপ নির্ব্বাসিত করিয়াছিল, এবং চিরবিচ্ছেদকেই তাহার প্রেমের সাধন-মন্ত্ররূপে বরণ করিয়াছিল, সে যে কত সত্য, আর একবার তাহারই নিষ্ঠুরতর প্রমাণ সে প্রত্যক্ষ করিল। সেই তাঁবু হইতে ফিরিবার পথে, গোরুর গাড়ীতে, সে সম্ভবতঃ তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল; সে দৃশ্য আমি যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতেই রাজলক্ষ্মীর বজ্রদীর্ণ হৃদয়ের বিদ্যুৎবেদনা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। তৎসত্ত্বেও এই নূতনতর সংঘটনায় সে হয়তো আর একবার শ্রীকান্তকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল; তাহাতেও সেই এক সত্য, নির্ম্মম নিয়তির মতই, তাহাকে নিরাশ ও সাবধান করিয়া দিয়াছে। রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছে,—প্রেম তাহার নাই, কোন নারীর প্রেমই তাহার কাম্য নহে। বরং ঐরূপ প্রেমের আকুলতা ও সনির্ব্বন্ধতা তাহার পুরুষ-ধর্ম্মকে দুর্ব্বল করিতে পারে, তাহাকে আত্মভ্রষ্ট করিতে পারে,—তাহাতে উভয়েরই সমূহ ক্ষতি। তাই সে শ্রীকান্তের সেই রোগ-দুর্ব্বল অবস্থায় তাহাকে বেশিদিন নিকটে থাকিতে দিবে না।

সে যে কত বড় মর্ম্মান্তিক নৈরাশ্যে, কত বড় মমতাকে নিষ্পেষিত করিয়া, শ্রীকান্তকে এমন করিয়া সরাইয়া দিতেছে—শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল না; সে তাহার মধ্যে মাতৃধর্ম্মের একটা মহিমা দেখিয়া মনে মনে নিষ্কৃতি বোধ করিল; এবং নিজেরও—প্রেমের নয়—অন্যপ্রকার দুর্ব্বলতা জয় করার, রাজলক্ষ্মীর কল্যাণের জন্য একটা ত্যাগ স্বীকার করার গর্ব্ব অনুভব করিল। তাহার সেই বিশ্বাস যে আন্তরিক তাহাতে সন্দেহ নাই, নহিলে সে এমন ভাববিভোর হইয়া পড়িত না; আমরা যেমনই বুঝি না কেন, যাহাই ভাবি না কেন, নিজের সম্বন্ধে সে এমনই অকপট।

(৭)

দ্বিতীয় অঙ্কের জের—দুর্ভাগিনী

"কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ,
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?"
—মানসী

শ্রীকান্তের এই আলোচনায় আরও অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাকে একটু পদ-সম্বরণ করিতে হইবে — পথের নিশানা আর একবার ঠিক করিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ যাহা গোড়ায় বলিয়াছি তাহাই আর একবার দৃঢ়ভাবে বলিতে হইবে। একটি কারণ ঘটিয়াছে; কারণটা নূতন না হইলেও উপেক্ষার যোগ্য নয়। সকলেই বোধ হয় জানেন — অন্তত শুনিয়াছেন যে, শরৎচন্দ্র তাঁহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে এমন নির্ব্বাক ছিলেন যে, কেহ — এমন কি অন্তরঙ্গ আত্মীয় পর্য্যন্ত — সে বিষয়ে সকল কথা জানিতে পারেন নাই। ঐরূপ কৌতূহলকে তিনি যেমন ঘৃণা করিতেন, তেমনই তাহাতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতেন। শরৎচন্দ্র যে কতখানি আত্ম-গোপন-প্রিয় ছিলেন তার প্রমাণ তাঁহার সাহিত্যিক জীবনেও পাওয়া যায়; আর কোন বাঙালী লেখক এত অধিক বয়সে একরূপ জোর-জবরদস্তির বশে লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন নাই; যদি কেহ করিয়া থাকেন তবে তাঁহারা নিশ্চয় এতবড় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গল্প 'মন্দির', শুধুই ছদ্মনামে নয়, একজন জীবিত অপর ব্যক্তির নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'ভারতী'তে তাঁহার বেনামী গল্প 'বড়দিদি'রও লেখকের নাম অনেকেই জানিতে পারেন নাই। শরৎচন্দ্র যেন সমাজের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতেই ইচ্ছুক ছিলেন না, — যেন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে কোনদিক দিয়াই কাহাকেও প্রবেশাধিকার দিবেন না। এই শরৎচন্দ্র যখন উপন্যাসের আকারে, যতদূর সম্ভব আত্মগোপন করিয়া, 'শ্রীকান্ত' নামে আত্মকাহিনী লিখিতে আরম্ভ করিলেন, এবং গল্পের রোমান্স ভেদ করিয়া তাহার মধ্যেও একটা বাস্তব ব্যক্তি এবং সেই ব্যক্তির জীবন ও চরিত্রের সহিত লেখকের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল — তখন এই অতিশয় লঘুচিত্ত পরচর্চ্চালোলুপ বাঙালী-সমাজ যে কিরূপ কৌতূহলী হইয়া উঠিবে তাহা

তিনি জানিতেন। অতঃপর তিনি যেন বোল্‌তার চাকে খোঁচা দিয়া ভীষণ বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। বিশেষ করিয়া ঐ রাজলক্ষ্মীর পরিচয় দিতেই হইবে, নহিলে নিস্তার নাই। এই বিপদে তিনি যে কি করিয়া, কত রকমের কৈফিয়ৎ দিয়া, কত মিথ্যার আশ্রয় লইয়া, নিজ জীবনের সেই অতিনিভৃত এবং অতি-পবিত্র পূজাগৃহের দ্বার রুদ্ধ রাখিতে পারিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। জীবনের যে ব্যথা বড় গভীর,—সেই ব্যথার আত্মধিক্কার, পরাজয়ের গ্লানি, বা হারানোর হাহাকার—তাহা যদি কাহারও ঘটিয়া থাকে (যাহার হৃদয় গভীর এবং চিত্তও দৃঢ় তাহারই এমন হইয়া থাকে), তবে সেই ব্যক্তি ইহার মর্ম্ম বুঝিবে।

আমরা এ আলোচনার ভূমিকাতেই বলিয়াছি, শ্রীকান্তের এই কাহিনীতে যে আত্মপরিচয় আছে, সে কেমন পরিচয়,—কি করিয়া, কেমন যুক্তি ও প্রমাণ, এবং কোন্ দৃষ্টির দ্বারা তাহা উদ্ধার করিতে হইবে। এমনও বলিয়াছিলাম যে, ইহাতে শরৎচন্দ্রের বাহিরের পরিচয়—তিনি নিজমুখে কোথায় কি বলিয়াছেন,—এমন কি, এই উপন্যাসে তিনি যেখানে যে মনোভাব বা মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও বর্জ্জন করিয়া, কেবল উপন্যাসগত তথ্যের যেটুকু সত্য তাহাই লওয়া হইবে। এক কথায়, আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি তাহার মূলে আছে খাঁটি সাহিত্য-তত্ত্ব; মানুষটিকে বুঝিবার জন্য, রচনার পরতে পরতে আর্টিষ্টকে পৃথক করিয়া কেবল সেই মানুষটাকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছি; তাহার জন্যই সাহিত্য-কলার সূক্ষ্মতম আবরণ—যাহা ব্যক্তিকে ঢাকিয়া রাখে, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা সজাগ থাকিতে হইয়াছে, সাহিত্য-সমালোচনার মূল সূত্রগুলিও স্মরণ রাখিতে হইয়াছে। এইরূপ রচনায় লেখক আপনার গূঢ়তম অন্তরটিকে উদ্‌ঘাটন করেন, অথচ একটা আব্রু চাই। অনেক কাল্পনিক মিথ্যাও উহাতে যুক্ত করিতে হয়, তথাপি নিজেকে প্রকাশ করিতেই হইবে—না করিতে পারিলে তাহার স্বস্তি নাই, শান্তি নাই। তাই এই আত্মকাহিনী যে কেমন আত্মকাহিনী, সে কথা আমি অতি সূক্ষ্ম বিচার সহকারে এবং সবিস্তারে ভূমিকায় বলিয়াছি, তাহার পর সে সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছুই বলিবার নাই।

আর ঐ রাজলক্ষ্মীর কথা। যাঁহারা এই কাহিনী—শুধুই রসতত্ত্ব নয়—সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের সন্দেহ থাকিবে না যে, শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীতে ঐ রাজলক্ষ্মীর চরিত্র কত সত্য, কত বাস্তব। ঐ চরিত্র যদি বাস্তব না হয়, তবে সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্বই মিথ্যা। কোন

কবি, এমন কি শেক্স্‌পীয়ারও বোধ হয়, এতখানি কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন না যে, চোখে না দেখিয়া এইরূপ একটা চরিত্রসৃষ্টি করেন। শরৎচন্দ্রকে যদি জিজ্ঞাসা করা হইত, রাজলক্ষ্মী কে? ঐ চরিত্র কি একটা বাস্তব চরিত্র? —তবে তিনি তাহার কি উত্তর দিতেন, আমি কিছুপূর্ব্বে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই সকলে অনুমান করিতে পারিবেন। উপায় কি? মিথ্যা কথা ছাড়া আর কোন্ ভদ্র উপায়ে ঐরূপ কৌতূহলকে সম্মানিত বা নিরস্ত করা যায়? রাজলক্ষ্মীর চরিত্র যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক—বরং অন্যান্য চরিত্রগুলির কিছু বাস্তব-ভিত্তি আছে, এমন অসম্ভব কথাও শরৎচন্দ্রকে বলিতে হইয়াছে, না বলিলে, নিজ জীবনের সেই অন্তরতম স্থানটিকে বাহিরের কৌতূহলী চক্ষের অশুচি দৃষ্টিপাতে কলুষিত করিতে হয়।

এইবার সেই কারণটার কথা বলিব। সম্প্রতি একখানি পত্রিকায় বন্ধুবর কালিদাস রায় কবিশেখর মহাশয় শরৎচন্দ্রের সহিত তাঁহার আলাপ-আলোচনার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বন্ধুবর একজন জন্ম-কবি, অর্থাৎ 'সাহিত্যিক'-কবি নহেন; বাণীর স্বহস্তে যাহাদের অন্নপ্রাশন হইয়াছে তিনি তাহাদেরই একজন। অতএব সারল্য ও মাধুর্য্য-রসই তাঁহার প্রাণের পানীয়। এহেন ব্যক্তি যে শরৎচন্দ্রের মত—লোক-ব্যবহার ও মানবচরিত্রজ্ঞ, আত্মসচেতন ও আত্মরক্ষা-নিপুণ—কথাশিল্পীর সঙ্গে পারিয়া উঠিবেন না, তাহাই স্বাভাবিক। তিনি লিখিয়াছেন, শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনায় কিছুতেই প্রবৃত্ত করা যাইত না, প্রসঙ্গ তুলিলেই তিনি নানাবিধ গল্প বা অপর প্রসঙ্গের দ্বারা তাহা চাপা দিতেন। ইহার অন্য কারণ থাকিতে পারে; শরৎচন্দ্র হয়তো সত্যই সাহিত্যের তর্ক-বিতর্ক বা সূক্ষ্ম সমালোচনা পছন্দ করিতেন না। কিন্তু কালিদাস-বাবু যে কেমন সাহিত্যের আলোচনা করিতে চাহিতেন তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—শরৎচন্দ্র এত ভয় পাইতেন কেন। তিনি ঐ শ্রীকান্ত সম্বন্ধেই শরৎচন্দ্রকে 'সাহিত্যিক' আক্রমণ করিতেন। তথাপি, বন্ধুবর নাছোড়বান্দা; একদিন নিরালায় পাইয়া চাপিয়া ধরিলেন; তখন শরৎচন্দ্র নিরুপায় হইয়া কবুল করিলেন, শ্রীকান্তের ঐ কাহিনী এক অর্থে, এবং কতক অংশে, তাঁহার আত্ম-কাহিনীই বটে; কিন্তু আসল প্রশ্নের উত্তরে সাফ বলিয়া দিয়াছিলেন—"রাজলক্ষ্মী ও কমললতা এই দুইটি চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক"। কবি-মানুষটি অতঃপর নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছিলেন।

এখন পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিতেছেন, আমি কি বিপদে পড়িয়াছি।

এত দিন ধরিয়া কি ভুলই করিয়া চলিতেছি—আপনাদিগকেও ভুল বুঝাইতেছি! কথাটা এতদিন পরে বন্ধুবর যে কেন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন তাহাও বুঝি। তিনি নিশ্চয়ই আমার এই আলোচনা পড়িতেছেন; আমি ঐ রাজলক্ষ্মীকেই শ্রীকান্ত-কাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় বাস্তব-গ্রন্থি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। এ সম্বন্ধে বোধ হয় তাঁহার মনে সংশয় হইয়াছে—তিনি শরৎচন্দ্রের নিজমুখে ঐ স্বীকারোক্তি শুনিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যই তিনি করিয়াছেন। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য অন্যরূপ, তাই পুনরায় এই কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, পাঠক-পাঠিকাগণ আমার কথাটা বুঝিতে পারিয়াছেন; যদি সংশয় থাকে, তবে নিম্নে শরৎচন্দ্রের যে উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতেই তাঁহারা নিঃসংশয় হইতে পারিবেন যে, আমি শরৎচন্দ্রের মনোভাব সম্বন্ধে কিছুমাত্র ভুল করি নাই। সৌভাগ্যক্রমে ঐ একই পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের যে একখানি চিঠি মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেই এই উক্তিটি আছে। শরৎচন্দ্র লিখিতেছেন—

"জগতে মানুষের এমন কথাও থাকিতে পারে যাহা কাহারও কাছে ব্যক্ত করা যায় না। গেলেও তাহাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের মাত্রাই বাড়ে। অথচ নীরবতার শাস্তি অতি কঠিন।...

"এই উপদেশটা কখনো বিস্মৃত হইও না যে, পৃথিবীতে কৌতূহল বস্তুটার মূল্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক দিয়া যতই বড় হোক, তাহাকে দমন করার মত পুণ্যও সংসারে অল্প নয়।...

"যে বেদনার প্রতিকার নাই, নালিশ করিতে গেলে যাহার নীচেকার পঙ্ক জেরায় জেরায় একেবারে উপর পর্য্যন্ত ঘুলাইয়া উঠিতে পারে, সে যদি থিতাইয়া থাকে ত' থাক না। কি সেখানে আছে, নাই বা জানা গেল—কি তাহাতে ক্ষতি?"

[পশ্চিমবঙ্গ-পত্রিকা—শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৫]

—কি মর্ম্মান্তিক ঐ শেষের কথাগুলি! আমার অনুমান যে এত সত্য তাহা জানিতাম না; এই কারণেই আমি 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' লিখিতে একরূপ বাধ্য হইয়াছি, উহার আদি ও শেষ মর্ম্ম বুঝিবার এমন চেষ্টা করিতেছি। না, আমরা শরৎচন্দ্রকে জেরা করিব না, সে রকম কৌতূহলও আমাদের নাই। তিনি নিজেই যে গভীর মর্ম্মকথা গূঢ় অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহারই অর্থ বুঝিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র; যদি না বুঝি, তবে তাঁহার অভিপ্রায়ও যে ব্যর্থ হইবে। রাজলক্ষ্মী ও কমললতা যে কত সত্য, কত বাস্তব, তাহা অস্বীকার করিবার জন্য তাঁহাকে আর মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইবে না; বাঁচিয়া থাকিলে আমরা সে প্রশ্ন তাঁহাকে করিতাম না, আজিও করিব না। আমরা জানি, তাহারা অতিশয় সত্য বলিয়াই, এবং 'সে বেদনার প্রতিকার নাই' বলিয়াই, সারাজীবন তাহাকে অস্বীকার করিবার কি প্রাণান্ত চেষ্টাই না তাঁহাকে করিতে হইয়াছে!

এইবার পূর্ব্বকথার অনুসরণ করি।

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বিদায় করিয়া দিল। শ্রীকান্তও তাহাকে যাহা বলিল, এবং পাঠককেও যাহা বুঝাইল তাহা আমরা দেখিয়াছি। ইহার পর নাটকটা কিছুক্ষণ স্থগিত থাকিবে, কারণ অতঃপর কিছুদূর পর্য্যন্ত যাহা চলিয়াছে, তাহা বাহিরের ঘটনা নয়—অন্তরের স্বগত কথোপকথনের মধ্যেও তাহা দৃশ্য-রূপ ধারণ করে না; তাহা শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর ব্যক্তিগত পৃথক ব্যবহার। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে আপনার সংস্কার ও বিশ্বাস অনুযায়ী বুঝিতেছে—সকলেই তাহা করে; একমাত্র প্রেমই পর-চিত্তের অন্ধকার ভেদ করিতে পারে। আমি আর একবার শ্রীকান্তের চিন্তাধারার একটু পরিচয় দিব। তাহাতে দেখা যাইবে, শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সেই একেবারে অন্তর-গহনের কথাটি ছাড়া অর্থাৎ তাহার নারীহৃদয়ের সেই দুর্জ্জেয় দুর্ব্বোধ্য পিপাসাটি ছাড়া, তাহার সম্বন্ধে আর যাহা বুঝিয়াছে, তাহাতে মোটামুটি একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লওয়া যায়, নিজের মনটাও তৃপ্ত হয়,—যদিও নিয়তিকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। শ্রীকান্তের এই উক্তিগুলি বেশ চিন্তা ও যুক্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইলেও, পাঠক-পাঠিকাগণ তাহা দ্বারা ভ্রান্ত হইবেন না; উহাতে রাজলক্ষ্মীর কথা ততটা নাই, যতটা আছে—নারী-চরিত্র সম্বন্ধে শ্রীকান্তের নিজের মনোমত বিচার। শ্রীকান্তের সঙ্কটও তেমন গুরুতর নয়, সে যে মুক্ত-পুরুষ!

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সত্যই বিপদ হইয়াছে। তাহার পূর্ব্বসাধনার আসন বিচলিত হইয়াছে। যে প্রেমকে সে অন্তরে পোষণ করিয়াও পোষ মানাইয়াছিল, এবং সর্ব্বকামনা-মুক্ত হইয়া, সংসার ও নারীজীবনের ঊর্দ্ধে তুলিয়া তাহাকেই একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় করিয়া লইয়াছিল—সেই প্রেম, সেই সুপ্ত হৃদয়ব্যাধি যোগভ্রষ্টের রুদ্ধ-কামনার মত, দ্বিগুণবেগে তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে, এখনও সে বুঝিতে পারিতেছে না—উহা সেই কামনাই। বাল্য ও কৈশোরে তাহার যে মূর্ত্তি দেখিয়াছিল, এখন এই পরিণত যৌবনে সেই প্রেমের মূর্ত্তি বহুগুণ ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে; এত দিন যে অনুভূতিগুলা যেন জন্মিতেই পারে নাই, এক্ষণে তাহাই সহসা আবির্ভূত হইতেছে, তাই সে নিজেরও দিগ্‌দর্শন হারাইয়াছে; যত বড় সংযমী সে হউক, ব্রত-উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের গুণে তাহার চিত্তের দীপশিখা যতই স্তিমিত ও স্থিররশ্মি হউক, এই আকস্মিক সমীরোচ্ছ্বাসে সেই দীপ যেমন চঞ্চল তেমনই দীপ্ততর হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকান্তের মত পুরুষের পক্ষে—নারীর এই পিপাসা কিছুতেই বোধগম্য হইবে না। আমরা পুরুষেরা

সংযম, কৃচ্ছ্র-সাধন প্রভৃতি নিবৃত্তিমার্গের মহিমা যত সহজে বুঝি, নারীর ঐ প্রবৃত্তিকে তেমন বুঝি না; তার কারণ, উহা আমাদের বিবেক-বুদ্ধির নিকটে কাম বা ভোগাকাঙ্ক্ষা মাত্র। পুরুষের কাম যে তাহাই; এইজন্য বৈরাগ্যই তাহার অভয়। এইজন্যই একদিকে সে যেমন দুর্দ্দান্ত ভোগী, অপর দিকে তেমনই দুর্দ্দান্ত ত্যাগী। কিন্তু নারী-প্রকৃতিই স্বতন্ত্র; তাহার ঐ কাম—গভীর, প্রবল ও বিশুদ্ধ হইলে, অর্থাৎ নারীপ্রকৃতির পূর্ণবিকাশ হইলে—ঠিক ভোগও নয়, আবার ত্যাগও নয়, সে যে কি তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য, কারণ তাহা যে আমাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাই আমাদের বিচার যতই যুক্তি-শাসিত ও সত্যাশ্রয়ী হউক না কেন, তাহা আমাদেরই। রাজলক্ষ্মীর ঐ হৃদয়-রহস্য আমরাও বুদ্ধির দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছি, তাহাও পুরুষের বুদ্ধি; অতএব আমাদের অনেক কথাই অসম্বদ্ধ, এমন কি স্ববিরোধীও হইতে পারে; এজন্য আমার এই আলোচনা হইতে একরূপ যোগেযাগে তাহা বুঝিয়া লওয়াই সম্ভব।

রাজলক্ষ্মীর ঐ প্রেমকে ব্যাধি, আত্মঘাতী passion, বা প্রাণের অন্ধ আবেগ—ট্র্যাজিক, fateful (সেই 'Fate is the name of her, and his name is Death')—প্রভৃতি, কত নামই আমরা দিব। নারীর যৌন-প্রকৃতিকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'masochistic' বা পীড়নসুখপিপাসু বলা হইয়াছে; এ সকলই পুরুষের কথা। রাজলক্ষ্মীর ঐ ব্যবহার যেন তাহাই প্রমাণ করিতেছে—উহা যেন দুঃখভোগেরই পিপাসা। এ সকল কথার আলোচনা পূর্ব্বে অল্প-বিস্তর করিয়াছি, কিন্তু সেই সকলের মধ্যে, বার বার একটি কথার উল্লেখও করিয়াছি, তাহা এই যে, নারীর ঐ প্রেমকে আমরা যতই কাম বা ভোগপ্রবৃত্তির সহিত যুক্ত করি না কেন, ঐ ভোগই নারীর ত্যাগ-তপস্যা, উহাতেই তাহার আত্মার মুক্তি-সুখ আছে। উহা বৈরাগ্য বা নিবৃত্তিমার্গ নয়, ঐ পিপাসা উন্মূলিত করিবার প্রয়োজনও তাহার নাই। যেখানে সেই প্রয়োজন হয়, সেখানে নারীর নারীধর্ম্মচ্যুতি ঘটে; পুরুষের নিকটে পুরুষের ধর্ম্মমন্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া তাহার সেই নারী-আত্মার দীপশিখাটি নির্ব্বাণ লাভ করে। রাজলক্ষ্মীর সেই দীপ বাধ্য হইয়া নির্ব্বাণ কামনা করিলেও, তাহার বর্ত্তিকার স্নেহরস কিছু বেশী—সেই শিখাকে বাতাস যতই ঝাপটে ঝাপটে বর্ত্তিকাচ্যুত করিতে চাহিতেছে, ততই তাহার দীপ্তি ও দাহ বাড়িয়া উঠিতেছে; আধার না ভাঙিলে এ দীপ নিবিবে না, আধারই ভাঙিবে। রাজলক্ষ্মী ভাবিয়াছিল, সে তাহার সেই দীপটিকে নিভৃত স্থানে নিবাত-নিষ্কম্প করিয়া রাখিবে; শ্রীকান্তের সহিত পুনঃপরিচয়ে সে যে

ভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি—সেই সংযম অমানুষিক বলিলেও হয়; কিন্তু তখন সে বুঝিতে পারে নাই, এইবার তাহার নিয়তি তাহাকে খুঁজিয়া লইয়াছে—তাহার আর নিস্তার নাই।

শ্রীকান্তকে বিদায় করিয়া সে প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল; ভিতরে যে ফাট্ ধরিয়াছে—তাহার ঐ অস্বাভাবিক কঠোরতাই তাহার প্রমাণ। সে শ্রীকান্তকে চায়, পাইবে না তাহাও জানে; সে জানাও নিঃসংশয়ে জানা, শ্রীকান্তকে সে চেনে। এইবার আমরা, তাহার সেই নৈরাশ্য সত্ত্বেও—শ্রীকান্তের মতি-গতি ও চরিত্র জানিয়াও—তাহার প্রেমের না হউক, আত্মীয়তার একটুকু স্পর্শলাভের কাঙালপনা দেখিব; আরও দেখিব, দুইজনে দুইজনকে কেমন চিনিয়াছে।

প্রথমে শ্রীকান্তের কথাই বলি। এই প্রেমজয়ী আত্মাভিমানী পুরুষ রাজলক্ষ্মীকে তাহার হৃদয়ে আসন দিবে না, তাহাকে আত্মানুরূপ মর্য্যাদা দেওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য; অথচ তাহার স্নেহ-সেবা, তাহার সেই মমতার উপরে সে মনে-মনে—খুব সজ্ঞানে নয়—একটা দাবী অনুভব করিতেছে; স্বীকার না করিলেও তাহার আচার-আচরণে এই দুর্ব্বলতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইখানে তাহার অধঃপতন সুরু হইয়াছে। পুরুষ যতবড় শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী হউক, তাহার চরিত্রে একটা রন্ধ্র থাকিবেই। শ্রীকান্তের তাহা ছিল, কোথায় ছিল তাহা সে জানিত না; রাজলক্ষ্মী বোধহয় সেই সন্দেহ করিয়াছিল—তাহাই আশঙ্কা করিয়া সে শ্রীকান্তকে একরূপ তাড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু রাজলক্ষ্মী ক্রমেই মমতার বশীভূত হইয়া পড়িল—নারীহৃদয়ের সেই দুর্ব্বলতা সে মোচন করিবে কেমন করিয়া? শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে গ্রহণ করিবে না, কিন্তু তাহার ঐ দুর্ব্বলতার পূর্ণ সুযোগ লইতেও ছাড়িবে না। অধঃপতন আর কাহাকে বলে? আবার শ্রীকান্ত-চরিত্রে এই দুর্ব্বলতার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে। এইরূপ egotism—বালক-প্রকৃতির লক্ষণ; যে-বালক মায়ের উপরে নানা উপদ্রব অত্যাচার করে, সেও মায়ের দুর্ব্বলতা বুঝিতে পারিয়া অতিশয় অন্যায় অসঙ্গত দাবী করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না। সেখানেও স্নেহ বা প্রেম একতরফা। শ্রীকান্তের মধ্যেও একটা বালক আছে, তাই এইরূপ আচরণ অস্বাভাবিক নহে। হয়তো, এই কারণেই রাজলক্ষ্মীর স্নেহ আরও গভীর ও দুর্দ্দমনীয় হইয়া ওঠে। ঐ যে বালক-সুলভ স্বার্থপরতা উহার একটা মাধুর্য্য আছে—শ্রীকান্তের মত বয়স্ক বালক—অথচ নির্লোভ, অনাসক্ত দৃঢ়চেতা পুরুষের এইরূপ আচরণে যে মাধুর্য্য আছে তাহা নারীই বুঝে, পুরুষ বুঝে না; পুরুষের নিজের চক্ষে এইরূপ দাবী বা

আবদার অতিশয় ঘৃণার্হ। এই প্রসঙ্গে আমি পূর্ব্বে যে একটি কথা বলিয়াছি তাহাও স্মরণ করিতে বলি—মধুর রসে আর সব রসই বিদ্যমান থাকে, বাৎসল্যও। কিন্তু শ্রীকান্তের পক্ষে ইহা দুর্ব্বলতা—বিশেষতঃ ঐ অবস্থায়। রাজলক্ষ্মী সেই যে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া, তাহার গৃহের সম্পদরাশির মধ্যে ঐ ভবঘুরে লক্ষ্মীহীন মানুষটাকে দেবতার মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাহার পূজা করিয়াছিল—তাহাই নিস্পৃহ শ্রীকান্তের চিত্তেও এমন একটা বাসনার উদ্রেক করিয়াছে, যাহা পূর্ব্বে সে কখনো অনুভব করে নাই। উহা ঠিক বন্ধনের মত না হইলেও—যাহা চাহে নাই, তাহা পাইয়া-হারানোর মত একটা বেদনা শ্রীকান্তকে উন্মনা করিয়াছে। পুরুষের ভাষায় আমরা বলিব, নারীর মোহিনীর কি অন্ত আছে? প্রকৃতিকে জয় করা পুরুষের পক্ষে কি সহজ? কপিলের মতে, পুরুষ যদি অসঙ্গ-জ্ঞান দৃঢ় করিতে পারে তবে প্রকৃতি আর তাহাকে মজাইতে পারিবে না—'ভৃষ্টবীজবৎ' তাহাতে আর অঙ্কুরোদ্গম হইবে না। তাহার উত্তরে আমাদের একালের এক রসিক মনীষী বলিয়াছেন "হায় কপিল! তুমি 'ভৃষ্টবীজ' অর্থাৎ ভাজাছোলার দৃষ্টান্ত দিয়াছ, কিন্তু, তুমি কি বর্ষাকালে ভাজাছোলা কখনো খাও নাই?—অবস্থাবিশেষে, প্রকৃতি ঐ ভাজাছোলার রূপেই পুরুষকে মজাইবে।" শ্রীকান্ত যত বড় পুরুষই হোক—সে তো সিদ্ধপুরুষ নয়। কিন্তু রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে এই যে একটা নূতন বন্ধনে বাঁধিয়াছে, ইহা রাজলক্ষ্মীর পক্ষেই কাল হইয়া উঠিল। শ্রীকান্ত যদি ইহার পর, যখনই যে কোন বিপদে বা নিরুপায় অবস্থায় পড়ে, তখনই রাজলক্ষ্মীর শরণাপন্ন না হইত, তবে অন্ততঃ রাজলক্ষ্মী বাঁচিত। এই অসহায়, সর্ব্বস্নেহবঞ্চিত, আত্ম-নির্ম্মম মানুষটির প্রতি নূতন করিয়া তাহার এই যে আকর্ষণ জন্মিয়াছে, সেই আকর্ষণও যে কত নিষ্ফল তাহা সে জানে; তবু যে নারীহৃদয়ের কথা বলিয়াছি তাহা যে বুঝিয়াও বুঝে না। অথচ তাহার মত বুদ্ধিই বা কাহার? যে-বুদ্ধি পুরুষকে শিশুর মতই নির্ব্বোধ বলিয়া বুঝে, অথচ তাহার দাম্ভিকতায় ও পুরুষ-সুলভ প্রভুত্ব-প্রতিষ্ঠায় যেমন মুগ্ধ হয়, তেমনই ভয় পায়,—যে-বুদ্ধি পুরুষের সেই দুরন্তপনা, বীরত্বের আস্ফালন ও পরাজয়ের হাহাকার সমান স্নেহে ও সহিষ্ণুতায় সহ্য করে, সেই বুদ্ধিও এখানে এমন নিরাশার আশায় প্রতারিত হইতেছে; তাই শ্রীকান্তকেও সে যেন একটু না খেলাইয়া পারিতেছে না। 'খেলাইতেছে' বলিলাম কেন, পরে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে; তাহাতে আশ্চর্য্য হইবারই বা কি আছে? নারী যখন প্রাণ দিবার জন্য আপনিই বধ-মঞ্চে আরোহণ করে, তখনও সে তাহার স্বভাব ত্যাগ করিতে পারে না,

একটু খেলা সে খেলিবেই। একথাও পুরুষের কথা—নারী-চরিত্র আমরা এমনই বুঝি!

এইবার আমি গ্রন্থ হইতে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিব,—উপরের ঐ কথাগুলির পর আশা করি, তাহাদের অর্থ খুব সরল ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

পাটনা হইতে সেই বিদায়ের পর শ্রীকান্তের পৌছানো-সংবাদের উত্তরে রাজলক্ষ্মী একখানি অতি সাধারণ সংক্ষিপ্ত পত্র লিখিয়াছে, লিখিয়াছে—

"আমি যেন মাঝে মাঝে নিজের সংবাদ দিই এবং তাহাকে আপনার লোক মনে করি। তথাস্তু। এতদিন পরে রাজলক্ষ্মীর এই চিঠি! আকাশকুসুম আকাশেই শুকাইয়া গেল।"

[দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ২]

'আকাশকুসুম'—অর্থাৎ, রাজলক্ষ্মীর সেই প্রেম, শ্রীকান্তের সেই আশ্রয়-শাখাটি—যাহা না চাহিতে পাওয়া গিয়াছিল, কোন মূল্যই দিতে হয় নাই।

ইহার পর, একটা বিপদে উদ্ধার পাইবার জন্য—একরূপ পরেরই বিপদ—এবং বর্ম্মায় চাকরীর সন্ধানে দেশান্তরী হইবার পূর্ব্বে শেষ বিদায় লইবার অছিলায়, আবার পাটনায় বাইজীর গৃহে শ্রীকান্তের আবির্ভাব। এখনও দ্বিতীয় অঙ্কের জের চলিতেছে—তাহারই শেষ দুই দৃশ্য। বর্ম্মা-যাত্রার কথায় রাজলক্ষ্মী আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, ভাঙিয়া পড়িল—পড়িবেই যে! বাহিরের সেই কঠোরতাও টিকিল না, পিয়ারী বলিল, "বর্ম্মায় গেলে মানুষ আর ফেরে না—সে খবর জানো?"

তারপর—

"পিয়ারী আমার পায়ের উপর একেবারে ভাঙিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। আমি ইচ্ছা করিয়াই পা টানিয়া লইলাম না। কিন্তু মিনিট দশেক কাটিয়া গেলেও যখন সে মুখ তুলিল না, তখন তাহার মাথার উপর আমার ডান হাতখানা রাখিতেই, সে একবার শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু, তেমনি পড়িয়া রহিল। মুখও তুলিল না, কথাও কহিল না।

"হঠাৎ সে চোখ মুছিয়া, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, পুরুষমানুষ যত মন্দই হয়ে যাক, ভাল হ'তে চাইলে তাকে ত কেউ মানা করে না; কিন্তু আমাদের বেলাই সব পথ বন্ধ কেন? কেন আমাদের তোমরা ভাল হতে দেবে না?

আমি বলিলাম, আমরা কোনদিন মানা করিনে। আর করলেও সংসারে ভাল হবার পথ কেউ কারো আটুকে রাখতে পারে না।

পিয়ারী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল, বেশ! তা হ'লে তুমিও আট্‌কাতে পারবে না।"

[দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৫-১৬]

'তা হ'লে তুমিও আটকাতে পারবে না'—অর্থাৎ, আমাকে দোষ দিতে পারিবে না। পুরুষের হইলে সমাজ যাহা ক্ষমা করে, নারীর হইলে তাহা করে

না, অথচ সে কলুষ নারীর পক্ষেও দুরপনেয় নয়, বরং তাহার প্রায়শ্চিত্ত সে আরও কঠোর ভাবেই করিতে পারে। আচ্ছা, প্রেমও যদি সেই কারণে তাহাকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে—যে-ক্ষমা সমাজ করে না প্রেমও যদি তাহা না করে, তখন অগত্যা তাহাকে আত্মশুদ্ধির কৃচ্ছ্র সাধনই করিতে হইবে—আর কোন ভাবনা তাহার থাকিবে না, বাধ্য হইয়াই তাহাকে প্রেমের দায়িত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। সে এখন কেবল আত্ম-পরিত্রাণের উপায় সন্ধান করিবে।

এইখানে এইকথায় আমরা রাজলক্ষীর নিজ-হৃদয়ের সহিত কঠিন সংগ্রামের সূচনা লক্ষ্য করি। তাহার কামনাও যেমন গভীর হইয়া উঠিয়াছে, দমন করিবার প্রয়োজনও তেমনই গুরুতর হইয়াছে। এতদিনে ট্র্যাজেডির বীজ অঙ্কুরিত হইল।

এইবার আর একটি বিদায় দৃশ্য,—পিয়ারীর পাটনার বাড়ীতে শ্রীকান্তের বর্ম্মা-যাত্রার পূর্ব্বে দীর্ঘবিদায়—হয়তো বা চিরবিদায়গ্রহণ। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি; এই নাটকের সকল প্রধান দৃশ্যই বিদায়-দৃশ্য—যেন জীবন ভরিয়া একই বিদায় চলিয়াছে; মিলন নয়, বিচ্ছেদই ইহার মূল কথা—তত্ত্বও তাহাই; মিলনের মধ্যেও বিরহ নিরবচ্ছিন্ন হইয়া আছে। পুরুষের জন্য প্রকৃতি কাঁদে, পুরুষ ফিরিয়া চাহিবে না; অথচ নিঃসঙ্গ-জীবনের হাহাকার তাহার প্রাণকেও ভরিয়া রহিয়াছে। তথাপি মিলনের সুধা তাহার পক্ষে গরল! এ যেন কোন্ দেবতারই অভিশাপ—সেই অভিশাপ সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া বহন করিবে—দেবতার নিকটে পরাজয় স্বীকার করিবে না।

"রাজলক্ষ্মী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা সে না হয় নাই পারব; তুমি বর্ম্মায় যাবে, আমাকে সঙ্গে নেবে?

তাহার প্রস্তাব শুনিয়া হাসিলাম। কহিলাম, আমার সঙ্গে যেতে তোমার সাহস হবে? আমি যাই করি, কিন্তু তোমার এই সমস্ত বাড়ী-ঘর, জিনিষ-পত্র, বিষয়-আশয়—তার কি হবে?

পিয়ারী কহিল, যা ইচ্ছে তা হোক। তোমাকে চাকরি করবার জন্যে যখন এত দূরে যেতে হল, এত থাকতেও কোন কাজেই কিছু এল না, তখন বকুকে দিয়ে যাব।

সে পুনরায় কহিল, অত দূরে না গেলেই কি নয়? এ সব তোমার কি কোনদিন কোন কাজেই লাগতে পারে না?

বলিলাম, না কোন দিন নয়।

পিয়ারী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমি জানি। কিন্তু নেবে আমাকে সঙ্গে? বলিয়া আমার পায়ের উপর ধীরে ধীরে আবার তাহার হাতখানা রাখিল। আমার বুক কাটিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলাম না। বলিলাম, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারিনে বটে, কিন্তু যখনি ডাকবে তখনি আসব। যেখানেই থাকি, চিরদিন আমি তোমারই থাকব, রাজলক্ষ্মি!

এই পাপিষ্ঠার হয়ে তুমি চিরদিন থাকবে?

হাঁ, চিরদিন থাক্‌ব।

তা হ'লে ত তোমার কোনদিন বিয়েও হবে না বল?

চোখ মুছিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, এই হতভাগিনীর জন্যে তুমি সমস্ত জীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে?

বলিলাম, তা আমি থাক্‌ব। তোমার কাছে যে জিনিষ আমি পেয়েছি, তার বদলে সন্ন্যাসী হয়ে থাকাটা আমার লোকসান নয়;—যেখানেই থাকি না কেন, আমার এই কথাটা তুমি কোনদিন অবিশ্বাস কোরো না।

পলকের জন্য দুজনের চোখোচোখি হইল, এবং পরক্ষণেই সে বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। শুধু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে তাহার সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া, ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।...

রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, দেখ, আমি অবোধ নই, আমার পাপের গুরুদণ্ড আমাকে ভুগতে হবে, জানি; কিন্তু, তবু বল্‌চি, আমাদের সমাজ বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্দ্দয়! এর শাস্তি একদিন পেতে হবে! ভগবান এর সাজা দেবেনই দেবেন!" [ঐ, পৃঃ ২০-২৩]

আর একটি—সেই বিদায়ের শেষ দৃশ্য—

"ওগো, শুনচ? মুখ তুলিয়া দেখিলাম, সে তাহার ওষ্ঠাধরের কাঁপুনিটা প্রাণপণে দমন করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে। উভয়ের দৃষ্টি এক হইবামাত্রই তাহার চোখের জল আবার ঝরঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল, অস্ফুট অবরুদ্ধ স্বরে চুপিচুপি বলিল, নাই গেলে অত দূরে? থাক্ গে, যেও না!"

নিঃশব্দে চোখ ফিরাইয়া লইলাম। গাড়োয়ান গাড়ী ছাড়িয়া দিল!"

[ঐ, পৃঃ ২৩]

ইহা হইতে আমরা কি বুঝিলাম? প্রথমতঃ, রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্ত যে মধুর স্নেহময় বাক্য বলিয়াছে—তাহাকেই একমাত্র হিতৈষিণী পরমাত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ইহাতেই রাজলক্ষ্মী যেন গলিয়া গিয়াছে। শ্রীকান্তের ঐ ভাব যে প্রেম নয়—অনুকম্পা ও কৃতজ্ঞতার একটা উদার হৃদয়াবেগ মাত্র, রাজলক্ষ্মী তাহা বোঝে; তথাপি সে তাহাতেই কৃত-কৃতার্থ হইয়াছে। শ্রীকান্ত যে কার্য্যতঃ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল, তজ্জন্য সে শ্রীকান্তকে দায়ী করিল না—করিল সমাজকে। যাহা সে অন্তরের অন্তরে জানে, পরে যাহা সে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়াও দিয়াছে, এখন সে তাহা ভুলিবার চেষ্টা করিল। এই মোহ সে বার বার স্বীকার করিয়াছে। তাহার নিজের প্রেমই তো তাহাকে সেই জ্ঞানের অধিকারী করিয়াছে—সে তো জানিয়াছে যে, প্রেম যদি সত্য হয়, যদি তাহাই একমাত্র সাধন হয়, তবে সেই সত্য সমাজ-সত্যের উপরে; সেই প্রেমই সমাজের শাসন লঙ্ঘন করিতে পারে, ও করে; তাহাতে সমাজেরও ক্ষতি হয় না; সে আগুনে সকল অশুচিতা পুড়িয়া শুচি হইয়া যায়। রাজলক্ষ্মীর মুখে সমাজের বিরুদ্ধে এখানে এই যে অভিযোগ ও অভিশাপ—ইহার কারণ—হয় রাজলক্ষ্মীর সেই প্রেম-দৃষ্টির

সাময়িক আবিলতা, নয় লেখক শ্রীকান্তের নিজেরই মনোভাব ঐখানে রাজলক্ষ্মীর জবানীতে প্রকাশ পাইয়াছে। এমন অনেক এই গ্রন্থে আছে—রাজলক্ষ্মীর মুখেও এমন উক্তি দেওয়া হইয়াছে যাহা পুরুষ-বুদ্ধির পরিচায়ক—নারীস্বভাব-বিরুদ্ধ; অন্ততঃ রাজলক্ষ্মীর মধ্যে নারীপ্রকৃতির যে পূর্ণ ও অনবদ্য বিকাশ দেখা যায়—ঐরূপ মনোভাব তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এ সম্বন্ধে পরে আরও দৃষ্টান্ত ও মন্তব্যের অবকাশ পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় অঙ্ক—দণ্ডিতা

ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে ছুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব।
—সোনার তরী

তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—স্থান কলিকাতায় ; মাঝের সময়টা শ্রীকান্তের বর্ম্মা-প্রবাসের কাল। সেখানে যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিশেষ সম্বন্ধ নাই। তাই দ্বিতীয় অঙ্কের সহিত এই তৃতীয় অঙ্কের কালগত ব্যবধান থাকিলেও ভাবগত ব্যবধান নাই ; বরং সেই একই ধারা খরতর হইয়া উঠিয়াছে। বর্ম্মায় শ্রীকান্তের কঠিন পীড়া হইয়াছিল, আরোগ্যলাভের পরেই রাজলক্ষ্মীর অনুনয়ে, একবার দেশে কিছুদিনের জন্য বায়ুপরিবর্ত্তনে আসিয়াছে। রাজলক্ষ্মী তাহাকে দেখিয়া, যেমন আবশ্যক—সেইরূপ ব্যবস্থা করিবে বলিয়া, কলিকাতায় আসিয়াছে।

দৃশ্যটা কলিকাতার বাসায়। পথক্লান্ত ও সদ্য-রোগমুক্ত দুর্ব্বল শ্রীকান্তের সহিত রাজলক্ষ্মীর পুনর্ম্মিলন-দৃশ্য—তাহা এইরূপ।—

"স্নানাহার সারিয়া ক্লান্তিবশতঃ দুপুরবেলায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিতে দেখিলাম, পশ্চিমের জানালা দিয়া অপরাহ্ণ-রৌদ্র আমার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে এবং পিয়ারী এক হাতে ভর দিয়া আমার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া আমার কপালের, কাঁধের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া লইতেছে। রতন ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা, বাবুর চা' নিয়ে আসব?

হাঁ, নিয়ে আয়। আর বঙ্কু বাড়ী থাকে ত একবার পাঠিয়ে দিস্।

দেখিলাম, এ একটা মস্ত নূতন ব্যাপার। অসুখের কথা আলাদা, কিন্তু সে-ছাড়া, সে ইতিপূর্ব্বে কোনদিন আমার বিছানার এত কাছে বসিয়া আমাকে বাতাস পর্য্যন্ত করে নাই ; কিন্তু তা না হয় একদিন সম্ভব বলিয়া ভাবিতে পারি, কিন্তু এই যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিল না, চাকর বাকর, এমন কি বঙ্কুর সমুখে অবধি দর্পভরে আমাকে প্রকাশ করিয়া দিল, ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করিয়া তুলিল। আমার সে দিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন এই বঙ্কুই পাছে কিছু মনে করে বলিয়া পাটনার বাটী হইতে আমাকে বিদায় লইতে হইয়াছিল। তাহার সহিত আজিকার আচরণের কতই না প্রভেদ!" [দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৩৪]

শ্রীকান্তের এই উক্তি অতিশয় অর্থপূর্ণ। রাজলক্ষ্মীর ভিতরে নিশ্চয় একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এখন সে শ্রীকান্তের সহিত তাহার সম্বন্ধটাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করে না। তাহার অর্থ এই যে, এইবার সে তাহার সেই নবজাগ্রত কামনাকেও শুচি করিয়া তুলিয়াছে; সজ্ঞান স্বার্থ বা লোভ আর তাহাতে নাই, অন্তর-সংগ্রামে সে পুনরায় জয়ী হইয়াছে, তাই তার সঙ্কোচ আর নাই। কিছু পরেই আমরা জানিতে পারিব, সে এই তপস্যার জন্য এক গুরুর আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে বর্ম্মা হইতে শ্রীকান্তের পত্রগুলিতে সে আর একটা প্রেমের ইতিহাস জানিয়াছে, তাহা হইতেই তাহার মনের সেই চিরদিনের প্রশ্নটা আবার মাথা তুলিয়াছে—রোহিণী-অভয়ার কাহিনী হইতে সে পুরুষের প্রেম সম্বন্ধে একটা নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছে; তাহার ফলে, শ্রীকান্তের বিরুদ্ধে তাহার সেই চাপা-দেওয়া অভিমান আবার উপদ্রব সুরু করিয়াছে। অতঃপর আমরা দেখিব যে, এই ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করিয়া রাজলক্ষ্মীকে এমন পথে টানিয়া লইবে যে, তাহার লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার অবধি থাকিবে না; শেষে তাহার সেই পিপাসা—রমণীর রমণীয় প্রেম—একটা বড় করুণ তীব্র-বিধুর কীর্ত্তনের সুরে গুমরিয়া গুমরিয়া নিঃশেষ হইতে চাহিবে। কিন্তু সে অনেক পরের কথা, এখানে সেই পরিণামের এই সূচনাকে লক্ষ্য করিতে বলি। যে ক্ষত শুকাইয়াছে মনে করি, অথবা যাহাকে শুকাইয়া লইবার আশা রাখি, সে যে কিছুতেই শুকাইবার নহে; শেষ পর্য্যন্ত তাহার মুখ অতিশয় অগোচরে একটুকুও খোলা থাকে, তাহাতেই বাহিরের ক্ষুদ্রতম আঘাত—গৌণতম স্পর্শও—যে-কোন সময়ে রুধিরস্রোত বহাইতে পারে। সাবধান হইবার যো নাই যে!

"রাজলক্ষ্মী এক মুহূর্ত্ত স্থির থাকিয়া কহিল, তা সে যাই হোক্, বেশি ভালবাসেন কিন্তু রোহিণী-বাবু। বাস্তবিক এত ভালবেসেছিলেন ব'লেই সংসারে এত বড় দুঃখ তিনি মাথা পেতে নিলেন। নইলে, এ তো তাঁর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল না। অথচ, সে তুলনায় কতটুকু স্বার্থত্যাগ অভয়াকে করতে হয়েচে বল দেখি?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া সত্যই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কহিলাম, বরঞ্চ আমি ত দেখি ঠিক বিপরীত। বরং সে হিসাবে যা কিছু কঠিন দুঃখ, যা কিছু ত্যাগ সে অভয়াকে করতে হয়েচে। রোহিণীবাবু যাই কেন করুন না, সমাজের চক্ষে তিনি পুরুষ মানুষ,—এ অভ্রান্ত সত্যটা ভুলে যাচ্ছো কেন?

রাজলক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া কহিল, আমি কিছুই ভুলিনি। পুরুষ বলতে তুমি যে সুযোগ এবং সুবিধের ইঙ্গিত করচ, সে ক্ষুদ্র এবং ইতর পুরুষের জন্যে, রোহিণীবাবুর মত মানুষের জন্যে নয়। সখ ফুরোলে, কিম্বা হালে পানি না পেলে, ফেলে পালাতে পারে, আবার ঘরে ফিরে মান্য-গণ্য ভদ্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে,—এই ত বলচ? পারে বটে, কিন্তু সবাই পারে? তুমি পারো? যে পারে না, তার ভারের ওজনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। তার নিশ্চিত জীবন ঘরের কোণে

নিরালায় কাটাবার জো নেই, তাকে সংসারের মাঝখানে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে নেমে আসতে হবে, অবিচার ও অপযশের বোঝা একাকী নিঃশব্দে বইতে হবে। এই দুঃখের বোঝা নামিয়ে দিয়ে ঘরে যেতে পারে, তার এই সর্ব্বনেশে বিকট প্রলোভন থেকে অহোরাত্র আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে চলার গুরুভারও তাকেই বয়ে বেড়াতে হবে। দুঃখের মানদণ্ডে এই আত্মোৎসর্গের সঙ্গে ওজন সমান রাখতে যে প্রেমের দরকার, পুরুষমানুষে আপনার ভিতর থেকে যদি বার করতে না পারে, ত' কোন মেয়ে-মনুষেরই সাধ্য নয় তা পূর্ণ করে দেয়।

কথাটা এদিক হইতে কোনদিন এমন করিয়া ভাবি নাই।" [ঐ, পৃঃ ১৪৫-৪৬]

—শ্রীকান্ত ভাবিয়া দেখে নাই। সে অভয়াকেই বড় করিয়া দেখে, রোহিণীবাবুর দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িবে কেন? বোধ হয়, এই জন্য পড়ে নাই যে, সে নিজের তুলনায় তাহাকে ছোট মনে করিয়াছিল। সে-ও তাহারই মত পুরুষ; যে-পুরুষ ঐরূপ একটা আসক্তির বশে সামাজিক কর্ত্তব্য ও আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দেয়, সে অতিশয় দুর্ব্বল বই আর কি? ঐরূপ অধঃপতন তো অনেকেরই হইয়া থাকে। রাজলক্ষ্মীর সহিত শ্রীকান্তের নিজের যে ব্যবহার, তাহার সমর্থনে শ্রীকান্ত নিজেকেও ঐরূপ বুঝাইয়াছে। ঐ কারণেই সে রোহিণীর চেয়ে বড়, অতএব রোহিণীকে সে শ্রদ্ধা করিবে কেমন করিয়া? কিন্তু রাজলক্ষ্মী সেই রোহিণীর প্রেমকেই বড় মনে করে—অভয়ার চেয়ে সে ঢের বড়; তাহার যুক্তিও অকাট্য। ইহাতে শ্রীকান্ত একটা ধাক্কা পাইল মাত্র; ইহার বেশি কিছু তাহার চরিত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। রাজলক্ষ্মীও রোহিণীর সঙ্গে তাহার তুলনা করিয়া, শ্রীকান্তকে লজ্জা দিবার ও নিজের একটা ক্ষোভ মিটাইবার সুযোগ লইয়াছে।

ইহার পর হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ। রাজলক্ষ্মী কিছুতেই ছাড়িবে না—ঐ রোহিণীর কাহিনীই যেন তাহাকে ভিতরে ভিতরে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিয়াছে। এইবার আমরা কয়েকটি দৃশ্যে রাজলক্ষ্মীর যেন একটা শেষ বোঝা-পড়ার চেষ্টাই লক্ষ্য করি; ইহাও বুঝিতে পারি, রাজলক্ষ্মী বেশ একটু ভাঙ্গিয়াছে, তাহার সেই তপস্যা ও সেই সঙ্কল্প না টলিলেও, হৃদয় আর শাসন মানিতেছে না।

শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী কলিকাতা হইতে কাশীতে লইয়া যাইতেছে—তাহার গুরুদেবকে দেখাইবার জন্য। এই দ্বিতীয় দৃশ্যটি—ট্রেনের কামরা। রাজলক্ষ্মী বলিতেছে—

"আজ ত আমার টাকার অভাব নেই, কিন্তু আমার মত দুঃখী কি কেউ আছে? পথের ভিক্ষুক যে, সেও বোধ হয় আজ আমার চেয়ে ঢের বেশী সুখী।

তাহার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিলাম, তোমার কি সত্যিই এত কষ্ট?

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, লক্ষ্মী, তোমার জন্ত আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সম্ভ্রম ত্যাগ করি কি কোরে?

রাজলক্ষ্মী কহিল, আমি কি তোমাকে তাই বল্‌চি? আর সম্ভ্রমই ত মানুষের আসল জিনিস। সেই যদি ত্যাগ করতে পারো না, তবে ত্যাগের কথা মুখে আন্‌চো কেন? তোমাকে ত আমি কিছুই ত্যাগ করতে বলিনি।

বলিলাম, বলনি বটে, কিন্তু পারি। সম্ভ্রম যাওয়ার পরে পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা। শুধু সেই সম্ভ্রম ছাড়া তোমার জন্যে আর সমস্তই আমি বিসর্জ্জন দিতে পারি।

রাজলক্ষ্মী সহসা হাতটা টানিয়া লইয়া কহিল, আমার জন্যে তোমাকে কিছুই বিসর্জ্জন দিতে হবে না। কিন্তু তুমি কি মনে কর, শুধু তোমাদেরই সম্ভ্রম আছে, আমাদের নেই? আমাদের পক্ষে সেটা ত্যাগ করা এতই সহজ? তবু তোমাদের জন্যেই কত শত সহস্র মেয়েমানুষ যে এটাকে ধূলোর মতো ফেলে দিয়েচে, সে কথা তুমি জানো না বটে, কিন্তু আমি জানি।

আমি কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই সে আমাকে থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক্, আর কথায় কাজ নেই। তোমাকে আমি এতদিন যা ভেবেছিলুম তা ভুল। তুমি, ঘুমোও—এ সম্বন্ধে আর আমিও কোনও কথা কহিব না। তুমিও কোয়ো না। বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া তাহার নিজের বেঞ্চিতে গিয়া বসিল।" [দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৭২-৭৩]

এ দৃশ্যের উপর কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ইহারই শেষ অংশ আর এক দৃশ্যে অভিনীত হইয়াছে। সেই তৃতীয় দৃশ্য—কাশীতে রাজলক্ষ্মীর বাড়ী। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হইল না, তিনি তখন কাশীতে ছিলেন না।—

"পিয়ারী বলিল, বন্ধুর বিয়ের ত এখনো কিছু দেরি আছে, চল না, আমিও প্রয়াগে একবার স্নান করে আসি!

একটু মুস্কিলে পড়িলাম।

পিয়ারী চক্ষের নিমিষে আমার মনের ভাব উপলব্ধি করিয়া বলিল, আমি সঙ্গে থাক্‌লে হয় ত কেউ দেখে ফেল্‌তেও পারে, না?

অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, বাস্তবিক, দুর্নাম জিনিষটা এম্‌নি যে, লোকে মিথ্যে দুর্নামেরও ভয় না ক'রে পারে না।

পিয়ারী জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, তা বটে। আর-বছর আরাতে ত' তোমাকে একরকম কোলে নিয়েই আমার দিন রাত কাটত। ভাগ্যি সে অবস্থাটা কেউ দেখে ফেলে নি। সেখানে বুঝি তোমার কেউ চেনা-শোনা বন্ধু-টন্ধু ছিল না?

অতিশয় লজ্জিত হইয়া বলিলাম, আমাকে খোঁটা দেওয়া বৃথা। মানুষ হিসেবে তোমার চেয়ে যে আমি অনেক ছোট, সে কথা ত অস্বীকার করিনে।

পিয়ারী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—খোঁটা! তোমাকে খোঁটা দিতে পারবো বলেই বুঝি তখন গিয়েছিলুম?

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিল, কলঙ্কই বটে। কিন্তু আমি হ'লে এ কলঙ্ক মাথায় নিয়ে লোককে বরঞ্চ ডেকে দেখাতুম, কিন্তু এমন কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারতুম না।

বলিলাম, তুমি আমার প্রাণ দিয়েচ,—কিন্তু আমি যে অত্যন্ত ছোট মানুষ, রাজলক্ষ্মী। তোমার সঙ্গে যে আমার তুলনাই হয় না।

রাজলক্ষ্মী দৃপ্তস্বরে কহিল, প্রাণ যদি দিয়ে থাকি ত সে নিজের গরজে দিয়েচি, তোমার গরজে দিই নি। সে জন্যে তোমাকে একবিন্দু কৃতজ্ঞ হতে হবে না। কিন্তু ছোট মানুষ বলে যে তোমাকে

ভাব্‌তে পারিনে। তা' হলে বাঁচতুম, গলায় দড়ি দিয়ে সব জ্বালা জুড়োতে পারতুম। বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা মাত্র না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।"

[দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১১৫-১৬]

ইহারও টীকা-ভাষ্য অনাবশ্যক। কিছু পরে রাজলক্ষ্মীই বলিতেছে—

"আমি কাল থেকেই ভাব্‌চি, এই টানা-হেঁচড়া আর না থামালেই নয়। তুমিও এক রকম স্পষ্টই জানিয়েচ, আমিও এক রকম করে তা বুঝেচি। ভুল আমারই হয়েচে, সে নিজের কাছেও আমি স্বীকার কর্‌চি। কিন্তু—

তাহাকে সহসা থামিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু কি?

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিছুই না। কি যে নির্লজ্জ বাচালের মত যেচে যেচে তোমার পিছনে পিছনে ঘুরে মরুচি—বলিয়া সে হঠাৎ মুখখানা যেন ঘৃণায় কুঞ্চিত করিয়া কহিল, ছেলেই বা কি ভাব্‌চে, চাকর-বাকরেরাই বা কি মনে করচে। ছি ছি, এ যেন একটা হাসির ব্যাপার ক'রে তুলেচি।"

[ঐ, পৃঃ ১১৭]

কিন্তু ইহার পর রাজলক্ষ্মী যাহা করিয়া বসিল, আমার মনে হয়, এ কাহিনীতে রাজলক্ষ্মীর তেমন আচরণ আর কোথাও নাই। আমি আগে সেই অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিই, পাঠক-পাঠিকাদের তাহা পড়িয়া কি মনে হয়? আরেকটি স্থান, দৃশ্য—সেই একই।—

"সন্ধ্যা হইল, ঘরে ঘরে আলো জ্বলিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী ফিরিল না।

চাদর কাঁধে ফেলিয়া একটু বেড়াইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। রাত্রি দশটার পর বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, পিয়ারী তখনও ফিরে নাই। ব্যাপার কি? একটা ভারী জুড়ীর শব্দে জানালা দিয়া চাহিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ফিটন আমাদের বাড়ীর সম্মুখেই থামিয়াছে।

পিয়ারী নামিয়া আসিল। জ্যোৎস্নার আলোকে তাহার সর্ব্বাঙ্গের জড়োয়া অলঙ্কার ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল। যে দুইজন ভদ্রলোক গাড়ীতে বসিয়াছিলেন, মৃদুকণ্ঠে বোধ করি পিয়ারীকে সম্ভাষণ করিয়া থাকিবেন,—শুনিতে পাইলাম না। তাঁহারা বাঙালী কি বিহারী তাহাও চিনিতে পারিলাম না,—চাবুক খাইয়া জুড়ী-ঘোড়া চক্ষের পলকে দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী আমার তত্ত্ব লইতে সেই সাজে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমি লাফাইয়া উঠিয়া তাহার প্রতি দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া থিয়েটারী গলায় কহিলাম, ওরে পাষণ্ড রোহিণী! তুই গোবিন্দলালকে চিনিস্ না? আহা! আজ যদি আমার একটা পিস্তল থাকিত! কিম্বা একখানা তলোয়ার!

পিয়ারী কহিল, এ সকল কথার অর্থ? বলিলাম, অর্থমনর্থং। সে যাক্। আমি এই একটার ট্রেনে বিদায় হলুম। সম্প্রতি প্রয়াগ, পরে বাঙালীর পরমতীর্থ চাকুরীস্থান—অর্থাৎ বর্ম্মা। যদি সময় এবং সুযোগ হয়, দেখা ক'রে যাবো।

আমি কোথায় গিয়েছিলুম, তাও শোনা তুমি আবশ্যক মনে করো না?

কিছু না, কিছু না।

এই ছুতো পেয়ে কি তুমি একেবারে চ'লে যাচ্চো?

বলিলাম, পাপমুখে এখনো বলতে পারিনে। এ গোলকধাঁধাঁ যদি পার হতে পারি তবেই।

পিয়ারী হঠাৎ জবাব দিল না। আমার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, কোথায় গিয়েছিলাম, কেন গিয়েছিলাম, শুনবে না?

না। আমার মত নিয়ে যাওনি যে, ফিরে এসে তার কাহিনী শোনাবে। তা' ছাড়া আমার সে সময়ও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

পিয়ারী আহত ফণিনীর ন্যায় সহসা গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, আমারও শোনাবার প্রবৃত্তি নেই। আমি কারও কেনা বাঁদী নই যে, কোথায় যাবো, না যাবো, তারও অনুমতি নিতে হবে। যাবে যাও। বলিয়া রূপ ও অলঙ্কারের একটা তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

[ঐ, পৃঃ ১৭৮-৮০]

এই দৃশ্য একটা ধাঁধার মত নয় কি? ইহার সহজ অর্থ এই যে, রাজলক্ষ্মী যেন এতদিন পরে তাহার সেই আবাল্য বিশ্বাস, তাহার সেই ধর্ম্মমন্ত্র—তাহার ইহকাল পরকালের সেই আশা—এক মুহূর্ত্তে ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলিল। শ্রীকান্তকে তাহারই চরম নোটিশ দিয়াছে। কিম্বা, হয়তো সে হঠাৎ উন্মাদ হইয়া গিয়াছে; শ্রীকান্তের বারবার প্রত্যাখ্যান—তাহার সেই হৃদয়হীন রূঢ় আচরণ সে আর সহ্য করিতে পারিল না—রক্তমাংসের দেহ তো? শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ-বৌ' গল্পটিতে ঠিক এই ধরণের একটা দৃশ্য আছে—স্বামীর আচরণে মর্ম্মান্তিক আহত হইয়া সেখানেও এক নারী ক্ষণিক মস্তিষ্কবিকারের বশে এমন একটা কাজ করিয়া বসিল, যাহাকে আত্মহত্যা—আত্মার হত্যা—বলা যায়। পরমুহূর্ত্তেই জ্ঞান হইল, তার পর সে কি প্রায়শ্চিত্ত! রাজলক্ষ্মীর ঐ আচরণ সেইরূপ হইতে পারিত—হইয়াও হয় নাই, তার কারণ, রাজলক্ষ্মী বিরাজ-বৌ—পরাধীনা কুলবধূ—নয়। প্রসঙ্গক্রমে, এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। রাজলক্ষ্মীর প্রেমে ও 'বিরাজ-বৌ'য়ের প্রেমে—অর্থাৎ তাহাদের নারী-চরিত্রে একটা গভীর মিল আছে। দুইজনেই শুধু ভালবাসে না, সেই ভালবাসার সেই প্রাণান্ত-প্রেমের একটা গর্ব্বও আছে। পুরুষ তেমন প্রেমের মূল্য দিতে পারুক আর নাই পারুক—তথাপি তাহার অসম্মান করিতে পারিবে না; উহা যে কত বড়, অন্তত সেটুকু স্বীকার তাহাকে করিতে হইবে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জীবন ততটা জটিলতাহীন নয়, তাই তাহার চরিত্র এমন অনুভূতি-গভীর—মানসিক দ্বন্দ্বে এমন আত্মসচেতন হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মী রাজলক্ষ্মীই বটে, তথাপি পিয়ারী বাইজী তাহার সেই সত্যকার পরিচয়কে পদে পদে খণ্ডিত করিয়া দিতেছে। শ্রীকান্তের সেই প্রত্যাখ্যান সে মানিয়া লইল—শ্রীকান্তকে সে মুক্তি দিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে সে শ্রীকান্তের নিকটে একটা বস্তু নিঃসংশয়ে বুঝিয়া পাইতে চাহিল তাহা এই যে—সে পিয়ারী বাইজীই বটে, সেজন্য শ্রীকান্ত তাহাকে যতই অশ্রদ্ধা করুক,—কিন্তু তাহার ঐ প্রেমের নিষ্ঠা ও গভীরতাকে শ্রীকান্ত কিছুতেই অবিশ্বাস করিতে পারিবে না।

তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য—শ্রীকান্তের নিকটে তাহারই প্রমাণ পাইবার জন্য, ঠিক ঐদিনে, ঐ মুহূর্ত্তে, সে ঐরূপ সাজসজ্জা করিয়া, পূর্ব বাইজীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া—ঐ-জাতীয় গণিকার সকল বাহ্যিক আচার বজায় রাখিয়া, গীতবাদ্যের মজলিস করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—না, শ্রীকান্ত তাহাকে ততখানি বিশ্বাস করে নাই—সে কেবল সামাজিক মর্য্যাদা-নাশের ভয়েই নহে; সে তাহার চরিত্রকেই বিশ্বাস করে না; শুধু সমাজের চক্ষেই নয়, তাহার চক্ষেও রাজলক্ষ্মী সেই ধর্ম্ম হারাইয়াছে—যে-ধর্ম্ম প্রেম অপেক্ষাও বড়, যে-ধর্ম্ম নারীজীবনের একমাত্র সত্য, যাহার নাম সতীত্ব। তাহা একবার হারাইলে—নারীকে আর বিশ্বাস করা যায় না।

ইহার পর উপরি-উদ্ধৃত দৃশ্যে রাজলক্ষ্মীর মূর্ত্তি ও তাহার শেষ কথাগুলি আর বিস্ময় উদ্রেক করিবে না। আসল কথা, এই রাজলক্ষ্মীর সহিত শ্রীকান্তের ঘনিষ্ঠতা যতই বাড়িবে ততই আমরা তাহার দুর্ব্বলতা ও বুদ্ধিহীনতা—তাহার চরিত্রের যে দিকটা অন্ধ ও অসম্পূর্ণ—তাহাই প্রকাশিত হইতে দেখিব।

আরও দুই-একটি দৃশ্য এই অঙ্কেরই অন্তর্গত। এখন হইতে নাটকীয় ঘটনাধারা খরস্রোত না হউক, গভীরতর হইয়া উঠিতেছে। একদিকে রাজলক্ষ্মীর প্রেম, যেন তাহারই দুঃখ বাড়াইবার জন্য, অন্তর্নিরুদ্ধ বেগে তাহার হৃদয় মথিত করিতেছে; অপর দিকে শ্রীকান্তের পতন সুরু হইয়াছে। শ্রীকান্তের সেই পতনই রাজলক্ষ্মীকে একটা ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্বে অবসন্ন করিয়া ফেলিল। কারণ, একদিকে শ্রীকান্তের দুর্ব্বলতা রাজলক্ষ্মীর বুভুক্ষু হৃদয়ের পক্ষে যেমন প্রেয়, তেমনই, অপর দিকে, রাজলক্ষ্মীর চক্ষে শ্রীকান্তের সেই কঠোর উদাসীন চরিত্রের যে মহিমা, তাহা ধূলিসাৎ হইতে দেখিলে যন্ত্রণারও সীমা নাই। শ্রীকান্ত যতই পরের বিপদে জড়াইয়া পড়ে,—আত্মরক্ষায় উদাসীন বলিয়া, এবং পরদুঃখকাতর বলিয়া, যতই সে নিরুপায় হইয়া পড়ে, ততই রাজলক্ষ্মীকে তাহার প্রয়োজন হয়; রাজলক্ষ্মীর দয়া, তাহার সেই মহত্বও যেমন তাহাকে মুগ্ধ না করিয়া পারে না, তেমনই, রাজলক্ষ্মীর সেই অকাতর সাহায্য যে শ্রীকান্তকেই তাহার হৃদয়ের দান—তাহার প্রতি স্নেহ যে সত্যই কত গভীর—ইহা মনে করিয়া সে কৃতজ্ঞতায় অবসন্ন হয়। বারবার এইরূপ হইতে থাকিলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবার কথা; সে দুর্ব্বলতা সত্যকার প্রেম নয়—অপরের নিকটে আত্মসমর্পণ মাত্র। ইহার ফলে সে ক্রমে একরূপ অবশে রাজলক্ষ্মীর অধিকারে নিজেকে টানিয়া আনিতেছে, তাহাতে রাজলক্ষ্মীর কিছু সুখ যে হইতেছে না তাহা নয়, কিন্তু রাজলক্ষ্মী ঐ মানুষটিকে ভালরূপই জানে, ইহাও

সে বোঝে যে, যাহাকে সুস্থ-সবল বীর্য্যবান অবস্থায় সে পাইল না তাহাকে এমন অসুস্থ, দুর্ব্বল, প্রাণশক্তিহীন অবস্থায় স্ববশে পাওয়ার মত দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? সেও একটা অভিশাপ; তেমন করিয়া পাওয়াতেই যদি তৃপ্ত হইতে হয়, তবে তাহার নিজের আত্মার সম্মান রহিল কোথায়? তাহার সেই দেবতাও যে ধূলায় লুটাইল! রাজলক্ষ্মী অতঃপর নিজেও মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িল—তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে ক্ষুধা জাগিয়াছে, অন্তরে লোভের পাপ প্রবেশ করিয়াছে। যে আত্মভ্রষ্টতার লক্ষণ সে শ্রীকান্তের আচরণে উত্তরোত্তর লক্ষ্য করিতে লাগিল, তাহা যতই শোচনীয় হউক—শ্রীকান্ত যে তাহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিতেছে, ইহাতে সে একটু সুখবোধ না করিয়া পারিল না পরে সেই আত্মপ্রবঞ্চনার শাস্তিও কম হইল না—সে শাস্তি অনিবার্য্য। যাহার জীবনে যেটা সত্য তাহাকে সে লঙ্ঘন বা অস্বীকার করিতে পারে না; তাহার মত পাপ আর নাই, সে পাপের শাস্তি যে হইবেই। যাহার জীবনে তেমন কোন সত্য নাই যাহা লঙ্ঘন করিলে পাপ হয়, তাহার শাস্তিও নাই—দেহের শাস্তির কথা বলিতেছি না, আত্মার শাস্তির কথাই বলিতেছি; যাহার আত্মাই নীচ, তাহার কোন শাস্তির বালাই নাই।

উপরে যাহা লিখিয়াছি তাহা পরবর্ত্তী অঙ্কের সূচনা বা ভূমিকা হিসাবে। এ অঙ্কের শেষ এখনও হয় নাই, তথাপি আমার ঐ আলোচনা এখানেও অপ্রাসঙ্গিক নয়—বর্ত্তমানে যাহা ঘটিতেছে, ভবিষ্যতের আভাস পাইলে তাহার পূর্ণ অর্থ বুঝিবার সুবিধা হয়।

সেই এক দৃশ্যের জের চলিতেছে। শ্রীকান্ত পিয়ারী বাইজীর কাশীর বাড়ী হইতে আবার গোঁসা করিয়া চলিয়া যাইতেছে—

"গাড়ী ডাকিতে গিয়াছিল। সদর দরজায় গাড়ী থামিবার আওয়াজ পাইয়া ব্যাগটা হাতে লইতে যাইতেছি, পিয়ারী আসিয়া পিছনে দাঁড়াইল।"

তার পর—

"রাজলক্ষ্মী কহিল, একি তুমি ছেলেখেলা মনে কর? আমাকে একলা ফেলে রেখে চ'লে যাবে, চাকর-বাকরেরাই বা কি ভাববে? তুমি কি এদের কাছেও আমার মুখ রাখবে না?...

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, যদি অন্যায়ই একটা ক'রে থাকি, তার কি মাপ নেই? তুমি ক্ষমা না করলে আমাকে আর কে করবে?

বলিলাম, পিয়ারী, এগুলো যে দাসী-বাঁদীদের মত কথা হচ্ছে। তোমার মুখে ত মানাচ্ছে না।

এই বিদ্রূপের কোন উত্তর পিয়ারী সহসা দিতে পারিল না, আরক্ত মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল। আমি নিঃশব্দে ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইতেই এবার পিয়ারী ধপ্ করিয়া আমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি যে সত্যিকার অপরাধ কখনো করতেই পারিনে তা' জেনেও যদি শাস্তি দিতে চাও, নিজ হাতে দাও, কিন্তু এই একবাড়ী লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট ক'রে দিয়ো না।...

অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলাম, লক্ষ্মি, তোমার আজকের ব্যবহার ক্ষমা করা যত কঠিনই হোক্, আমি করলুম। কিন্তু নিজে তুমি এ লোভ কিছুতেই ত্যাগ করতে পারবে না। তোমার অনেক টাকা, অনেক রূপ-গুণ। অনেকের উপর তোমার অসীম প্রভুত্ব। সংসারে এর চেয়ে বড় লোভের জিনিস আর নেই। তুমি আমাকে ভালবাসতে পারো, শ্রদ্ধা করতে পারো, আমার জন্যে অনেক দুঃখ সইতেও পারো, কিন্তু এ মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী মৃদুকণ্ঠে কহিল, অর্থাৎ এ রকম কাজ আমি মাঝে মাঝে করবই?

প্রত্যুত্তরে আমি শুধু মৌন হইয়া রহিলাম। সে নিজেও কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল, তার পরে?

কহিলাম, তার পরে একদিন খেলাঘরের মত সমস্ত ভেঙে পড়বে। সে দিনের সেই হীনতা থেকে আজ তুমি আমাকে চিরদিনের মত রেহাই দাও,—তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা।

একটু থামিয়া কহিলাম, কিন্তু লোকে ত মনসা পণ্ডিতের পাঠশালার সেই রাজলক্ষ্মীকে চিনবে না, তারা চিনবে শুধু পাটনার প্রসিদ্ধ পিয়ারী বাইজীকে। তখন সংসারের চোখে যে কত ছোট হয়ে যাবে, সে কি তুমি দেখতে পাচ্ছো না? সে তুমি কেমন করে' বাধা দেবে বল ত?

রাজলক্ষ্মী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কিন্তু, তাকে ত সত্যিকারের ছোট হওয়া বলে না।

বলিলাম, ভগবানের চক্ষে না হ'তে পারে, কিন্তু সংসারের চক্ষুও উপেক্ষা করবার বস্তু নয়, লক্ষ্মি।

রাজলক্ষ্মী কহিল, কিন্তু তাঁর চক্ষুকেই ত সকলের আগে মানা উচিত?

কহিলাম, এক হিসেবে সে কথা সত্যি। কিন্তু তাঁর চক্ষু ত সর্ব্বদা দেখা যায় না। যে দৃষ্টি সংসারের দশজনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়, সেও ত তাঁরই চক্ষের দৃষ্টি, রাজলক্ষ্মি। তাকেও ত অস্বীকার করা অন্যায়।

রাজলক্ষ্মী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া অশ্রু-বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, যাবে যাও। কিন্তু আমাকে যাই ভাবো না কেন, আমার চেয়ে আপনার লোক তোমার আর নেই। সেই আমাকে ত্যাগ ক'রে যাওয়া দশের চক্ষে ধর্ম্ম, একথা আমি কখনও মানবো না।—বলিয়া দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

নিঃশব্দে ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিলাম।

[ঐ, পৃঃ ১৮০-৮৪]

শ্রীকান্তের কথা কিন্তু বরাবর এক। সে ঐরূপ প্রেমে মজিবে না। সে জানে, এবং এক্ষণে দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, প্রেম এমন বস্তু নয় যাহা নীতিধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া একটা পৃথক মহিমা লাভ করিতে পারে। 'সংসারের দশজন'কে অগ্রাহ্য করিয়াও আত্মসম্মান অটুট রাখা যায়—একমাত্র ন্যায়-সত্যের পক্ষে দাঁড়াইয়া, অবিচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া; প্রেমের উপরে দাঁড়াইয়া নহে।

প্রেমের পরিণাম তো এই!' রাজলক্ষ্মী তাহার উত্তরে যাহা বলিল, তাহা শুনিয়া মনে হয় নাকি, কবি ঠিকই বলিয়াছেন?—

ম্লানমুখ, অশ্রু-আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব;
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধকণ্ঠে কয়—
"যেতে নাহি দিব।" যতবার পরাজয়
ততবার কহে, "আমি ভালবাসি যারে
সে কি কভু আমা হ'তে দূরে যেতে পারে?"

—একথা সত্য, কিন্তু প্রায়ই একজনের পক্ষে; তাই দেবতাদের যাহা কমেডি, মানুষের পক্ষে তাহাই মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

তৃতীয় অঙ্কের জের—'স্বখাত সলিলে'

সুন্দরি, তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়ায়লি
জনম গোঙায়বি রোয়।
—গোবিন্দ দাস

যদি এ কাহিনীকে এমনই নাটকের আকারে দেখিতে হয়, তবে ইহার অঙ্ক-ভাগ রীতিমত ট্র্যাজেডি-নাটকের মতই হওয়া উচিত। সে পক্ষে সুবিধাও আছে। আগের অঙ্কটিকে তৃতীয় অঙ্ক ধরিলে, সেই অঙ্কে এ নাটকের অন্তর্গত 'দ্বন্দ্ব' চরমে উঠিয়াছে; এবং তাহারও যে 'সঙ্কট-লগ্ন'—ইংরেজীতে যাহাকে 'Crisis' বলে—তাহাও এই অঙ্কে আসিয়া গিয়াছে, অতঃপর এই অঙ্কের যে একটু জের আছে তাহাতে উহার চূড়ান্ত পরিণতি দেখিতে পাইব। পরবর্ত্তী সমস্ত অঙ্কটি ধরিয়া ঘটনার যে বহিঃস্তব্ধ, অন্তঃক্ষুব্ধ স্রোত বহিয়াছে, তাহাই ক্রমাগত নিম্নাভিমুখী হইয়া একটা ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের শেষে চরম সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

এই চতুর্থ-অঙ্কটি কিছু দুর্ব্বোধ্য, তার কারণ, এই অঙ্কে রাজলক্ষ্মী, বাহিরেও যেমন ভিতরেও তেমনই, অজ্ঞাতবাস করিতেছে। আমি 'শ্রীকান্তে'র তৃতীয় পর্ব্ব—'গঙ্গামাটী'-অধ্যায়ের কথা বলিতেছি। রাজলক্ষ্মীর আচরণ, কথাবার্ত্তা —সকলই এমন আত্মগোপন করার মত যে, প্রতিপদে পাঠকের ধাঁধা লাগে, এমন কি, শেষ পর্য্যন্ত একটা উল্টা ধারণাই হয়। লেখক শ্রীকান্ত, নায়ক-শ্রীকান্তের অবস্থায় পড়িয়া, এমনই বিভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে যে, সে-ও এবার সম্পূর্ণ হার মানিয়াছে—সে যে বিবরণ দিয়াছে তাহাতে তাহার নিজেরই ধারণা, নানা প্রকার অনুযোগ, এবং সেন্টিমেণ্টের প্রবল উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছু নাই—রাজলক্ষ্মী তাহার বুদ্ধিভ্রংশ করিয়াছে। কাজেই পাঠক নিরুপায়, ধাঁধা ও হেঁয়ালী ছাড়া আর কিছুই মেলে না। কিন্তু এই অঙ্কটিকে ভালো করিয়া বুঝিতে না পারিলে, এ কাহিনীর একটা অতি-গভীর ও জটিল ভাব-সন্ধি আমাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবে। যেহেতু এই অঙ্কে ঠিক নাটকীয় দৃশ্যের মত কিছু নাই, অতএব আমাকে এবার প্রধানতঃ কথকের কাজই করিতে হইবে।

আমরা দেখিয়াছি, রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাড়ী হইতে শ্রীকান্ত বড় ঘটা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে—তাহার আত্মসম্মান-বোধ ও নীতিজ্ঞানের একটা বড় গৌরব স্থাপন করিয়া, রাজলক্ষ্মীর সহিত একরকম ছাড়ান-কাটান করিয়া আসিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর অপরাধ, সে বাইজীর নীচবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না, তাহার লোকলজ্জা নাই, বোধ হয় চারিত্রিক শুচিতা-নাশের ভয়ও নাই। থাকিবে কেমন করিয়া? তাহার প্রবৃত্তি বড় vulgar হইয়া গিয়াছে—হইবারই যে কথা! তার উপর, রূপ-যৌবন ও ধনৈশ্বর্য্য আছে—সে মোহ কি সহজে দূর হয়? সেদিনের সেই ঘটনায় শ্রীকান্তের চক্ষু খুলিয়াছে। আমি এখানে রাজলক্ষ্মীর সেই আচরণের কথা আর একবার বলিব। সেই আচরণের কৈফিয়ৎ যেমনই থাকুক, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাহার সদর্থ করা দুরূহ; দুরূহ বলিয়াই আমরা রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে অসাধারণত্বই লক্ষ্য করি। রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্ত কেন বুঝিতে পারে না তাহা আমি বলিয়াছি; তার উপর, তাহার ঐ আচরণে শ্রীকান্ত যে এমন বিমুখ হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। রাজলক্ষ্মীর জীবনে ও চরিত্রে প্রেমের ঐ যে বিচিত্র বিকাশ—তাহা নায়ক শ্রীকান্তের পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছে যে কারণে, সেই কারণেই উহা লেখক শ্রীকান্তের বা কবি শরৎচন্দ্রের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে—সেই বিস্ময় হইতেই এই কাব্যের জন্ম হইয়াছে। তাই শ্রীকান্তের নিজের জবানী যেমনই হোক, তাহার ভিতরকার সেই অপর পুরুষটির একটা উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত না করিলে, রাজলক্ষ্মী-চরিত্রের সুগভীরতার আভাস পাওয়া যাইবে না। পাঠক-পাঠিকাদের বোধ হয় মনে আছে, আমি অনেক পূর্ব্বেই, রাজলক্ষ্মীর পরিচয়-প্রসঙ্গে, তাহার ঐ বাইজীবৃত্তি ত্যাগ না করার একটা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম এই যে, ঐ গীতবাদ্যের চর্চ্চায় সে তাহার ব্যর্থ-জীবনের গভীর ব্যথা ভুলিবার একটি উপায় পাইয়াছে। সঙ্গীত-কলা যে আধ্যাত্মিক সাধনারও সহায়—ঐ কারণেই উহা যে অপরাপর কলাবিদ্যা হইতে একহিসাবে শ্রেষ্ঠ, তাহা অনেকে অবগত আছেন। সকল কলা-কর্ম্মই এক একটি সাধনা-বিশেষ। যে শিল্পী সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, সে যে তাহাকেই তাহার উচ্চতম পিপাসার পথ ও পাথেয় করিতে পারিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজলক্ষ্মীও সঙ্গীতকলায় তাহার প্রাণমন সমর্পণ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছে—ঐ সঙ্গীতই তাহার নিরাশ্রয় হৃদয়ের একটা বড় আশ্রয় হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইহাও খুব সম্ভব, এমন কি, বোধ হয় তাহাই আরও সত্য যে—সেদিন শ্রীকান্তের নিকট হইতে দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্তির পর, সেই দারুণ ব্যথার

কিঞ্চিৎ উপশমের জন্য, সে সঙ্গীতের উচ্ছ্বসিত অবারিত ধারায় নিজেকে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। শ্রীকান্ত তাহা বুঝিবে কেমন করিয়া? তবু পরে, এক স্থানে রাজলক্ষ্মী কথায় কথায় তাহার ঐ গীতবাদ্যচর্চ্চার সম্বন্ধে এমন একটি মন্তব্য করিল যে, শ্রীকান্ত তাহাতে চমকিত হইয়া, রাজলক্ষ্মীর সেদিনের সেই আচরণ সম্বন্ধে তাহার ভুল-ধারণার জন্য লজ্জাবোধ করিয়াছে। অবশ্য, এইরূপ ভুল সে ক্রমাগতই করে, এবং লজ্জিত বা অনুতপ্তও হয়—তাহার বেশিকিছু হয় না। সেই স্থানটি এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। অতিশয় অসহায় অবস্থায় পড়িয়া, শ্রীকান্ত যখন রাজলক্ষ্মীর হাতে নিজের সকল ভার অর্পণ করিতে চাহিল (একটু পরের কথা), তখন রাজলক্ষ্মী—

"একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমি কি করব? তুমি বাঁয়া-তবলা বাজাতেও পারবে না, সারেঙ্গী বাজাতেও পারবে না।

বলিলাম, ভরসা দিলে পারিলেও পারিতে পারি। বলিয়া নিজেই একটু হাসিলাম।

হঠাৎ রাজলক্ষ্মী উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি পারো?

বলিলাম, আশা করতে ত দোষ নেই।

রাজলক্ষ্মী বলিল, না। তারপর নিঃশব্দ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ নির্নিমেষে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, মাঝে মাঝে তাই যেন আমার মনে হোত, আবার ভাবতাম, যে-মানুষ নিষ্ঠুরের মত বন্দুক নিয়ে কেবল জানোয়ার মেরে বেড়াতেই ভালবাসে, সে এর কি ধার ধারে? এর ভেতরের এত বড় বেদনাকে অনুভব করা কি তার সাধ্য?

তার সত্য অনুভূতির কাছে মনে মনে আমাকে হার মানিতে হইল। কথাটাকে সে ঠিকমত বলিতেও পারে নাই; কিন্তু সঙ্গীতের যে অন্তরতম মূর্ত্তিটি কেবল ব্যথার ভিতর দিয়াই কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করে, সেই করুণায় অভিনিষিক্ত সদাজাগ্রত চৈতন্যই যেন রাজলক্ষ্মীর ঐ দুটা কথার ইঙ্গিতে রূপ ধরিয়া দেখা দিল। এবং তাহার সংযম, তাহার ত্যাগ, তাহার হৃদয়ের শুচিতা আবার একবার যেন আমার চোখে আঙুল দিয়া তাহাকেই স্মরণ করাইয়া দিল।"

[তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৩-১৫]

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই কথাগুলি নায়ক-শ্রীকান্তের নয়—লেখক-শ্রীকান্তের; ঐ নারীর ঐ ব্যথা—তাহার ঐ চরিত্র—সে আর্টিষ্ট-কবির মত বেশ দেখিতে ও বুঝিতে পারে—সেই সহানুভূতিমূলক কল্পনা তাহার বরং কিছু অধিক; কিন্তু যখনই তাহার ব্যক্তিহৃদয়ের—তাহার নিজ-জীবনের সহিত উহার সম্পর্ক-চিন্তা আসে, তখনই সে আত্মরক্ষার জন্য একটি দেয়াল তুলিয়া দেয়।

যাক, আমরা এখন সেই কাহিনী-সূত্রটি আবার ধরিয়া চলি। শ্রীকান্ত চলিয়া গেল। তারপর, দুইদিন যাইতে না যাইতে সে আবার যাহা ঘটাইয়া বসিল, এবং উদ্ধার পাইবার জন্য আবার সেই রাজলক্ষ্মীরই যেরূপ শরণাপন্ন হইল, তাহাতে, আর কেহ হইলে তাহার প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা রাখিতে পারিত না;

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর মরণ এমনই যে, সে আবার ছুটিয়া আসিল। তারপর যাহা ঘটিল, সে এমন একটি ঘটনা যাহার তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য, আমাদিগকে একটু প্রস্তুত হইয়া লইতে হইবে। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে ঐরূপ ত্যাগ করিয়া যাওয়ার পর এবং এই ঘটনাটির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে সময়টি, তাহাতে রাজলক্ষ্মীর মনে একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছে। শ্রীকান্তের সেই কঠিন কথাগুলার মধ্যে একটা সত্য ছিল—রাজলক্ষ্মীর এমন একটা অপরাধ বা মিথ্যাচারের অভিযোগ তাহাতে ছিল, যাহা রাজলক্ষ্মীকেও অন্তরে স্বীকার করিতে হইল। রাজলক্ষ্মীর প্রতি শ্রীকান্তের বিশ্বাস থাকুক, আর নাই থাকুক—প্রেম বস্তুটা যতই তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ হউক,—রাজলক্ষ্মীর ঐ বাইজীবৃত্তি, এবং তদ্দ্বারা উপার্জ্জিত তাহার ঐ শ্রী-সম্পদ্ সত্ত্বেও, কোন্ আত্মসম্মানবিশিষ্ট ভদ্রসন্তান তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত না হইবে? প্রেম যতই গভীর বা বিশুদ্ধ হউক, ঐরূপ বাইজীর অঞ্চল ধরিয়া যে থাকিতে পারে সে কি একটা পুরুষ! সে কোন্ মুখে শ্রীকান্তের জীবনেও একটা স্থান পাইবার আকাঙ্ক্ষা করে? এই কথা সে ইতিপূর্ব্বে ভাবিয়া দেখে নাই, শ্রীকান্তের ঐ নিন্দাবাদ শুনিয়া সে আর একবার নিজের পানে তাকাইল। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহার মত বুদ্ধিমতী নারীর পক্ষে এ কথাটা কি এতদিন মনে না হওয়া সম্ভব? তাহার উত্তরে বলিতে হয়, সে ইতিপূর্ব্বে তাহার জীবনটাকে যে ভাবে গুছাইয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিয়াছিল—একটা যে সংসার-বন্ধন গড়িয়া লইয়াছিল, তাহার জন্যই কতক-গুলি প্রয়োজনও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। শ্রীকান্তের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ার পরেও, সে বিচলিত হয় নাই; যাহার আশা সে কখনো করে নাই—সে আশাও কত-মিথ্যা তাহা জানিত—তাহা হইতে সে এখনও পূর্ব্ববৎ আত্মসম্বরণ করিয়াছিল। তাহার অন্তরের সেই আজীবন-রুদ্ধ গোপন বেদনাকে সে যে বেদীতে বসাইয়া ইষ্টমন্ত্রের মত জপ করে, তাহা চিরদিন রুদ্ধই থাকিবে, বাহিরের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্কই যে নাই। তাই সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে জীবন্তের সঙ্গে এই সাক্ষাতের পর, সেই ঘুমন্তকে সে আর ঘুম পাড়াইয়া রাখিতে পারিতেছে না, সেই সাধনার বস্তুই কামনার বস্তু হইয়া উঠিতেছে। অথচ সে যে কত নিষ্ফল, তাহাও সে জানে; জানে—তাহার জীবনে ঐ জীবন্তের সহিত কোন যোগ নাই। এইজন্য সে সেই পূর্ব্বব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন চিন্তাই করে নাই; এখানে সে বুদ্ধির কাজই করিয়াছে। কিন্তু ক্রমেই, তাহার অজ্ঞাতসারে, বুদ্ধিকেও পরাহত করিয়া, ভিতরে ভিতরে সেই

ঘুমন্ত কামনাই যে জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে—এতদিন সে তাহা নিজের নিকটেও স্বীকার করে নাই।

এবার শ্রীকান্তের সেই ভর্ৎসনা ও চরম দণ্ডাদেশ হইতেই সে এই প্রথম আপনার মিথ্যাচার বুঝিতে পারিয়াছে। বুঝিয়াছে—সেই পূর্ব্বের মত ব্যবস্থায় আর চলিবে না; জীবনটাকে কোনরূপে সহনীয় বা শান্তিময় করিবার উপায় আর নাই। সেই তাহার প্রেম আজ আর ভস্মাচ্ছাদিত থাকিবে না—তাহার আগুনে সব আহুতি দিতে হইবে; নিজেকে ঐরূপ বাঁচাইয়া—একরূপ আত্ম-প্রবঞ্চনা করিয়া—আত্মরক্ষা করা আর চলিবে না। যে প্রেমে প্রাপ্তি বা প্রতিদানের আশা নাই—সেই একান্ত একার প্রেমকেই আত্মার ইষ্টমন্ত্র করিয়া সে এতকাল একটা বড় আশ্বাস লাভ করিয়াছিল। আজ সেই প্রেমের চূড়ান্ত পরীক্ষা উপস্থিত; যদি হার মানে, তবে তাহার সারা জীবনটাই ভস্মমুষ্টিতে পরিণত হইবে। তবে সে এখন কি করিবে? এই তাহার শেষ সঙ্কল্প—শেষ যুদ্ধসজ্জা। শ্রীকান্ত তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, সেজন্য কোন দুঃখই করিবে না; তাহার সেই অলক্ষ্য-সঞ্চার দুষ্ট কামনাকে সে-ই সবলে নিপীড়িত করিবে; সেই প্রেমকেই সে আর এক উপায়ে জয়ী করিবে—সত্য করিয়া তুলিবে। শ্রীকান্ত তাহাকে গ্রহণ না করুক, কিন্তু তাহার প্রত্যাখ্যানের ঐ কারণটা সত্য। ঐ বাইজী-জীবন, ঐ ধনসম্পদ সে যে ত্যাগ করে নাই, তাহার কারণ, সত্যই তাহার মন অশুচি, মনের কোন একটা কোণে পাপ রহিয়াছে। শ্রীকান্তের কথায় নয়, —সে যাহাই বলুক, যাহাই মনে করুক—সেজন্য নয়, তাহাকে খুসী করিবার জন্য নয়—তাহার নিজেরই সেই প্রেম-সত্যের অনুরোধে সে ঐ সকল ত্যাগ করিবে। আর, শ্রীকান্তকে সে সম্পূর্ণ মুক্তি দিবে; নিজের কারণে শ্রীকান্তের কিছুমাত্র ক্ষতি হইতে দিবে না—তাহারই জন্য শ্রীকান্তের যেন মানহানি, ধর্ম্মহানি না হয়, তাহার ছায়াও যেন শ্রীকান্তকে স্পর্শ করিতে না পারে। রাজলক্ষ্মীর এইরূপ মনোভাব ও সঙ্কল্প তাহার পক্ষে এতই স্বাভাবিক, যে ইহাকে অনুমান বলা যায় না—বুঝিয়া লওয়া মাত্র।

এইখানেই আমি আমার পক্ষ হইতে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। রাজলক্ষ্মীর চরিত্র কেমন, তাহার প্রেমের স্বরূপ কি, এবং শ্রীকান্ত-সম্বন্ধে তাহার একরূপ দিব্যজ্ঞান—এ সকলই আমি বারবার বলিয়াছি; ইহাও সত্য যে, সকল পরবর্ত্তী ঘটনায় রাজলক্ষ্মীর সেই এক চরিত্র, তাহার সেই এক মনোভাব—সেই একই সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পচ্যুতিই দেখা যাইতেছে—অন্ততঃ আমি তাহাই

দেখাইতেছি। যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই কথা; তবে ইহাতে সেই ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত কোথায়? এ যেন একই বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া একটা আবর্ত্তই ঘুরপাক খাইতেছে। কথাটা এক অর্থে সত্য, এবং সেই কারণে, এ কাহিনী খাঁটি নাটকীয় কাহিনী নয়। রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে কোন development বা growth আর নাই—আমরা একেবারে তাহার নারী-প্রকৃতির পূর্ণ-বিকশিত রূপটিই পাইয়াছি। সে যাহা তাহাই আছে, ও থাকিবে। কেবল নূতনতর আঘাতে তাহার সেই অপরিবর্ত্তনীয়তাই স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে। তথাপি একটা বিকাশও আছে, তাহাকে বিকাশ না বলিয়া প্রকাশ বলাই সঙ্গত। রাজলক্ষ্মীর সেই প্রেম-সত্যের উপরে যে আত্মাভিমানের আবরণ আছে, তাহাই খুলিয়া যাইতেছে; সে আপনাকে আপনিই চিনিতেছে; তাহার সেই অন্তরের সত্যই নির্ম্মম হইয়া তাহাকে আত্মসাক্ষাৎকার করাইতেছে। সেই মোহজনিত যে ভ্রম তাহাই সূক্ষ্ম আকারে, নানা নূতন ছদ্মবেশে তাহাকে আক্রমণ করিতেছে, এবং প্রতিবার সে তাহার অন্তরের সেই এক সত্যের আশ্রয় লইতেছে—ইহাই এ নাটকের দ্বন্দ্বতত্ত্ব; ইহার পরিণাম—রাজলক্ষ্মীর পূর্ণতম আত্ম-পরিচয়, সকল দ্বন্দ্বের অবসান, নিয়তির নিকটে আত্মসমর্পণ। শ্রীকান্তেরও ঠিক তাহাই হইতেছে; তাহার যে অশক্তিকেই সে শক্তি মনে করিয়া আত্মাভিমান ও আত্মসন্তোষ বজায় রাখিতেছে, তাহাও চূর্ণ হইয়া যাইবে; সে চরিত্রের একটা মূলগ্রন্থি টুটিয়া যাইবে —তাহার জীবন সম্পূর্ণ ভিন্নমুখে প্রবাহিত হইবে। কিন্তু এসকল কথা অনেক পরের—একেবারে শেষের কথা, তবু প্রসঙ্গক্রমে একটু আভাস দিতে হইল।

তথাপি, রাজলক্ষ্মীর ব্যক্তি-মানসের অন্তরালে যাহা রহিয়াছে—যাহার বশে সে ক্রমাগত ভুল করিতেছে, অথচ অন্তরের সত্যটি হইতেও ভ্রষ্ট হইতেছে না—সে কথা আমি এখনও স্পষ্ট করিয়া বলি নাই। এতদূর আসিয়া এখন বলিলে সম্ভবতঃ এ কাহিনীর রসভঙ্গ হইবে না। এই যে পরের কথা পরে না বলিয়া অনেক আগেই বলিয়া ফেলি, ইহার একটা কারণ, এই উপন্যাসের সকল অংশই পাঠক-পাঠিকার কত সুপরিচিত তাহা জানি; তাই কাহিনীর পারম্পর্য্যও যেমন লঙ্ঘন করি, তেমনই, আমার এই আলোচনার পশ্চাতে যে একটি নেপথ্য-চিন্তাগৃহ আছে তাহার দ্বারও যখন-তখন খুলিয়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করি না। তাহাতে হয়তো একটু অধীরতা প্রকাশ পায়, কিন্তু এত 'ফরম্যালিটি'র প্রয়োজন কি? আমি তো কাহিনী-রস সৃষ্টি করিতেছি না—ব্যাখ্যাকার মাত্র; ব্যাখ্যার অবশ্য একটা পদ্ধতি আছে, সূত্রের একটা ক্রম-পর্য্যায় আছে, নহিলে বিচারটা অসংলগ্ন

হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে ভয় আর নাই—পাঠক-পাঠিকাগণ এতক্ষণে আমার এই ব্যাখ্যার মূলসূত্র ধরিতে পারিয়াছেন। তাই আমি এইখানেই সেই একটি কথা বলিব—রাজলক্ষ্মীর সেই মোহ, সেই ভ্রমের কথা, যে-ভ্রম তাহাকে এমন করিয়া তাহার নিজেরই চারিপাশে ভ্রমণ করাইতেছে। এবারেও রাজলক্ষ্মীর ঐ সংকল্প সেই প্রেমেরই সংকল্প; উহা সেই একটুখানি দুর্ব্বলতা—যাহা না থাকিলে, মানুষের জীবন-নাট্যে দুঃখের মাধুরী যুক্ত হইত না, হাহাকারের সেই পরম রস হইতে মানুষ বঞ্চিত হইত। সেই মোহ যদি না থাকিত, তবে আমরা এই কাহিনী পাইতাম কোথায়? রাজলক্ষ্মী একটা অতি কঠোর ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—এ ত্যাগ বৈরাগ্যের ত্যাগ, সন্ন্যাসের ত্যাগ। কিন্তু প্রেম—যথার্থ প্রেম—এবং নারীর প্রেম তো সেই ত্যাগেরই প্রতিবাদী। এইখানে নারী ও পুরুষের মৌলিক প্রকৃতি-ভেদ। নারীর যে প্রেম, তাহাতে সে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়াও পরকে বাঁধিতে চায়; পরের পায়ে নিজেকে বাঁধিয়া সে পরকে বাঁধে; নিজের সর্ব্বস্ব ত্যাগই সেই বন্ধন-রজ্জু; তাহার নিঃস্বার্থতাই তাহার স্বার্থ; সে নিজের জন্য কিছুই চায় না—তবু চায়, চায়—পরের সুখ, পরের আনন্দ। আমাদের বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্ব এই অতিগূঢ় রহস্যকেই ধরিয়াছে। উহাই নারী-প্রকৃতি; নারীর প্রেম পুরুষের প্রেম নয়। পুরুষ যখন মহা-প্রেমিক হয়, তখন তাহার নিকটে আর 'দুই' নাই, সব এক হইয়া গিয়াছে, আত্ম ও পর নাই —কে কাহাকে ভালবাসিবে? তখন সে বিশ্ববিহার করে—প্রেমের কোন পাত্র আর থাকে না, নিজেও নয়, পরও নয়। ইহারই নাম ত্যাগ। এই ত্যাগ নারীর ধর্ম্ম নয়—সৃষ্টির ধর্ম্ম নয়; ঐ ধর্ম্ম যদি নারীরও ধর্ম্ম হইত, তবে সৃষ্টি থাকিত না; ঐ প্রেমই নারীর নারীত্ব, উহাই প্রকৃতিরূপা নারীর স্বধর্ম্ম। নারীও ত্যাগ করে বটে, কিন্তু সেই ত্যাগ আর একজনকে গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব 'এক' থাকিলেই চলিবে না, 'দুই' চাই। রাজলক্ষ্মীর মধ্যে পূর্ণ-নারীত্বের বিকাশই আমরা দেখি। সেই নারী 'ত্যাগ'-এর জন্য অধীর হইয়াছে; কিন্তু তাহার ত্যাগ যতবড় হোক—তাহা তো একের দ্বারা সম্পূর্ণ হইতে পারে না, তাহার জন্য একটা পাত্র যে চাই-ই। তাই সে আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু শ্রীকান্তকে ত্যাগ করিতে পারে না। ঐ যে ত্যাগের সংকল্প সে করিয়াছে, তাহা একটি অতি-গভীর, অজ্ঞান-নিহিত দুর্জ্জয় অভিমান ছাড়া আর কিছু নয়। সেই অভিমানকেই সে জয়ী করিতে চাহিতেছে। যাহাকে সে দূরে রাখিতে চায়, সেই যে তাহার মর্ম্মমূলে একই ভাবে একই ভঙ্গিতে বসিয়া আছে! ইহাই তাহার

নারী-জীবনের নিয়তি,—তাহার সেই জীবনও ক্ষুদ্র নয়, তাই সে নিয়তি এমন রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

এইবার পুনরায় পাঠ আরম্ভ করি। পরের দৃশ্যটি একটি উৎকৃষ্ট নাটকীয় দৃশ্য, এমন দৃশ্য এ কাহিনীতে অল্পই আছে; এ দৃশ্য বিশেষ করিয়া দর্শনীয়, তাই আমারও দেখিতে বিলম্ব হইবে। এখানেও দুইজনের দুইখানি ঘনবাষ্পপুঞ্জিত, স্তম্ভিত হৃদয়মেঘ চকিত-সংঘর্ষে বিদ্যুৎস্ফুরণ করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর মনের অবস্থা যখন ঐরূপ, তখন শ্রীকান্ত আবার এক কাণ্ড বাধাইল। সে নিজের গ্রামের সেই পরিত্যক্ত, এবং অধুনা জ্ঞাতিগণের অধিকৃত—বাস্তুভিটায় উপস্থিত হইয়া প্রবল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইল; সেই জ্বরঘোরের অবস্থায় একদিন তাহার টাকার ব্যাগটিও চুরি হইয়া গেল। তখন সে পূর্ব্বের মতই রাজলক্ষ্মীকে টেলিগ্রাম করিল। রাজলক্ষ্মী তাহার সেই 'ত্যাগ'-এর পরীক্ষা দিতে চলিল। পরীক্ষা চরম পরীক্ষাই বটে; এবার সে তাহার কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া, তাহার নিজের সেই গ্রামে, সেই সমাজের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইবে—হরিণী বাঘের মুখে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে! রাজলক্ষ্মীর পক্ষে ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ 'অবদান', বা martyrdom; কিন্তু শ্রীকান্ত ইহাকেও মর্ম্মান্তিক করিয়া তুলিল। সেই দৃশ্য এইরূপ।—

"প্রকাশ্য দিনের বেলায় এই গ্রামে পথের উপরে রাজলক্ষ্মী আসিয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা চিন্তার অতীত।

সে অবিচলিত ধীর-পদক্ষেপে আমার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া, হাত দিয়া কপালের বুকের উত্তাপ অনুভব করিয়া বলিল, এখন আর জ্বর নেই।

বলিলাম, এ গ্রামে, এ পাড়ার মধ্যে তুমি ঢুকলে কোন্ সাহসে? তুমি কি মনে কর, তোমাকে কেউ চিন্‌তে পারবে না?

কি কোরব বল? আমার কপাল! নইলে তুমি এসে এখানে অসুখে পড়বে কেন?

অদৃষ্টই বটে। কিন্তু লজ্জা-সরমের মাথা কি একেবারে খেয়ে বসে আছ? এখানে মুখ দেখাতেও তোমার বাধলো না?

রাজলক্ষ্মী তেম্‌নি উদাস কণ্ঠে উত্তর দিল—লজ্জা-সরম আমার যা' কিছু, এখন তুমি!

* * * *

সহসা দ্বারের বাহিরে মানুষের গলা শুনিয়া দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম, এবং রাজলক্ষ্মী শয্যা ছাড়িয়া উঠিবার পূর্ব্বেই ডাক্তারবাবু প্রসন্ন ঠাকুর্দ্দাকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুর্দ্দা অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি কিছুক্ষণ একদৃষ্টে রাজলক্ষ্মীর আনত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, মেয়েটি কে, শ্রীকান্ত? যেন চিনি-চিনি মনে হচ্ছে।

ডাক্তারবাবুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, ছোট খুড়ো, আমারও যেন মনে হচ্ছে, এঁকে কোথায় দেখেছি।

আমি আড়চোখে চাহিয়া দেখিলাম, রাজলক্ষ্মীর সমস্ত মুখ যেন মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। সেই নিমিষেই কে যেন আমার বুকের মধ্যে বলিয়া উঠিল—শ্রীকান্ত, এই সর্ব্বত্যাগী মেয়েটি শুধু তোমার জন্যই এই দুঃখ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। একবার আমার সর্ব্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিলাম, আমার সত্যে কাজ নাই, আজ আমি মিথ্যাকেই মাথায় তুলিয়া লইব। এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের উপর একটু চাপ দিয়া কহিলাম, তুমি স্বামীর সেবা করতে এসেচ, তোমার লজ্জা কি, রাজলক্ষ্মী! ঠাকুর্দ্দা, ডাক্তারবাবু, এঁদের প্রণাম কর।

পলকের জন্য দুজনের চোখাচোখি হইল, তাহার পরে সে উঠিয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়কে প্রণাম করিল।"

[দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৮৮-৯২]

পাঠক-পাঠিকারা কি বুঝিলেন? রাজলক্ষ্মীর অবস্থা শ্রীকান্ত যেমন বুঝিয়াছিল—তাঁহারাও তাই বুঝিলেন। রাজলক্ষ্মী যে লজ্জা-সরমের মাথা খাইবে, তাহা শ্রীকান্তের নিকট অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইলেও, বিস্ময়কর নহে। পারিবে না কেন? ও জাতের মেয়েরা সব পারে, উহাদের কি আর লজ্জা-সরম আছে? তবু আহা! বেচারীর বড়ই দুর্দ্দশা হইয়াছে। সহসা শ্রীকান্তের প্রাণে বড় অনুকম্পা হইল—"এই সর্ব্বত্যাগী মেয়েটি" ইত্যাদি! তখন শ্রীকান্ত নিজেও একটা প্রকাণ্ড ত্যাগস্বীকার করিয়া বসিল, সে রাজলক্ষ্মীর জন্য নিজের জাতটাও দিল—সেই সমাজপতিগণকে অগ্রাহ্য করিয়া সে তাহার পতিত্ব স্বীকার করিল। এই মেয়েটার দুঃসাহসের চক্রে পড়িয়া শ্রীকান্ত তাহার আজন্ম-লালিত মহামহার্ঘ আত্মমর্য্যাদা ও সামাজিক ইজ্জত বিসর্জ্জন দিল। ইহার পর তাহার তো আর কিছুই রহিল না। রাজলক্ষ্মীই তো তাহার এই সর্ব্বনাশ ঘটাইল। কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলেই সব চুকিয়া যাইত; তাহা না করিয়া এইরূপ দুঃসাহসিক অভিযানের অর্থ কি? কি সর্ব্বনাশিনী বুদ্ধি তাহার! শ্রীকান্তের প্রতি তাহার কি দুর্দ্দমনীয় লোভ। সে কিছুতেই ছাড়িবে না! শ্রীকান্তও আর পারিয়া উঠিল না, সে অবশেষে হার মানিল। ভাবখানা এইরূপই বটে; শ্রীকান্ত নিজেকে তাহাই বুঝাইতে চায়,—রাজলক্ষ্মীর প্রতি তাহার মহৎ হৃদয়ের ঐ অনুকম্পা এবং তেমন অনুকম্পার সে যে যোগ্য—ইহাই অনুভব করিয়া সে কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। ইহা যে তাহারও কতবড় আত্মপ্রবঞ্চনা—পরবর্ত্তী কাহিনীতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে; ইহার পর, রাজলক্ষ্মীর ব্যবহারে শ্রীকান্তের সেই খেদোক্তি, অভিমান ও আত্মধিক্কার হইতেই বুঝিতে পারা যায়, তাহার সেই ত্যাগী উদাসীন চরিত্রেও ভিতরে ভিতরে ঘুণ ধরিয়াছে; রাজলক্ষ্মী তাহাকে সত্যকার প্রেমের বলে বলীয়ান করিতে পারে নাই, বরং আরও দুর্ব্বল, আরও ছোট করিয়া ফেলিয়াছে। দুই বিপরীত প্রকৃতির মধ্যে এ কি দ্বন্দ্ব!—কি প্রাণান্তিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ!

কিন্তু, অপরদিকে, ঐ ঘটনায় রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ে একটা গুরুতর আঘাত লাগিল। লেখক শ্রীকান্তও তাহা বুঝিতে চাহে নাই বটে, তবু তাহার বহির্দৃষ্টি এমনই প্রখর—অতি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র বিষয়ের স্মরণশক্তি এমনই তীক্ষ্ণ যে, রাজলক্ষ্মীর সকল আচরণই সে লক্ষ্য করিয়াছে, এবং নিজে না বুঝিলেও, তাহা যতদূর সম্ভব আত্মভাবমুক্ত হইয়া অবিকৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছে। সর্ব্বত্র পারে নাই বটে, কোথাও কোথাও রাজলক্ষ্মীর মুখে তাহার নিজের জবানীও দিয়াছে। কিন্তু তাহাও ধরিয়া ফেলা দুরূহ নয়—এমনই তাহার সত্যনিষ্ঠা। আমি ইতিপূর্ব্বেও বলিয়াছি, এই আত্মকাহিনীতে লেখক শ্রীকান্তের এই যে একই কালে দুই-ব্যক্তি হইবার শক্তি—ইহারই কারণে এ কাহিনী এমন একটি অপূর্ব্ব রচনা হইয়া উঠিয়াছে; নতুবা রাজলক্ষ্মীর মত চরিত্র তাহার হাতে এমন ফুটিয়া উঠিত না। এইজন্যই আমি রাজলক্ষ্মীর চরিত্রকে অতিশয় বাস্তব-চরিত্র বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় করিয়াছি—অর্থাৎ, ঐ চরিত্র লেখকের স্বকপোল-কল্পনার সম্পূর্ণ বহির্ভূত; অন্ততঃ শরৎচন্দ্রের মত লেখক ইহাকে এতখানি 'objective' করিয়া তুলিতে পারিত না। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক চরিত্রে প্রবল সেন্টিমেণ্ট-প্রবণতা আছে, তাহা অতি তীক্ষ্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন বলিয়াই, আত্মভাবমুক্ত নয়; এইজন্য প্রত্যক্ষ-দর্শন বা বাস্তব-অভিজ্ঞতার বাহিরে তিনি কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না; কেবল ঐ অনুভূতি-কল্পনার সাহায্যেই তিনি তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, আপন ধারণা ও সংস্কারমত যে চরিত্রগুলি অঙ্কিত করেন, সেগুলি আমাদেরও হৃদয়স্পর্শী হয়। সেই চরিত্রগুলির যেমন একটা দিকই ফুটিয়া উঠে, তেমনই, তাঁহার সেই অনুভূতি-কল্পনারও একটা গণ্ডি আছে। রাজলক্ষ্মী সেই গণ্ডির কতকটা বাহিরে,—এ চরিত্রের সহিত শ্রীকান্তের হৃদয়-মনেরও একটা দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। তাঁহার সেই কল্পনা যে তাহাকে সম্পূর্ণ ধরিতে পারিতেছে না, ইহাই এ চরিত্রের বাস্তব স্বাতন্ত্র্যকে যেমন উজ্জ্বল করিয়াছে, তেমনই, পুরুষের বিপরীত যে নারী, সেই নারীর চরিত্র ও হৃদয়রহস্যকে —পুরুষের নিজের চক্ষেও যেমন, আমাদের চক্ষেও তেমনই ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। রাজলক্ষ্মীর কি হইল? তাহার সেই সংকল্পে আবার একটা আঘাত লাগিল। সে শ্রীকান্তের কোন ক্ষতির কারণ আর হইবে না, নিজের ছায়াকেও স্পর্শ করিতে দিবে না; শ্রীকান্তের উদাসীন হৃদয়ের নির্ম্মম নিস্পৃহতা—তাহার সেই উচ্চ আত্মাভিমান যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, রাজলক্ষ্মী হইতে যেন তাহাতে কোন বিঘ্ন, কোন আশঙ্কা না ঘটে এইরূপ সংকল্প করিয়াছিল। কিন্তু এ কি হইল! এ যে ঠিক বিপরীত! সে যখন শ্রীকান্তের

টেলিগ্রাম পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, তখন তাহার যে কোন জ্ঞানই ছিল না; কলঙ্কিনী হইয়া গ্রামে মুখ দেখাইবার ভয়ও তাহার ছিল না—আত্মরক্ষার কোন চিন্তাই সে করে নাই। কিন্তু সেই আত্মরক্ষার ভার দিতে হইল শ্রীকান্তের উপরে; শ্রীকান্তকে সে তাহার কলঙ্কের ভাগী করিল, বা ভাগী হইতে বাধ্য করিল! এ শুধুই মরমে মরিয়া যাওয়া নয়, তাহার ধর্ম্ম-রক্ষার শেষ আশ্রয় ঘুচিয়া গেল। শ্রীকান্তকে লইয়া গ্রাম হইতে ফিরিবার কালে, ষ্টেশনের যাত্রীশালায়, রাজলক্ষ্মীর অবস্থাটা একটু দেখিয়া লইলেই হইবে।—

"যাত্রীশালায় আর কোন লোক ছিল না, রতনও বোধ করি কোথাও একটু অন্তরাল খুঁজিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল; দেখিলাম, একটা মিট্‌মিটে আলোর নীচে রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিতেই সে চমকিয়া মুখ তুলিল, কহিল, তুমি ঘুমোও নি?

না, এই ধুলোবালির ওপর একলাটি চুপচাপ না থেকে আমার বিছানায় গিয়ে বসবে চল।...... কিন্তু নিজের কাছে টানিয়া আনিয়া আর কথা খুঁজিয়া পাইলাম না, কেবল আস্তে আস্তে তাহার হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এমনি গেল। আমার সন্দেহ যে অমূলক নয়, সে কেবল হঠাৎ তাহার চোখের কোণে হাত দিয়া অনুভব করিলাম। ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিয়া কাছে টানিবার চেষ্টা করিতেই, রাজলক্ষ্মী আমার প্রসারিত পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া জোর করিয়া চাপিয়া রহিল, কোনমতেই তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আনিতে পারিলাম না।"

[তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৩]

রাজলক্ষ্মীর সেই কালের অন্তর্বিপ্লব যথাযথ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার শক্তি অবশ্যই আমার নাই; একেই 'পরচিত্ত অন্ধকার', তার উপর, সেই "স্ত্রিয়াশ্চরিত্র"ও বটে। অতএব, কেবল ঐ দৃশ্যটি মাত্র দেখাইলাম, যেটুকু বলিবার সাধ্য তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ দৃশ্যের বাকি অংশও উদ্ধৃত করিব, তাহা হইতেও পাঠক-পাঠিকা আমার কথা মিলাইয়া লইবেন। হয়তো মিলিবে না, উল্টা বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, আগাগোড়াই একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে; রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে আমার সকল কথা স্মরণ রাখিলে, তাহার কোন আচরণই বিসদৃশ মনে হইবে না। আর একটা কথা কখনো বিস্মৃত হইলে চলিবে না—তাহা এই যে, পুরুষই হোক, আর নারীই হোক—মানুষ দেবতা নয়; যত বড় শক্তিমান হউক, flesh is weak; এবং—'The soul may be trusted to the end.'—ইহাও যেমন সত্য, তেমনই, সেই শেষ সদ্‌গতি-লাভের পূর্ব্বে কোন মানুষই বলিতে পারে না—আমি আমাকে চিনিয়াছি, নিজের সম্বন্ধে আমি নির্ভুল ও নিশ্চিন্ত হইয়াছি। যে বিষের জ্বালায় বুক জ্বলিয়া যাইতেছে, সেই বিষই মানুষ তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পান করে—জানে না বলিয়া নয়, এমন কি শক্তিহীন বলিয়াও নহে। যে সত্যকে

নিঃসংশয়ে বরণ করিয়াছি, যাহাকে আমি আমার করিয়া লইয়াছি, সেই সত্যকে লইয়াও একটু খেলা করিতে ইচ্ছা হয়—হোলির দিনে তাহার গায়েও একটু পিচকারী দিতে, মুখে একটু আবীর মাখাইতে ইচ্ছা হয়। হৃদয় সেটুকু মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না, ইহাই মানবের মানবতা। তারপর, আমার সত্যই কি সব? পরের মিথ্যাকেও যে ক্ষমা করিতে, বরদাস্ত করিতে হয়—প্রেমে যদি না পারো, করুণায় কর, অনুকম্পায় কর। তাহাতে আমার সত্য নষ্ট হইবে না। ইহাকেই যদি ভ্রম বা দুর্ব্বলতা বলিতে হয়—ঐ রাজলক্ষ্মীর আচরণই দেখ না! —তবু, অন্তরে যদি সেই সত্যের প্রকৃত অধিষ্ঠান হইয়া থাকে, তবে সেই ভ্রমগুলাও যেন আমাকে লইয়া সেই সত্যেরই লীলা! রাজলক্ষ্মীরও যাহা-কিছু তাহা এমনই সত্য।

ঐ দৃশ্যের বাকিটুকু উদ্ধৃত করার পূর্ব্বে, আমি উহার প্রথম দিকে, শ্রীকান্তের রিপোর্টে রাজলক্ষ্মীর মুখে যে একটি কথা বাহির হইয়াছিল—সে সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। ঐ কথার অর্থ একাধিক হইতে পারে, এবং তাহাতে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে একটা গুরুতর দোষ স্পর্শ করে। শ্রীকান্তের ভর্ৎসনার ('লজ্জা-সরমের মাথা খাওয়া') উত্তরে রাজলক্ষ্মী বলিল, "লজ্জা-সরম আমার যা-কিছু, এখন সব তুমি।" ইহাতে মনে হইতে পারে, রাজলক্ষ্মী যেন এ বিপদে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য, শ্রীকান্তকে একটা উপায় অবলম্বনের ইঙ্গিত করিতেছে—তাহারই জন্য অনুনয় করিতেছে। যদি তাহাই হয়, তবে রাজলক্ষ্মীর শুধু ঐ চরিত্রই নয়—তাহার সেই প্রেমের মর্য্যাদাও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ইহার দুইটা কারণ দেওয়া যাইতে পারে—এক, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের নিকটে ঐটুকু প্রত্যাশা করে বলিয়াই এমন দুঃসাহসের কাজ করিয়াছিল, অর্থাৎ সে শ্রীকান্তের জন্য ঐরূপ ছুটিয়া আসিবার সময়ে আত্মরক্ষার চিন্তাও করিয়াছিল। ইহা যদি সত্য হয়, তবে রাজলক্ষ্মীর চরিত্রই অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আর একটা কারণ এই হইতে পারে যে, এতখানি ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ তাহার ছিল না; যখন সেই অবস্থায় পড়িল তখন, জন্মগত সংস্কারের বশেই সে ভয়-লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিল,—কুলত্যাগ করিলেও, তাহার সেই কুলস্ত্রী-সংস্কার ঘুচিবার নয়। অতএব এই আচরণ খুব স্বাভাবিক হইয়াছে; অথবা ইহাই যেন—"The last infirmity of a woman's mind"। এমন অর্থ করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে রাজলক্ষ্মীর রাজলক্ষ্মীত্ব থাকে না, তাহার নারীমূর্ত্তির সেই 'tragic character' ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব, ঐ অবস্থায় রাজলক্ষ্মীর ঐ কথার সহজ অর্থ ইহাই হইবে—

"এখন তোমার ভাবনা ছাড়া আমার আর কোন ভাবনাই নাই।" কিন্তু যখন সত্যাই সেই অবস্থা ঘটিল, কেবল তখনই, রাজলক্ষ্মীর 'সমস্ত মুখ মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল', এবং তাহা ঐ চরিত্রের পক্ষে স্বাভাবিক বটে।

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ঐ সময়ের ঐ যে কথা—শ্রীকান্ত তাহার অর্থ অন্যরূপ বুঝিয়াছে। সে ঐ কথাকে আত্মত্রাণের আকুল মিনতি মনে করিয়া সহসা রাজলক্ষ্মীর প্রতি অতি-গভীর অনুকম্পা-পরবশ হইয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। রাজলক্ষ্মীও তাহা বুঝিল—সে যে সকলই বোঝে। সে বুঝিল, শ্রীকান্ত যেন তাহার প্রত্যুপকার করিল—একটা দুর্ব্বহ ঋণ পরিশোধ করিল। তাহার ঐ দয়া যেন রাজলক্ষ্মীর প্রেমের প্রতিদান! হায় ঋণ! হায় ঋণমুক্তি! কিন্তু রাজলক্ষ্মী তো কখনও কোন ঋণ দেয় নাই, সে তো শ্রীকান্তের কোন উপকার করে নাই। দেনা-পাওনার হিসাব করিবে সে কাহার সঙ্গে? তাহার ব্যবসা যে একার ব্যবসা—সে যে তাহার নিজের প্রাণটার সঙ্গেই প্রাণের বেসাতি করে! শ্রীকান্তকে সে যাহা দান করিতে চায়—করিয়া ধন্য হইতে চায়—সে তো আত্মদান, আপনাকেই নিঃশেষে দান; সে দানের পর প্রতিদান গ্রহণ করিবার জন্য কেহ যে আর থাকে না। তাহার পরে যাহা-কিছু সে দান করে, তাহা তো সেই প্রথম দানের দক্ষিণা—গুরুকে, ব্রাহ্মণকে পুণ্যার্থী যে দক্ষিণা দেয়। রাজলক্ষ্মীর সেই আদি দানটাই শ্রীকান্ত গ্রহণ করিতে পারে নাই—এতবড় অপ্রতিগ্রাহী সে; যেন সেই কারণেই তাহার প্রতি রাজলক্ষ্মীর শ্রদ্ধা এমন অসীম। এ কাহিনীর ইহাই তে মর্ম্মকথা,— তাহাই মর্ম্মান্তিক। রাজলক্ষ্মী ঐ প্রত্যাখ্যান-পূত প্রেমের সাধনায় তাহার জীবনকে সফল করিতে চায়। তপস্বিনী মহাশ্বেতার যে প্রেম-তপস্যা, এই তপস্বিনী নারীর তপস্যা তাহা অপেক্ষাও কঠিন; সেখানে বিরহ বা বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছিল মৃত্যু, এখানে জীবনই সেই বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। যতবার সে শ্রীকান্তকে—তাহার চির-বিরহী প্রেমের সেই জীবন্ত বিগ্রহটিকে দেখে, ততবার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটে; এত বুদ্ধি, এত বাস্তব-জ্ঞান, এত সংকল্প সব ভাসিয়া যায়; শ্রীকান্ত প্রতিবার তাহাকে আঘাত করে, প্রতিবার সে চমকিত হইয়া আত্মসম্বরণ করে। কিন্তু এবারকার আঘাতটা বড় বেশি বাজিয়াছে—এ আঘাত তাহার প্রেমে নয়, তাহার তপস্যার শুচিতায়, তাহার ত্যাগের নিঃসংশয়তায়। সে কি সত্যই শ্রীকান্ত সম্বন্ধে সকল স্বার্থবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়াছে? না, তাহারই একটা প্রচ্ছন্ন কামনার অধীর উদ্বেগের ফলে আজ শ্রীকান্তকেও ঐরূপ আত্মাপমান বা হীনতা স্বীকার করিতে হইল? এ কি তাহার সেই প্রেমেরই অত্যাচার নহে?

শ্রীকান্তকে রক্ষা করিবার, তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিবার এই যে একটা অধিকার সে ত্যাগ করিবে না—এ অধিকারই বা তাহাকে কে দিয়াছে? প্রেমের অধিকার? তাহার প্রেম কি সেই অধিকার পাইয়াছে? তবে কেন আরেক জন তাহার জন্য এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়—সে প্রেম তাহার পক্ষে বিষ হইয়া উঠে কেন?

রাজলক্ষ্মী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; একদিকে এই আত্মধিক্কার, অপরদিকে তাহার সেই দলিত পদাহত প্রেমের নির্লজ্জ মোহ-মাধুরী—এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে সে বিবশ হইয়াছে। শ্রীকান্ত যখন বলিল "তুমি স্বামী-সেবা করতে এসেছ, তোমার লজ্জা কি, রাজলক্ষ্মী?" তখন সেই পরিহাস-নিষ্ঠুর মিথ্যাই রাজলক্ষ্মীর কাণে মুহূর্তের জন্যও কি অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার শক্তি আমার নাই। তবু পড়িবার সময় রোমাঞ্চ হয়—অনুভব না করিলেও, কল্পনা করিতে পারি। যেন মশানে শূলবিদ্ধ অবস্থায় নিষ্ঠুর মৃত্যুও কাণের কাছে মুখ আনিয়া এমন একটি কথা শুনাইল যাহা জীবনব্যাপী চির-দুরাশার আশা-পূরণ; যাহা হয় নাই, কখনো হইত না, সেই নিষ্ফলতাই যেন সফলতার একটা ভান করিল! "How mad, how bad, how sad it was, yet it was sweet!"

আমি এই অঙ্কের এই দৃশ্যের একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিতেছি এইজন্য যে, ইহার পর এই অঙ্কে, গঙ্গামাটীতে উভয়ের ঘর-করণার যে বিড়ম্বনা-কাহিনী আছে, এবং তাহাতে রাজলক্ষ্মীর আচরণে যে দুর্ব্বোধ্যতা বা বিরোধাভাস আছে তাহার আর বিস্তারিত পরিচয়ের প্রয়োজন হইবে না, কেবল কয়েকটি দৃশ্য উদ্ধৃত করিলেই চলিবে। এবার সেই কাহিনীর আরম্ভ-সূচক একটি দৃশ্য এইখানেই উদ্ধৃত করিয়া দিই—সেই একই দৃশ্য, রেল-ষ্টেশনে যাত্রীশালার পূর্ব্বোদ্ধৃত দৃশ্য। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে শান্ত করিবার একটা উপায় স্থির করিয়াছে।—

> "সহসা এক সময় বলিয়া উঠিলাম, একটা কথা এখনো তোমাকে জানানো হয় নি, লক্ষ্মী।
> সে চুপি চুপি কহিল, কি কথা?
> ইহাই বলিতে গিয়া সংস্কারবশে প্রথমটা একটু বাধিল, কিন্তু—থামিলাম না, কহিলাম, আজ থেকে নিজেকে তোমার হাতে একেবারে সঁপে দিলাম, এর ভাল-মন্দর ভার এখন সম্পূর্ণ তোমার।
> বলিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সেই স্তিমিত আলোকে সে আমার মুখের পানে চুপ করিয়া চাহিয়া আছে। তারপর একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমাকে নিয়ে আমি কি কোরব?......"
>
> [তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৪-১৬]

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের মনোভাব যেমন বুঝিল, তেমনই তাহার অসহায় অবস্থা দেখিয়া নিশ্চয় করুণার্দ্র হইল, তাই নিজের কথা তখনকার মত তুলিয়া রাখিয়া সে

শ্রীকান্তের ঐ আত্ম-সমর্পণ ফিরাইয়া দিল না। শ্রীকান্ত কিন্তু নিজের মত করিয়াই বুঝিল, এবং খুসী হইল; ভাবিল, রাজলক্ষ্মী এইবার কৃতার্থ হইবে,—তাহাকে এমন করিয়া তাহার প্রেমের বাঁধনে বাঁধিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইবে। এ দিকে রাজলক্ষ্মী, প্রেমসম্পর্ক-হীন হইয়া—অর্থাৎ নিজের সকল কামনা ত্যাগ করিয়া—শ্রীকান্তের সেই ভার কি ভাবে বহন করিবে তাহা নিমেষে স্থির করিয়া ফেলিল। এবার তাহাকে তাহার পিয়ারী-বাইজীর জীবন ত্যাগ করিতে হইবে, সেই সমাজ এবং তাহার সেই সংসারটি হইতেও তাহাকে বিদায় লইতে হইবে,—এবং সম্পূর্ণ অজ্ঞাত-বাস করিতে হইবে। রাজলক্ষ্মীর এই ত্যাগের দিকটাও শ্রীকান্ত অবশ্য বুঝিল, তাই—সে সম্মত হইবা মাত্র, তাহার লাভের সঙ্গে ক্ষতির পরিমাণটাও চিন্তা করিয়া, সে পুনরায় রাজলক্ষ্মীর বদান্যতায় বিস্মিত হইল—কেমন যেন লজ্জা বোধ করিল।—

"বলিলাম, তবু ত' এই নিষ্ঠুরের জন্যই সর্ব্বত্যাগ করলে।

রাজলক্ষ্মী কহিল, সর্ব্বত্যাগ আর কই? নিজেকে তুমি ত' নিঃস্বত্ব হয়েই আজ আমাকে দিয়ে দিলে, সে ত আর চাইনে বলে' ত্যাগ করতে পারলাম না।" [ঐ]

"সে তো আর চাইনে বলে' ত্যাগ করতে পারলাম না"—ইহাই তাহার আত্মধিক্কার; এখনও সে সেই পূর্ণত্যাগের অধিকারী হয় নাই—তাহাই হইতে হইবে। সেই অসম্ভব, অর্থাৎ প্রেমের সেই স্ব-বিরোধী চেষ্টা—তাহাই লইয়া এ নাটকের পরবর্ত্তী অঙ্ক, তাহাতেই রাজলক্ষ্মীর আত্ম-দ্বন্দ্ব প্রায় শেষ হইয়াছে, তাহার সকল অভিমান চূর্ণ হইয়াছে।

এই অভিমান কথাটা বারবার আসিয়া পড়িতেছে—পাঠক-পাঠিকাদের তাহাতে বিরক্ত হইলে চলিবে না। অভিমান কথাটা একটা বড় আধ্যাত্মিক সমস্যার কথা—কেবল প্রেমের অভিমানই নয়। রাজলক্ষ্মীর এই যে অভিমান ইহার কারণ একটা নয়, তবু ইহার মূলে আছে তাহার চরিত্রেরই একটা বড় দোষ এবং গুণ। শ্রীকান্তের অপ্রেম ইহার কারণ নয়—সেই অপ্রেমকে সে জানে, এবং জয় করিয়াছে। ইহার কারণ সেই সতীত্বের সংস্কার—যাহা তাহার মত নারীর পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য। ইহাও একরূপ বিদ্রোহ—আত্মসচেতনতার বিদ্রোহ। অবস্থার দুশ্ছেদ্য পাকচক্রে যে জীবন তাহাকে বাধ্য হইয়া যাপন করিতে হইয়াছে, সেই জীবনই ভিতরে ভিতরে তাহার এই আত্মাভিমান, এই শুচিতাবোধকে উগ্র ও উদ্যত করিয়া তুলিয়াছে; তাই তাহার প্রেম—এমন প্রেমও—স্বাধীন, স্বয়ম্পূর্ণ আত্মসমাহিত নয়; কারণ, প্রেম যদি পূর্ণতা লাভ করে তবে তাহা আপন গৌরবে

আপনি মহিমান্বিত; কবি কীট্‌স্ (Keats) সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, প্রেমও ঠিক তাহাই—

'Tis the supreme of Power;
'Tis might half-slumbering on its own right arm.

রাজলক্ষীর প্রেম এই ঐশ্বর্য্য, এই পরিপূর্ণ শক্তির পথে বাধা পাইতেছে—তাহার হৃদয়ের এমন অমৃতফলও কীটদষ্ট হইয়াছে; সেই পাপবোধের দুর্ব্বলতা কিছুতেই ঘুচে না।. ঐ যে অভিমান, উহা সেই দুর্ব্বলতারই অপর দিক; উহাই তাহার প্রেমের অসম্পূর্ণতা, উহাই তাহার পাপ। কারণ, আসলে ঐ অভিমান একরূপ অহঙ্কার, কিন্তু ইহার জন্যও দায়ী সে নয়—তাহার সেই জন্মগত হিন্দু-সংস্কার। যখন সর্ব্বপাবক প্রেমও তাহাকে ঐ সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই, তখন বুঝিতে হইবে, তাহার তপস্যা এখনও অসম্পূর্ণ আছে, দহন এখনও শেষ হয় নাই।

এইখানে আর একটা কথা আসিয়া পড়িল, না বলিলে, শ্রীকান্তের পক্ষেও সব কথা বলা হয় না। রাজলক্ষীর প্রতি শ্রীকান্তের মনোভাব আর একটা কারণে কঠিনতর হইয়াছে। বর্ম্মায় অবস্থান কালে সে তাহার আদর্শের অনুরূপ একটি নারী-চরিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। অন্নদাদিদির সেই সতীত্ব-প্রভা ও সেই তপস্বিনী-মূর্ত্তি তাহাকে অনেকদিন আচ্ছন্নবৎ করিয়া রাখিলেও, সে অভয়াকে দেখিয়া যেন একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছিল। সতীত্বের সেই কঠোর সাধনা—আত্মহত্যার সেই অধ্যাত্ম-শক্তি—একটা অত্যুচ্চ আদর্শরূপে তাহার বালক-হৃদয়কে বড় গভীরভাবেই আকৃষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাতে আর কিছু দেখে নাই—প্রেমকে দেখে নাই, একটা শক্তিকেই দেখিয়াছিল। নারীর সেই শক্তিকেই সে পূজা করিয়াছে; সতীত্বও তাহার কাছে আর কিছু নয়, নারী-স্বভাবেরই বাধ্যতামূলক একরূপ চারিত্রিক দৃঢ়তা। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকান্তের মত অনুবেদনশীল, অনুকম্পাকাতর মানবের পক্ষে ইহাই একটা বিদ্রোহের কারণ হইয়া উঠা স্বাভাবিক। ঐরূপ কৃচ্ছ্রসাধনই যদি নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয়, তবে তাহাতে দুইটা মহৎ দোষকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, একটা—দুঃখেরই পূজা; আরেকটা—একরূপ সংস্কারের দাসত্ব, আত্মার বন্ধন। শ্রীকান্ত এই দুইটাকেই সহ্য করিতে পারে না; দুঃখমাত্রেই তাহাকে বিচলিত করে, অকারণ দুঃখ তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। আবার বন্ধনমাত্রেই তাহার শ্রদ্ধা হরণ করে। এইজন্যই সে যখনই—সেই প্রথম, অভয়ার মত একটি নারীর দর্শন লাভ

করিল, তখনই তাহার বহুদিনের একটা সংশয় মিটিল—তাহার প্রাণ যেন গভীর স্বস্তিবোধ করিল। অভয়ার মধ্যেই সে সর্ব্বপ্রথম পুরুষ-সুলভ দৃঢ়তা ও মনের মুক্তি—নারীচরিত্রেও সর্ব্বসংস্কার-জয়ের সহজ শক্তি—প্রত্যক্ষ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ দুইটা দুঃস্বপ্ন হইতে অব্যাহতির পথ পাইল,—একটা, অন্নদাদিদির সেই ভৈরবী-সাধনার নিদারুণ স্মৃতি; আরেকটি, রাজলক্ষ্মীর স্বৈরিণী-জীবনেও তাহার সেই দুঃখভোগের জন্য নিজের অস্বস্তিবোধ। অন্নদাদিদিকে সে সহজে বিদায় করিতে পারে নাই, তাহার কারণ, শ্রীকান্তের নিজেরই একটা দুর্ল্লঙ্ঘ্য সংস্কার। কিন্তু অভয়াকে দেখিবার পর রাজলক্ষ্মীর প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে অনুকম্পা অনুভব করিতে পারিয়া সে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। একটা জিনিস সে বরাবর লক্ষ্য করিয়াছে—রাজলক্ষ্মীর মন মুক্ত নয়, তাহার শুচিতা-সংস্কার অতিশয় প্রবল; সে নিজে অসতী বলিয়াই সতীত্বের প্রতি তাহার এমন আত্যন্তিক শ্রদ্ধা। আসলে, তাহার প্রেমও আর কিছু নয়—তাহার সেই আত্মশুদ্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একটা কৃচ্ছ্র-সাধন মাত্র। শ্রীকান্তের প্রতি তাহার ঐ প্রেম যদি প্রবল, গভীর ও দুঃখকর হয়, তথাপি তাহার মনে আছে একটা বন্ধন; তাহাতে সেই মনের মুক্তি নাই যাহা থাকিলে মানুষ কোন কিছুর দাস হয় না—নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিয়া, অর্থাৎ কোনরূপ প্রেমের বশীভূত না হইয়া, কেবল অনুকম্পার বশে পরের দুঃখ মোচন করে; তাহাই মানুষের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহাতেই নিষ্কলঙ্ক নিঃস্বার্থতা প্রকাশ পায়—যেমন অভয়ার। অভয়ার কথা আমি পরে বলিব; এইখানে এইটুকু বলিবার প্রয়োজন ছিল, নহিলে রাজলক্ষ্মীর প্রতি শ্রীকান্তের এই অপরিবর্ত্তনীয় মনোভাবের কারণ বুঝিতে পারা যাইবে না।

এই প্রসঙ্গে পাঠক-পাঠিকার মনে দুই একটি প্রশ্ন জাগিতে পারে—অবশ্য যদি তাঁহারা আমার এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মনোযোগের সহিত অনুসরণ করিয়া থাকেন। রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে শ্রীকান্তের ঐ মনোভাব তাহার আচরণেও এমন প্রকাশ পাইয়াছে যে, সে যেন রাজলক্ষ্মীর ঐ ব্রত-উপবাস, অর্থাৎ সাত্ত্বিক জীবন-যাপনের নানা প্রমাণ সত্ত্বেও, তাহার ঐরূপ চেষ্টাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না; উহাও একরূপ বাড়াবাড়ি—দুর্ব্বলতার সহিত সংগ্রাম বলিয়াই মনে করে; অতএব পদস্খলনের সম্ভাবনাও আছে। রাজলক্ষ্মীর সেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্য বা বৈধব্যপালন শ্রীকান্তকে কতকটা খুসী করিলেও, ঐরূপ অতিরিক্ত নিষ্ঠা তাহার মনকে বিরূপ করিয়া তোলে। উহাতে যেন একটা আত্ম-গরিমার ভাব আছে; হয়তো তাহা সত্য। শ্রীকান্তের চক্ষে তাহার কারণ আর কিছুই নয়—পতিতার পাপ-দুর্ব্বল চিত্তের সেই

সংস্কার-বশ্যতা। এইজন্যই রাজলক্ষ্মীর তুলনায় অভয়া শ্রীকান্তের চক্ষে বারবার মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছে।

এইখানে আরেকটি কথার উল্লেখ করিতে হইবে—এই প্রসঙ্গে তাহার আবশ্যকতা আছে। এই উপন্যাস-পাঠকালে পাঠক-পাঠিকাদের মনে নিশ্চয়ই একটা প্রশ্ন উঁকি দিয়াছে—শ্রীকান্তের সহিত রাজলক্ষ্মীর যে ব্যবহার তাহা খাঁটি স্বামী-স্ত্রী-সম্বন্ধের মত; কিন্তু তাহা কি দেহসম্পর্কশূন্য? অতখানি ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও রাজলক্ষ্মীর এমন দূরত্ব-রক্ষা—অতিরিক্ত সতী-পনা বলিয়াই মনে হইতে পারে। অসতীর এইরূপ সতীপনা, শরৎচন্দ্রের কোন কোন উপন্যাসের নায়িকাতেও দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, আমাদের দেশের প্রবীণ সম্প্রদায় এককালে লেখকের উপরে যৎপরোনাস্তি নির্দ্দয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। এখানেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। মনে রাখিতে হইবে, উভয়ের কেহই বৃদ্ধ, এমন কি প্রৌঢ়ও নয়; আবার রাজলক্ষ্মীর তখন পূর্ণ-যৌবন। এক স্থানে শ্রীকান্ত নিজেই এ বিষয়ে সকল সন্দেহের নিরসন করিয়া দিয়াছে—যদিও তৎসত্ত্বেও ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়; সে আলোচনা পরে করিতেছি। শ্রীকান্ত বলিতেছে—

"ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কথা কেবল মনে হইতে লাগিল, পিয়ারী বিরক্ত হইল কেন? এমন কি করিয়াছি যাহাতে সে আমার যাওয়ার জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে? সে যে অত্যন্ত সংযমী ও বুদ্ধিমতী, সে পরিচয় আমি বহুবার পাইয়াছি; এবং আমার নিজেরও বুদ্ধি না থাক্, প্রবৃত্তি সম্পর্কে সংযম তার চেয়ে কম নয়। বুকের মধ্যে যাই হোক, মুখ দিয়া তাহাকে বাহির করিয়া আনা আমার অতিবড় বিকারের ঘোরেও সম্ভব বলিয়া মনে করি না। ব্যবহারেও কোনদিন কিছু ব্যক্ত করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। তাহার নিজের কার্য্যের দ্বারা লজ্জার হেতু কিছু ঘটিয়া থাকে ত সে আলাদা কথা, কিন্তু আমার উপর রাগ করিবার তাহার কিছুমাত্র কারণ নাই।"

[প্রথম পর্ব্ব, পৃঃ ১৭৫-৭৬]

এমন কথার উল্লেখ এই একবার মাত্র আছে, যদিও একত্র বাসকালে তাহারা যে ভিন্ন ঘরে পৃথক শয্যায় শয়ন করিত, তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সর্ব্বত্র আছে। উপরি-উদ্ধৃত উক্তিটিতে শ্রীকান্তের অভিযোগ অন্যরূপ বটে, তথাপি, ইহাতেই রাজলক্ষ্মীর আচরণে তাহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগার প্রমাণ রহিয়াছে—রাজলক্ষ্মীর ঐ 'সংযম' ও শুচিতার সাধনাকে শ্রীকান্ত কেমন চক্ষে দেখে তাহার প্রমাণ ইহার পরে আর এক উক্তিতে আছে। আর একস্থানে শ্রীকান্ত বলিতেছে—

"আমি চলিলাম অন্যত্র। আমারই মত যে কলুষের পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছে, ভালো হইবার আর পথ নাই, সেই অভয়ার আশ্রয়ে।...অভয়ার চিঠি পাইয়াছি। স্নেহে প্রেমে করুণায় অটল অভয়া, ভগিনীর অধিক—বিদ্রোহী অভয়া আমাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়াছে।"

[ঐ, পৃঃ ২১৫]

শ্রীকান্তের এই অভিমান যেমন বিসদৃশ, তেমনই প্রবল। এই উপন্যাসের আদ্যন্ত, রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে নায়ক শ্রীকান্তের এই যে অবুঝ-পনা ইহাই এ কাহিনীকে এমন বাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর পরিচয় যথাযথ করিবার জন্য তাহার আগ্রহও যেমন—তাহার চরিত্র-চিত্রটি নিখুঁত করিয়া আঁকিবার চেষ্টা যেমন সে করিতেছে, তেমনই, সেই রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে তাহার নিজের ধারণাও অসংকোচে এবং অসংশয়ে প্রকাশ করিতেছে। এখানে নায়ক ও লেখক একই ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও (যেমন অনেক উপন্যাসে ঐরূপ শিল্পরীতি অবলম্বন করা হয়) নায়ক-চরিত্র একরূপ, এবং লেখকের উক্তি বা সমালোচনা আরেক রূপ; এই যে বিরোধ, ইহা নায়ক-চরিত্রেরই একটি পরিকল্পিত লক্ষণ বলিয়া মনে হয় না; বেশ বুঝিতে পারা যায়, এ কাহিনীর পিছনে শুধু শিল্পী নয়, মানুষটাও রহিয়াছে; সে কেবল কাহিনী রচনাই করিতেছে না,. নিজের কথাও বলিতে চাহিয়াছে। এই কথাই আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি—কথাটা বড় প্রয়োজনীয়, তাই বার বার উল্লেখ করিতে হইতেছে। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে যেমন, নিজেকেও তেমনই, যতদূর সাধ্য ভ্রমশূন্য করিয়া চিত্রিত করিতেছে,—রাজলক্ষ্মীর দিকটাও সে আমাদিগকে দেখাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিজের ধারণা ও মতামত কিছুমাত্র গোপন করিতেছে না। ইহার ফলে, আমাদের বড় সুবিধা হইয়াছে—শ্রীকান্তের নিজের দুর্ব্বলতা ও ভুলগুলাই (ভুল সে স্বীকার করে, কিন্তু আত্মসংশোধন করিতে পারে না) রাজলক্ষ্মীর স্বাতন্ত্র্য তথা চরিত্রের বাস্তবতাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তোলে। রাজলক্ষ্মীকে সে যেমন শিল্পীর দৃষ্টিতে তাহারই মত করিয়া চিত্রিত করিতেছে—সেই objective দৃষ্টি তাহার আছে, তেমনই নায়ক-চরিত্র-চিত্রণে সে অতিশয় subjective—আত্মভাবান্ধ। এইজন্য এ কাহিনী একাধারে একটি Confession এবং উৎকৃষ্ট রস-রচনাও (work of art) বটে।

রাজলক্ষ্মীর চরিত্র আমি এ পর্য্যন্ত এই কাহিনী হইতেই যাহা উদ্ধার করিয়াছি তাহাতে আশা করি, আমি কোন যুক্তিহীন স্বকীয় কল্পনার বশবর্ত্তী হই নাই। ইহাও লক্ষ্য করা যাইবে যে, আমার ঐ ধারণা শ্রীকান্তের ধারণার প্রায় বিপরীত। রাজলক্ষ্মীর এবারকার ঐ সংকল্প—অর্থাৎ শ্রীকান্তের ঐরূপ ভার গ্রহণ করিয়া একটা নূতন পথে আত্মশুদ্ধির ঐ সংকল্প—শ্রীকান্ত কোন্ চক্ষে দেখিয়াছে তাহা বলিয়াছি, প্রমাণস্বরূপ তাহার দুই একটি কথাও এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। রাজলক্ষ্মীর হাতে সে যে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল কি কারণে, তাহা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীকান্ত নিজেও বলিতেছে—

"সহসা মনে হইল, ইহাকে আমি কোনদিন ভালবাসি নাই। তবু ইহাকেই আমাকে ভালবাসিতে হইবে, কোঁথাও কোনদিকে বাহির হইবার পথ নাই। পৃথিবীতে এতবড় বিড়ম্বনা কি কখনো কাহারো ভাগ্যে ঘটিয়াছে? (৩য় পর্ব্ব, পৃঃ ২৫)"

গঙ্গামাটিতে আসিয়া তাহার নিজের মনের অবস্থা এই। রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে তাহার আশঙ্কাও কম নয়, পাছে তাহার মোহ ভাঙিয়া যায়, সে তাহাকে একটা বোঝা মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়, তাই শ্রীকান্ত বলিতেছে—

"বেশ স্পষ্ট নয় বটে, কিন্তু তবু যেন দেখিতে পাই, তাহার যে দুর্দ্দম কামনা এতদিন অত্যুগ্র নেশার মত তাহার সমস্ত মনটাকে উতলা উন্মত্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সে যেন আজ স্থির হইয়া তাহার সৌভাগ্যের, তাহার এই প্রাপ্তিটার হিসাব দেখিতে চাহিতেছে; কিন্তু শূন্য ছাড়া আর কিছুই যদি দেখিতে না পায় ত' কেমন করিয়া কোথায় গিয়া যে আবার আমি—" ইত্যাদি।

[ঐ, পৃঃ ৬৬-৬৭]

আরও আছে—

"পিয়ারী সত্য সত্যই নিঃশেষ হইয়া মরিয়াছে, এবং তাহারই কৃতকর্ম্মের (অর্থাৎ শ্রীকান্তের ভার লওয়া) দুঃসহ ভারে আজ রাজলক্ষ্মীর সর্ব্ব দেহ-মনে যে বেদনার আর্ত্তনাদ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সম্বরণ করিবার পথ সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।" [ঐ, পৃঃ ১৪১]

পিয়ারীর "দুর্দ্দম কামনা", "প্রাপ্তিটার হিসাব" এইসব কথা হইতেই রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে শ্রীকান্তের মনোভাব নিঃসংশয় রূপে জানিতে পারা যায়,—এ মনোভাব তাহার কখনো ঘুচে নাই, সে কখনো রাজলক্ষ্মীর সেই প্রেমকে, ও সেই প্রেমের মর্য্যাদাকে স্বীকার করে নাই। নাটকের এই অঙ্কে—এই 'গঙ্গামাটি'-অধ্যায়ে, শ্রীকান্ত নিজ চরিত্রের অপর দিকটার—তাহার হীনতা ও দুর্ব্বলতার—পূর্ণ পরিচয় দিয়াছে। এজন্য এই অঙ্কই এ নাটকের ট্র্যাজিক পরিসমাপ্তির পূর্ব্ব-সঙ্কেত।

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ঐ আচরণ আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয় —নারী-চরিত্রের পক্ষেও যেমন, তাহার সেই সুমহান্ প্রেমের পক্ষেও তেমনই। রাজলক্ষ্মীর জীবন ও জীবিকা যেমনই হোক, সে যে সাধারণ নারী অপেক্ষা উচ্চ-স্তরের, তাহা আমরা প্রথম হইতেই বুঝিয়াছি, সে যে সাধারণ পতিতা নারী নয়, ইহাও অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারি। আবার, শ্রীকান্তের সহিত ব্যবহারে তাহার যে দৈহিক-সংযমশীলতার কথা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাও একজন সুস্থ বা normal নারীর পক্ষে আদৌ অসম্ভব নহে। এইখানে, আর একটি কথা আমাকে দৃঢ়ভাবে বলিয়া রাখিতে হইবে। নারীর যৌন-প্রকৃতি পুরুষের মত নয়; বরং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়াই, পুরুষ নিজ সংস্কারবশে তাহাকে চিরদিন ভুল বুঝিয়া থাকে, নিজেরই যৌন-প্রবৃত্তির মোহে নারী-সম্পর্কে নানা গুরুতর প্রমাদের বশীভূত হয়। সে তাহার দৈহিক ও সামাজিক প্রভুত্বের বলে নারীকে নিজের যৌন-ধর্ম্মের অধীন করিয়া—নারীর ধর্ম্মকে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ

বিকাশের সুযোগ না দিয়া—যে বিকৃতি ঘটায়, তাহার জন্ত নারীকেই দায়ী করে; যাহা সম্পূর্ণ তাহারই subjective—তাহাকেই objective, অর্থাৎ নারীঘটিত বলিয়া, সে আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত যে লালসার জাল বয়ন করিয়াছে, তাহাতে নিজেকেও যেমন জড়াইয়া মরে, তেমনই নারীকে সেই জালের গ্রন্থন-রজ্জু বলিয়া সুসংস্কৃত ভাষায় কুৎসিত গালি রচনা করিয়াছে। এই যে সংস্কার, ইহারই বশে আমরা রাজলক্ষ্মীর ঐ ব্যবহারকে একটা কৃত্রিম 'সতীপনা' বলিয়াও মনে করিতে পারি; উহা যে নারীর পক্ষে কত সহজ ও স্বাভাবিক তাহা ধারণা করিতেও পারি না। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর ঐ যে সংযম—প্রেমের আত্মত্যাগ হিসাবে ত' নহেই—উহাই শ্রীকান্তের অবিশ্বাসের একটা বড় হেতু হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীকান্ত যে নারী-পুরুষের যুগল-প্রেমে বিশ্বাসী নয়, রাজলক্ষ্মী তাহা জানে; ঠিক সেই কারণেই তাহাকে আরও কঠোরভাবে আত্মসংবরণ করিতে হইয়াছে। সে জানে, ঐ নির্ম্মম, উদাসীন, আত্মাভিমানী পুরুষ তাহার ঐরূপ দান গ্রহণ করিবে না—বিশেষ করিয়া, সে তাহার চক্ষে পতিতা, অর্থাৎ দেহে-মনে অশুচি। এই জন্ত তাহার প্রেম—এত বড় প্রেমও—প্রবাহিত হইবার পথ পায় না, দেহের তটবন্ধন ভাঙ্গিয়া অকূল সাগর-বন্যায় মোক্ষ-স্নান করিবার উপায় তাহার নাই। এই যে অবস্থা, ইহাই তো এই আর একটি প্রেম-কাহিনীকে এমন অনন্য-সাধারণ করিয়া তুলিয়াছে। মহানাটকের নাট্যরসিক মহাকবি যিনি, তাঁহার অফুরন্ত কল্পনায় কত নিত্য-নূতন নাটকীয় সংঘটনের সৃষ্টি হইতেছে! একটি নর ও একটি নারী, এই দুইটি মাত্র কুশীলব লইয়া যে অন্তহীন অভিনয় চলিতেছে, তাহাতে সেই শিল্পী-যাদুকরের অতি-চতুর, অতি-কুটিল রসবুদ্ধির কৌশলে নব নব রস-স্ফুলিঙ্গের অন্ত নাই।

রাজলক্ষ্মীর প্রেম তাহার অসতী-দেহের নির্জ্জন নিঃসঙ্গ মশানে ক্রুশবিদ্ধ হইয়া আছে—সেই ক্রুশ হইতে অবতরণ, সেই কলঙ্ক-প্রক্ষালনই তাহার একমাত্র সাধনা, উহাই তাহার ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার প্রেম বদ্ধ-স্রোত বলিয়াই, সেই প্রেমেরই অবারিত প্রবাহে ঐ কলঙ্ক ধৌত হইয়া যাইতেছে না—সে আপনাকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছে না। তাহার পাপ-সংস্কার ঘুচে নাই, তাহারও কারণ তাহার নিজেরই চরিত্র—প্রখর আত্ম-চেতনা, দুর্জ্জয় আত্মাভিমান। এই আত্মাভিমান ঐ একটি ঘটনায় পূর্ণ-জাগরিত হইয়াছে; তাহারই সহিত এইবার যে সংগ্রাম সুরু হইল, ইহাই শেষ সংগ্রাম, ইহাই তাহার শেষ পরীক্ষা। ঐ সংগ্রাম তাহার একার, শ্রীকান্তের নিকট হইতে কোন সহায়তাই সে আশা করে

না। শ্রীকান্ত তাহার ঐ নিয়ম-নিষ্ঠাকে, এমন কি, তাহার ঐ ব্রহ্মচর্য্যকে একটা বন্ধন-বশ্যতা বলিয়াই মনে করে,—তাহার পূর্ব্বজীবনের স্বৈরিণী-সংস্কারেরই একটা অবশ্যম্ভাবী শুচিতা-ব্যাধি বলিয়া মনে করে; এবং এ বিষয়ে অভয়ার সহিত তুলনা করিয়া তাহাকে একটা অতিসাধারণ কুসংস্কারপীড়িতা নারী বলিয়া অশ্রদ্ধাই করে। অথচ, শ্রীকান্ত তাহার মুখে এমন কথাও শুনিয়াছে, এবং তাহা ভালো করিয়াই লিপিবদ্ধ করিয়াছে—

"আশা ছিল একদিন আমার পাপ ক্ষয় হবে, আমি নিষ্পাপ হব। এ লোভ কেন জানো? স্বর্গের জন্য নয়—সে আমি চাইনে। আমার কামনা, মরণের পরে যেন আবার জন্মাতে পারি। বুঝতে পারো, তার মানে কি?" [৪র্থ পর্ব্ব, পৃঃ ৭৩]

শ্রীকান্ত 'তার মানে' বুঝিতে পারে, কিন্তু প্রাণে মানে না। কিন্তু ঐ কথাগুলির মধ্যে সেই ক্রুশবিদ্ধ নারী-হৃদয়ের যে কাতর-শ্বাস বহিতেছে, পৃথিবীর কোন কবির কাব্যে কোন নায়িকার মুখে তাহা অপেক্ষা মর্ম্মন্তুদ কিছু বাহির হইয়াছে?

অপরদিকে, রাজলক্ষ্মীর চরিত্রে, তাহার প্রেমেও যে একটি অটল আত্মস্থতা আছে, তাহাই শ্রীকান্তের পক্ষে, তাহার নিজেরই অবস্থার দোষে, অসহনীয় হইয়া উঠে। বিশেষ করিয়া তাহার সম্পর্কে রাজলক্ষ্মীর ঐ দৈহিক ব্যবধান রক্ষার প্রয়াস শ্রীকান্তকে আরও অবিশ্বাসী করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সে যে উহা কামনা করে তাহা নয়। কিন্তু তাহার সহজ পুরুষ-সংস্কারে বুঝিতে পারে, ঐ আচরণ রাজলক্ষ্মীর মত নারীর পক্ষে একরূপ উগ্র আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা; এবং তাহার মতে ইহার কারণ দুইটি,—প্রথম রাজলক্ষ্মীর প্রেম যেমনই হোক, তাহাতে মনের মুক্তি নাই; দ্বিতীয়তঃ, সে সত্যই নিজেকে দান করে নাই, সে অতিশয় আত্মপরায়ণ; তাহার সংসারের সকলই—এমন কি শ্রীকান্তও—তাহার সেই আত্মগত সাধনার উপকরণ মাত্র।

শ্রীকান্তের এই ধারণা যে কখনো ঘুচিয়াছিল, এমন মনে হয় না। রাজলক্ষ্মীর দেহ-মনের সৌন্দর্য্য তাহাকে বিস্মিত এবং প্রশংসা-মুখর করিয়াছে সত্য; তাহার স্নেহ, যত্ন, সেবা, এবং তাহার দাক্ষিণ্য ও চিত্তের উদারতা তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে; এমন কি, রাজলক্ষ্মীর প্রাণের ব্যাকুলতা, তাহার বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত জীবনের যত কিছু ব্যথা, বেদনা ও অভিশাপ সকলই সে অনুভব করিয়াছে, কিন্তু সে রাজলক্ষ্মীকে ভালোবাসিতে পারে নাই। অথচ, এই প্রেম-বিমুখ, একান্ত আত্মমুখী, উদাসীন মানুষটিকে প্রেম-সাধনার শ্রেষ্ঠ বিগ্রহরূপে ভজনা করিয়া রাজলক্ষ্মী শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

চতুর্থ অঙ্ক—তপস্বিনী

Canst thou not minister to a mind diseased,
Pluck the memory of a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain ?

—*SHAKESPEARE*

এইবার কয়েকটি দৃশ্য উদ্ধৃত করিব; যাহা বলিবার তাহার সবই ইতিপূর্ব্বে সবিস্তারে বলিয়া লইয়াছি, তবু দৃশ্যহিসাবে এগুলিও চাই—কাব্যহিসাবেও অপূর্ব্ব! শ্রীকান্তকে লইয়া রাজলক্ষ্মী তাহার গঙ্গামাটির জমিদারীতে নূতন বাসস্থাপন করিয়াছে, সেটা হইয়াছে তাহার তপস্যার অগ্নিক্ষেত্র। সেখানকার সেই 'বায়ুভূত নিরালম্ব' অবস্থায় সে ছুইটি অবলম্বন-রজ্জু পাইয়াছিল, এক—পথে কুড়াইয়া পাওয়া একটি ভাই, স্বদেশী-ব্রতের নবীন সন্ন্যাসী; তাহার নাম রাখিয়াছিল, আনন্দ। এই মানুষ-আনন্দটিই তাহার তপস্যার অগ্নিতাপকে একটু শীতল ও সহনীয় করিয়াছিল; সেই প্রাণবান, মানব-প্রেমিক যুবা সন্ন্যাসীকে ভগবান ঐরূপ মিলাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই সেই নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে রাজলক্ষ্মীর প্রাণে একটু আলোকরেখা প্রবেশ করিত। আরেকটি ছিল—সেখানকার কুশারী-পরিবার, বিশেষ করিয়া তাহাদের বধূ, সুনন্দা। এই সুনন্দাকে সে তাহার আত্ম-বলিদানের যূপ-স্তম্ভের মত প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়াছিল; কারণ, ঐ মেয়েটি প্রেম-প্রীতি, করুণা-মমতা সম্পূর্ণ জয় করিয়া, ন্যায়-সত্যের সুকঠিন নীতি-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল—সে যেন অন্ধ ন্যায়-নিষ্ঠা বা ধর্ম্মাভিমানের একটি সাকার বিগ্রহ। রাজলক্ষ্মী নিজ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা জয় করিবার জন্য ঐ কঠোর আত্মাভিমানিনী তেজস্বিনী রমণীকে তাহার গুরু করিয়া লইল; ইহাও ভগবানের জুটাইয়া দেওয়া বটে, কিন্তু সে আরেক প্রয়োজনে—তাহার আত্ম-পরীক্ষা ও শেষ-শিক্ষার উপায়রূপে। সে তাহাকে পরে চিনিয়াছিল, তবু সে সময়ে তাহাকেই যে বড় প্রয়োজন! শ্রীকান্তও তাহাকে চিনিয়াছিল তাহার মনোগত আদর্শের একটি মহনীয় দৃষ্টান্তস্বরূপে; পরে রাজলক্ষ্মীর মুখে কুশারী-গৃহিণী ও সুনন্দার তুলনামূলক সমালোচনা শুনিয়া কিছু বিমূঢ়

হইয়াছিল। শ্রীকান্তও ভুল করিয়াছিল, কিন্তু রাজলক্ষ্মী করে নাই; শ্রীকান্ত এমন ভুল আরও করিয়াছে, সে কথা যথাস্থানে বলিব। ইহার কারণ, রাজলক্ষ্মীর হৃদয় তাহাকে ভুল করিতে দেয় নাই; শ্রীকান্ত হৃদয়বান হইলেও সে আত্মনিষ্ঠ এবং অনাসক্ত, সে প্রেমিক নয়—Idealist ; Idealist ভুল করে, প্রেম ভুল করে না। এইবার গঙ্গামাটির কাহিনী শেষ করি। রাজলক্ষ্মীর ঐ তপস্যা শ্রীকান্তকে কোন্ বিষয়ে কিরূপ নিঃসংশয় করিয়াছিল, তাহার জবানীতেই আমি পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি; ইহার পর কয়েকটি দৃশ্যমাত্র তুলিয়া দিব।

ব্রত উপলক্ষ্যে রাজলক্ষ্মী ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি লইয়া বড় ব্যস্ত ছিল, এ কারণে শ্রীকান্তের প্রতি তাহার সাম্প্রতিক অবহেলা আজ যেন একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছে; দৃশ্যটি সেই দিনের।

"কাজকর্ম্ম সারিয়া নিঃশব্দপদে রাজলক্ষ্মী যখন গৃহে প্রবেশ করিল তখন রাত্রি বোধ হয় দশটা। আলো কমাইয়া অত্যন্ত সাবধানে আমার মশারি ফেলিয়া দিয়া সে নিজের শয্যায় গিয়া শুইতে যাইতেছিল, আমি কথা কহিলাম। বলিলাম, তোমার ব্রাহ্মণ-ভোজনের পালা তো সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শেষ হয়েছে; এত রাত হ'ল যে?

রাজলক্ষ্মী প্রথমে চমকিত হইল, পরে হাসিয়া কহিল, আ আমার কপাল! আমি ভয়ে ভয়ে আসছি পাছে তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিই। এখনো জেগে আছ, ঘুমোও নি যে বড়?

তোমার আশাতেই জেগে আছি।

আমার আশায়? তবে ডেকে পাঠাওনি কেন? এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া মশারীর একটা ধার তুলিয়া আমার শয্যার শিয়রে আসিয়া বসিল। বরাবরের অভ্যাসের মত আমার চুলের মধ্যে তাহার দুই হাতের দশ আঙুল প্রবেশ করাইয়া দিয়া বলিল, ডেকে পাঠাও নি কেন?

ডেকে পাঠালেই কি আসতে? তোমার কত কাজ।

হোক কাজ। তুমি ডাকলে না বলতে পারি এমন সাধ্যি আছে আমার?

* * * *

রাজলক্ষ্মী কহিল, চুপ করে রইলে যে?

ভাবচি।

ভাবচো? কি ভাবচো? এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে আমার কপালের উপরে তাহার মাথাটি ন্যস্ত করিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার উপরে রাগ ক'রে বাড়ী থেকে চ'লে গিয়েছিলে যে বড়?······

রাজলক্ষ্মী নীরব হইয়া রহিল। পূর্ব্বে হইলে সে আমাকে সহজে অব্যাহতি দিত না, লক্ষকোটি প্রশ্ন করিয়া ইহার কৈফিয়ৎ আদায় করিয়া ছাড়িত, কিন্তু এখন সে মৌনমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে সে মুখ তুলিয়া অন্য কথা পাড়িল। [তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৮৯-৯০]

রাজলক্ষ্মীর এই মনোভাব যেমন সূক্ষ্ম, তেমনই জটিল বটে। তবু তাহার তপস্যা যে কেমন তপস্যা তাহার একটু আভাস ইহাতেও পাওয়া যায়। সে যে কঠোর হইতে চেষ্টা করিতেছে তাহা শ্রীকান্তের প্রতি নয়—নিজের প্রতি, এবং তাহাতেও সে প্রেমকে কিছুমাত্র অস্বীকার করিবে না, সেই প্রেমেই একটা কঠিন

নির্লিপ্ততার সাধনা করিতেছে, সকল স্বার্থকে সেই প্রেম হইতে নিষ্কাশিত করিবার জন্য সে এইবার চরম আত্মনিগ্রহ আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীকান্তের প্রতি তাহার সেই মমতা, তাহার সুখ-অসুখের ভাবনা ও সেবা-শুশ্রূষার কামনাও ত্যাগ করিতে সে কৃতসংকল্প হইয়াছে। শ্রীকান্তের যদি তাহাকে প্রয়োজন থাকে তবে সেই প্রয়োজন সে পালন করিবে কিন্তু সম্পূর্ণ আত্ম-প্রয়োজন-মুক্ত ভাবে; এবং সেজন্য সে শ্রীকান্তের মুখাপেক্ষা করিবে না, তাহাকে কোনদিকে কোন প্রকারে বাধ্য বা বদ্ধ রাখিবে না। ইহার মধ্যে যে কতবড় ফাঁকি আছে তাহা সে এখনও বুঝিতে পারে নাই; মূলব্যাধিটাকে বাঁচাইয়া রাখিয়া সে তাহার উপসর্গগুলা দূর করিতে চায়—যাহা "মর্ম্মে বিজড়িত-মূল" তাহাকে উৎপাটন করিবে না, অথচ তাহার দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে চায়। কিন্তু বেচারী যে আর পারে না—এমন সঙ্কটে আর কেহ কখনো পড়িয়াছে! অতঃপর শ্রীকান্ত সম্বন্ধে সে এই মনোভাব অভ্যাস করিতেছে—"If I love you what is that to you?"—

> "রাজলক্ষ্মী আঁচলে নিজের চোখ মুছিয়া বলিল, তুমি বিদেশে চাকরি নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছ আমাকে একথা জানাও নি কেন? তুমি কি ভেবেছ, আমি বাধা দেবো?……তুমি যাও, তোমাকে আমি কিছুতেই বারণ করব না।……এখানকার এই কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবন তো তোমার আত্মহত্যার সমান। এ আমি চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।
>
> জিজ্ঞাসা করিলাম, কেউ কি তোমায় দেখিয়ে দিয়েছে?
>
> রাজলক্ষ্মী বলিল, না। আমি নিজেই দেখেছি। তীর্থযাত্রা করেছিলাম, কিন্তু ঠাকুর দেখতে পাইনি। তার বদলে কেবল তোমার লক্ষ্যহারা বিরস মুখই দিনরাত্রি চোখে পড়েছে। আমার জন্যে তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু আর না।" [ঐ, পৃঃ ১৯২-৯৩]

এই শেষের কথাগুলিতে রাজলক্ষ্মীর প্রাণের বেদনা ও প্রেমের কারণ দুইই প্রকাশ পাইয়াছে। আবার সেই কথাই বলি। শ্রীকান্ত-চরিত্রের একটা দিক রাজলক্ষ্মী যেমন বুঝিয়াছে তেমন আর কেহ বুঝিবে না। সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে তাহার কোন হৃদয়-বন্ধন নাই, তাহা সে জানে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই নারী মজিয়াছে—অর্থাৎ প্রেমের প্রতিদান বা সর্ব্বপ্রকার স্বার্থসুখের আশা ত্যাগ করিয়াই সে প্রেমে পড়িয়াছে। তবু মানুষের প্রাণ, বিশেষ করিয়া নারীর প্রাণ বোঝে না—অতবড় ত্যাগ স্বীকার করিয়াও, প্রাণের মমতা কিছুতেই ঘোচে না। এখানে আরও একটা কারণ রহিয়াছে, রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছে, শ্রীকান্তের জীবনও শূন্য—সে-ও একরূপ আত্মহত্যা করিতেছে; নিজের দেহটার প্রতিও তাহার কোন মমতা নাই; শুধু তাহাই নয়—শ্রীকান্ত বালকের মতই দুর্ব্বল, নিরুপায় ও ভাবনাহীন, তাহার দুঃসাহসও বালকের মত। সে সত্যকার সন্ন্যাসী নয়; তাহার জীবনে কোথাও একটা বড় অভাব আছে, নিজেও তাহা বুঝিতে পারে না; কিংবা

সে হয়তো জানে, সে অভাব এত বড় যে সংসার তাহা পূরণ করিতে পারে না; সেই বিশ্বাসই তাহাকে যেমন অপর সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহাকে এমন আত্মমুখী করিয়াছে—তেমনই, একটা ক্লান্তিকর, আশাহীন, লক্ষ্যহীন জীবনে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর ভালবাসার মূলে যেমন শ্রীকান্ত-চরিত্রের ঐ নিস্পৃহ সংসারবিমুখতার পুরুষ-সুলভ আধ্যাত্মিক আদর্শ, তেমনই সেই ভালবাসার কারণেই সে শ্রীকান্তের ঐ বিরস মুখ এমন স্পষ্ট দেখিতে পায়, তাহার নিজের প্রেমের বেদনাকেও ছাপাইয়া উহার বেদনাই রাজলক্ষ্মীকে এমন আতুর করিয়া তোলে। আজ সে তাহার হৃদয় হইতে সেই বেদনাকেও ছিঁড়িয়া ফেলিবে; শ্রীকান্তের নিয়তি তাহাকে যে-পথেই লইয়া যাক সে ভাবনা আর করিবে না, সে শ্রীকান্ত-জীবনের সেই শূন্যতা ও ব্যর্থতার কথা ভাবিয়া আর উৎকণ্ঠিত হইবে না। সে ইহাও বুঝিয়াছে যে, শ্রীকান্তকে সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নবিপদ হইতে রক্ষা করিয়া—জীবিকার চিন্তা হইতেও মুক্ত করিয়া—তাহার মনকে স্বাধীন নিশ্চিন্ত অবসর দিবার এই যে ব্যবস্থা সে করিয়াছে, ইহাও তাহার সেই অতি-চঞ্চল ভবঘুরে প্রকৃতির পক্ষে একটা নিদারুণ বন্ধন, অতএব অস্বাস্থ্যকর। ইহাও সে বুঝিয়াছিল যে, শ্রীকান্ত যে তাহার নিকট ঐরূপ আশ্রয় চাহিয়াছে, তাহার সকল ভার রাজলক্ষ্মীকে লইতে বলিয়াছে—সে তাহার নিজের জন্য নহে, রাজলক্ষ্মীর প্রতি করুণার বশেই সে যেন একরূপ আত্মবলিদান করিয়াছে, রাঙামাটিতে আসিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই রাজলক্ষ্মী এই সত্যটা প্রত্যক্ষ করিয়াছে। তাই রাজলক্ষ্মী তখনই স্থির করিয়াছিল, সে সজ্ঞানে, নিজের লোভের বশে শ্রীকান্তের সাহচর্য্য আর করিবে না—তাহার সান্নিধ্য রক্ষা করিয়াই নিজের সেই আত্মনিগ্রহের তপস্যাকে আরও সফল করিয়া তুলিবে।

শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে কখনও বুঝে নাই; তার কারণ, সে তাহাকে অন্তরের অন্তরে শ্রদ্ধা করিতে পারে নাই—তাহা আমরা দেখিয়াছি। গঙ্গামাটিতে আসিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে নিজের ভুল সংশোধন না করিয়া রাজলক্ষ্মীকে আরও ভুল বুঝিল, তাহার সেই অদ্ভুত অভিমান আরও বাড়িয়া গেল, রাজলক্ষ্মীর আচরণে সে ছেলেমানুষীর চূড়ান্ত করিল।

রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে যে আবার সরাইয়া দিল, তাহার আরও কারণ থাকা সম্ভব। সে নিজেরই দুর্ব্বলতার বশে শ্রীকান্তের ভার লইয়াছিল—শ্রীকান্তের তাহাতে ক্ষতি হইতে পারে জানিয়াও। সে এতদিনে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই মানুষটার প্রকৃতির মধ্যে, তাহার অজ্ঞাতসারে, একটা কাঙালপনা আছে,

এবং সে তাহারই প্রশ্রয় দিতেছে। নানা কারণে শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর সহিত ঘনিষ্ঠতা পছন্দ না করিলেও, রাজলক্ষ্মীর সেবা ও তাহার সামর্থ্য তাহাকে এমন একটু প্রলুব্ধ করে—যাহা ঐ চরিত্রের পক্ষে আদৌ শ্রেয়স্কর নহে; গঙ্গামাটিতে সে ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। তাহার উদাসীনতায় শ্রীকান্ত কিরূপ আহত হয়, তাহার মনের সেই অভিমান একরূপ কাঙালপনারই সাক্ষ্য দিতেছে—এ সকলই রাজলক্ষ্মী দেখিয়াছিল, এবং দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল। সে বুঝিল, এই অধঃপতনের জন্য সে নিজেই দায়ী; ইহার পর যখন সে আরও বুঝিল যে, শ্রীকান্ত তাহারই কামনা পূরণ করিবার জন্য এই অবস্থা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়াছে—সেজন্য তাহার অন্তরের গ্লানিও কম নয়, তখন রাজলক্ষ্মী তাহাকে ঐ কথা বলিল—"আমার জন্যে তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু আর নয়।"

প্রেমের এই যে ট্র্যাজেডি ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে—ইহা কেমন ট্রাজেডি? এইখানেই সেই প্রশ্ন জাগিল, তাই আমি আবার একটু রসভঙ্গ করিতেছি,—এমন রসভঙ্গ এখন হইতে প্রায়ই করিব, পাঠক-পাঠিকাগণ কিছু মনে করিবেন না। এরূপ ট্র্যাজেডিতে বাহিরের ঘটনার ঘনঘটা নাই; প্রবৃত্তির যে উদ্দাম ঝড়ে পাশ্চাত্য জীবন-নাট্যে মহা-মহা ট্র্যাজেডির উদ্ভব হয়, তাহা ইহাতে নাই। একটি সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত পুরুষ-চরিত্রের সহিত এক স্বাভাবিক সুস্থ ও গভীর-প্রকৃতি নারীর এই যে ঘনিষ্ঠতা, এবং তাহার ফলে যে অন্তর-সংগ্রাম—ইহা সমুদ্রের উপরকার ঝড়-ঝঞ্ঝা নয়, আঘাত-প্রতিঘাতের সেই বিপুল গর্জ্জন ইহাতে নাই। সে ঐ হৃদয়-সমুদ্রের গহন-গভীর তলদেশে এক নিস্তব্ধ অথচ মর্ম্মান্তপ্রসারী আলোড়ন; তাহার বিস্তার বাহিরে নয়—নিম্নমুখী ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের মত তাহা অন্তরের অন্তস্তল বিদ্ধ করে, বাহিরে তাহা প্রকাশ পাইবার নয়। সেই মর্ম্মস্থানের অতি-জটিল গ্রন্থিচ্ছেদের যে যাতনা তাহাকে ভাষায় রূপ দেওয়া কঠিন, পাত্রপাত্রীর মুখেও তাহা মূক হইয়া থাকে। তথাপি এই ট্র্যাজেডিও সামান্য নহে, বরং এক অর্থে আরও গূঢ় ও গভীর। এ কাব্যের কল্পনা-ভূমিই স্বতন্ত্র; ইহার জন্য যে জীবন, যে সমাজ, ও যে চরিত্র বা হৃদয়বত্তার প্রয়োজন তাহা শুধু দেশগত নয়—জাতিগত, তাই এমন কাব্য বাংলাসাহিত্যেই সম্ভব; তার কারণ, এই জাতি এমন এক প্রকৃতির কোলে এমন জগতে বাস করে যেখানে দেহটা বিশ্রাম পায়, বাহিরের প্রয়োজনগুলা প্রবৃত্তিকে তেমন প্রখর করিয়া তোলে না; সেজন্য অতিরিক্ত ভাবালুতা ও ভাবপ্রবণতার বশে প্রাণের ক্ষুধাও অন্তর্মুখী হয়; সেই ক্ষুধার বিষামৃত যে কিরূপ ট্র্যাজেডি-রস—তাহা এই কাব্যেই আমরা আস্বাদন করিতেছি।

আর কোন সাহিত্যে সামান্যের মধ্যে এমন অসামান্যের লীলা অতিশয় বিরল, এ রসের রসিকও দুর্লভ।

শ্রীকান্ত সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মীর যে মনোভাবের কথা বলিয়াছি তাহার সাক্ষ্যস্বরূপ আমি আরও একটি দৃশ্যটি উদ্ধৃত করিতেছি—দৃশ্যটি নাটক ও কাব্য দুইহিসাবেই অনবদ্য। সুনন্দার গৃহ হইতে দুইজনে স্বগৃহে ফিরিতেছে—পথে পাশাপাশি চলিয়াছে;—

"পথে আমরা ছাড়া আর কেহ ছিল না। সে (রাজলক্ষ্মী) সুমুখে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, তোমার ছায়া পড়েনি কেন বল তো? চাহিয়া দেখিলাম, অদূরে ডানদিকে আমাদের অস্পষ্ট ছায়া এক হইয়া মিলিয়াছে; কহিলাম, বস্তু থাকলে ছায়া পড়ে, বোধ হয় সেটা আর নেই।

আগে ছিল?

লক্ষ্য করিনি, ঠিক মনে পড়ছে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিয়া বলিল, আমার পড়চে—ছিল না। এতটুকু বয়স থেকে ওটা দেখতে শিখেছিলাম। এই বলিয়া সে একটা পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজকের দিনটা আমার বড় ভাল লেগেছে।" [ঐ, পৃঃ ১০৭]

রাজলক্ষ্মীর ঐ হাসি তাহার জীবনব্যাপী কান্নার একটি রৌদ্রোজ্জ্বল গুণ্ঠন। ঐ কথাগুলির অর্থ শ্রীকান্ত বুঝিল না, কিন্তু আমরা বুঝিলাম। রাজলক্ষ্মী জানে, শ্রীকান্তের মধ্যে সেই বস্তু নাই—সংসারের প্রেমালোকিত প্রাঙ্গণে যাহার ছায়া পড়ে। আজ সুনন্দাকে দেখিয়া তাহার একটা আশা হইয়াছে—সে তাহার প্রাণের মোহভঙ্গ করিবার একটা উপায় পাইয়াছে।

ইহার পর একেবারে শেষের দৃশ্যটি দেখিলেই হইবে—আর একটা বিদায় দৃশ্য; বিদায় কি একটা! এ কাহিনী যে আগাগোড়াই বিদায়ের কাহিনী; বিদায়গুলাই ইহার কমেডি,—মিলনই ট্র্যাজেডি! গঙ্গামাটির বাস উঠাইয়া রাজলক্ষ্মী আবার নিজ সংসারে ফিরিতেছে, শ্রীকান্ত তখনো সঙ্গে আছে।

"সন্ধ্যায় আমরা সাঁইথিয়ায় আসিয়া পৌঁছিলাম। রাজলক্ষ্মীর আদেশ ও উপদেশের কোনটাই বঙ্কু অবহেলা করে নাই।, সে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া নিজে আসিয়া ষ্টেশনের প্লাটফর্মে উপস্থিত ছিল; যথাসময়ে ট্রেন আসিলে মালপত্র বোঝাই দিয়া, রতনকে চাকরদের কামরায় তুলিয়া দিয়া বিমাতাকে লইয়া গাড়ীতে উঠিল।......

গাড়ী ছাড়িতে মিনিট পাঁচেক বাকি ছিল, কিন্তু আমার কলিকাতা যাইবার ট্রেন আসিবে প্রায় শেষরাত্রে। একধারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, রাজলক্ষ্মী তাহার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া হাতের ইসারায় আমাকে আহ্বান করিল। নিকটে যাইতেই কহিল, একবার ভিতরে এস। ভিতরে আসিতে সে হাত ধরিয়া আমাকে পার্শ্বে বসাইয়া কহিল, তুমি কি খুব শীঘ্রই বর্ম্মায় চলে যাবে? যাবার আগে আর একটিবার দেখা দিয়ে যাবে না?

কহিলাম, যদি প্রয়োজন মনে কর তো যেতে পারি। রাজলক্ষ্মী চুপি চুপি উত্তর দিল, সংসারে যাকে প্রয়োজন বলে সে নেই। শুধু আর একবার দেখতে চাই।

আসবো।" [ঐ, পৃঃ ২০১]

রাজলক্ষ্মী এবার শ্রীকান্তকে চিরতরে বিদায় দিতেছে—তাহার সংকল্প যে অতিশয় দৃঢ় তাহা সে জানে; তাই একবার—আর একটিবার মাত্র সে তাহাকে দেখিতে চায়—ঠিক প্রয়োজনে নয়, তবু একেবারে শেষ কি না! ইহার পর সে আর দেখিতে চাহিবে না, সে এমন কিছু করিবে স্থির করিয়াছে যাহাতে দেখিবার পথই বন্ধ হইয়া যাইবে। গঙ্গামাটির তপস্যায় কিছু হইল না, এখন ঐ শেষ ভরসা আছে। কি পাজি এই প্রাণটা, কিছুতেই বশ মানিবে না!

কিন্তু এবারকার ঐ বিদায়টা যে একটা কত বড় কমেডি তাহার প্রমাণ এখনই মিলিবে, এবার এ কমেডির অভিনেতা আর কেহ নয়—একা শ্রীকান্ত। কলিকাতায় পৌঁছিয়াই শ্রীকান্ত তাহার সেই প্রতিশ্রুতি-রক্ষার জন্য কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া—তাহারই অছিলায়—বর্ম্মা-যাত্রার পূর্ব্বে, রাজলক্ষ্মীর কাশীর বাড়ীতে গিয়া হাজির। কমেডি আর কাহাকে বলে? আহা! রাজলক্ষ্মী তাহার অনেক করিয়াছে, তাহার এই শেষ সাধটুকু না মিটাইলে অকৃতজ্ঞ হইতে হয় যে! শ্রীকান্ত ত্যাগী, উদাসীন, এবং পৌরুষাভিমানী, তবু তাহার কেমন যেন একটু চিত্তবিকার দেখা যাইতেছে। যত বড় বৈরাগী হও, ঐ প্রকৃতি-সঙ্গ একবার করিলে কি আর নিস্তার আছে? তুমি তো শ্রীকান্ত বই আর কিছুই নও, স্বয়ং ভগবান—যাঁহার মত নিরাসক্ত আর কেহ নাই,—যিনি কতবার বলিয়াছেন 'আমাকে কেহ বাঁধিতে পারে না'—তিনিও গীতায় প্রায় প্রতি অধ্যায়ে ঐ প্রকৃতির প্রসঙ্গ একবার না করিয়া নিস্তার পান না,—তা সে যে-ভঙ্গিতে, যে-অর্থেই করুন না কেন। শ্রীকান্তের ভিতরে ভিতরে বেশ একটু হইয়া আসিয়াছে। আহা বেচারী! বর্ম্মায় সে যাইবেই—কেহ আটকাইতে পারিবে না; কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কাছে বিদায় নেওয়া আর শেষ হয় না, অথচ রাজলক্ষ্মী তাহাকে স্পষ্ট বিদায় দিয়াছে। তবু সে আবার কাশী ছুটিল, সেখানে যাহা ঘটিল তাহা এই—

"রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করিল, গাড়ীতে কষ্ট হয় নি তো? ধীরে ধীরে আসনে বসিয়া পড়িয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, পরে মুখ তুলিয়া কহিলাম, না, কষ্ট হয় নি।······তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সে যে শুধু থান কাপড় পরিয়া দেহের সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়াছে তাই নয়, তাহার সেই মেঘের মত পিঠ-জোড়া সুদীর্ঘ চুলের রাশিও আর নাই। উপবাস ও কঠোর আত্মনিগ্রহের এমনি একটা রুক্ষ শীর্ণতা মুখের পরে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, হঠাৎ মনে হইল এই একটা মাসেই সে যেন আমাকে দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে।···

আহারের শেষে রাজলক্ষ্মী কহিল, বন্ধু বলছিল, তুমি নাকি আজ রাত্রের গাড়ীতেই ফিরে যেতে চাও?

বলিলাম, হাঁ।

ইস্! আচ্ছা, কিন্তু তোমার জাহাজ ছাড়বে তো সেই রবিবারে।···

বলিলাম, হঁা, আরও কাজ আছে।
পুনরায় রাজলক্ষ্মী কি একটা বলিতে গিয়াও চুপ করিয়া রহিল।" [ঐ, পৃঃ ২১২-১৩]

ইহার পর আর একটা দৃশ্য—দৃশ্যগুলি সব সেই এক বিদায়ের দৃশ্য, কেবল রকমারি মাত্র।—

"রাজলক্ষ্মী পথে আসিয়া গাড়ীর ভিতরে হাত বাড়াইয়া বার বার করিয়া আমার পায়ের ধুলা মাথায় দিল, কিন্তু কথা কহিল না। বোধ হয় সেশক্তি তাহার ছিল না। ভালই হইল যে, অন্ধকারে সে আমার মুখ দেখিতে পাইল না। আমিও স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, কি যে বলিব খুঁজিয়া পাইলাম না। শেষ বিদায়ের পালাটা নিঃশব্দেই সাঙ্গ হইল।" [ঐ, পৃঃ ২১৪-১৫]

ইহার পর শ্রীকান্ত আপন মনে বলিতেছে—"তুমি সুখী হও, শান্ত হও, তোমার লক্ষ্য ধ্রুব হউক, তোমাকে হিংসা করি না"। কত বড় মহাপ্রাণ সে! রাজলক্ষ্মীর কত বড় হিতাকাঙ্ক্ষী! সে যে রাজলক্ষ্মীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ করিতেছে, তাহার যে কোন ক্ষোভ নাই, তার প্রমাণ, একটু পরেই সে বলিতেছে—

"আমি চলিলাম অন্যত্র। আমারই মত যে কলুষের পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছে, ভাল হইবার আর পথ নাই—সেই অভয়ার আশ্রয়ে।"

এই একটি কথায়, তাহার তদানীন্তন মানসিক অবস্থা অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু এ অভিমান করে সে কোন্ অধিকারে? রাজলক্ষ্মী যতই গুণবতী হউক না কেন, সে সমাজ-বহির্ভূতা কুলত্যাগিনী পতিতা নারী, এজন্য সে কিছুতেই তাহাকে পত্নীর মর্য্যাদা দান করিতে পারে না—বিবাহের তো কথাই নাই, সে তাহাকে জীবন-সঙ্গিনী করিবার কথা ভাবিতেও যেন লজ্জা বোধ করে; এমন কি, সে তাহার চরিত্রেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে না—তাহার জীবিকা যে বড়ই ঘৃণ্য! কিন্তু যখন সে আত্মশুদ্ধির জন্য কঠোর তপশ্চরণ আরম্ভ করিয়াছে তখনও শ্রীকান্ত তাহা সহ্য করিতে পারে না; এই যে দ্বন্দ্ব ইহারই তাড়নায় সে দিশাহারা হয়। যে প্রেম থাকিলে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজনও হয় না তাহাও তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। প্রবল সেন্টিমেণ্ট আছে, কিন্তু বিচার-বুদ্ধি নাই; এই কারণে আমাদের সমাজের ঐ নারী-সমস্যা (অন্য সমস্যাও আছে, কিন্তু এইটাই প্রধান) তাহাকে অতিমাত্রায় বিচলিত করিলেও সে তাহার সমাধান-মূলক কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারে নাই—তাহাতেও সংশয় রহিয়া গিয়াছে। এজন্য একরূপ Idealism-এর বিদ্রোহ এই কাহিনীকে রসোজ্জ্বল করিলেও—ইহাতে অনুভূতির অতিবৃদ্ধ ও গভীর বর্ণবিশ্লেষ থাকিলেও—জীবনকে তদ্রূপে (objectively) দেখিবার সেই বৃহত্তর দৃষ্টি নাই। শ্রীকান্তের সহানুভূতি বা সমদুঃখকাতরতা যত গভীর, বিচার-

শক্তি ততই দুর্ব্বল। ঐ যে দ্বন্দ্ব—নিছক দুঃখকাতরতা এবং প্রেমবিমুখ, কঠিন আত্মাভিমান, এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া তাহার জীবন ছন্নছাড়া হইয়াছে—অন্ততঃ রাজলক্ষ্মীর সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে তাহার চরিত্রে সেই দিকটাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সে সমাজকে ত্যাগ করিতেও পারে না, গ্রহণ করিতেও পারে না, তাই সে লক্ষ্যহারা। সংসারে সে সত্যই অনাসক্ত, অথচ সে সন্ন্যাসীও নহে—এত বড় সংবেদনাশীল হৃদয় যাহার সে সন্ন্যাসী হয় কেমন করিয়া? অন্তরের ঐ নিঃসঙ্গতা তাহাকে বেদনাতুর করিয়া তোলে, সেই বেদনাকে সে বাহিরেও বড় করিয়া দেখে; আবার, যাহা সে গ্রহণ করিতে পারে না—যেন একটা জন্মগত অভিশাপ আছে—তাহার জন্যও প্রাণে একটা গভীর শোচনা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। রাজলক্ষ্মী সেই বেদনাকে তাহার জ্ঞানগোচর করিয়াছে—তাই শ্রীকান্তের একটা বড় পরীক্ষা চলিতেছে।

এইখানে চতুর্থ অঙ্কের শেষ বটে, কিন্তু—তৎপূর্ব্বে আরও কয়েকটি দৃশ্য চয়ন করিতে হইবে—তাহারই ভূমিকায় আমরা অতঃপর অতিশয় জটিল ও বিপরীত স্রোতসঙ্কুল পঞ্চম অঙ্কে প্রবেশ করিব।

(১১)

চতুর্থ অঙ্কের জের—হৃদয়-যমুনা

যদি, গাহন করিতে চাহ,
এস নেমে এস, হেথা
গহন-তলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ,
তীরে ফেলে এস আজ,
ঢেকে দিবে সব লাজ
সুনীল জলে।

—সোণার তরী

রাজলক্ষ্মী এতদিন ধরা দেয় নাই, নিজেকে অতি সাবধানে বড় ভয়ে ভয়ে দূরে রাখিয়াছিল; সাপের বিষ-দশন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া তাহার মাথার মণিটি সযত্নে বক্ষে ধরিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিতে পারিল না—কঠিন আত্মনিগ্রহও নিষ্ফল হইল। সে সাপকে বুকে জড়াইবে না, মণির লোভও ত্যাগ করিবে না, এমনই একটা সংকল্প করিয়া গঙ্গামাটিতে তাহাই অভ্যাস করিতেছিল; সেই মণিকে ধূলায় নিক্ষেপ করিয়া অবিচলিত চিত্তে তাহার পানে চাহিবার সাধনাও সে করিয়াছিল, কিছুই বাকী রাখে নাই। শেষে সে বুঝিতে পারিল, পানীয় ত্যাগ করিলেই পিপাসা দূর হয় না, কেবল রূপান্তরিত হয় মাত্র। ভোগও যেমন পিপাসা, ত্যাগও তেমনই একটা পিপাসা নয়? তাহাতেও রসের মাত্রা কম নয়! ও দুইটাই পিপাসা, অন্ততঃ যতদিন দেহ-সংস্কার থাকিবে। বৈদান্তিক আত্ম-সাধনায় যে পিপাসা আছে উহা সেই পিপাসা নয় বটে; সেখানে পিপাসা ও পানীয় একই পাত্রে অবস্থিত—এক বই দুই নাই যে! সেখানে কৃচ্ছ্রসাধনার দুঃখই আছে—ঐ পিপাসাও দুঃখনিবৃত্তির পিপাসা! তাহাতে 'দুই'-এর দ্বন্দ্ব নাই বলিয়া বিরহ-মিলনও নাই—রসের বালাইও নাই। অতএব সেই বৈদান্তিক আত্ম-পিপাসা এই প্রেমের পিপাসা হইতে স্বতন্ত্র। রাজলক্ষ্মী ত্যাগ করিবে কি? কাহাকে ত্যাগ করিবে? বৈদান্তিক দুই-এর ঐ এক-কে—অহংটাকে—লোপ করিতে চায়, বৈষ্ণব উহাকে বড়'র বেনামীতে বজায় রাখিয়া একটি অপূর্ব্ব রস আস্বাদন করে; রাজলক্ষ্মী ইহার কোনটাই পারে না, তাহার

নারী-স্বভাব যেমন পূর্ণ-বিকশিত, তেমনই অতিশয় normal বা সুস্থ; সেই নারীত্বের 'মমতা' অতিশয় প্রবল। ঐ কঠোর সাধনা তাহার সেই পিপাসা দমন করিল না; ত্যাগ করিতে গিয়াও ত্যাগের দুঃখটা অমৃত-মধুর হইয়া উঠে—"All other pleasures are not worth half its pains"—ইহাই তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। গঙ্গামাটির তপস্যা যে ব্যর্থ হইল তাহা রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছে।

এখন তবে সে কি করিবে? যাহা সত্য তাহাকে স্বীকার করিতে সে ভয় পায়, কারণ স্বীকার করিয়া ফল নাই—কোন উপায় নাই। তাই সে আর ভাবিতে পারে না—কাশীতে ফিরিয়া যেন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অতঃপর সে চক্ষু বুজিয়া গুরু ও ধর্ম্মশাস্ত্র শিরোধার্য্য করিল, ইহজীবনকে পশ্চাতে ফেলিয়া পর-জীবনের অভিমুখে মনটাকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া লইল। তাহা দেখিয়া শ্রীকান্ত যাহা বুঝিল, আমরাও প্রথমে তাহাই বুঝিলাম। বুঝিলাম না যে, সে এইবার নিজের কাছে নিজে হার মানিয়াছে—তাহারও সেই অভিমান চূর্ণ হইয়াছে; আসলে সে নব-জন্মলাভের পূর্ব্বে আর একটা মৃত্যুর সেতু-পথ পার হইতেছে! সে শ্রীকান্তের সহিত তাহার সেই পূর্ব্ব-সম্পর্ক—সেই দূরত্ব আর রক্ষা করিতে পারিতেছে না; কিন্তু সে কথা তাহাকে বলিতে, তাহার সেই নিরাশ্রয় হৃদয়ের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে সে কিছুতেই সাহস পায় না। শ্রীকান্তের দুর্ব্বলতা সে জানে, তাহার দুর্জ্জয় আত্মাভিমানের কথাও সে জানে; কিন্তু সব চেয়ে বড় বাধা ছিল রাজলক্ষ্মীর নিজের আত্মাভিমান—তাহার সেই পিয়ারী বাইজী-জীবনের দুরতিক্রমণীয় কুণ্ঠা; সেই কুণ্ঠার কণ্টকই তাহার চরিত্রগত আত্মসম্মানবোধকে উগ্র করিয়া তুলিয়াছিল। শ্রীকান্তের মনোভাব—তাহার রাগ-বিরাগ যেমনই হউক, সেই বাধা যতই কঠিন হউক, রাজলক্ষ্মীর নিজের পক্ষ হইতেও একটা বড় ত্রুটি ঘটিয়াছে—সে এতদিন তাহার সেই প্রেমের গর্ব্বই করিয়াছে, সে তো সেই প্রেমের অকুণ্ঠিত অধিকারে শ্রীকান্তকে পাইতে চাহে নাই, বরং ত্যাগ ও তপস্যার শিখরে আরোহণ করিয়া, ঐরূপ দূরত্ব রক্ষা করিয়া, সে কি কেবল নিজের শুচিতার অভিমান বজায় রাখিতে চাহে নাই? গঙ্গামাটিতে সেই চূড়ান্ত আত্মদান-ব্রতের ফলস্বরূপ সে তাহার প্রেমের এই ফাঁকিটাই উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু উপায় তো নাই; শ্রীকান্তের প্রেমও যেমন, শ্রদ্ধাও তেমনই প্রায় একই কারণে দুষ্প্রাপ্য; সে যদি শ্রদ্ধাই করিবে তবে রাজলক্ষ্মীর এই অভিমান কেন? এতদিনে সে বুঝিয়াছে, প্রেমের পথ একটাই; তাহাতে কোনরূপ আত্মবিচার নাই, নিজের দিক দিয়া কোন হিসাবই

চলিবে না। কিন্তু ঐ মানুষটাকে অকারণ কষ্ট দিয়া, তাহাকে বারবার বিড়ম্বিত করিয়া—তাহার দুর্ব্বলতার দিকটায় বারবার আঘাত করিয়া কি ফল? সে তাহাতে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তাই রাজলক্ষ্মী বলিয়াছিল "আমার জন্যে তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েছে, কিন্তু আর নয়।"

রাজলক্ষ্মী বুঝিয়াছে, আর কোন পথ নাই; শ্রীকান্তের উপরে প্রেমের অধিকার স্থাপন করিবার সাহসও তাহার নাই; তাই এইবার সে ঐ শেষ পন্থা অবলম্বন করিয়াছে—নিজেই নিজের চিতা সাজাইয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এদিকে শ্রীকান্তের অবস্থাও আর একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। রাজলক্ষ্মী যখন তাহাকে এমন বাক্যে মুক্তি দিল (পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি) —যে বাক্যের মত হৃদয়ভেদী আর কিছু হইতে পারে না, তখন শ্রীকান্ত কেবল ইহাই বুঝিল—

"আজ সে-ই যদি বাঁধন খুলিয়া আমাকে মুক্তি দিয়া আপনাকে মুক্ত করিতে চায় তো আমি ঠেকাইব কোন্ পথে?" [ঐ, পৃঃ ১৯৪]

বেশ বুঝিতে পারা যায়, রাজলক্ষ্মীকে সে যেমন চায় না, তেমনই রাজলক্ষ্মী যে তাহাকে এমন করিয়া পরিত্যাগ করিবে ইহাও তাহার মনঃপূত নয়। কি অদ্ভুত মনোভাব! ইহার একমাত্র কারণ, রাজলক্ষ্মীর ঐ আচরণ তাহার আত্মাভিমানে আঘাত করে—প্রেম নয়, তাহার সেই লোভটাকে তিরস্কৃত করে, তাহার পৌরুষ আহত হয়। রাজলক্ষ্মী যতক্ষণ না তাহার সেই উচ্চ আসন ত্যাগ করিতেছে, ততক্ষণ সে তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিতেছে না। আবার, না পাওয়ার কেমন একটা বেদনা, অর্থাৎ সেই লোভের শাস্তিও তাহাকে অসুস্থ করিয়াছে। সে যাহা চায় না, অথচ না চাহিয়া পায়—সেই না-চাহিয়া পাওয়াটা বন্ধ হইলে সে বেদনা বোধ করে। সব মিলিয়া রাজলক্ষ্মীর একটা শক্তি—এক প্রকার প্রাধান্য তাকে পদে পদে আত্ম-সচেতন করে। উহাই একটা বন্ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তাহাকে ছোট করিয়া দিয়াছে। এবার ঐ শেষ আঘাতের পর, শ্রীকান্তও বোধ হয় মরিয়া হইয়া উঠিল, তাহার মন এমন একটা কিছু করিবার জন্য অধীর হইয়াছে যাহাতে সে রাজলক্ষ্মীর উপরে বেশ একটু প্রতিশোধ লইতে পারে। সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল, কারণ খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে। কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে ট্রেনেই তাহার গ্রামের সেই ঠাকুরদা'র সহিত সাক্ষাৎ হইল; ঠাকুরদা'র সঙ্গে দরিদ্র আত্মীয়ের যে অরক্ষণীয়া কন্যাটি ছিল, তাহার করুণ কাহিনী দ্বারা কন্যার অতিবিচক্ষণ অভিভাবকটি শ্রীকান্তকে শুধুই

অভিভূত নয়, সেই কন্যার উদ্ধারকারী হইতেও প্রায় রাজী করিয়া ফেলিল। শ্রীকান্তের স্বভাবে করুণার মাত্রা যতই অধিক হউক, এইরূপ কার্য্য তাহার পক্ষে কি কারণে কতখানি অসম্ভব তাহা আমরা জানি; কিন্তু শ্রীকান্তের তখন সহজ অবস্থা নয়, যে রাজলক্ষ্মীর উপরে জয়ী হইবে। এ যেন একটা প্রতিশোধ, পরবর্ত্তী আচরণে তাহার প্রমাণ আছে। সে রাজলক্ষ্মীকে এ সংবাদ না জানাইয়া পারিল না,—যে তাহার এত উপকার করিয়াছে, তাহার মত হিতৈষিণীর অনুমতি না লইলে কি ভাল দেখায়? তা ছাড়া, সে যে এইরূপ আত্মবিসর্জ্জনের সংকল্প করিয়াছে রাজলক্ষ্মীকে তাহা না জানাইলে উহার সার্থকতাই বা কি? আসলে তাহার ঐ সংবাদ-দান রাজলক্ষ্মীকে একরূপ ultimatum দেওয়ার মত, সে তাহাকে একটা শেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

রাজলক্ষ্মীর ভাগ্যবিধাতা—তাহার সেই অখণ্ডনীয় নিয়তি এবার শ্রীকান্তের ঐ পত্রখানির রূপেই তাহার উপরে ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিল, এ কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত পড়িলে তাহাই মনে হয়। তাহার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থার বর্ণনা পূর্ব্বে করিয়াছি, সেই অবস্থায় সে ঐ পত্র পাইল। শ্রীকান্ত লিখিয়াছে, সে বিবাহ করিবে! রাজলক্ষ্মীর স্তম্ভিত হইবারই কথা। এমন ঘটনা সে স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই। তবে কি তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যই সেও মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে? কিন্তু তাহার কি অপরাধ? পরক্ষণেই সে যেন একটা দিশা পাইল, তবে কি?—এতদিনে সেই পাথর গলিয়াছে! শ্রীকান্ত বিবাহ করিবে—তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য! সেও তবে শ্রীকান্তকে এমন আঘাত দিতে পারে! সেই আঘাতের প্রতিঘাতে শ্রীকান্ত বিবাহ করিবে! সেই কথা রাজলক্ষ্মীকে সে জানাইয়াছে! কতখানি চিত্তভ্রংশ হইলে শ্রীকান্তের মত পুরুষ এতখানি নামিতে পারে রাজলক্ষ্মী তাহা বিদ্যুৎ-চমকের মত দেখিতে পাইল। এ কোন্ শ্রীকান্ত? রাজলক্ষ্মী তো ইহাকে জানিত না! তবে কি তাহার তপস্যায় দেবতা তুষ্ট হইয়াছেন? পাথরের ঠাকুর ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছে? রাজলক্ষ্মী একই কালে হর্ষ ও বিষাদে অভিভূত হইল; বিষাদ নয়, আশঙ্কা—পাছে সেই পাথরের দেবতা মাটির পুতুলে পরিণত হয়; আর হর্ষ—সেই দেবতার হৃদয় বুঝি এতদিনে দ্রবীভূত হইয়াছে! তখন রাজলক্ষ্মী সমস্ত কার্য্যকারণসূত্র একসঙ্গে বুঝিয়া লইয়া এইবার তাহার চিরদিনের সঙ্কোচ, এবং সর্ব্বশেষের ভয় পরিহার করিল; সকল লজ্জা সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া সে তাহার প্রেমের অধিকার, এবং প্রেমের সর্ব্ব-সমর্পণ ঘোষণা করিয়া শ্রীকান্তকে উত্তর লিখিল—

"বাঙালী ঘরের মেয়ে আমি; জীবনের সাতাশটা বছর পার করে' দিয়ে আজ যৌবনের দাবি আর করি নে।…আমাকে তুমি ভুল বুঝো না—যত অধমই হই, ও কথা যদি ঘুণাক্ষরে তোমার মনে থাকে তার বাড়া লজ্জা আমার নেই। বঙ্কু বেঁচে থাক, সে বড় হয়েছে, তার বউ এসেছে,—তোমার বিয়ের পর তাদের সুমুখে আমি বার হব কোন্ মুখে? এ অসম্মান সইবো কি করে'?…

…হয় তো প্রশ্ন করবে, তবে কি এমনি নিঃসঙ্গ জীবনই চিরদিন কাটাবো? কিন্তু প্রশ্ন যাই হোক, এর জবাব দেবার দায় আমার নয়, তোমার।…

…কিন্তু আমাকে অপমান করার ফন্দি যদি ক'রে থাকো, সে বুদ্ধি ত্যাগ কর। তুমি দিলে বিষ আমি নেবো, কিন্তু ও আমি নিতে পারবো না।" [৪র্থ পর্ব্ব, পৃঃ ৩২-৩৩]

এ পত্রের ঐ কথাগুলির অর্থ একটুও অস্পষ্ট নয়; উহাতে যে ধরণের স্বীকারোক্তি আছে, বিশেষ করিয়া ঐ 'প্রশ্ন'টার জবাব সম্বন্ধে,—তেমন সুস্পষ্ট আত্মনিবেদন আর কি হইতে পারে? উহার অর্থ, শ্রীকান্ত যদি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে না চায়, তবে তাহার জীবনসঙ্গিনী সে ভিন্ন আর কে হইতে পারে? এমন কথা এমন করিয়া বলিতে সে পূর্ব্বে কখনো সাহস পাইত? এইবার এতদিনে পিয়ারী বাইজী মরিতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে রাজলক্ষ্মীও মরিবে—সে মৃত্যু অন্যরূপ, তাহা প্রেমেরই পূর্ণাহুতি; অথবা তাহার জীবন-জ্বরের পূর্ণ-বিরাম; সে কথা পরে। কিন্তু রাজলক্ষ্মী এই যে কাজ করিল—ইহা বুদ্ধির কাজ নয়, বড় বেহিসাবী; ঐ পত্রে সে তাহার নিজের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা নিজেই স্বাক্ষর করিয়া দিল—জানিতেও পারিল না সে কি করিল। শ্রীকান্তকে এত জানিয়াও সে এমন ভুল করিল! কিন্তু ভুল সে করে নাই—সে কথা আগে বলিয়াছি; ঐ ভুল প্রাণের ভুল নয়; জ্ঞানের ভুল বটে। প্রেমের চোখে ঐ ঘুমের ঘোর থাকিবেই, নহিলে মানুষ এমন স্বচ্ছন্দে এত বড় আত্মবিসর্জ্জন করে কেমন করিয়া? রাজলক্ষ্মীর চোখে সেই ঘুমের আবেশ আসিয়াছে, এইবার তাহাকে তলাইয়া যাইতে হইবে, তাই সে একবারও ভাবিল না যে, যে-মুহূর্ত্তে সে এমন করিয়া ধরা দিবে সেই মুহূর্ত্তে ঐ মানুষ নিজেকে মুক্ত করিয়া লইবে, বাঁধনটা শক্ত হইবা মাত্র সে কাটিয়া ফেলিবে—ধরা দিতে আসিলেই পলাইবে। তাহার সেই পত্র পড়িয়া শ্রীকান্ত হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে—

"এতকাল ধরাই পড়িয়াছি, ধরিতে পারি নাই, কিন্তু আজ ধরা পড়িল রাজলক্ষ্মীর সবচেয়ে বড় দুর্ব্বলতা কোথায়!" [ঐ, পৃঃ ৩৫]

ইহার পর শ্রীকান্তের আর কোন ভাবনাই রহিল না, তাহার নিজের সেই কাঙালপনাও ঘুচিল। প্রেমনামক সেই যে মোহ—যুগল-মিলনের সেই গ্রাম্য সুখ-পিপাসা—যাহাতে আত্মার স্বাধীনতা নাই, হৃদয় ও মন একটা সংকীর্ণ গণ্ডিতে

আবদ্ধ থাকে—সেই মাদক পিপাসাই এখনও রাজলক্ষ্মীর ভিতরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহার ঐ জপ-তপ সকলই একটা উপরকার আবরণ মাত্র! যাক্, বাঁচা গেল! রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে তাহার আর কোন সংশয় রহিল না, সে একটা সাধারণ মাটির পুতুলই বটে; কেবল সেই পুতুলের গড়নটা ভাল—রূপে গুণে অন্য অনেক পুতুলের তুলনায় তাহার মূল্য অনেক বেশি। কিন্তু তবু পুতুল ছাড়া আর কি? মাঝে মাঝে দেখিয়া সুখ হয়, তারিফ করিতেও ইচ্ছা হয়,—এমন কি, একটু রসবিগলিত হওয়াও স্বাভাবিক; তেমন অবস্থা শ্রীকান্তেরও মাঝে মাঝে হয়। সেটা বোধ হয় তাহার কবি-প্রাণের একরূপ ভাব-সুখ; অথবা, তাহার সেই পরদুঃখকাতরতারই একটু আবেগ ইহার কারণ। সে যেন একটু জড়াইয়া পড়িয়াছিল, আর একটু হইলে, হয়তো এমন কিছু করিয়া ফেলিত যাহার গ্লানি সারাজীবনেও ঘুচিত না। তাই ঐ পত্র পড়িয়া এতদিন পরে সে আবার মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিল; কবির ভাষায় তাহার প্রাণ যেন গাহিতেছে—

"এতদিন পরে ছুটি, আজ ছুটি!
মন ফেলে তাই ছুটেছি···
যাঁর বেড়ী তাঁরে ভাঙা বেড়ীগুলি ফিরায়ে
বহুদিন পরে মাথা তুলে আজ
উঠেছি।"

কিন্তু ইহাও তাহার ভুল; কারণ সে মনকে ফেলিয়া ছুটিলেও মন তাহাকে ফেলিয়া পলায় নাই, বরং এইবার সেই মন তাহাকে আরও বেশি করিয়া চাপিয়া ধরিবে। রাজলক্ষ্মীর নিয়তি—তাহার প্রাণ, শ্রীকান্তের নিয়তি—তাহার মন, দুইয়ের গতি দুইরূপ; একজন হারাইয়াও পাইবে, আরেক জন পাইয়াও হারাইবে।

মনকে ফেলিয়া ছুটিয়াছে রাজলক্ষ্মী; এতদিন পরে সে তাহার মনকে ঘুম পাড়াইয়া এইবার স্বপ্নরসে ঢুলিয়া পড়িয়াছে। যে মিলন-সুখের কল্পনায় সে এমন আত্মহারা সে যে কেমন, সে বিষয়ে রাজলক্ষ্মীর মন আর কোন প্রশ্নই করিবে না প্রাণ যাহা করিবার তাহা করিবে। এতদিন সে যাহাকে মনের মধ্যে পাইয়াই প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইতে চাহিয়াছিল তাহা যে সত্যকার পাওয়া নয়—নিজের সঙ্গে নিজেরই একটা লুকাচুরী খেলা, নিজেরই ছায়ার পিছনে ছুটাছুটি—আজ সে তাহা বুঝিয়াছে। সে যে শ্রীকান্তকে কেবলই বলে, আমি তোমাকে হারাই নাই আরও বেশি করিয়া পাইয়াছি, সে ছিল তাহার মনেরই একটা মনগড়া সান্ত্বনা—কারণ, বিরহটাই সত্য ছিল, প্রকৃত মিলন কখনো হয় নাই; তাই শ্রীকান্তকে সে তাহার

মনের আঁচল-খুঁটে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, খুব জোরেই বাঁধিয়াছিল, কিন্তু খুলিয়া কখনো বুকে লইতে পারে নাই; তার কারণ কি, পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি—সে তাহার কুণ্ঠা এবং ততোধিক অভিমান কখনো ত্যাগ করিতে পারে নাই। আমি এই যে মনের প্রেম, আর প্রাণের প্রেম—দুইটার ভেদ নির্দ্দেশ করিতেছি—ইহা হয়তো একালের প্রেমিক-প্রেমিকারা বুঝিতে পারিবেন না। একালের কাব্যে-উপন্যাসে, সম্ভবতঃ বাস্তবেও—প্রেম আর দেহকে—প্রাণকে—আশ্রয় করিতে পারে না; দেহের সম্পর্ক যেটুকু যে কারণে, তাহাতে প্রেমের প্রয়োজন হয় না—প্রথম হইতেই সে একটা business; এজন্য প্রেম এক্ষণে মনকেই আশ্রয় করিয়াছে, প্রাণ বলিয়া কিছুই নাই—সেটা দেহেরই ধর্ম্ম কিনা? তাই প্রেমের মনো-বিশ্লেষণই কাব্যে ও উপন্যাসে একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। অতি-আধুনিক বাংলাসাহিত্যে আর প্রেম নাই; কবির মনোবিলাসের সেই মানসী—সূক্ষ্ম সূচীশিল্পের সেই কারু-বিগ্রহগুলিই—জীবন্ত নর-নারীর স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং প্রেমহীন প্রেতাত্মারা তাহারই জয়গান করে। যাহাদের জীবনই অতি দুর্ব্বল, প্রেমের ক্রুশভার বহন করিবার শক্তি যাহাদের নাই, তাহারাই প্রেমকে—সর্ব্ববিধ loyalty-কে—একটা কুসংস্কার বলিয়া গালি দেয়; এইরূপ প্রেমকে primitive বা pastoral বলিয়া তাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সেই সান্ত্বনা বা আত্মপ্রসাদ এইরূপ দুর্ব্বল মনোবিলাস নয়, সে ছিল নিজেকে ভুলাইয়া রাখিবারই একটা উপায়। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র এই প্রেমকেই—নরনারীর, বিশেষ করিয়া নারীর হৃদয়শোণিতে রঞ্জিত করিয়া, তাহার সেই বিষামৃত-মাধুরীর সহিত আমাদের যে পরিচয় করাইয়াছেন তাহাই তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি; কিন্তু এখানে সে আলোচনা অবান্তর। আমরা রাজলক্ষ্মীর কথা বলিতেছিলাম। এত দিনে তাহার সেই মনের অভিমান চূর্ণ হইয়া গেল; সেই মনের আড়ালে প্রাণটা চাপা ছিল বলিয়াই তাহার অন্তর্দাহ এমন প্রবল হইয়াছিল; আজ সেই প্রাণের আগুনেই মন ভস্ম হইয়া গেল। যে-প্রেমে সত্যকার পাওয়া নাই, সে-প্রেমে সত্যকার হারানোও নাই—যাহাতে মিলন নাই, তাহার আবার বিরহ কি? হারাইয়া পাওয়ার যে গভীরতর প্রাপ্তি—সেই যে ভাব-সম্মিলনের সুধা-রস তাহার জন্যও বাস্তব-বিরহ চাই, অর্থাৎ বিগত-মিলনের স্মৃতি চাই। শ্রীকান্তের সহিত রাজলক্ষ্মীর এতদিন সেই বিরহ-মিলনের একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল; এইবার মিলন। আমরা এখনই দেখিব সেই মিলনও রাজলক্ষ্মী নিজেই ঘটাইতেছে; ইহার পর চিরবিরহের চিরমিলনেই রাজলক্ষ্মী-নাটকের পরিসমাপ্তি। এ নাটকের সেই

পঞ্চমাঙ্কের এই ভূমিকা করিয়া রাখিলাম; নাটকের সমাপ্তি ঐরূপই কিনা, সে বিচার পরে হইবে,—রাজলক্ষ্মী হারাইল না পাইল, সে প্রশ্নের মীমাংসা আমরা সকল দিক দিয়াই করিব। কিন্তু পঞ্চমাঙ্কে প্রবেশ করিবার মুখে একটা বিষ্কম্ভক আছে, সেইটিই আগে সারিয়া লইতে হইবে।

নেপথ্য-কাহিনী

(১)

গহ্বর

"Love is a sacrament that should be taken kneeling, and 'Domine non sum dignus' (Lord, I am unworthy) should be on the lips and in the hearts of those who receive it."

—*OSCAR WILDE : De Profundis.*

এই কাহিনী মুখ্যতঃ রাজলক্ষ্মীর কাহিনী হইলেও ইহার শেষাংশে একটু জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে; রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত উভয়ের জীবনে—একজনের পক্ষে গৌণ, অপরের পক্ষে মুখ্যভাবে—এমন একটি গ্রহের উদয় হইয়াছে যাহার আকর্ষণ-বিকর্ষণে মূল কাহিনীটি গতিভ্রষ্ট হইয়া একটা আকস্মিক পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নারীরূপী গ্রহটির নাম—কমললতা। ঐ নারী শ্রীকান্তকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, তেমনি, শুধু রাজলক্ষ্মী নয়—এই কাহিনীতে যতগুলি ছোট-বড় নারী-চরিত্র আছে, এমন কি অন্নদাদিদিকেও আড়াল করিয়া এক দুর্জ্ঞেয় মহিমায় দীপ্তি পাইয়াছে। সাক্ষাৎভাবে রাজলক্ষ্মীর প্রেম-পরিণামকে ত্বরান্বিত ও ভিন্নমুখী করিলেও, এই নারীর জীবন ও চরিত্র এমনই—তাহাতে এমন একটা বুদ্ধি-বিভ্রমকারী মিষ্টিক ভাব-সত্যের উদ্ভাস আছে যে, সে যেন এই কাহিনীর মূল সমস্যাকে—সেই নরনারী-ঘটিত মানবীয় প্রেমের যতকিছু জটিলতা ও প্রশ্ন-গভীরতাকে নিমেষে ছিন্ন ও নস্যাৎ করিয়া দেয়; তাহার নিজের প্রেম এমন একটা উচ্চভূমিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে দেহ-মন-আত্মার সঙ্গে বাস্তবের যত কিছু বিরোধ, অর্থাৎ সকল দুঃখ, সকল পরাজয় একটি অপূর্ব্ব রসে সমাহিত হইয়া প্রেমকে নির্দ্বন্দ্ব করিয়া তোলে; যাহা মূলে দেহেরই আকুতি, তাহা দেহকে আশ্রয় করিয়াই দেহাতীত হইয়াছে! এ সাধনা বাংলার নিজস্ব; আমরা—আধুনিক বাঙালী—ইহার সংবাদও রাখি না; অথচ এখনও ঐ সাধনা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। শ্রীকান্ত, আমাদের মতই, ইহার বিশেষ পরিচয় রাখিত না; হঠাৎ সে-ও এই সাধনার অতি গূঢ়, গভীর ও জীবন্ত পরিবেশের মধ্যেই আসিয়া পড়িল, তাই এই চতুর্থ-পর্ব্ব পাঠকেরও বড় অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হয়; অনেকে বোধ হয়, ইহাকে নিতান্ত আগন্তুক, এমন কি নিকৃষ্ট অংশ বলিয়া

নিরাশ হইবেন ; শুনিয়াছি একজন রস-পণ্ডিত সাহিত্য-সমালোচক—বড় অধ্যাপক —নাকি এমন কথাই বলিয়াছেন। খুবই স্বাভাবিক ; প্রথমতঃ, সাহিত্য-বিচার পাণ্ডিত্য-সাপেক্ষ হইলেও—রসবোধের অপেক্ষা রাখে, এবং তাহা জাতি, জন্ম, ও সমাজ ছাড়াও আর একটা বস্তুর উপরে নির্ভর করে বলিয়া সকলের তাহাতে অধিকার নাই, সেই প্রাক্তন সংস্কার বা gift সকলের নাই ; আবার কবি ও অধ্যাপক এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান অল্প নহে, এজন্য এক জার্মান কবি ও মনীষী এমন একটি বাক্য রচনা করিয়াছিলেন—'From the poet down to the professor of poetry"। সে যাহাই হোক, 'শ্রীকান্ত'-কাহিনীর এই চতুর্থ-পর্ব্ব আরও এক কারণে মূল্যবান,—এই পর্ব্বে শ্রীকান্তও নিজের মন ও হৃদয় বড় বেশি করিয়া মুক্ত করিয়াছে—বিশেষ করিয়া আত্মকথাই কহিতেছে। ইহার কারণ স্পষ্ট। এতদিন সে জড়াইয়া পড়িয়াছিল—বাহিরের দ্বারা একটু বেশি আক্রান্ত হইয়াছিল; তাই রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে তাহার যত কিছু ভাব-অভাব, সংকল্প-বিকল্পের কথাই সে বলিয়াছে ; আর ছিল ভবঘুরের ভ্রমণ-কাহিনী। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর সহিত ঐ ঘনিষ্ঠতা, এবং তজ্জনিত আঘাত-প্রতিঘাতে তাহার ভিতরটা যেরূপ নাড়া পাইয়াছে, তাহাতে সে নিজের জীবনটার দিকেও চাহিতে বাধ্য হইয়াছে। হঠাৎ তাহার জীবন বড় শূন্য, বড় নিঃসঙ্গ বোধ হইল,—তাহার সদ্য-বন্ধনমুক্ত উদাসীন প্রাণ কি যেন একটা বস্তুর সন্ধান করিতেছে। কি চায় তাহা সে জানে না, অথচ বেদনায় বুক ভরিয়া উঠিতেছে।

কাশী হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে ট্রেনে গ্রামের ঠাকুরদা'র সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলে, তাঁহার শ্যালিকা-কন্যাটিকে উদ্ধার করিতে সম্মত হইয়া শ্রীকান্ত গ্রামে ফিরিয়া আসিল ; তারপর রাজলক্ষ্মীকে সেই সংবাদ দিয়া তাহার উত্তরের আশায়, এবং অন্য প্রয়োজনে কলিকাতায় যাইবার জন্য বাহির হইয়া ষ্টেশনে হঠাৎ তাহার বাল্যবন্ধু গহরের সঙ্গে সেই যে দেখা হইয়া গেল, তাহার জীবনে উহাও একটা বড় দৈব-ঘটনা। গহরও তাহারই মত নিঃসঙ্গ, অর্থাৎ আত্মসঙ্গী ; সে কবি, ভাবসাধনাই তাহার ধর্ম্ম—সে সাধনা সাহিত্যিক রসচর্চ্চাই নয়, সে তাহার আত্মার জীবিকা। গহরের সমাজ মুসলমান-সমাজ হইলেও সে খাঁটি বাঙালী, তাহার ঐ সাধনাও বাঙালী-সাধনা অর্থাৎ সে প্রকৃতিপন্থী, সহজিয়া ; তাহাতেও সে শাক্ত নয়, বৈষ্ণব—সে মাধুরীর সাধনা করে। আমাদের পঞ্চমাঙ্কের প্রবেশ-পথে এই যে একটি মানুষের সহিত শ্রীকান্তের সাক্ষাৎ—এবং আমাদেরও পরিচয় হয়, তাহাতে শ্রীকান্তের মত আমরাও একটা নূতন জগতে প্রবেশ করি। শ্রীকান্ত

গহরের মধ্যে তাহার নিজ-আদর্শের একটা দিক লক্ষ্য করিয়া খুশী হইল, কবি-গহরের সরল কবি-প্রাণ ও রচনাশক্তির তারিফ করিল; কিন্তু সে তাহার সেই কবিত্বের গভীরতর উৎস—তাহার আত্মার গূঢ়তর পিপাসা লক্ষ্য করিল না; কোন্ অপরূপ রসের নেশায় সে এমন আত্মভোলা আত্মহারা হইয়াছে সে বিষয়ে কোন জিজ্ঞাসাই তাহার মনে উদয় হইল না। বরং তাহার প্রাণের সেই সারল্য ও মনের নিশ্চিন্ততা দেখিয়া সে তাহার প্রতি একটু মমতাপরবশ হইল। শ্রীকান্তের মত সে নিঃসঙ্গ-স্বাধীন, অর্থাৎ সংসার-বিমুখ, ইহাই হয়তো কিছু শ্রদ্ধারও উদ্রেক করিয়াছিল; কিন্তু সে তো শ্রীকান্তের মত আত্ম-সচেতন নয়। শ্রীকান্ত গহরের মতই এত সহজে সব কিছু সহিয়া লইতে পারে না—নিজের সঙ্গে নিজের এবং জগতের বোঝাপড়া সে ত্যাগ করিতে পারে না। তাই গহরের কবি-প্রাণ তাহাকে মুগ্ধ করিলেও সে তাহার সেই অবোধ আত্ম-সন্তোষকে একরূপ স্নেহ-হাস্যে অভিনন্দিত করিল। শ্রীকান্ত তখন জানিতে পারে নাই—ঐ গহরই তাহাকে এক অনাবিষ্কৃত দিগ্‌বলয়ের সন্ধান দিবে, না জানিয়া—যেন নিশির ডাকে—সে এমন এক পুরীপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইবে, যেখানে তাহার সারা শ্রীকান্ত-জীবনের স্বপ্ন-ঘোর ভাঙ্গিয়া যাইবে, ঐ গহরই তাহার সেই রূঢ় জাগরণের কারণ হইবে।

এই গহর-চরিত্রটি উপন্যাসের মধ্যে দুইবার কি তিনবার মাত্র উঁকি দিয়াছে; তাহাতেও গোচর অপেক্ষা অগোচর ভাগই বেশি। তথাপি যেটুকু গোচর হইয়াছে তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়, এই চরিত্র—উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলির পর্য্যায়ভুক্ত; রাজলক্ষ্মীর কথা ছাড়িয়া দিলে, গহর—ইন্দ্রনাথ, অন্নদা-দিদি বা কমললতার তুলনায় ক্ষুদ্র নয়। শ্রীকান্ত তাহার যেটুকু পরিচয় দিয়াছে তাহার বেশি সে পারিত না, কিন্তু তাহাতেই গহর-চরিত্র অসামান্য হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ একদিকে যেমন ইন্দ্রনাথ, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে এই গহর—এই আরেক প্রাণ, মানবাত্মার আরেক মহিমা আমাদের হৃদয়-মন অভিভূত করে। শ্রীকান্ত তাহার যতদূর সাধ্য, ইহাকে আমাদের হৃদয়গোচর করাইয়াছে। সে ইহার পানে যেন ভাল করিয়া তাকাইতেই পারে নাই—তাহার স্বভাবে সেই সঙ্কোচ আছে; দ্বিতীয়তঃ, কমললতার সহিত গহরের সম্পর্কটা সে বুঝিয়াও বুঝে না; তাহার দৃষ্টি যতটা কমললতার দিকে, ততটা গহরের দিকে নয়; তাই কমললতার দিক দিয়া, তাহারই গৌরব রক্ষা করিতে গিয়া, গহরকে সে একটু ঢাকিয়া রাখিয়াছে,—গহরকেও বুঝিতে পারিলে সে প্রয়োজন হইত না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও

শ্রীকান্ত গহরের প্রতি যে সুবিচার করিয়াছে তাহাতেই গহরকে আমরা স্বাধীনভাবে চিনিয়া লইতে পারি।

আমরা দেখিতে পাই, সমগ্র উপন্যাসখানিতে নারী-প্রেমের কথাই মুখ্য; পুরুষের জীবনে প্রেমের প্রভাব ঐ একটি চরিত্রে দেখা দিয়াই অদৃশ্য হইয়াছে। শ্রীকান্ত এ পর্য্যন্ত প্রেমকে নারীহৃদয়ের দুর্ব্বলতা বলিয়াই আশ্বস্ত হইয়াছে, পুরুষের মধ্যে ঐ ব্যাধির এমন প্রকোপ সে ইতিপূর্ব্বে দেখে নাই; রোহিণীকে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু সে প্রেম অতি দুর্ব্বল পুরুষের প্রেম—করুণা উদ্রেক করে। এবার সে সেই প্রেম-রোগের এই অদ্ভুত রোগীটিকে দেখিয়া রীতিমত ঘাবড়াইয়া গিয়াছে। ঐ প্রেম সত্যই দুর্ব্বোধ্য,—শ্রীকান্ত কেন, আমাদের পাঠকেরাও অনেকে উহা হয়তো বিশ্বাস করিবেন না। বস্তুতঃ, প্রেমিক গহর যেখানে তাহার প্রেমের আসন পাতিয়াছে তাহা আত্মার যজ্ঞ-বেদিকাই বটে; যদি উহা pathology বা স্নায়ুঘটিত কোন রোগের অধিকারভুক্তও হয়, তথাপি তাহা মানবাত্মারই ব্যাধি; উহারই কীর্ত্তন-গান নিশীথ-স্বপ্নে আমাদের সুস্থহৃদয়কেও আকুল করিয়া তোলে। এ চরিত্র একখানি স্বতন্ত্র কাব্যের বিষয় হইতে পারিত; তাহা নাটক না হইয়া উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যই হইত। তথাপি শ্রীকান্ত তাহার যে ছায়াচিত্র আঁকিয়াছে তাহাতেই বাকিটা আমরা পূরণ করিয়া লইতে পারি,—কমললতা, শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া আমরা তাহার সেই অপূর্ব্ব চরিত্র ধ্যান করিতে পারি। গহরের কবি-জীবনেও যেমন, তেমনি তাহার প্রেমিক-জীবনেও আকাশের মত একটা নীল নির্ম্মলতা আছে, আলোর মত একটা নিঃশব্দ ব্যাপ্তি ও নীরব আত্মনিবেদন আছে। শ্রীকান্ত তাহাকে কতকটা আড়-চোখে দেখিয়াছে, ভাল করিয়া দেখাইতেও ভয় পাইয়াছে। তথাপি এ কাহিনীতে তাহার স্থান অল্প হইলেও তুচ্ছ নহে; কাহিনীর বাকি সমগ্র অংশ যদি সন্ধ্যাকাশের বর্ণগরিমা লাভ করিয়া থাকে, তবে এই একটি চরিত্র তাহাতে সন্ধ্যাতারার মত দীপ্তি পাইতেছে।

আমি বলিয়াছি, শ্রীকান্ত হঠাৎ বড় একা বোধ করিল; জগৎ যেন শূন্য হইয়া গিয়াছে, প্রাণের ভিতরটায় একটা হাহা-শ্বাস জমিয়া উঠিতেছে, এই অবস্থায় গহরের সঙ্গে তাহার দেখা। যখন সে সর্ব্ববন্ধন হইতে মুক্তিলাভের আশায় অধীর হইয়াছে, অথচ একটা দারুণ অভাব বোধ করিতেছে, তখন এই নিঃসঙ্গ, এবং বাহিরে শূন্য হইলেও ভিতরে পূর্ণ-প্রাণ যুবাকে সে তাহার সতীর্থ মনে করিয়া একটু আত্মপ্রসাদের আয়োজন করিতেছিল, বুঝিতে পারে নাই—সে কোন্

অতলের তটকিনারে আসিয়া বসিয়াছে। গহর যখন হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—

"আচ্ছা শ্রীকান্ত, তুই কখনো কাউকে ভালবেসেছিলি ?

গহরের প্রশ্নে হাসিয়া বলিলাম, না।

গহর কহিল, যদি কখনো ভালবাসিস, যদি কখনো সেদিন আসে, আমাকে জানাস্ শ্রীকান্ত।

—জেনে তোমার কি হবে ?

—কিছুই না। তখন শুধু তোদের মধ্যে গিয়ে দিনকতক কাটিয়ে আস্‌বো।

—আচ্ছা।

—আর যদি তখন টাকার দরকার হয় আমাকে খবর দিস্। বাবা অনেক টাকা রেখে গেছে, সে আমার কাজে লাগল না,—কিন্তু তোদের হয় তো কাজে লেগে যাবে।

তাহার বলার ধরণটা এমনি যে, শুনিলেও চোখে জল আসিয়া পড়িতে চায়। বলিলাম, আচ্ছা তাও জানাবো। কিন্তু আশীর্ব্বাদ কর, সে প্রয়োজন যেন না হয়।" [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ২৪]

আশীর্ব্বাদই বটে। শ্রীকান্ত তাহার বন্ধুর এই নিঃস্বার্থ পরসুখচিকীর্ষা দেখিয়া মুগ্ধ হইল, কিন্তু উহার মূলে কোন্ বস্তু রহিয়াছে, তাহা সন্দেহমাত্র করিল না। সে তো জানে না—উহাই প্রেম, উহার মত উচ্চাধিকার,—আত্মার এত বড় মহত্ব আর নাই। উহা দয়া নয়, পরদুঃখকাতরতাও নয়, অনুকম্পা বা করুণা নয়; উহা সেই রস—যাহা পান করিতে হইলে, হৃদয়ের পাত্রখানি আর একজনের মুখে ধরিতে হয় বটে, তথাপি সে রস যদি সত্য হয় তবে আত্ম-পর-সংস্কার ঘুচিয়া যায়; পরদুঃখমোচনের মধ্যেও যে 'আমি'-জ্ঞান জাগিয়া থাকে—একেবারে লুপ্ত হয় না,—তাহাও আর থাকে না, থাকে কেবল ভালবাসার আনন্দ; সে যে কি তাহা আত্ম-পর-জ্ঞানীরা বুঝিবে কেমন করিয়া? গহর এই প্রেমেরই কবি; তাহার প্রেমেও 'তুই' আছে, কিন্তু সেই তুইয়ের অপরকে সম্বোধন করিয়া সে-ও বলিতে পারে—

তোমার পবিত্র কায়া
প্রাণেতে ফেলেছে ছায়া,
মনেতে জন্মেছে মায়া, ভালবেসে সুখী হই।
ভালবাসি নারী-নরে,
ভালবাসি চরাচরে,
সদাই আনন্দে আমি চাঁদের কিরণে রই॥

শ্রীকান্ত যদি তাহার প্রাণের সেই গান শুনিতে পাইত, তবে নিশ্চয় বড় অস্বস্তি বোধ করিত; তথাপি সে গহরকে যথাসাধ্য তাহার মত করিয়াই দেখাইয়াছে, ইহাই-তো তাহার সেই শক্তি, যাহার জন্য এই আত্ম-কাহিনীকেও সে একটি উৎকৃষ্ট কবি-কর্ম্মে পরিণত করিতে পারিয়াছে।

তথাপি শ্রীকান্তের নিকটে গহর রহস্যময় হইয়াই রহিল। সে উহার কথা জানিলেও বুঝিবে না—কমললতা তাহা জানিত। তাই শ্রীকান্ত যখন তাহাকে বলিল,—

"কিন্তু যাবার আগে গহরের কথাটা একটু জেনে যেতে ইচ্ছে করে।
বৈষ্ণবী নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিল, গহরের কথা? না, সে শুনে তোমার কাজ নেই।"

[ঐ, পৃঃ ১০১]

আরও একদিন সে শ্রীকান্তের ঐ এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল—

"সেও তোমাকে আমি বলব না। তোমার যা ইচ্ছে হয় ভাবো গে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।" [ঐ, পৃঃ ১২১]

কিন্তু ঐ কমললতাই একদিন বাগানে ফুল তুলিবার সময়ে শ্রীকান্তের আর এক কথার জবাব না দিয়া একটু পরে মৃদু কণ্ঠে গাহিয়াছিল—

চণ্ডীদাস-বাণী শুন বিনোদিনী, পীরিতি না কহে কথা।
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলয়ে তথা॥

[পৃঃ ১০৮-১০৯]

—এ যে কাহাকে মনে করিয়া,—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। যাঁহারা গহরের ঐ কাহিনী শেষ পর্য্যন্ত মন দিয়া পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, এ শুধুই কবিতার কাব্যরস নয়—ইহা কত সত্য! ঐ যে 'পীরিতি না কহে কথা', ইহা যে কোন বিশেষ সাধনার তত্ত্ব নয়, পরন্তু মানব-মানবীর (বোধ হয়, বিশেষ করিয়া—নারীরই) গভীর প্রেমের একটা লক্ষণ, তাহার প্রমাণ, এইরূপ প্রেমের কাহিনী সকল সমাজেই মিলিবে। এ জন্য সকল দেশের কবিরাই ইহা লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করেন। আমি এই পুস্তকের এক স্থানে, ফরাসী মহাকবি Victor Hugo-র উপন্যাসের যে একটি নারী-চরিত্রের উল্লেখ করিয়াছি—সেই Eponine-চরিত্রটি ঐরূপ প্রেম-সাধনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ঐ গানের দ্বিতীয় পংক্তিটির কথায় আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি সহসা সায় দিবে না, কিন্তু চোখে দেখিলে যদি বিশ্বাস করিতে হয়—গহরের পরিণাম সেইরূপ চোখে-দেখারই মত; অন্ততঃ সে চিত্র এমনই যে, বিশ্বাস করিতে কিছুমাত্র বাধে না। গহরের পরিচয় উপস্থিত এই পর্য্যন্ত, পরে কাহিনীসূত্রে আরও কিছু বলিব।

(২)

কমল-লতা ও শ্রীকান্ত

'Tis hers to pluck the amaranthine flower
Of Faith, and round the Sufferer's temples bind
Wreaths that endure affliction's heaviest shower
And do not shrink from sorrow's keenest wind.

—*WORDSWORTH*

দ্বিতীয়বার দেশে আসিয়া অরক্ষণীয়া মেয়েটিকে বিবাহ্ করার প্রতিশ্রুতি হইতে—প্রথমে অর্থদণ্ড, পরে তাহা হইতেও—নিষ্কৃতিলাভের পর শ্রীকান্ত গহরের খোঁজে বাহির হইল। ইহাই সেই নিশির ডাক; তাহার প্রাণ তো গহরকে খুঁজিতেছে না, যাহাকে খুঁজিতেছে সে তাহার নিয়তি—সে-ই তাহাকে ডাকিতেছে। তাই গহরের খোঁজেই সে মুরারিপুরের আখড়ায় গিয়া পৌঁছিল। সেইখানে বৈষ্ণবী কমললতাকে দেখিয়া শ্রীকান্ত বড় আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

"বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাঁট ছিপছিপে গড়ন; হাতে কয়েকগাছি চুড়ী, হয়তো পিতলের—সোনার হইতেও পারে; চুল ছোট নয়, গেরো-দেওয়া, পিঠের উপর ঝুলিতেছে; গলায় তুলসীর মালা। হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা।......ইহার মুখের দিকে চাহিয়া কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। সবিস্ময়ে মনে হইল, এই চোখ-মুখের ভাবটা যেন পরিচিত, এবং চলার ধরণটাও যেন পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি।

বৈষ্ণবীও কিছুমাত্র ভূমিকা করিল না, সোজা আমার প্রতি চাহিয়া কহিল,

কি গোঁসাই, চিনতে পারো?

বলিলাম, না, কিন্তু কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।

বৈষ্ণবী কহিল, দেখেছ বৃন্দাবনে। বড় গোঁসাইজীর কাছে খবরটা শোননি এখনো?

বলিলাম, তা' শুনেছি। কিন্তু বৃন্দাবনে আমি তো কখনো জন্মেও যাই নি।

বৈষ্ণবী কহিল, গ্যাছো বই কি! অনেক কালের কথা, হঠাৎ স্মরণ হচ্ছে না। সেখানে গোরু চরাতে, ফল পেড়ে আনতে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে? এই বলিয়া সে ঠোঁট চাপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।" [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ৫৭-৫৮]

কমললতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের এই যে বর্ণনা ইহাতে কেমন একটা অন্য ধরণের সুর—সম্পূর্ণ নূতন একটা সাইকোলজির তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কমললতার ঐ কথাগুলির অনেক রকম অর্থ হইতে পারে; কিন্তু সে যে-ভাষায় কথা কহিতেছে তাহা তাহাদের সাধনমার্গের ভাষা, একরূপ সন্ধ্যা-ভাষাও বলা

যাইতে পারে। তাহাতে সে ঐ যে পূর্ব্বপরিচয়ের উল্লেখ করিল তাহা মানুষে-মানুষে আর একপ্রকার পরিচয়ের কথা। প্রেমের যে আধ্যাত্মিক জগৎ—যাহার নাম বৃন্দাবন, সেখানে সেই এক প্রেমের আলোকে কেহ কাহারও অপরিচিত নয়। বৈষ্ণবীর ঐ কথার অর্থ এইরূপ হইতে পারে,—যে-বৃন্দাবনে মহাসৌভাগ্যবান প্রেমিক নর-নারীই বাস করিতে পায়, শ্রীকান্তও সেই স্থানের অধিবাসী, অতএব বৈষ্ণবী তাহাকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছে, সে তাহারই সতীর্থ। কিন্তু পরে তাহার আচরণে ও কথাবার্ত্তায় ইহারও অধিক একটা অর্থ উঁকি দিয়াছে, ক্রমে তাহাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—সে শ্রীকান্তের সহিত একটা বিশেষ পরিচয় দাবি করে। তাই সেই প্রথম-দর্শনেই তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠিয়াছে, যেন সে জন্মান্তর-পরিচিত প্রিয়জনকে হঠাৎ দেখিয়া চিনিয়াছে; শ্রীকান্ত যাহা বিস্মৃত হইয়াছে—হওয়াই স্বাভাবিক—সে তাহা নিঃসংশয়ে স্মরণ করিতেছে।

এ ঘটনা অলৌকিক বলিয়া, পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁহারা অতিমাত্রায় শিক্ষিত, অর্থাৎ আধুনিক, তাঁহারা উপন্যাসে, বিশেষ করিয়া এইজাতীয় রচনায় ঐরূপ বস্তুর আমদানি করিতে দেখিলে, লেখকের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে মনে করিয়া এইবার হাই তুলিতে থাকিবেন। একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ, বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারিলে লেখককে বাঁচাইতে পারা যায়, নহিলে শ্রীকান্ত-উপন্যাসের এই পর্ব্বটি এইখান হইতেই বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু সে ভয় নাই, আমরা ইহাকে একরূপ unconscious cerebration বা একটা psychic experience বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি। শ্রীকান্তের দিক দিয়া আরও সহজ সমাধান আছে; তাহার মত ভবঘুরে কত স্থানে কত ব্যক্তিকে দেখিয়া থাকিবে, সকলকে স্মরণ রাখিবার কথা নয়। এই বৈষ্ণবীকেও হয়তো সে কোথাও পূর্ব্বে সত্যই দেখিয়াছিল, তারপর ভুলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার দেখিয়া একটা অস্পষ্ট পরিচয় বোধ করিতেছে। অতিশয় নূতন পরিবেশে, এবং অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হইলে আমরা অনেক সময়ে মানুষটাকে চিনিয়াও চিনিতে পারি না। শ্রীকান্তের মনে সেই সামান্য পরিচয়ের অস্পষ্ট স্মৃতি এমন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। যেখানে এইরূপ বিস্মৃত পরিচয় নূতন হইয়া উঠে, সেখানে স্মৃতির পুনরুদ্ধার করিতে না পারিলে—অন্ততঃ আমাদের দেশে একটা বিশ্বাস আছে—উহা কোন এক পূর্ব্ব-জন্মের পরিচয়। শ্রীকান্ত তাহা মনে করে নাই—তাহার সংস্কার অন্যরূপ; সে কোন অপ্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ-জীবন-বহির্ভূত বস্তুকে বিশ্বাস করে না, মানুষের দেহ ও হৃদয় এই দুইয়ের যুক্তিসঙ্গত দাবি ছাড়া আর কোন দাবিই স্বীকার করে না।

ধর্ম্ম-সাধনার গুহ্যতত্ত্বও তাহার নিকটে দুর্ব্বোধ্য, এ কথা সে বার বার কবুল করিয়াছে। তাই পূর্ব্বজন্ম তো দূরের কথা, ইহজন্মে মানুষের অবচেতনায় বা নির্জ্ঞানে মাঝে মাঝে যে সকল অনুভূতি হয় তাহাও সে বিচারযোগ্য মনে করে না—যে সকল অনুভূতিকে আমরা আত্মিক উপলব্ধি বলিয়া ব্যাখ্যা করি, শ্রীকান্ত তাহার কবিত্বও সহ্য করিতে পারে না। শ্রীকান্ত সে ধরণের ভাবুকও নয়, যে নিজ-মনেরই কোন একটা ছবিকে বাহিরে প্রতিবিম্বিত করিয়া তাহাতে চেনা এবং না-চেনার-একটি ভাব-রস উপভোগ করিবে; যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার সেই—

> গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে—
> দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

সেখানে অপরিচিতকে চেনার কারণ আমরা বুঝিতে পারি। রূপকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, ঐরূপ অনুভূতি ব্যক্তিবিশেষের প্রাণের মধ্যেই হইতে পারে—সে পরিচয় সম্পূর্ণ আত্মগত, subjective; তাই ঐরূপ 'চিনি উহারে' মনে হওয়ার জন্য কোনরূপ বাস্তব পরিচয়ের প্রয়োজনই নাই। শ্রীকান্তের ঐরূপ ভাব-সাধনার বালাইও নাই। তথাপি কমললতার ঐ কথায় সে যেন একটু বোকা বনিয়া গিয়াছে—তাহার সেই পরিহাস-লঘু বচনভঙ্গির মধ্যে একটা স্পষ্ট অর্থ অনুমান করিয়া মনে মনে সংশয়যুক্ত হইয়াছে। সে তাহার ঐ ভাষাই বুঝিতে পারে নাই, পারিলে নিজের মত করিয়া একটা অর্থ বুঝিয়া লইত এবং তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিত। আমরা দেখিব, কমল-লতার ঐ প্রথম কথাতেই তাহার চিত্তে এমন একটা ভাবান্তর ঘটিতে সুরু করিয়াছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত পুনঃপুনঃ বিমূঢ় হইলেও, সে বুদ্ধির দ্বারা সেই বিমূঢ়তাকে জয় করিতে পারে নাই। অতঃপর কমললতা ক্রমেই তাহার পক্ষে একটা হেঁয়ালী হইয়া উঠিয়াছে—রাজলক্ষ্মীকে যত সহজে বুঝিয়া লইয়াছিল, কমললতাকে তেমন পারে নাই। কমললতা তাহাকে চিনিয়াছিল, কিন্তু সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মীও তাহাকে চিনিয়াছিল—নারী পুরুষকে যেমন চেনে তেমনই; কমললতা চিনিয়াছে আরও ভিতরকার তাহার সেই 'আমি'টাকে—যে 'আমি'কে সেও চেনে না। রাজলক্ষ্মী তাহার চরিত্রের যে গুণে এমন আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি, ইহাও সত্য যে, সে শ্রীকান্ত-চরিত্রের দুর্ব্বলতার দিকটা কখনও বিচার করিয়া দেখিতে সম্মত হইত না—তাহার প্রেম তেমন নির্লিপ্ত, মোহশূন্য নয়; তাই শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী একজন স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, বন্ধন-ভীরু, উদাসীন পুরুষ বলিয়াই জানে—সেইজন্য তাহার

প্রতি শ্রদ্ধার অন্ত নাই ; অথচ তাহার জন্য প্রাণও কাঁদে, সে এমন আত্মবঞ্চিত বলিয়া, তাহাকে সর্ব্ববিপদ ও অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই ব্যাকুল হয়। কমললতা শ্রীকান্তকে আরও গভীর ভাবে চিনিয়াছে, সেও তাহাকে কম শ্রদ্ধা করে না ; কিন্তু তাহার উৎকণ্ঠা অন্যরূপ ; সে তাহাকে আত্ম-ভীরু, আপনাতে আপনি-বদ্ধ, ভাব-দুর্ব্বল, অভিমানী পুরুষ বলিয়া চিনিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার অমঙ্গল-ভয় সে করে না, তাহার প্রেম এমনই নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত। রাজলক্ষ্মী নারী,—কমললতা নারী এবং আরও কিছু ; রাজলক্ষ্মীর সত্য—নারীহৃদয়ের সত্য, কমললতার সত্য অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সত্য—সে নারীজীবনকে জয় করিয়াছে।

কমললতা কেমন করিয়া শ্রীকান্তকে দেখিবামাত্র তাহার সেই জন্মান্তরীণ, অথবা ঐ শ্রীকান্ত-জীবনের ভূমিকা-নিরপেক্ষ পরিচয় তাহাকে স্মরণ করাইবার জন্য তাহার সেই অদ্ভুত ভাষায় এমন কথা বলিল—

"দেখেচ বৃন্দাবনে।......সেখানে গোরু চরাতে, ফল পেড়ে আন্‌তে, বনফুলের মালা গেঁথে আমাদের গলায় পরাতে—সব ভুলে গেলে ?"

—তাহা কে বলিবে ? শ্রীকান্ত ইহার জবাবে নির্ব্বোধ বালকের মতই বলিল, "আমি তো বৃন্দাবনে কখনো জন্মেও যাই নি"। অর্থাৎ, সে তাহার গূঢ় অর্থ দূরে থাক্, রহস্যটুকুও বুঝিতে পারে নাই। আমরা তদপেক্ষা কিছু বেশি বুঝিলাম, তার কারণ আমরা এই কাহিনীর নায়ক নই। সবটা না বুঝিলেও আমরা উহার রূপক-অর্থটা বুঝি—সত্য বলিয়া গ্রহণ করি বা না করি।

ঐ বৃন্দাবন একটা অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতেও পারে। এমন জগতের আভাস আমাদের এই ইন্দ্রিয়-চেতনার ফাঁকে ফাঁকে নাকি কখনো কখনো পাওয়া যায়। তেমন সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা সাহিত্যে কবিদের মুখেও শোনা গিয়াছে, আমাদের এই আলোচনা মুখ্যত সাহিত্যিক, অতএব সেইরূপ অ-বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ অবান্তর নয় ; আমি তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত করিব—জানি, তাহাতে পাঠক-পাঠিকার ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না, বরং বেশ একটু রসাবেশ হইবে, সেটুকুও কম লাভ নয়,—আমাদের অধ্যাপকেরা যতই ভ্রূকুটি করুন। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সেই বহুবিখ্যাত কবিতার এই পংক্তিগুলি সকলেই স্মরণ করিবেন—

Our birth is but a sleep and a forgetting :
The Soul that rises with us, our life's Star
Hath had elsewhere its setting,
And cometh from afar :

Not in entire forgetfulness,
And not in utter nakedness,
But trailing clouds of glory do we come
From God who is our home :
* * * *

Hence in a season of calm weather,
Though inland far we be,
Our souls have sight of that immortal sea
Which brought us hither,
Can in a moment travel thither,
And see the children sport upon the shore,
And hear the mighty waters rolling evermore.

—ইহাও সেই বৃন্দাবনের কথা! কেবল ভাষাটা একটু অন্যরূপ। ঐ 'immortal sea' বা অমৃত-সাগরের বেলাভূমিই বৃন্দাবন, আর ঐ যে 'children' উহারাই সেই চির-তরুণ প্রেমোৎফুল্ল-হৃদয় নর-নারী। আরও একজন বিদেশী কবি আর এক রূপকের ভাষায় ঠিক ঐ ধরণের স্বপ্নাকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহার একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"আমার হৃদয়ে একটা দূর দেশের স্মৃতি আছে—আর এমন একটা কালের, যে-কালে সূর্য্য ও চন্দ্র দুই-ই আরও বৃহৎ, আরও দীপ্তিমান্ ছিল। সেটা এই জীবনের কি কোন পূর্ব্ব-জীবনের তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আমি জানি, তখন আকাশ আরও নীল, এবং পৃথিবীর আরও নিকটে ছিল।...... বাল্যকালে যখন এই পৃথিবীতেই স্বর্গবাস করিয়াছিলাম, তখন এক একদিন পাহাড়ের ধারে বসিয়া স্বপ্নাবেশে মনে হইত, যেন ক্ষণেকের জন্য সেই মধুর বাতাস বহিয়া গেল,—ঠিক সেই বাতাস নয়, তবু তাহারই মত।

—সেই দেশ ও সেই কালের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল আমি কিসে সুখী থাকিব। সময়ে সময়ে আমি সুখ ত্যাগ করিয়া দুঃখকেই বরণ করিতে চাহিতাম, তাহাতে সেই দুঃখহীনা অমর-কন্যা বড় দুঃখ পাইত।......তারপর বিদায়ের দিন আসিল, সে কাঁদিতে লাগিল; শেষে আমার হাতে একটি মন্ত্রপূত বস্তু দিয়া বলিল, আমি যেন তাহা কখনো কিছুতে না হারাই; উহাই আমাকে চির-যৌবনে জ্যোতিষ্মান্ রাখিবে, উহারই বলে আমি ফিরিয়া আসিতে পারিব। কিন্তু আমি আর ফিরিলাম না। কত দিন কত বৎসর কাটিয়া গেল, শেষে জানিতে পারিলাম সেই মন্ত্রপূত কৌটাটি হারাইয়া ফেলিয়াছি।" [Lafcadio Hearn]

কবিদের এই সব ভাব-স্বপ্নের রূপক-কথা সেই বৃন্দাবনের কথাই বটে; তথাপি কমললতা যে-বৃন্দাবনের কথা বলিতেছে তাহা কবি-কল্পনার বৃন্দাবন নয়, তাহা সাধন-লব্ধ সত্য। ঐ দ্বিতীয় রূপকটির কাহিনী যেন শ্রীকান্তেরই কাহিনী; কমল-লতার ঐ কথায় তাহাই মনে হয়। এখানে কমল-লতাই যেন শ্রীকান্তের সেই স্বর্গলোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—প্রত্যেক পুরুষ-আত্মার এক চিরন্তনী বধূ,—বৃন্দাবন-সহচরী অর্থেও তাহাই। শ্রীকান্ত তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—সেই অভিজ্ঞান-কৌটা

হারাইয়াছে; বধূ তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, বলিল, "কি গোঁসাই, চিনতে পারো? সেই যে বৃন্দাবনে"—ইত্যাদি। কিন্তু ঐ কবি-কথার চেয়ে এ কথা আরও গভীর; কমললতার বৃন্দাবন এবং তাহার সেই প্রেম কোনটাই ঐরূপ রূপকের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ সে কেবল ভাবুকতার বস্তুই নয়, তাহার মূল ধ্যানের চেয়েও গভীর; পরে আমরা তাহা দেখিব।

তথাপি ইহার সহিত ঐ সাধনার যোগ কিরূপ তাহাও জানিয়া রাখিলে মন্দ হয় না। আমি এ পর্য্যন্ত বাহির হইতে, অর্থাৎ বিদেশী কবি ও ভাবুকসমাজের রচনা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে আর কিছু না হোক, ঐরূপ অনুভূতির মূলে মানব-চৈতন্যেরই একটা গূঢ়তর সংবেদনা আছে, এ কথা মানিতে হইবে। এইবার আমি আমাদের কবির একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব, তাহাতে ঠিক এই ধরণের আত্মগত অনুভূতির সম্বন্ধে, ঐ বিশিষ্ট সাধনা ও সাধক-জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> "কিন্তু এ কথা মনে হয়, আমরা যেন কোন এককালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন, 'তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির'। এ কি হইল! যে আমার মনোরাজ্যের লোক সে আজ বাহিরে আসিল কেন? যাহারা একটি সর্ব্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়াছিল, তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির থাকিতে পারিতেছে না—বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে। আবার হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।"
>
> —মেঘদূত

—ইহাও সেই নিত্য-বৃন্দাবনের ভাবস্থির জন্মান্তর-সৌহৃদের কথা; বৈষ্ণবী কমললতার তাহাই মনে পড়িয়াছে, তাই শ্রীকান্তকে দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা নাই—"হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির"!

কিন্তু কমললতার মুখে ঐরূপ পরিচয়ের যে একটা সাক্ষাৎ কারণও পরে আমরা পাই, তাহাতেও যুক্তির লেশমাত্র নাই, শ্রীকান্তের নিকটেও তাহা অর্থহীন। কিন্তু সে যেমনই হউক, কমললতার ঐ প্রশ্নটা অতঃপর শ্রীকান্তের পক্ষে একটা বড় পরীক্ষার আকার ধারণ করিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়াই সে নিজের নিকটেও পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছে। এইবার আমি কমললতার সেই কথাগুলি তুলিয়া দিব, এবং সেই সঙ্গে তাহার চরিত্রের পরিচয়—ঠিক চরিত্র-পরিচয় নয়—তাহার সেই রূপান্তরিত দেহ-মন-আত্মার একটু পরিচয় দিবার জন্য কয়েকটি দৃশ্য উদ্ধৃত করিব। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ নর-নারী-পরিচয় হইতে ইহা স্বতন্ত্র, নাটকে-উপন্যাসে আমরা মানব-হৃদয়ের যে সার্ব্বজনীন পরিচয়-রসে মুগ্ধ

ও আশ্বস্ত হই, ইহা সেই-জাতীয় নহে। প্রথমে কমল-লতার শ্রীকান্তকে সেই প্রশ্ন এবং সে বিষয়ে তাহার নিজেরই বিশ্বাস কিরূপ, তাহাই দেখাইব।

ঐ কথাগুলির পর কমললতা একান্তে শ্রীকান্তকে বলিতেছে—

"তোমাকে কি বলে' ডাকবো বল তো? নতুন গোঁসাই বলে' ডাক্‌লে হয় না?

বলিলাম, কেন হবে না? তোমাদের এখানে গহর পর্য্যন্ত যখন গহর-গোঁসাই হয়েছে তখন আমি তো অন্ততঃ বামুনের ছেলে।

কিন্তু আমার নিজের নামটা কি দোষ করলে? তার সঙ্গেই একটা গোঁসাই জুড়ে দাও না।

কমললতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, সে হয় না ঠাকুর, হয় না। ও নামটা আমার ধরতে নেই; অপরাধ হয়, এসো।

—তা' যাচ্চি, কিন্তু অপরাধটা কিসের?

—কিসের তা' তোমার শুনে কি হবে? আচ্ছা মানুষ ত! যে বৈষ্ণবীটি মালা গাঁথিতেছিল সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়াই মুখ নিচু করিল।" [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ৬১]

ইহার পরে একদিন—

"বৈষ্ণবী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপরে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা গোঁসাই, তুমি পূর্ব্ব-জন্ম পর-জন্ম এসব বিশ্বাস করো?

—না।

—না কেন? এ কি সত্যিই নেই তুমি ভাবো?

—আমার ভাবনার অন্য জিনিস আছে, এ সব ভাববার বোধ হয় সময় পেয়ে উঠিনে।

বৈষ্ণবী আবার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, একটা ঘটনা তোমাকে বলব, বিশ্বাস করবে? ঠাকুরের দিকে মুখ করে' বলছি তোমাকে মিথ্যে বলব না।......

একদিন গহর-গোঁসাইয়ের মুখে শুনলুম, হঠাৎ তাঁর পাঠশালার বন্ধু এসেছিলেন বাড়ীতে। ভাবলুম, যে লোক একটা দিন আমাদের এখানে না এসে পারে না সে রইলো কোন্ ছেলেবেলার বন্ধুকে নিয়ে মেতে ছ'সাত দিন! আবার ভাবলুম, এ কেমন ধারা বামুন-বন্ধু যে অনায়াসে পড়ে রইলো মুসলমানের ঘরে, কারও ভয় করলে না। তার কি কোথাও কেউ নেই নাকি? জিজ্ঞাসা করতে গহর-গোঁসাইও ঠিক এই কথাই বললে। বল্লে, সংসারে তার আপনার কেউ নেই বলে' তার ভয়ও নেই, ভাবনাও নেই।

মনে মনে বললুম, তাই হবে। জিজ্ঞাসা করলুম, তোমার বন্ধুর নাম কি গোঁসাই?

নাম শুনে চমকে গেলুম। জানো তো গোঁসাই ও নামটা আমার করতে নেই?......

জিজ্ঞাসা করলুম, বন্ধু দেখতে কেমন? বয়স কত? গোঁসাই কত কি যে বলে' গেল তার কতক বা আমার কানে গেল, কতক বা গেল না, কিন্তু বুকের ভিতরটায় ঢিপ ঢিপ করতে লাগ্‌লো। তুমি ভাববে এমন মানুষ তো দেখিনি,—এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়। কিন্তু শুধু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই,—এ সত্যি।......

বৈষ্ণবী বলিল, সবে কাল সন্ধ্যায় তো তুমি এসেছো, কিন্তু আমার চেয়ে বেশি এ সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না। পূর্ব্বজন্ম সত্যি না হ'লে এমন অসম্ভব কাণ্ড কি কখনো একটা দিনের মধ্যে ঘটতে পারে?

"একটু থামিয়া সে আবার বলিল, আমি জানি তুমি থাকতেও আসোনি, থাকবেও না। যত

প্রার্থনাই জানাই না কেন, দু' একদিন পরেই চলে' যাবে। কিন্তু আমি যে কতদিনে এই ব্যথা সামলাবো তাই কেবল ভাবি। এই বলিয়া সে সহসা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।"

[ঐ, পৃঃ ৮১-৮৩]

শ্রীকান্তের কি দুর্ভোগ! এ তো বালক-বয়সে বালিকার হাতে বৈঁচির মালা নয়, এ আবার কিসের ফাঁস! সকল মমতা সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া যে নারী শুধু সমাজের বাহিরে নয়, সংসারেরও বাহিরে—একটা ভিন্ন জীবন যাপন করিতেছে, তাহার মধ্যেও সেই এক ক্ষুধা! আবার শ্রীকান্তকে দেখিয়াই তাহা উদ্রিক্ত হয় কেন? এ কোন্ ব্যাধ তাহাকে বন হইতে বনান্তরে সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে! রাজলক্ষ্মী পাগল হইয়াছিল যে কারণে তাহার হয়তো একটা যুক্তি আছে, কিন্তু এ যে নাম শুনিয়াই পাগল হইয়াছে, এ যেন সেই—

"কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥"

উহারা যে ঐ মন্ত্রের সাধনা করে, নামই যে উহাদের সাধন-মন্ত্র। কিন্তু বৈষ্ণবী ইহার আরও একটা অর্থ করিয়াছে, তাহার বিশ্বাস এই ব্যাকুলতার মূলে আছে—জন্মান্তর-সৌহৃদ, সেই "ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি"; শ্রীকান্তকে দেখিয়া তাহার সেই পূর্ব্বজন্মের বৃন্দাবন-স্মৃতি উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, সে বিশ্বাস করে, মানবজীবনের এই জন্ম-জন্মান্তরের যাত্রাপথ সেই এক নিত্য-বৃন্দাবন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ভ্রমণশেষে সে পথ পুনরায় সেইখানে গিয়া মিলিবে। সেই বৃন্দাবনে সকল নর-নারী এক একটি যুগলের রূপে বিরাজ করে, সেই যুগল-সম্পর্ক ছিন্ন হয় না; সেইসব যুগলকেই আশ্রয় করিয়া এক অখণ্ড প্রেম খণ্ডের মধ্যেই লীলা করিতেছে। সংসারের এই গোলোকধাঁধায় পড়িয়া তাহারা যতই বিযুক্ত হইয়া পড়ুক না কেন, সেই নিত্যের পরিবর্ত্তে অনিত্যের সঙ্গ করুক না কেন—তথাপি তাহাদের অন্তরের অন্তরে সেই প্রেম চির-জাগরূক থাকে, তাই পথের কোথাও দেখা হইবামাত্র একজন অপরকে চিনিতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়া উঠে—

"তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি যুগে যুগে অনিবার!"

পূর্ব্বজন্ম-বাদী হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে এইরূপ অন্তশ্চেতনার উদ্রেক কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়; ঐরূপ বিশ্বাস সত্যই হোক, আর মিথ্যাই হোক, উহার ফলে মানব-চৈতন্যের অগম-গহনে যে সব রুদ্ধদ্বার খুলিয়া যায়, এবং যে সকল অধ্যাত্ম-গভীর অনভূতির সঞ্চার হয়, তাহার মূল্য অল্প নহে। কমল-লতা বৈষ্ণবীর কথা ছাড়িয়া দিই, ঐরূপ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসের ফলে সাধারণ মানবীয়

প্রেমেও যে একটা লোকাতীত সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জনা জাগে তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ একটি জাপানী প্রেম-কবিতার কয়েক পংক্তি পাঠ করিতে বলি—

"চিত্তহারিণী জাপানী বালিকা
ওহারু তাহার নাম,
বুকে তার চেরী-ফুলের স্তবক
রক্তিম অভিরাম!
জানু পাতি' বালা পতি-বর মাগে
প্রজাপতি-মন্দিরে,
থরে থরে ফোটে চন্দ্রমল্লি
ওহারুর তনু ঘিরে।
* * *
"দাও, প্রজাপতি! দাও মোরে পতি,
দাও মোরে হেন বর,
গোপন সানুর মর্ম্মরসম
যার কণ্ঠের স্বর,—
সেই সানুদেশে চুপে চুপে পশে
বাসন্তী চাঁদ একা!"
ওহারুর বুকে চারু চেরী-ফুল
চন্দ্রমল্লি লেখা!
* * *
"দাও হেন পতি যাহার মুরতি
হৃদে অহরহ রয়,
জনমের আগে সাথী যে ছিল গো,
মরণে যে পর নয়,—
জন্ম-তোরণে জন-অরণ্যে
হারায়ে ফেলেছি যা'য়!"
ওহারুর বুকে চন্দ্রমল্লি
চেরী-ফুল মুরছায়।

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। বৈষ্ণবী কমল-লতার ঐ প্রেম-নিবেদনে শ্রীকান্তের অবস্থা যেমনই হোক, আমরাও একটু বিস্মিত না হইয়া পারি না,—আমি তাহার ঐ প্রেম-নিবেদনের কথাই বলিতেছি, অলৌকিক সম্বন্ধের কথা বলিতেছি না। তবে কি সেও সেই এক পিপাসায় কাতর—তাহারও সেই এক ক্ষুধা! এখানে তো তাহার ভাষা সাধারণ ভাষারই মত, রাজলক্ষ্মীও তো এইরূপ ভাষায় কথা বলে; তবে আর তফাৎ কোথায়? শ্রীকান্ত তাহা লক্ষ্য করিল, এবং তাহাই ভাবিয়া ভয়ে ও ঘৃণায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—

"চুপ করিয়া রহিলাম। এত অল্পকালে এমন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় রমণীর প্রণয়-নিবেদনের কাহিনী ইহার পূর্ব্বে কখনো পুস্তকেও পড়ি নাই, লোকের মুখেও শুনি নাই। এবং ইহা অভিনয় যে নয় তাহা নিজের চোখেই দেখিতেছি। কমল-লতা দেখিতে ভালো, অক্ষর-পরিচয়হীন মূর্খও নয়; তাহার কথাবার্ত্তায়, তাহার গানে, তাহার যত্ন ও অতিথি-সেবার আন্তরিকতায় তাহাকে আমার ভাল লাগিয়াছে।······কিন্তু দেখিতে দেখিতে পরিণতি যে এমন ঘোরালো হইয়া উঠিবে, বৈষ্ণবীর আবেদনে, অশ্রুমোচনে ও মাধুর্য্যের অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশে সমস্ত মন যে এমন তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া যাইবে ক্ষণকাল পূর্ব্বেও তাহা কি জানিতাম! যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। কেবল লজ্জাতেই যে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাই নয়, কি একপ্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও আর শান্তি স্বস্তি রহিল না।" [ঐ, পৃঃ ৮৩-৮৪]

কমল-লতার কথা পরে বলিতেছি, এখন শ্রীকান্তের কথাই বলি। তাহার অন্তরে ঐ যে বিতৃষ্ণা—প্রেম তাহাকে কত রূপে কত সুরে ডাক দিতেছে, কিন্তু আত্মসমর্পণের ভয়ে ঐ যে তাহাতে এমন বিরক্ত হইয়া উঠে, ইহার কারণ বৈষ্ণব-শাস্ত্রে যাহা লেখে, তাহার একটু উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বিশেষতঃ আমরা যখন শ্রীকান্তের সঙ্গে ঐ রকম একটা বৈষ্ণবের আখড়ায় আসিয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণব-মতে প্রেমিকমাত্রেই নারী; কথাটা হঠাৎ দুর্ব্বোধ্য মনে হইবে, তাই একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক জীবই অন্তরের অন্তরে প্রচ্ছন্ন প্রেমিক, এবং নিখিল জীব-হৃদয়ের সেই প্রেমই রাধারূপিণী। যতক্ষণ বা যতদিন সেই প্রেম আত্মাভিমান, বা আত্মগৌরবের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে ততদিন তাহার সেই নারীত্বের স্ফুরণ হয় না। আবার, ঐ প্রেমের—খাঁটি সত্যকার প্রেমের—পাত্র এক পরম পুরুষ, আর সকলেই, অর্থাৎ যাহারা—প্রেমের পাত্র নয়—আশ্রয়, তাহারা নারী; ইহার অর্থ—ভালবাসিতে সকলেই পারে, ও বাসে, কিন্তু ভালোবাসার পাত্র হইবার যোগ্যতা সেই একজনেরই আছে, আর কাহারও নাই, কোন জীবের নাই। যতক্ষণ কেহ ভালবাসা দাবি করে ততক্ষণ তাহার সেই নারীত্ব, সেই ভালবাসা জন্মে নাই—তাহাই লৌকিক পুরুষত্ব, অর্থাৎ নারীত্বের বিপরীত। কিন্তু সেই পুরুষত্বও একটা মিথ্যা অভিমান, কারণ সত্যকার পুরুষ সেই একজন, কোন জীবই সেই পুরুষ হইতে পারে না। শ্রীকান্ত তবে কোন্ পদবীর উপযুক্ত? সে ভালবাসে না, ভালবাসা দাবিও করে না; তাহা হইলে সে কি জীব নয়—বেদান্তের মুক্ত পুরুষ? বৈষ্ণব-মতে ঐরূপ মুক্তপুরুষ বলিয়া কিছু নাই। আমরাও এখানে কোন তত্ত্ববিচার করিতেছি না, বৈষ্ণবই হোক, আর বেদান্তই হোক—আমরা নর-নারীর হৃদয়-রহস্যের আলোচনা করিতেছি; তাহাতে ঐ বৈষ্ণব-দর্শনের যতটুকু কাজে লাগে তাহা গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই; আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইলেই হইল, তা' সে অ্যালোপ্যাথি মতেই হোক, আর

কবিরাজী মতেই হোক—হোমিওপ্যাথিতেও আপত্তি নাই। বরং যাহার দ্বারা সমস্যার জটিলতা যত সরল হইয়া আসে তাহাকে ততটুকু শ্রদ্ধাই করিব। মানব-হৃদয়ের মত এমন অতল অকূল সাগর আর আছে? উহার স্থল-বিশেষের তল-দর্শন যদি সম্ভব হয় তাহাই যথেষ্ট—গোটা সাগরটা মাপিবে কে? তাহা হইলে, ঐ বৈষ্ণব-মতে শ্রীকান্তের প্রেম-বিতৃষ্ণাও সত্য নহে, সেও ভালবাসে, কারণ সে-ও মনুষ্য-জীব; কেবল, ভালবাসিতে গিয়া সে বাধা পায়—তাহার আত্মাভিমান, সেই মিথ্যা পৌরুষগর্ব্বই বাধার সৃষ্টি করে। কিন্তু মিথ্যা হইলে কি হয়, ঐ অভিমানই তাহার শক্তি, উহাই তাহার স্বাতন্ত্র্যের আশ্রয়। আর একটু বাড়াইয়া লইলে এমন কথাও বলা যাইতে পারে (কমল-লতাও পরে তাহাই বুঝিয়াছে) যে, শ্রীকান্তের মধ্যে ঐ ভালবাসা এমন একটা মাত্রায় পূর্ণ হইয়া আছে যে, বাঁধ ভাঙিলে সে একেবারে তলাইয়া যাইবে, তাহার শ্রীকান্ত-জীবনের ঐ অনাসক্ত, আত্মবিস্মৃত ভাব-সর্ব্বস্বতার, ও সর্ব্বদায়িত্বহীন অপচয়শীলতার রসসম্ভোগ আর ঘটিবে না, তাই সে কিছুতেই তাহার সেই আত্মাভিমানের কঠিন বর্ম্মটা ত্যাগ করিবে না। তবু এইবার কমল-লতাকে দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছে—"কেবল লজ্জাতেই যে সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল তাহা নয়, কি এক প্রকার অজানা বিপদের আশঙ্কায় অন্তরের কোথাও শান্তি স্বস্তি রহিল না।"

বৈষ্ণব-মতে ইহার আর এক ব্যাখ্যাও করা যায়—অবশ্য একটু ভিতরে চাহিয়া। চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছে—

> গোকুল নগরীমাঝে এতেক রমণী আছে,
> তাহে কেন পড়িল না বাধা,
> নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি—
> বাঁশী কেন ডাকে "রাধা, রাধা"?

শ্রীকান্ত ও রাধা—অনেক দূর বটে, কিন্তু প্রত্যেক নর ও নারী তো রাধারই অংশ। শ্রীকান্ত রাধার মত আক্ষেপ না করিয়া ভয় ও বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিয়াছে। রাধার দুঃখের কারণ, ঐ বাঁশীর স্বর তাহাকে পাগল করে, তবু তাহার কুল-মানের সংস্কার এখনও ঘুচে নাই; সে এত যত্নে তাহার কুল বা সতীধর্ম্ম—চারিত্রিক শুচিতার অভিমান—রক্ষা করিয়াছে, তথাপি বাঁশী তাহারই নাম ধরিয়া ডাকে কেন? গোকুল-নগরে এত যুবতী নারী আছে তাহাদের কেহ তো এমন বিপদে পড়ে নাই! রাধার কি দুর্ভাগ্য! কিন্তু সে যাহার জন্য এমন আক্ষেপ করিতেছে তাহা তো দুর্ভাগ্য নয়—তাহার মত সৌভাগ্য যে আর নাই! অতএব তাহার

ঐ আক্ষেপ যে মুগ্ধহৃদয়ের আক্ষেপ, এই পরম কৌতুককর তত্ত্বটি কবি এখানে কি অপূর্ব্ব ইঙ্গিত-রসে অমৃতসমান করিয়া তুলিয়াছেন! পদাবলীর এই সকল পংক্তি যখন পাঠ করি তখন মনে হয়, এত গভীর কাব্যরস এমন সহজ ভাষায় ও সরল ভঙ্গিতে আর কোন জাতির সাহিত্যে প্রবাহিত হইয়াছে! এ যেন হৃদয় নয়—একেবারে আত্মার আকুতি!—দেহের জবানীতেই তাহা নাটীকৃত হইয়াছে। তাহার কারণ, ইহা একটা বিশেষ সাধনা-সাপেক্ষ; ইহা প্রাকৃত বা লৌকিক নহে—উৎকৃষ্ট কাব্য হইলেও ইহার রূপক-রস মিষ্টিক ভাব-জগতের দিকে প্রসারিত হইয়া আছে; ইহার রস কাব্যেই শেষ হয় নাই, তাই সাধারণ মানব-কাব্য হইতে ইহা স্বতন্ত্র। শ্রীকান্তের অবস্থাও এক হিসাবে রাধার মতই বটে; সে-ও তাহার 'নিরমল কুলখানি' অতিযত্নে রক্ষা করিতে চায়, কিন্তু এমনই তাহার দুর্ভাগ্য যে, সে যেখানেই যায় সেই বাঁশীর রব তাহার পিছু ছাড়িবে না। মাঝে মাঝে সে থমকিয়া দাঁড়ায়, সেই বাঁশীর সুর ভাল করিয়া শুনিতে ও তাহার একটা ব্যাখ্যা করিতে চায়—কিন্তু একটু বুঝিবার মত হইয়া উঠিলেই সে কান দুইটা চাপিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতে থাকে। না, ঐ ডাকে সে কিছুতেই ধরা দিবে না; তাহার মত হৃদয় যাহার, সে উহাতে ধরা দিলেই সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে এবারকার ঐ উদাসীন ভবঘুরে জীবনের যতকিছু বিফলতার আক্ষেপ সে প্রাণ ভরিয়া সম্ভোগ করিতে পারিবে না; তাই ঐ প্রেমকে সে তাহার আত্মদ্রোহী অহং-চেতনার পাদপীঠতলে চাপিয়া রাখিবে। ঐ কমল-লতা তাহাকে শেষ ডাক ডাকিল, সে ডাক সে শুনিয়াও শুনিল না, তাহার ফলে শেষে একূল ওকূল দুই কূলই গেল, তাহার সেই শ্রীকান্ত-জীবন হইতেই পতন ঘটিল; সে কথা পরে।

কিন্তু কমল-লতা শ্রীকান্তকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছে,—সে যে কি অবস্থায়, কি লইয়া, কোন্‌দিকে ছুটিতেছে—তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। সেই প্রথম দর্শনেই সে বলিয়াছে—"আমি জানি, তুমি থাকতেও আসো নি, থাকবেও না। যত প্রার্থনাই জানাই না কেন দু' একদিন পরেই চলে যাবে।" তারপর আর একদিন বলিয়াছিল—"তোমার ঐ উদাসীন বৈরিগী মন—ওর বড় অহঙ্কারী জগতে আর আছে নাকি?"

ইহার পর, শ্রীকান্ত সম্বন্ধে সে যে আর কোন আশাই করে না, সে যে রাজলক্ষ্মীর মত আত্ম-প্রতারণা করিতে পারে না, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সেই বেদনা, সেই কাতরতা তাহার নিজেরই সাধনার সামগ্রী; হয় তো ইহাই তাহার শেষ সোপান। ইহার পর শ্রীকান্তের সঙ্গে কমল-লতার যতবার দেখা

সাক্ষাৎ হইয়াছে তাহাতে কমল-লতার আচরণেও যেমন কোন দ্বিধা নাই, আমাদেরও কোন সংশয়ের কারণ থাকিবে না। আমি ইহার একটি দৃশ্য উদ্ধৃত করিতেছি!

"আশ্রমের বাহিরে একটু দূরে ফুলের বাগান। ঘন ছায়াচ্ছন্ন আমবনের ভিতর দিয়া পথ।...... বৈষ্ণবী আগে, আমি পিছনে; বলিলাম, কমল-লতা, পথ ভুলবে না তো?

বৈষ্ণবী বলিল, না। অন্ততঃ তোমার জন্যেও আজ পথ চিনে আমাকে চলতে হবে।

—কমল-লতা, একটা অনুরোধ রাখবে?

—কি অনুরোধ?

—এখান থেকে তুমি আর কোথাও চলে' যেয়ো না।

—গেলে তোমার লোকসান কি?

জবাব দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম।

বৈষ্ণবী বলিল, মুরারি ঠাকুরের একটি গান আছে—"সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। জীবন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে তারে তুমি কি আর বুঝাও॥" গোঁসাই, বিকালে তুমি কলকাতায় চলে যাবে, আজ একটা বেলার বেশি বোধ করি এখানে আর থাকতে পারবে না,—না?

—বলিলাম, কি জানি আগে সকাল বেলাটা তো কাটুক।

বৈষ্ণবী জবাব দিল না, একটু পরে গুন গুন করিয়া গাহিতে লাগিল—

কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি দুখ যায় তার ঠাঁই।

থামিলে বলিলাম, তার পরে?

—তারপরে আর জানিনে।" [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ১০৮]

শ্রীকান্ত-কমল-লতা সংবাদ আর একটু উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত এ কাহিনী শেষ করিব; তাহাতে প্রেম-বিমুখ শ্রীকান্তের সহানুভূতি-কাতর হৃদয়ের পরিচয় আছে, কিন্তু কমল-লতার নিকটে তাহার মূল্য কতটুকু, কারণই বা কি, তাহাও বুঝিতে পারা যাইবে। এই উদ্ধৃত অংশটির প্রথম কয় পংক্তি একটি উৎকৃষ্ট লিরিক কবিতা—এমন কবিতা এই উপন্যাসে অন্যত্রও আছে। আরও লক্ষণীয় এই যে, শরৎচন্দ্রের আর কোন উপন্যাসে, প্রাকৃতিক দৃশ্য-বর্ণনায় এমন হৃদয়-রক্তের অনুরঞ্জন নাই; অন্যত্র সংসার ও সমাজের হৃদয়-জনতার মধ্যে যে লেখক তাহার প্রাণের প্রদীপ-হস্তে বিচরণ করিয়াছেন, তিনি কেবল এই কাহিনীতেই ঐরূপ কবি-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ এই উপন্যাস খানিতে শরৎচন্দ্র স্থানে স্থানে প্রকৃতির যে রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা শ্রেষ্ঠ কাব্য-সাহিত্যেরও গৌরব; কিন্তু উহাদের এই লিরিক সৌন্দর্য্যই অতুলনীয়, ইহার কারণ, এই উপন্যাসে—বিশেষ করিয়া, এই চতুর্থ পর্ব্বে তাঁহার আত্মার ক্রন্দন আছে।—

"কখনো এত প্রত্যূষে শয্যা ছাড়িয়া উঠি না, এমন সময়টা চিরদিন নিদ্রাচ্ছন্ন জড়তায় অচেতনে কাটিয়া যায়;—আজ কি যে ভাল লাগিল তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে রক্তিম দিগন্তে জ্যোতির্ম্ময়ের

আভাস পাইতেছি, নিঃশব্দ মহিমায় সকল আকাশ শান্ত হইয়া আছে, আর ঐ লতায়-পাতায়, শোভায়-সৌরভে, ফুলে-ফুলে পরিব্যাপ্ত সম্মুখের উপবন—সমস্ত মিলিয়া এ যেন নিঃশেষিত রাত্রির বাক্যহীন বিদায়ের অশ্রুরুদ্ধ ভাষা। করুণায়, মমতায় ও অযাচিত দাক্ষিণ্যে সমস্ত অন্তরটা আমার চক্ষুর নিমিষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল,—সহসা বলিয়া ফেলিলাম, কমল-লতা, জীবনে তুমি অনেক দুঃখ অনেক ব্যথা পেয়েছ, প্রার্থনা করি, এবার যেন সুখী হও।

বৈষ্ণবী সাজিটা চাঁপা-ডালে ঝুলাইয়া আগলের বাঁধন খুলিতেছিল, আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া চাহিল, —হঠাৎ তোমার হ'ল কি গোঁসাই?

নিজের কথাটা নিজের কানেও কেমন খাপ-ছাড়া ঠেকিয়াছিল। তাহার সবিস্ময় প্রশ্নে মনে মনে ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেলাম।...মুখে উত্তর যোগাইল না,...শেষে চুপ করিয়া রহিলাম।"

[পৃঃ ১১৩-১১৪]

উপরের ঐ যে ঘটনা উহাতে শ্রীকান্তের উচ্ছ্বাসকে কমললতা কেমন ভাবে নিবাইয়া দিল তাহাই লক্ষ্য করিবার মত—সে যেন তাহার মূল্য বোঝে, তাই শ্রীকান্তকে প্রশ্রয় দিল না, তেমন অনুকম্পা সে চায় না। কিন্তু শ্রীকান্ত তো উহার বেশি দিতে পারে না, তাই বেচারী ধমক খাইয়া চুপ করিল।

শ্রীকান্তের গতিক কিন্তু ক্রমেই মন্দ হইয়া উঠিল, এইবার সে ভাগিবে, কারণ—

"প্রত্যহ রাত্রিশেষে বৈষ্ণবী আসিয়া আমায় জাগায়। ভোরের সুরে বৈষ্ণব-কবিদের ঘুম ভাঙানোর গান। ভক্তি ও ভালবাসার সে কি সকরুণ আবেদন! হঠাৎ সাড়া দিই না, কান পাতিয়া শুনি। চোখের কোণে যেন জল আসিয়া পড়িতে চায়। মশারি তুলিয়া সে দোর-জানালা খুলিয়া দেয়,—রাগ করিয়া উঠিয়া বসি, এবং হাত মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া সঙ্গে চলি।" [পৃঃ ১১৪]

অবস্থা খুব খারাপ বলিতে হইবে। তারপর—

"এমনি করিয়া দিনগুলো যেন স্বপ্নে কাটে। সেবায়, সহৃদয়তায়, ফুলে, গন্ধে কীর্ত্তনে, পাখীর গানে কোথাও আর ফাঁক নাই, অথচ সন্দিগ্ধ মন মাঝে মাঝে সজাগ হইয়া সহসা ভৎসনা করিয়া উঠে, একি ছেলেখেলা! বাহিরের সকল সংশ্রব রুদ্ধ করিয়া গুটিকতক নির্জ্জীব পুতুল লইয়া এ কি মাতামাতি! এত বড় আত্ম-প্রবঞ্চনায় মানুষ বাঁচে কি করিয়া?...স্থির করিলাম আর না,—যাই কেন না ঘটুক, এ জায়গা ছাড়িয়া কাল আমাকে পলাইতেই হইবে।" [পৃঃ ১১৩]

ইহার পর শ্রীকান্ত সত্যই বিদায় লইল। পরে আর দুইবার দেখা হইয়াছিল বটে, কিন্তু কমললতার সহিত পরিচয় ও সম্পর্ক ঐ একবারে দেখাতেই শেষ হইয়াছে। সে তো আর রাজলক্ষ্মী নয়, তাই কমললতা-কাহিনীতে নাটকীয় ঘটনা-ধারা—উত্থান-পতনের অবস্থান্তর, বা চরিত্রের ক্রম-বিকাশ নাই। এ কাহিনী নাটক নয়—নাটকীয় গীতি-কাব্যও নয়, একেবারে খাঁটি লিরিক, সেই বৈষ্ণব-কবিদের গান। ইহার ঐ যে একটি চরিত্র—ঐ কমল-লতা—উহার জীবন একটি ভাব-স্থির মুহূর্ত্তকে আশ্রয় করিয়া আছে; যতকিছু আক্ষেপ-বিক্ষেপের মধ্যেও সে আত্মস্থ। তাই তাহার কাহিনীও গানের একটি সুরের মত,—তাহাতে দেশ বা কালের বিস্তার নাই, ঘটনার অবকাশ নাই; আছে কেবল একটি মাত্র ভাবের অসীম ব্যঞ্জনা—ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক সুর।

(৩)

কমল-লতা

The ancient consciousness of woman, charged with suffering and sensibility, and for so many ages dumb, seems in them to have brimmed and overflowed and uttered a demand for something—they scarcely know what, for something that is perhaps incompatible with the facts of human existence.

—*VIRGINIA WOOLF.*

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, শ্রীকান্তের নিকটে কমল-লতার ঐরূপ প্রেম-ভিক্ষা ও তাহার সেই কাতরতা আমাদিগকেও বিস্মিত করে, মনে হয়, সাধারণ নারীর সহিত তাহার তবে পার্থক্য কোথায়? এই পার্থক্যই বুঝিয়া লইতে হইবে, না লইলে এই উপন্যাসের একটি অপূর্ব্ব নারী-চরিত্র আমাদের অপরিচিত থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, একটা বিশেষ সাধনার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোযোগ চাই। আমি বলিয়াছি এই কমললতা-চরিত্র—শুধু সমাজ নয়, সংসারেরও বহির্ভূত। অতএব উহাকে আমাদের অভ্যস্ত সামাজিক বা সাংসারিক সংস্কারের দ্বারা বুঝিয়া লওয়া যাইবে না। রাজলক্ষ্মী পতিতা হইলেও সমাজসম্পর্কহীন নয়; সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলেও সে নিজে তাহার নারী-ধর্ম্মে ও নীতি-সংস্কারে সমাজকে ত্যাগ করে নাই। কমললতার সেই নারী-ধর্ম্মেই একটা রূপান্তর ঘটিয়াছে; আর সকল নীতি-সংস্কার অতিক্রম করিয়া সে এমন একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়াছে যাহাতে অন্তরের মুক্তি ঘটে, বন্ধনের মধ্যেও বন্ধন-বোধ থাকে না। কিন্তু আমরা কি তাহা বুঝিতে পারিব? বুঝাইবার ভাষা যে আমাদের নাই; আমাদের ভাষায় উহাও একটা বন্ধন। তাই এ তত্ত্ব দুরূহ, ইহাকে যুক্তির দ্বারা বুঝানো যাইবে না; মূলে ইহা মিষ্টিক, অর্থাৎ জ্ঞানগম্য নয়—সাক্ষাৎ উপলব্ধির বস্তু; ইহাকে যোগে-যাগে বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহার জন্য কমল-লতার অন্তর্জ্জীবনের—তাহার সেই সাধনাশীল অন্তঃকরণের একটু পরিচয় দিব—শ্রীকান্তের জবানীতেই দিব। শ্রীকান্ত লিখিয়াছে—

"জিজ্ঞাসা করিলাম, সারাদিন তোমাদের কি করতে হয়?

বৈষ্ণবী কহিল, এসে যা' দেখ্‌লে তাই। * * *

—কিন্তু এ সব তো কেবল ঘর-গৃহস্থালীর কাজ, সব মেয়েরাই করে। তোমরা ভজন-সাধন করো কখন?

বৈষ্ণবী কহিল, এই আমাদের ভজন-সাধন।

—এই রাঁধা-বাড়া, জল-তোলা, কুটনো-বাটনা, মালা-গাঁথা, কাপড়-ছোপানো,—একেই বলো সাধনা?

বৈষ্ণবী বলিল, হাঁ, একেই বলি, সাধনা। দাস-দাসীর এর চেয়ে বড় সাধনা আমরা পাবো কোথায় গোঁসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ দুটি যেন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আমার হঠাৎ মনে হইল, এই অপরিচিত বৈষ্ণবীর মুখের মত সুন্দর মুখ আমি সংসারে কখনো দেখি নাই। বলিলাম, কমল-লতা, তোমার বাড়ী কোথায়?

বৈষ্ণবী আঁচলে চোখ মুছিয়া হাসিয়া বলিল, গাছতলায়।" [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ৬৪-৬৫]

শ্রীকান্ত বা শরৎচন্দ্র মিষ্টিক নয়, কিন্তু ঐ যে "হঠাৎ মনে হইল," ইত্যাদি উহার মত মিষ্টিক অনুভূতি আর কি হইতে পারে? বৈষ্ণবীর ঐ কথাগুলি শুধুই কথা নয়, তাহা এমনই অনুভূতিময় যে তাহার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য বৈষ্ণবীর মুখখানাকেও সেইক্ষণে সুন্দর করিয়া তুলিল—সেই ভাবই রূপময় হইয়া উঠিল, ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'transfigured' হওয়া। কিন্তু শ্রীকান্তও তাহার medium হইয়াছে, নতুবা ঐ অতীন্দ্রিয় দৃশ্য আমরা দেখিতে পাইতাম না। আমি বলিয়াছি, এই পর্ব্বে শ্রীকান্ত যেন নিজেকেও অতিক্রম করিয়াছে, তাহার প্রাণের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীর আওয়াজ এই পর্ব্বেই বারবার পাওয়া গিয়াছে।

পরদিন রাত্রিশেষে শ্রীকান্ত যাহা দেখিল ও শুনিল—

"বোধ হয় একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম—কে যেন দ্বারের বাহিরে ডাক দিল, নতুন গোঁসাই, মন্দিরে যাবে না? ওরা তোমাকে ডাকছেন যে।

ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। মন্দিরা সহযোগে কীর্ত্তন-গান কানে গেল—বহুলোকের সমবেত কোলাহল নয়, গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট। বামা-কণ্ঠ, রমণীকে চোখে না দেখিলেও নিঃসন্দেহে অনুমান করিলাম, এ কমল-লতা।

মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম, কেহ চাহিয়া দেখিল না। সকলের দৃষ্টিই রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির উপরে নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমল-লতা কীর্ত্তন করিতেছে—'মদন গোপাল জয় জয় যশোদা দুলাল কি, যশোদা দুলাল জয় জয় নন্দ দুলাল কি।'......

এই সহজ ও সাধারণ গুটি কয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষস্থল মথিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন, কিন্তু দেখিতে পাইলাম, উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়। গায়িকার দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝরিতেছে এবং ভাবের গুরুভারে তাহার কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল বলিয়া।.........

ভাবের এই বিহ্বল মুগ্ধতাকে আমি অত্যন্ত ভয় করি, ব্যস্ত হইয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম,—কেহ লক্ষ্যও করিল না।......নিশ্চয় জানি, জ্ঞান বিদ্যা ও বুদ্ধিতে আমি ইহাদের সকলের বড়, তথাপি কিসের ব্যথায় জানি না, মনের ভিতরটা কাঁদিতে লাগিল, এবং তেমনই অজানা কারণে চোখের কোন বাহিয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।" [ঐ পৃঃ ৬৬-৬৮]

শ্রীকান্তের ঐ শেষের কথা-কয়টিতে কমল-লতার অনুমান সত্য বলিয়াই মনে হয়—শ্রীকান্ত এ সকলকে ভয় করে, তার কারণ, শ্রীকান্তের ভাব-কাতরতা এত বেশি যে, সে তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিতে চায়। কমল-লতা তাহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিল। ইহার পর আর একদিন—

"দুপুর বেলায় কোন এক ফাঁকে বলিলাম, কমল-লতা, আমি জানি, তুমি অন্য সকলের মতো নও। সত্যি বলো ত, ভগবানের প্রতীক এই যে পাথরের মূর্ত্তি—

বৈষ্ণবী হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিল, কহিল, প্রতীক কি গো।—উনিই যে সাক্ষাৎ ভগবান। এমন কথা আর কখনো মুখেও এনো না, নতুন গোঁসাই—

আমার কথায় সে-ই যেন লজ্জা পাইল বেশী। আমিও কেমন একপ্রকার অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, তবুও আস্তে আস্তে বলিলাম, আমি তো জানিনে, তাই জিজ্ঞাসা করছি, তোমরা সত্যিই ভাবো ঐ পাথরের মূর্ত্তির মধ্যেই ভগবানের শক্তি এবং চৈতন্য, তাঁর—

আমার এ কথাটাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, সে বলিয়া উঠিল—ভাবতে যাবো কিসের জন্যে গো, এযে আমাদের প্রত্যক্ষ। সংস্কারের মোহ তোমরা কাটাতে পারো না বলেই ভাবো, রক্তমাংসের দেহ ছাড়া চৈতন্যের আর কোথাও থাকবার যো নেই। কিন্তু তা কেন? আর এ-ও বলি, শক্তি আর চৈতন্যের হদিস কি তোমরাই সবখানি পেয়ে বসে আছ যে বলবে, পাথরের মধ্যে তার জায়গা হবে না? হয় গো, হয়; ভগবানের কোথাও থাকতেই বাধা পড়ে না, নইলে তাঁকে ভগবান বলতে যাবো কেন বলো ত?" [পৃঃ ৭১]

ইহার পর আরও একটু আছে—

"বৈষ্ণবী কহিল, কি গোঁসাই, কথা কও না যে!

বলিলাম, ভাবচি।

—কাকে ভাবচো?

—ভাবচি তোমাকেই।

—ইস্! বড় সৌভাগ্য যে আমার! একটু জোরে কহিল, তবু তো থাকতে চাও না, কোথায় কোন্ বর্ম্মীদের দেশে চাকরি করতে যেতে চাও। চাকরি করবে কেন?

বলিলাম, আমার তো মঠের জমিজমাও নেই, মুগ্ধ ভক্তের দলও নেই, খাবো কি?

—ঠাকুর দেবেন।

কহিলাম, অত্যন্ত দুরাশা। কিন্তু তোমাদেরও যে ঠাকুরের উপর খুব ভরসা তাও তো মনে হয় না। না হ'লে ভিক্ষে করতে যাবে কেন?

বৈষ্ণবী কহিল, যাই তিনি দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দোরে দোরে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে'। নইলে নিজেদের গরজ নেই, থাকলে যেতুম না, না খেয়ে শুকিয়ে মরলেও না।" [ঐ, পৃঃ ৭২-৭৩]

কমল-লতার সাধন-জীবনের পরিচয় এইটুকুই যথেষ্ট, ইহার পর তাহার শিক্ষা দীক্ষা বা মানসিক সংস্কৃতির একটু পরিচয় দেওয়াও দরকার; স্কুল-কলেজের শিক্ষা নয়, বিদ্যা বা 'কুলচুর' নয়, বরং ঘোরতর অশিক্ষা ও কুশিক্ষা, এবং পূর্ব্বের ঐ পৌত্তলিক কুসংস্কার হইতেই যাহা হইয়াছে—তাহারই কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিব।

কমল-লতা তাহার জীবনের কাহিনী বলিয়া যাইতেছে, সেই কাহিনীতে এমন একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা, এবং তাহার মূলে মানুষের পৈশাচিক দুষ্কৃতির এমন একটা দৃষ্টান্ত ছিল, যেমনটি এই সমাজের পক্ষেই সম্ভব; সেই ধরনের ঘটনা ও চরিত্র একমাত্র শরৎচন্দ্রই তাঁহার উপন্যাসগুলিতে বীভৎস-করুণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন। একদিকে একপক্ষের সমাজ-শাসনের ভয়, অপর দিকে একটা নর-পশুর দারুণ লালসা—কাম-লালসা ও অর্থ-লালসা দুই-ই; এই দুইয়ের মধ্যে পড়িয়া নিষ্পাপ যুবকের সেই যে আত্মহত্যা, এবং তাহার জন্য মূলে সে যে নিজেই দায়ী—এই কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; কতক্ষণ পরে—

'বৈষ্ণবী আর্দ্র মৃদুকণ্ঠে নিজেই বলিল, ছাখো গোঁসাই, পাপ জিনিষটা সংসারে এত ভয়ঙ্কর কেন জানো?……জানিনে তোমার বিশ্বাস কি? কিন্তু সেদিন থেকে আমি একে আমার মতো করে বুঝে রেখেছি, গোঁসাই। স্পর্দ্ধাভরে তুমি কত লোককে বলতে শুনবে, কিছুই হয় না। তারা কত লোকের নজীর দিয়ে তাদের কথা প্রমাণ করতে চাইবে।—কিন্তু তার তো কোন দরকার নেই—তার প্রমাণ মন্মথ, প্রমাণ আমি নিজে; আজও কিছুই আমাদের হয়নি, হ'লে একে এতো ভয়ঙ্কর আমি বলতুম না। কিন্তু তাতো নয়,—এর দণ্ডভোগ করে নির্দোষী লোকেরা। যতীনের বড় ভয় ছিল আত্মহত্যায়, কিন্তু সে তাই দিয়ে তার দিদির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে গেল। বলো ত গোঁসাই, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর সংসারে আর কি আছে? কিন্তু এমনিই হয়, এম্‌নি কোরেই ঠাকুর বোধ হয় তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করেন।' [ঐ, পৃঃ ৯৪-৯৫]

সেই নরপশুটার সম্বন্ধে শ্রীকান্ত তাহাকে প্রশ্ন করিলে, কমল-লতা বলিয়াছিল—

"কে-ও? ও আমার ইহ-পরকালের নরক-যন্ত্রণা, তাই তো অহরহ ঠাকুরকে কেঁদে বলি, প্রভু, আমি তোমার দাসী। মানুষের উপর এতবড় ঘৃণা আমার মন থেকে মুছে দাও, আমি আবার সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। আমার সকল সাধনা যে ব্যর্থ হয়ে যায়,—" [ঐ, পৃঃ ৮৯]

আর একদিন কমল-লতা প্রেম-নামক বস্তুটির সমালোচনা করিতেছে—যে-বস্তুর আলোচনা ও সমালোচনা করিতে আমি এই এতগুলা পৃষ্ঠা ভরিয়াও কূল পাইতেছি না।

"বৈষ্ণবী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, হাঁ গোঁসাই, এ বয়সে সত্যিই কাউকে কখনো ভালবাসো নি?

—তোমার কি মনে হয় কমল-লতা?

—আমার মনে হয় না, তোমার মনটা হ'ল আসলে বৈরিগীর মন, উদাসীনের মন—প্রজাপতির মতো; বাঁধন তুমি কখনো কোনো কালে নেবে না।……

আমার ভালবাসার মানুষ যদি কোথাও সত্যিই কেউ থাকে, তার কানে গেলে যে অনর্থ বাধবে। বৈষ্ণবীও হাসিল, কহিল, ভয় নেই গোঁসাই, সত্যিই যদি কেউ থাকে—আমার কথায় সে বিশ্বাসও করবে না, তোমার মধু-মাখানো ফাঁকিও সে সারা জীবনে ধরতে পারবে না।

বলিলাম, তবে তার দুঃখ কিসের? হোক না ফাঁকি, কিন্তু তার কাছে ত সেই সত্যি হয়ে রইলো।

বৈষ্ণবী মাথা নাড়িয়া কহিল, সে হয় না গোঁসাই, মিথ্যে কখনও সত্যির জায়গা নিয়ে থাকতে পারে না।—তারা বুঝতে না পারুক, কারণটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট না হোক, তবু অন্তরটা তাদের চিরদিন অশ্রুমুখী হয়েই থাকে। মিথ্যের কাণ্ড দেখেছি তো।

তারা রসের খবর ত পায়না, তাই প্রাণহীন নির্জ্জীব পুতুলের নিরর্থক সেবায় প্রাণ তাদের দু'দিনে হাঁপিয়ে ওঠে; ভাবে এ কোন্ মোহের ঘোরে নিজেকে দিনরাত ঠকিয়ে মরি।……কিন্তু এমন যদি কেউ তোমার থাকে, তুমি তাকে ভুলবে, কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনও তার চোখের জলের ধারা,—

—তুমি কি আমাকে এই কথাই বলতে চাও, কমল-লতা, যে আমাকে ভালবাসার নামই হল দুঃখ পাওয়া?

—দুঃখ ত বলিনি, গোঁসাই, বলেছি চোখের জলের কথা।

—কিন্তু এ দুই-ই-এক কমল-লতা, শুধু কথার ঘোরফের।

বৈষ্ণবী কহিল না গোঁসাই, ও দুটো এক নয়। না—কথার ঘোরফের, না—ভাবের; মেয়েরা ওর এটাও ভয় করে না, ওটাও এড়াতে চায় না। কিন্তু তুমি বুঝবে কি করে?"

[ঐ, পৃঃ ৯৮-৯৯]

কমল-লতার ঐ যে কথাগুলি উহা যেন নারীপ্রেমের ব্রহ্মতত্ত্ব। ঐ-কথা শুনিয়া আমার লজ্জা হইতেছে—আমি রাজলক্ষ্মীর প্রেম লইয়া এত গবেষণা করিতেছি, কিন্তু এমন সংক্ষেপে এমন গভীর করিয়া মূলকথাটা কি এখনো বলিতে পারিয়াছি? তার কারণ, এমন করিয়া কোন সত্যকে চাক্ষুষ করিতে হইলে তাহা বিশ্বাস করিবার মত অভিজ্ঞতা থাকা চাই—নিজে তাহাই হইতে হয়, নতুবা সকল তর্ক সকল বিচারই বৃথা। আমি রাজলক্ষ্মী-কাহিনী যতই বুঝিবার বা বুঝাইবার চেষ্টা করি না কেন, এমন প্রত্যয় তাহাতে নাই, তাই যতই বিশ্লেষণ করি ততই তাহা জটিল হইয়া উঠে; যদি সেই বিশ্বাস থাকিত, তবে আমাকে এত ঘুরিয়া মরিতে হইত না। তবু কমল-লতার কথা যে কত সত্য, আমার এই দীর্ঘ আলোচনায় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরা এখানে কমল-লতারই পরিচয় করিতেছি—রাজলক্ষ্মীর নয়, অতএব তাহার নিজের হৃদয়ের সংবাদও চাই। সেই বাগানে ফুল তুলিবার সময়ে তাহার ব্যথার ব্যথী হইয়া শ্রীকান্ত যাহা বলিয়াছিল তাহাতে বাধা দিয়া সে শ্রীকান্তকে কিরূপ লজ্জিত করিয়াছিল, পূর্ব্বে আমরা তাহা দেখিয়াছি—এক্ষণে সেই দৃশ্যের বাকিটুকু তুলিয়া দিলেই হইবে।

বৈষ্ণবী ভিতরে প্রবেশ করিল, সঙ্গে আমিও গেলাম, ফুল তুলিতে আরম্ভ করিয়া সে নিজেই কহিল, আমি সুখেই আছি, গোঁসাই, যাঁর পাদপদ্মে আপনাকে নিবেদন করে' দিয়েছি কখনো দাসীকে তিনি পরিত্যাগ করবেন না।

সন্দেহ হইল কথার অর্থটা বেশ পরিষ্কার নয়। কিন্তু সুস্পষ্ট করিতে বলার ভরসাও হইল না। সে মৃদুগুঞ্জনে গাহিতে লাগিল, 'কালা মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে। কানু-গুণ-যশ কানে পরিব কুণ্ডলে। কানু অনুরাগে রাঙা বসন পরিয়া, দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া।'

* * * * ডালা ভরিয়া উঠিলে কহিল, হয়েছে, আর না।—স্থলপদ্ম তুললে না?

—না, ও আমরা তুলিনে, ঐখান থেকে ঠাকুরকে নিবেদন করে দিই, চলো এবার যাই।

[পৃঃ ১১০-১১]

পাঠকপাঠিকারা কিছু বুঝিলেন?—ঐ স্থলপদ্ম নিবেদন-করা পর্য্যন্ত? এ প্রেম আমাদের বুদ্ধির অগম্য—মানুষ, ভগবান, সুখ-দুঃখ, বিরহ-মিলন, সব এক হইয়া গেছে।

কমল-লতার এই যে পরিচয় আমরা পাইলাম, ইহার পর শ্রীকান্তের প্রতি তাহার ঐ অনুরাগ, এবং সেই উক্তি—"কিন্তু আমি কতদিনে এই ব্যথা সামলাবো তাই কেবল ভাবি"—তাহার সেই বুকভরা বেদনার কি অর্থ আমরা করিব? উহাও কি সাধারণ নরনারীর মতই প্রেমে-পড়া? তাহা হইলে কমল-লতার ঐ পরিচয়টাও যে মিথ্যা হইয়া পড়ে। তবু ঐ কাতরতা কেন? সকল প্রেমেই কাতরতা থাকে, কিন্তু প্রেমও যেমন এক স্তরের নয়, তেমনই কাতরতাও একরূপ নয়। বৈষ্ণবের প্রেমসাধনায় যে-প্রেম "নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়"—তাহাতেও ঐ কাতরতা, ঐ 'আর্ত্তি'ই সে-প্রেমের পারিজাত-সৌরভ; উহাই সেই সাধনার একটা বড় তত্ত্ব। বেদান্ত-মতে বিন্দুই সিন্ধু—বৈষ্ণব তাহা মানে না, তাহা চায়ও না; সেই বিন্দু—বিন্দু থাকিয়াই সিন্ধুকে আপন করিতে চায়; অসীমকে সীমার বাঁধনে বাঁধিয়া, ব্যবধান সত্ত্বেও সেই যে মিলন—একই কালে বিরহ ও মিলনের সেই যে রস—তাহাই অমৃতোপম। এইজন্য তাহাতে চোখের জল কখনো ঘোচে না, মুছিতেও চায় না। এ প্রেম দুঃখকে ভয় পায় না, তাই কমল-লতার মুখেও ঐ-কথা—"দুঃখ ত বলিনি, গোঁসাই, বলেছি চোখের জলের কথা"। এ তত্ত্ব বড় গভীর। ঐ চোখের জল আর দুঃখ এক নয়, চোখের জলও বড় সুখের। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে ঐ প্রেমেরই অপর নাম ভক্তি—ঐ প্রেমের শাস্ত্রকেই ভক্তিশাস্ত্র বলা হয়। সেখানে ভক্তির অর্থ কি তাহা কমল-লতার ঐ সাধনা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে। একজন ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ মহাত্মা ঐ 'চোখের জল' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"বিরহে অশ্রু, মিলনেও অশ্রু; এবং এক কথায় সমগ্র ভক্তিশাস্ত্রের সার সর্ব্বস্বটি বলিতে হইলে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হয় যে, গোবিন্দ চক্ষুর জল ঘুচায় না, মুছায়। নিত্য সঙ্গ দেয় না, বিরহ-বিষে কাতরা করিয়া, পরে বারংবার সঙ্গ-দান করিয়া—অশ্রুলাঞ্ছিত গোপী-বদন নিজ পটাঞ্চলে স্বহস্তে মুছাইয়া দেয়।"

[অভয়ের কথা, নূতন সংস্করণ, পৃঃ ১২০]

ইহার অর্থ, ঐ যে অশ্রু উহার বড় প্রয়োজন আছে। ঐ অশ্রু যদি না থাকিবে, তবে আমার সেই পরম প্রেমাস্পদের আদর-সোহাগ ভুঞ্জিব কেমন করিয়া? তিনি স্বহস্তে তাহা মুছাইয়া দিবেন—ইহার মত সুখ আর কি আছে? অতএব এ প্রেমের

সারবস্তু ঐ 'আর্ত্তি'। বেশ বুঝিতে পারা যায়, মানবতাই ঐ সাধনার নিদান—বেদনাই ত মানবতা; বৈষ্ণব-সাধনার সর্ব্বোচ্চ সোপানেও ঐ মানবতা জয়ী হইয়া আছে। তথাপি উহা লৌকিক প্রেম নয়—অলৌকিক; ঐ মানবতাও অতি সূক্ষ্ম ও উচ্চস্তরের; ঐ মানব—বেদান্তের মুক্ত আত্মাও যেমন নয়, তেমনই প্রাকৃত বা লৌকিক কামনা-বাসনায় বদ্ধ আত্মাও নয়; শরীরী বটে, কিন্তু দিব্যশরীরী—দিব্যদেহবাসী আত্মা।

তাই ঐ প্রেমেরও সাধন-সঙ্গীতে—ঐ বৈষ্ণব পদাবলীতে—আমরা লৌকিক নায়িকা-প্রেমের বর্ণনা পাইয়া যেমন মুগ্ধ হই, তেমন ভুল করি। অতি উচ্চস্তরের যাহা তাহাতে নিম্নস্তরের—আমাদের সাধারণ কামনা-বাসনার, এমন কি লালসারও চিত্র দেখি। কমল-লতা ঐ যে বলিয়াছে, "আমি যে এই ব্যথা কতদিনে সামলাবো তাই কেবল ভাবি"—উহাতে আমাদের সংস্কার-অনুযায়ী একটা সহজ ধারণাই হয়, কিন্তু ইহা সেই—

> "Infinite passion and the pain
> Of finite hearts that yearn".

আবার ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, কমল-লতা এখনোও তাহার সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করে নাই, তাই শ্রীকান্তকে তাহার প্রয়োজন ছিল। এই কমল-লতাই শ্রীকান্তকে তাহার প্রেম নিবেদন করিল। এ প্রেম সংসারের প্রেম নয়। সে শ্রীকান্তকে লইয়া গৃহ-সুখ ভোগ করিতে চায় না। শ্রীকান্তকে সে চিনিয়াছে—রাজলক্ষ্মীর মত নয়, এ আর একরকমের চেনা; তাই সে শ্রীকান্তকে বলিল—

> অনেক দিন পথে পথেই ছিলুম, গোঁসাই, সঙ্গী পাই তো আবার একবার পথই সম্বল করি।
>
> বলিলাম, তোমার সঙ্গীর অভাব এ কথা ত বিশ্বাস হয় না, কমল-লতা। যাকে ডাকবে সেই যে হাজির হবে।
>
> বৈষ্ণবী হাসিমুখে কহিল, তোমাকে ডাকছি নতুন গোঁসাই, রাজি হবে? [পৃঃ ৭৩]
>
> চলো না গোঁসাই, বেরিয়ে পড়া যাক। বলছিলে, শ্রীবৃন্দাবনধাম কখনো দেখিনি, চলো তোমাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। অনেকদিন ঘরে বসে' কাটলো, পথের নেশা আবার যেন টানতে চায়। সত্যি, যাবে নতুন গোঁসাই? [পৃঃ ৭৪]

কমল-লতা শ্রীকান্তকে এই যে ডাক দিতেছে তাহার ফল কি হইবে সে সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সংশয় নাই, তবু ডাকিল কেন? তাহার নিজের জন্য নয়। কমল-লতা শ্রীকান্তের সেই অন্তরবাসী মানুষটাকে, তাহার সেই আত্মদ্রোহী আত্মাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাই সে তাহাকে তাহার সেই ভ্রান্তিমোচনের বা আত্মপরিচয়সাধনের একটা সুযোগ দিল; জানে তাহা নিষ্ফল, তবু তাহাকে একটা

সত্যের ইঙ্গিত দিল। সে ইঙ্গিত যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই, এ কাহিনীর শেষে আমরা তাহা দেখিতে পাইব। কমল-লতা শ্রীকান্ত সম্বন্ধে তাহার চরম সিদ্ধান্ত একদিন জানাইয়াছিল, পূর্ব্বে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছি—সে বলিয়াছিল, "তোমার ঐ উদাসীন বৈরিগী মন ওর চেয়ে বড় অহঙ্কারী জগতে আর আছে নাকি ?" শ্রীকান্ত কিন্তু নিজের মত করিয়াই কমল-লতার এই সব কথার অর্থ করিয়াছে—সে যে সকলই বোঝে। সে বলিতেছে—

আর একবার তাহার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এবার আর সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না যে, সে পরিহাস করিতেছে না। আমি যে মাত্র উপলক্ষ তাহাও নিশ্চিত। কিন্তু যে কারণেই হোক এখানের বাঁধন ছিঁড়িয়া এই মানুষটি পালাইতে পারিলে বাঁচে—তাহার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব সহিতেছে না। [পৃঃ ৭৪]

আর একদিন কমল-লতা যখন তাহাকে তাহার প্রেমবিমুখ আত্মাভিমান-সর্ব্বস্বতার কথা বলিয়াছিল, তাহাতে শ্রীকান্ত আপত্তি জানাইলে, অর্থাৎ কমল-লতা যে তাহার মন জানে না, জানিতে পারে না, ইহা স্মরণ করাইয়া দিলে, সে বলিয়াছিল—

নিশ্চয় জানি। তাই তোমার বড়াই আমার সয় না।

আশ্চর্য্য হইলাম। বড়াই তো তোমার কাছে করিনি, কমল-লতা ?……কিন্তু এই দুটো দিনের মধ্যে আমাকে এত তুমি জানলে কি কোরে ?

—জানলুম তোমাকে ভালবেসেছি বলে'।

*　　　*　　　*

প্রশ্ন করিলাম, ভালবেসেছ একি সত্যি কমল-লতা ?

—হাঁ, সত্যি।

—কিন্তু তোমার জপ-তপ তোমার কীর্ত্তন, তোমার রাত্রি-দিনের ঠাকুর-সেবা এ সবের কি হবে বলো ত ?

বৈষ্ণবী কহিল, এরা আমার আরও সত্যি, আরও সার্থক হয়ে উঠবে। চলো না গোঁসাই, সব ছেড়ে পথে পথে বেরিয়ে পড়ি ?

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, সে হয় না, কমল-লতা ? কাল আমি চলে যাচ্ছি।

বৈষ্ণবী মুহূর্ত্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, কিন্তু এ-আশ্রমে আবার তুমি আসবে, তখন কিন্তু কমল-লতাকে আর খুঁজে পাবে না গোঁসাই। [পৃঃ ১০০-১০১]

ঐ প্রেম, আর ঐ প্রত্যাখ্যান! শ্রীকান্ত তাহার ঐ প্রেমকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা করিতে পারিল না—না পারিবার কারণ একটাই, সে প্রেম-জিনিষটাকে কখনো—শক্তি বা স্বাস্থ্যের লক্ষণ মনে করে না। কমল-লতার ঐ যে বিশ্বাস এবং ঐকান্তিক আকুতি উহারও সে একটা অর্থ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে—

তবু মনে হয় বিস্ময়ের কিছু নাই। রসের আরাধনায় আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়াও তাহার (কমল-লতার) নারী-প্রকৃতি আজও হয়তো রসের তত্ত্ব পায় নাই, সেই অসহায় অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তি এই নিরবচ্ছিন্ন

ভাব-বিলাসের উপকরণ সংগ্রহে হয়তো আজ ক্লান্ত,—দ্বিধায় পীড়িত। সেই তাহার পথভ্রষ্ট, বিভ্রান্ত মন আপন অজ্ঞাতসারে কোথায় যে অবলম্বন খুঁজিয়া মরিতেছে, বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা জানে না—আজ তাই সে চমকিয়া বারে বারে তাহার বিগত জনমের রুদ্ধ দ্বারে হাত পাতিয়া অপরাধের সান্ত্বনা মাগিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া বুঝিতে পারি, আমার 'শ্রীকান্ত' নামটাকেই পাথেয় করিয়া আজ সে খেয়া ভাসাইতে চায়। [পৃঃ ৮৫-৮৬]

কিন্তু ইহা শ্রীকান্তের নিজেরই সান্ত্বনা,—বৈষ্ণবী তাহার ঠিকানা যে ভালরূপেই জানে, সে কথা সে-ও একদিন স্বীকার করিবে।

কিন্তু আমাদের মনে তবু একটা খট্‌কা থাকিয়া যায়; শ্রীকান্ত ঐ প্রেমের বরং একটা ভদ্র রকমের ব্যাখ্যাই করিয়াছে, আমাদের সংস্কারে কোথায় যেন বাধে। কমল-লতার ঐ প্রেম যে তাহার পূর্ব্বজীবনের সেই কলুষ-পঙ্কেরই একটা লালসা-কীট নহে (আমাদের সংস্কার যে বড় অবাধ্য!) তাহার প্রমাণ, গহর-গোঁসাইকে লইয়া তাহার সেই প্রাণান্তিক সঙ্কট; সে যে কেমন সঙ্কট, পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় তাহা বুঝিয়াছেন। শ্রীকান্তের সন্দেহও তাই ঘুচে নাই।—

বৈষ্ণবী কিসের জন্য চলিয়া যাইতে চায়?.........এ গহর।......রাগ করিবার লোক সে নয়, কিন্তু সে আর আসে না কেন? হয়তো নিজের মনে মনে কি কথা সে ভাবিয়া লইয়াছে।......ভাল যদি সে বাসিয়াও থাকে, মুখ ফুটিয়া কোন দিন হয়তো সে বলিবেও না, কোথাও পাছে কোন অপরাধ স্পর্শে। বৈষ্ণবী ইহা জানে। সেই অনতিক্রম্য বাধায় চির-নিরুদ্ধ প্রণয়ের নিষ্ফল চিত্তদাহ হইতে এই শান্ত আত্মভোলা মানুষটিকে অব্যাহতি দিতেই বোধ করি কমল-লতা পলাইতে চায়। [পৃঃ ১২০]

তবু শ্রীকান্তের সন্দেহ ঘোচে নাই, সে কমল-লতাকে বারবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কমল-লতা শেষে তাহাকে বলিয়াছিল—"তোমার যা ইচ্ছে হয় ভাবো গে গোঁসাই, একদিন আপনিই তার জবাব পাবে।" শ্রীকান্ত যে তাহা পাইয়াছিল এমন বোধ হয় না। আমরা তাহা পাইয়াছি; কমল-লতার ঐ প্রেম—তাহার ইষ্ট দেবতারই আরাধনা; সে তাহার আত্মার সত্য, তাহাতে প্রেম ভিন্ন আর কোন ভাবের ভেজাল থাকিতে পারে না। অজ্ঞান পিপাসার (passion) মত উহা অন্ধও নহে; উহা যেন দেহেরই একরূপ spiritual বা দেহাতীত ক্ষুধা। ইহাই প্রকৃত 'free love',—কোন বন্ধন মানে না—দয়ার বন্ধনও নয়; তাই গহরকে সে দয়া করিতেও পারে না, করিলে নিজের প্রতিও যেমন, গহরের প্রতিও তেমনই মিথ্যাচার করা হয়; কারণ, গহরের সত্যও তাহার আত্মার সত্য। এ বিষয়ে যথাস্থানে আরও কিছু বলিব। কমল-লতার কথাও এখানে এই পর্য্যন্ত।

(৪)

প্রেমের দেহতত্ত্ব

The God, the Holy Ghost, the atoning Lord
Here in the flesh, the never yet explored,

—*JOHN MASEFIELD*

'শ্রীকান্ত'-কাহিনীর এই পর্ব্বে আসিয়া আমরা কাহিনী ছাড়িয়া কতকগুলি তত্ত্বের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়াছি, তাহার কারণ, আমরা এক্ষণে সমাজ ও সংসার হইতে কিছুদূরে বিচরণ করিতেছি ; ঐ মুরারিপুরের আখড়া, আর ঐ কমল-লতা বৈষ্ণবী, এই দুই-ই আমাদের অপরিচিত। তথাপি ঐ আখড়া হইতেও আমরা কিছু জ্ঞান লাভ করিব—কেবল মনটাকে একটু মুক্ত রাখিতে হইবে। জীবনের কোন দিকই অবহেলার যোগ্য নয়—লৌকিক, অলৌকিক, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সব মিলিয়াই তো জীবন। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত অনন্ত আকাশের কতটুকুই বা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে ? মানুষের এই দেহ-বিশ্বটার মধ্যেও তেমনই অনন্তের বিস্তার আছে, তাহার কতটুকু আমরা জানি বা সহজবুদ্ধিতে জানিতে পারি ? যাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত তাহাই যদি অপ্রাকৃত বলিয়া মিথ্যা হয়, তবে তো এই জগৎটা ভিতরে ও বাহিরে বড় ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে ! কিন্তু সত্যই অলৌকিক বলিয়া কিছুই নাই—লৌকিক ও অলৌকিক একই মহানিয়মের দুই প্রান্তমাত্র। যাহা কিছু বিজ্ঞান-গোচর নয় তাহাই যদি অলৌকিক হয়, তবে প্রেম-নামক বস্তুটাও অলৌকিক বলিতে হইবে, কারণ উহার মনোবিজ্ঞান বা যুক্তিবিজ্ঞান কোনটাই নাই—আমি অবশ্য সেই প্রেমের কথা বলিতেছি, যাহাকে বিজ্ঞানীরা ঐ কারণে একটা ব্যাধি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অথচ যাহার বশে আমরা সামান্য মানুষের মধ্যে দেবতার প্রকাশ দেখিতে পাই। তথাপি ঐ প্রেমেরও একটা লৌকিক বা প্রাকৃত ভিত্তি আছে ইহা স্বীকার করিতে আপত্তি নাই—মূলে উহা দেহজ, অন্ততঃ এই অর্থে যে, মানবদেহ ধারণ না করিলে উহা আস্বাদন করা যায় না। অতঃপর আমি এই প্রসঙ্গে ঐ প্রেম-নামক ব্যাধিটার কিঞ্চিৎ নিদান আলোচনা করিব। আশা করি পাঠক-পাঠিকার তাহাতে অমত হইবে না।

ঐ যে একবার দেখিয়াই প্রেমে পড়া—ঐ কথাটা এত পুরাণো হইয়া গিয়াছে যে, আমরা উহাকে তেমন মর্য্যাদা আর দিই না। অথচ উহা নিশ্চয় একটা প্রাকৃতিক ঘটনা, নহিলে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ঐরূপ একটা বিশ্বাস প্রচলিত হইল কেমন করিয়া? "পহিল হি প্রেম নয়নভঙ্গে ভেল" অথবা 'Who loved that loved not at first sight?"—ইহা কবিবচনও বটে—কিন্তু কাল্পনিক নহে। কিন্তু ঐরূপে যে-প্রেমের জন্ম হয় তাহাই যে খাঁটি প্রেম বা সত্যকার বড় প্রেম—একথা সব ক্ষেত্রে সত্য নয়, ইহাও আমরা দেখিতে পাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহা প্রেম নয়—কাম, কামেরই একটা প্রবল আকর্ষণ; কেবল, উহার মূল মানুষের দেহ-সংস্কারে অতিশয় গভীরে নিহিত থাকায় উহাকে 'physical' না বলিয়া 'metaphysical' বলা যাইতে পারে,—জর্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ের উহাকে সেই নামই দিয়াছেন, তিনি প্রেমের কোন উচ্চতর মহিমা স্বীকার করেন না। ঐরূপ প্রেমই প্রকৃতিবাদী ও প্রকৃতিধর্ম্মী য়ুরোপের জীবনে, তথা কাব্যে-নাটকে, একটা বড় স্থান অধিকার করিয়া আছে; মহাকবি শেক্‌সপীয়ার ইহাকেই তাঁহার 'রোমিও ও জুলিয়েট'-নাটকে অমর করিয়াছেন। উহাই সেখানকার জীবনে মহত্তম প্রেম— 'grand passion'; মাত্রাভেদে উহাই নর-নারীকে আবিষ্ট ও অভিভূত করে। উহা দেহের ধর্ম্ম বলিয়াই সর্ব্বদেশের সর্ব্বসমাজে উহার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; এই সংবাদপত্রের যুগে ঐরূপ ঘটনার সংবাদ আমরা নিত্যই পাইয়া থাকি। শোপেনহাউয়ের উহাকে 'metaphysical' বা একটা গূঢ়তত্ত্বের অধীন বলিয়াছেন এইজন্য যে, উহা নর-নারীর ব্যক্তি-মানসের বহির্ভূত,—উহা সজ্ঞান বা স্ববশ নহে, কারণ, জড়জগতের মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির মতই উহা জীবজগৎকে শাসন করিতেছে। আমাদের সমাজে, উহার ঐ 'metaphysical' নির্ব্বন্ধতাকে নিরস্ত করিবার জন্য বিবাহে স্বয়ম্বর-বিধি (love-marriage) একরূপ নিষিদ্ধ হইয়াছে; বর-কন্যার মিলন-সংঘটন হয় জ্যোতিষিক গণনা প্রভৃতির দ্বারা। অর্থাৎ, ঐ প্রাকৃতিক নিয়তিকে প্রশ্রয় না দিয়া, তার সেই অন্ধ-লীলাকে বুদ্ধির আলোকে একটু সুপথবর্ত্তী করা হয়,—ঐ ধরণের প্রেমকে নষ্ট করিয়া তাহার স্থানে অন্য একটা হিতকর হৃদয়-সম্পর্ক স্থাপন করাই উহার উদ্দেশ্য। তথাপি, তাহাতেও একটা কৌতুককর অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে—তাহার নাম 'শুভদৃষ্টি'। অতএব প্রেমের ঐ দৃষ্টি-তত্ত্বকে, ঐ চারি-চক্ষের মিলনকে, শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করা হইয়াছে।

পাঠক-পাঠিকারা বোধ হয় এখনও বুঝিতে পারেন নাই, আমি আর সব

ছাড়িয়া ঐ "love at first sight" বা চারিচক্ষুর প্রেম লইয়াই এ আলোচনা সুরু করিয়াছি কেন; আমি, শ্রীকান্তকে দেখিবামাত্র কমল-লতার সেই অলৌকিক আকর্ষণের ঘটনাটি একটু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক মনে করিয়াছি—উহা যে অলৌকিক তাহাতে সন্দেহ নাই, তথাপি ঐরূপ ঘটনার সম্বন্ধে আমাদের একরূপ সংস্কার আছে, সেই সংস্কারের বশে আমরা উহার একটা সাধারণ অর্থও করিতে পারি; উহা কতটুকু সাধারণ এবং কতটুকুই বা অসাধারণ তাহাই নিরূপণ করিবার জন্য, আমি উহার গোড়া ধরিয়া আলোচনা করিতেছি। ইতিপূর্ব্বে আমি লৌকিক ও অলৌকিক প্রেমের সেই এক লক্ষণ—প্রাণের আকুলতা বা কাঙালপনার তুলনা করিয়া, উভয়ের যে পার্থক্য দেখাইয়াছি, এখানেও তাহা করিব। ঐ যে চারিচক্ষু-মিলনের প্রেম উহা সাধারণতঃ এক যৌন-আকর্ষণমূলক আসক্তিই বটে, উহা সাক্ষাৎভাবে physical বা স্থূল দেহঘটিত, এবং পরোক্ষভাবে metaphysical, বা সৃষ্টির একটা বৃহত্তর নিয়মের অধীন। এই প্রেমকে দমন বা সংশোধন করিবার জন্য নানা সামাজিক বিধি-নিষেধ ও নৈতিক ধর্ম্ম-সংস্কারের উদ্ভব হইয়াছে। ঐ প্রেম সকলের মধ্যে সমান প্রবলতা লাভ করে না; কোথাও বা উহার সম্পূর্ণ অভাবও লক্ষিত হইয়া থাকে। উহাই সমাজ-বিধি ও প্রতিকূল অবস্থার চাপে বেগবান হইয়া নর-নারীর জীবনে ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে। গৃহ-সংসারে উহাই সংযত ও শান্ত হইয়া ভিন্ন প্রকার হৃদয়বৃত্তির রূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু উহা আদৌ দেহজ বলিয়া উহার যত কিছু বিকার বা বিকাশ সাধারণতঃ ঐ দেহ-জীবনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এজন্য যখনই আমরা উহার কোন মহত্তর বা সুন্দরতর প্রকাশ দেখি, তখনই তাহাকে 'দেহের' না বলিয়া 'প্রাণের' বলিয়া থাকি—ঐটুকু 'প্রমোশন' তাহাকে দিই—যদিও প্রাণটা দেহের সহিতই নিত্যযুক্ত।

কিন্তু এইবার আমাদিগকে একটু ভিন্ন কথার অবতারণা করিতে হইবে, দেহকে ধরিয়াই দেহের একটু উপরে উঠিতে হইবে। ঐ দেহজ বস্তুই যে শেষে আত্মা-নামক একটা চৈতন্যের অঙ্গীভূত হয় তাহার সাধনাগত সাক্ষ্য আমাদের দেশে—বোধ হয় অন্যদেশেও—পাওয়া যায়। ঐ সাধনা সংসার বা সমাজের নয়—অথচ ঠিক অধ্যাত্ম-সাধন বা সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের সাধনাও নয়,—তবে কিসের সাধনা? একরূপ দেহাত্ম-সিদ্ধির সাধনাই বটে,—দেহের ধর্ম্মকেই রূপান্তরিত করা। কথাটা বুঝানো শক্ত—বিশেষতঃ আজিকার এই বিজ্ঞানের যুগে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর অনুসরণই যদি বৈজ্ঞানিকের ধর্ম্ম হয়, তবে এই সাধনাও বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক প্রথমেই তথ্য বিচার করেন, নির্দ্দোষ প্রমাণের দ্বারা তথ্যটিকে শোধন করিয়া

লইয়া পরে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আমরাও প্রেমকে চারিচক্ষের মিলনে উৎপন্ন একটা বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিব—দেহজ বলিতে উপস্থিত তাহাই বুঝিব; কারণ, ঐ চারিচক্ষের দৃষ্টিযোগে যদি একটা কিছু উৎপন্ন হয় তবে, তাহা দেহাশ্রিত বা দেহঘটিত একটা বৈজ্ঞানিক বস্তুই বটে; কারণ magnetism ও electricity তো পরের কথা, মনও যদি একটা বৈজ্ঞানিক পদার্থ—bi-product of matter হয়, তবে ঐ প্রেমও সেইরূপ একটা পদার্থ, তাহারও একটা ঐরূপ বস্তু-সত্তা আছে। যতদিন তাহাকে মূল নিয়মগুলার একটাতে বাঁধিয়া ফেলা না যায় ততদিন তাহা একটা রহস্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহা অবস্তু নহে। ইহার পর, বস্তুর রূপান্তরের মত, উহারও রূপান্তর স্বীকার করিতে হইবে, ঐ দেহ-বস্তুই রূপান্তরিত হয়। আবার সেই প্রশ্ন—কিসে রূপান্তরিত হয়? আমি বলিব, একরূপ চৈতন্যের শিখারূপে জ্বলিয়া উঠে, ঐ দেহজ কামই প্রেম-নামক আত্মিক বস্তুতে পরিণত হয়; অর্থাৎ, সেই চৈতন্যের বীজ দেহেই নিহিত আছে। তাহা হইলে, যাহার আদি প্রবাহ-পথ, বা জন্ম-সেতু ঐ চোখ হইতে চোখে—তাহা আর কিছু নয়, দেহেরই কূটস্থ, ঘনীভূত চেতনা; সেই অতি-উদ্দীপ্ত কাম বা "grand passion" অবস্থাবিশেষে, অথবা সাধনার দ্বারা, ঐরূপ প্রেমে পরিণত হয়। যদি তাহাকে আত্মার ধর্ম্ম বলিতে হয়, তবে সেই আত্মার গহন-নিবাস—ঐ দেহ।

অতঃপর আমি ঐ চক্ষু-জাত প্রেমের প্রসঙ্গে দুইজন ভিন্ন-পন্থী সাধকের দুইটি সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিব। দুইজনেরই সহিত আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় হইয়াছিল। একজন যোগী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, ইঁহারা অতিশয় শৌচ-নিষ্ঠ, দেহের যাবতীয় মলিনতা বা অনাচারকে ভয় করেন। একদিন ঐ যৌন-আকর্ষণের কথায় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই। মেয়েদের মধ্যে ঐ পিপাসা প্রায় সুপ্ত থাকে (আধুনিক Sex-Psychology-তে এইরূপ স্বভাবকেই বোধ হয় 'frigid' বলে), কিন্তু জাগিয়া উঠিলে অর্থাৎ সম্যক্-স্ফুরণ হইলে—সতী-ধর্ম্ম, এমন কি, মাতৃত্ব-সংস্কার পর্য্যন্ত তাহাকে বাধা দিতে পারে না। যাহারা অতিশয় শিষ্ট, সংযত, সাধ্বী বলিয়া আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, যাহাদের সম্বন্ধে কোন অসৎ প্রবৃত্তি আমরা কল্পনা করিতেও পারি না, তাহারাও—এমন কি, বয়স অধিক হইলেও—কুলত্যাগ করিতে পারে, এবং করেও। ইহার কারণ কি? কারণ, স্বামী-নামক বিবাহিত পুরুষটির সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রে, দেহের সেই কূটস্থ কাম-চৈতন্যের ক্ষেত্রে মিলন হয় না; সেই কামনা জাগেই না, সুপ্ত থাকে, তাই কোন উপদ্রব ঘটে না। এই অ-জাগ্রত কামনাই অনেক নারীর সতীত্বের কারণ। যাহাদের তাহা জাগিয়াছে,

অথচ তাহারই সমধর্ম্মী কোন পুরুষের সহিত মিলন হয় নাই, তাহারা, হয় বিবাহিত স্বামীর প্রতি বিদ্বিষ্টা হয়, সর্ব্বদা অশান্তির সৃষ্টি করে—চরিত্রশক্তি বা মনের দৃঢ়তা থাকিলে বাহিরে বেশ মানাইয়াও লয়, নয় তো ভ্রষ্টা হয়। কিন্তু যদি কখনো সেইরূপ পুরুষের সাক্ষাৎ পায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ কুলত্যাগ করিয়া সেই পুরুষের সহিত সঙ্গতা হয়। এই সাক্ষাৎ-কর্ম্ম বা পরস্পরকে চিনিয়া লওয়া—এক আশ্চর্য্য উপায়ে হইয়া থাকে, তাহা চারি-চক্ষের মিলন। পথে একটা পুরুষ যাইতেছে, হঠাৎ তাহার সহিত দৃষ্টিবিনিময় হইল, সেই মুহূর্ত্তে উভয়ে উভয়কে চিনিল, তার পরে আর রক্ষা নাই। উভয়ের দেহবাসী সেই কূটস্থ কাম-চৈতন্য, যাহাকে আমি দেহ-আত্মার বীজ বলিয়াছি তাহাই দৃষ্টিপথে ধরা দেয়; আর একটা দেহে (নারী বা পুরুষের) তাহার ঠিক প্রতিরূপটা থাকে, রূপে ও প্রতিরূপে চক্ষু-পরিচয় না হইলে দেহ-আত্মার সেই জাগরণ হয় না। এই তত্ত্বটি শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাও সেই জর্ম্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়েরের কথা; তিনি একজন দার্শনিক, অর্থাৎ চিন্তার দ্বারা ঐ তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার ভাষাও স্বতন্ত্র; এই সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই সেই উপায়ে উহা আবিষ্কার করেন নাই, তাঁহার তত্ত্বটিও ততখানি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কিন্তু উভয়ের ধারণায় একটা আশ্চর্য্য মিল আছে দেখিয়া আমি কথাটা উড়াইয়া দিতে পারি নাই। এই যোগীও শোপেনহাউয়েরের মত সংসার-বিদ্বেষী সন্ন্যাসী; ইনিও প্রেমকে স্থূল দেহ-ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু বলিয়া বিশ্বাস করেন না, বরং তাহার প্রতি একটা নির্ম্মম অশ্রদ্ধার ভাবই আছে; তাই সতীত্ব বা অ-সতীত্ব কোনটাই তাঁহার নিকটে প্রেমের দিক দিয়া বিচারযোগ্য নহে; কেবল ঐ দেহটাকে দমনে রাখাটাই বড় কথা, কারণ উহাই সকল অশুচিতার আকর।

এইবার আর একজনের কথা বলি, ইনি ঐ যোগীর ঠিক উল্টা সম্প্রদায়ের মানুষ—বিপরীত সাধনার সাধক। বাংলাদেশে যে সহজিয়া-সম্প্রদায় ছিল (এখনও আছে কি না জানি না) ইনি ছিলেন সেই সম্প্রদায়ের গুরু—নাম, সধরচাঁদ আউলিয়া। সে প্রায় ২৫ বৎসরের কথা, এই মহাপণ্ডিত ও সাধনা-প্রবীণ পুরুষের সহিত ঐ তন্ত্রের গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলাপ-আলোচনার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। সহজিয়া-সাধনার আদি-সাধনযন্ত্র এই দেহ—যে-দেহ ঐ যোগীর সাধনায় এমন ঘৃণার্হ। আমি সেই সহজিয়া-সাধনার যে-ব্যাখ্যা ঐ সাধক-পুরুষের মুখে শুনিয়াছিলাম, তাহা নিশ্চয় কোন পুঁথিতে বা মুদ্রিত পুস্তকে নাই; সে তত্ত্বের সার-কথা সাধকমণ্ডলীর বাহিরে কখনো প্রকাশিত হয় নাই; তাহা গুরুমুখী

অর্থাৎ, গুরুশিষ্য-পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছে—অ-দীক্ষিত জনকে তাহা দান করা গুরুর নিষেধ। আমিও সেই গুহ্যতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহাতেই, শুধু বিস্মিত নয়—মানব-মনীষা ও মানবীয় সাধনার একটা কল্পনাতীত গৌরব উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। উহা ভারতের, না—বিশেষ করিয়া বাংলার গৌরব? মনে হইয়াছিল, এই দেশে, সৃষ্টির সেই চির-দুর্ভেদ্য রহস্য—সেই 'burden of the mystery' ভেদ করিবার কত পন্থাই আবিষ্কৃত হইয়াছে! এই দেহটাকেই মন্থন করিয়া—যাহাকে অতিস্থূল (gross), অতিনিকৃষ্ট ধূলামাটি-পাঁকের সামিল বলিয়া প্রায় সকল শাস্ত্রেই কম বা বেশি ধিক্কার দেওয়া হয়—তাহারই সর্ব্বনিকৃষ্ট বৃত্তিকে—ঐ যৌন-ক্রিয়াকেই—সাধনার অঙ্গ করিয়া আত্মদর্শন ঘটে! সেই সাধক-পুরুষের দিব্য-দর্শন সৌম্যমূর্ত্তিও যেমন, তেমনি তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক বিচার আমাকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল; সারাদেহে এমন জ্যোতির্ম্ময় স্বাস্থ্য আর কোথাও দেখি নাই—তাহাতেও পৌরুষ ও মাধুর্য্যের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণ, সেই তত্ত্বই যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে! তিনি বলিলেন, দেহেরই—নর ও নারী-দেহের—যোগযুক্ত অবস্থায় যখন চারি-চক্ষু স্থির ও অপলকভাবে পরস্পর নিবদ্ধ থাকে, সেই একাগ্র-দৃষ্টিতেই সহসা—গো-শৃঙ্গে সর্ষপ-বীজ যতটুকু সময় অবস্থান করিতে পারে—ততটুকু সময়মাত্র উভয়ে উভয়ের নেত্র-তারকায় একটা জ্যোতিঃ দর্শন করে; সেই সংযম-দৃঢ় দৈহিক সঙ্গম-সমাধিতে—দেহের অগম-গহনে যে আত্মা বাস করিতেছেন তাঁহারই ঐরূপ চকিত দর্শনলাভ হয়। ঐরূপ আত্মদর্শনই এ সাধনার নিঃশ্রেয়স, এবং তজ্জন্য ঐ দেহ-যোগই প্রশস্ত প্রকৃতির প্রতিকূলে নয়—অনুকূলে ঐ যে সাধনা, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সফল সাধনা। বোধ হয়, এই জন্যই ঐ সাধনাকে সহজিয়া-সাধনা বলে। তথাপি কোন সাধনাই সহজ নয়, আমি ইহার যেটুকু পরিচয় পাইয়াছিলাম তাহা দেহধর্ম্মের অনুকূল হইলেও, রীতিমত 'সাধনা'ই বটে। সে যাহা হউক, আমি এখানে ঐ কাহিনীর উল্লেখ কেন করিলাম তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি; এখানেও, সাধনার পদ্ধতি যেমনই হোক, সেই সাধনাতেও একজন নয় দুইজনকে চাই, এবং তাহাতেও ঐ আঁখির মিলনই সব।

অতঃপর, আমি আরও একজনের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিব,—একজন আধুনিক ইংরেজ লেখকের সাহিত্যিক ভাব-সাধনার সাক্ষ্য; বিখ্যাত ঔপন্যাসিক D. H. Lawrence-এর এই উক্তিটি এই প্রসঙ্গে পাঠ করিলেই যথেষ্ট হইবে।—

"My great religion is a belief in the blood, in the flesh, as being wiser

than the intellect. We can go wrong in our minds, but what our blood feels and believes and says is always true....I conceive a man's body as a kind of flame, like a candle flame forever upright and yet flowing, and the intellect is just the light that is shed on things around."

[অর্থাৎ,—"আমি যে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করি তাহা রক্তের ধর্ম্ম, দেহের ধর্ম্ম; ঐ দেহই মস্তিষ্ক বা মন অপেক্ষা জ্ঞানী। মন ভুল করিতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের রক্তে যাহা অনুভব করি, এই দেহ যাহা বিশ্বাস করে, তাহা অভ্রান্ত। মানুষের দেহকে আমি একটা দীপশিখা বলিয়া মনে করি, উহা যেমন প্রবাহশীল, তেমনই ঊর্দ্ধমুখ; আর ঐ মন-বুদ্ধি আর কিছুই নয়—সেই দীপেরই দীপরশ্মির মত,—চতুর্দ্দিকের বস্তুরাশির উপরে ছড়াইয়া পড়ে।"]

আরও একটি উক্তি—

"The body feels real hunger, real thirst, real joy...All the emotions belong to the body and are only recognised by the mind. We may hear the most sorrowful piece of news, and only feel a mental excitement. Then hours after, perhaps in sleep, the awareness may reach the bodily centres, and true grief wrings her heart."

[অর্থাৎ, "এই দেহই সত্যকার ক্ষুধা, সত্যকার তৃষ্ণা, সত্যকার হর্ষ অনুভব করে।...আমাদের যত-কিছু হৃদয়াবেগ সকলই দেহের, মন সেগুলাকে চিনিয়া লয় মাত্র। কোন দারুণ শোকসংবাদ শুনিলে আমরা কেবল একটা মানসিক উদ্বেগ অনুভব করি; তাহার অনেক পরে, হয়তো নিদ্রাবস্থায়, সেই চেতনা আমাদের দেহের কূটস্থ চৈতন্য-কেন্দ্রে প্রবেশ করে, তখনই সত্যকার শোকে হৃদয় মথিত, জর্জ্জরিত হয়"।]

—এখানেও সেই "bodily centres"; সত্যকার অনুভূতি ও অপরোক্ষ-জ্ঞান ঐ দেহেই হইয়া থাকে—আত্মা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা এবং ঐ দেহ যেন অভিন্ন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতদিন পরে ঐ দেহতত্ত্ব য়ুরোপীয় ভাবুক-দিগেরও চিত্তগোচর হইয়াছে—সাধনা-লব্ধ নয়, ভাবনা-গ্রাহ্য হইয়াছে।

আমার মূল বক্তব্য ছিল,ঐ "love at first sight" বা 'প্রথম-দর্শনেই প্রেম' একটা সাধারণ কথাই বটে, বিশেষ করিয়া, কবিদের দৌলতে কথাটা আমাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, আমরা উহাতে আর তেমন গুরুত্ব আরোপ করি না; তবু এই সকল সাক্ষ্য হইতে বুঝিতে পারি, উহার মূলে গভীরতর কিছু আছে। কবির মুখেও যখন শুনি—

আঁখির মিলন ও যে—আঁখির মিলন!
লোকে না বুঝিল কিছু, লোকে না জানিল কিছু,
দম্পতির হ'ল তবু শত আলাপন!
হ'ল মন-জানাজানি হ'ল মন-টানাটানি—
আশার চিকণ হাসি, মানের রোদন;
* * *

—তখন উহা নিছক কবিত্ব বলিয়াই উপভোগ করি বটে, তথাপি কবির ঐ কথাগুলিতে সেই সহজিয়া-তত্ত্বেরই একটা দূর-ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়; ঐ

প্রাণে-প্রাণে বা আত্মায়-আত্মায় জানাজানির মূলে দেহের সাড়াই আছে—যদিও তাহা সজ্ঞান নহে।

এইবার কমল-লতার ঐ 'প্রথম-দর্শনে প্রেম' এইরূপ কোন তত্ত্বের আমোলে আসে কিনা তাহাই দেখিতে হইবে। কমল-লতা শ্রীকান্তকে দেখিবারও পূর্ব্বে, তাহার নাম শুনিয়াই ঐরূপ প্রেমে পড়িয়াছে—বাহিরে দেখিবার আগে অন্তরে তাহাকে দেখিয়াছে। শুধু নাম নয়—গহরের মুখে তাহার আকৃতি-প্রকৃতিরও কিছু পরিচয় পাইয়াছিল, তাহাতেই যেন তাহার সেই পূর্ব্বজন্ম-স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীকান্ত বলিতেছে—

"শুনিয়াছি আমার শ্রীকান্ত নামটা কমল-লতার উচ্চারণ করিতে নাই। জানি না কে তাহার এই পূজ্য গুরুজন, এবং কবে সে ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছে। দৈবাৎ আমাদের নামের মিলটাই বোধ করি এই বিপত্তির সৃষ্টি করিয়াছে, এবং তখন হইতে কল্পনায় সে গত-জনমের স্বপ্ন-সাগরে ডুব মারিয়া সংসারের সকল বাস্তবতায় জলাঞ্জলি দিয়াছে।" [পৃঃ ৮৫]

এই 'পূর্ব্বজন্ম'-স্মৃতি আর কিছু নয়—নির্জ্ঞানের অনুভূতি সজ্ঞানে পরিণত হওয়া; উহা আরও গভীর-গহনের ঘটনা। অর্থাৎ, আমরা পূর্ব্বে ঐ যে চক্ষুদ্বারে প্রেম-সঞ্চারের কথা বলিয়াছি—এখানে সেই চক্ষু নিদ্রিত থাকিয়া প্রেমাস্পদকে দেখিয়াছে। অতএব, এই দেহতত্ত্ব যেমন যোগীর দেহতত্ত্ব নয়, তেমনই সহজিয়া দেহতত্ত্বকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে; উহা সেই জ্যোতি-দর্শনের মত একটা ক্ষণিক উপলব্ধি নয়—আত্মার নিত্যধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে, সূক্ষ্ম দেহ-চেতনার উপরেই প্রেমের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সহজিয়া সাধকের পক্ষে যাহা একটা যোগলব্ধ চকিত চৈতন্য-স্ফুরণ মাত্র, এখানে তাহা রসরূপে সারাক্ষণ সারা চৈতন্য ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই প্রেমের সাধনাই বৈষ্ণব সাধনা—ইহা ঐ সহজিয়া-সাধনারও এক ধাপ উপরে। এখানে নাম ও নামী এক হইয়া গিয়াছে—নাম শুনিলেই দর্শন হয়, সেই দর্শনেই মিলন হইতেছে! অর্থাৎ, নামের দ্বারাই নামীর—দেহীর—স্পর্শলাভ হইতেছে! এ যেন ঘুমন্ত চোখেই দেখিতে পাওয়া। আমাদের কবিরাও এই অবস্থার কথা বলিয়াছেন; চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে—

(আমার) বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর-দুয়ার খোলা।
(তোরা) নিসাড় হইয়া আয় না, সজনি,
আঁধার পেরিলে আলা।

আবার এমনও বলা যায়—

আত্মার নিশীথ-রাতে প্রেম বুঝি স্বপ্ন-সঞ্চরণ,
বাঁশীখানি বেজে ওঠে অচৈতন্য প্রাণের অতলে—
প্রেম কি 'নিশির ডাক'?—গাঢ় ঘুমে গূঢ় জাগরণ।

অতএব, এই যে 'প্রথম-দর্শনের প্রেম' ইহা অন্য স্তরের; ইহা physical বা metaphysical, এমন কি, সহজিয়া 'আঁখির মিলন'-এর তত্ত্বও নয়; ইহা শুধুই প্রথম দর্শন নয়—একরূপ পূর্ব্ব-দর্শন বা প্রাক্-দর্শনের প্রেম।

আমি জানি, এই যে প্রেমের দেহতত্ত্ব প্রভৃতির এত আলোচনা করিতেছি—এ আলোচনা কাব্য-উপন্যাসের প্রসঙ্গে কিরূপ গুরুপাক; প্রেমের এইরূপ বৈজ্ঞানিক বা আধ্যাত্মিক বিচার-বিশ্লেষণের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না; আমরা নর-নারীর স্বাভাবিক জীবন, এবং সেই জীবনের যতকিছু গভীর হৃদয়-কথা তাহাই বলিতে বসিয়াছি। কিন্তু উপায় নাই, শ্রীকান্তই আমাদিগকে এই বিপদে ফেলিয়াছে, আমরা সহসা আর এক প্রেমের সমস্যায় জড়াইয়া পড়িয়াছি। মুস্কিল হইয়াছে এই যে, ইহাও প্রেম, অথচ ইহা কাব্যের সেই আদিরস নয়; আবার, এক অর্থে ইহা দেহ-সম্পর্কিত হইলেও, কতকটা আধ্যাত্মিক বটে,—বোধ হয় আধ্যাত্মিক দিকটাই বড়। এই প্রেম ভগবৎ-প্রেমেরই পর্য্যায়ভুক্ত—ইহারই আরেক নাম ভক্তি। কিন্তু আমাদের বাংলার বৈষ্ণব-সাধনায় ঐ আদিরসকেই, ঐ দেহ-চেতনা-সম্পর্কিত প্রেমকেই—লৌকিক হইতে অলৌকিকের পর্য্যায়ে তুলিয়া (ইংরেজীতে যাহাকে sublimate করা বলে), এমন ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে যে, সেই কৃষ্ণ-প্রেম আর ঐ সাধারণ নর-নারীর প্রেম কেবলই একাকার হইয়া যায়; তখন, যাহাকে প্রাণের পিপাসা বলি তাহাকেই একটা গভীরতর সত্তার—যেমন আত্মার—আকুতি রূপেই বুঝিতে হয়; কিন্তু তাহা কি কতকগুলা কথার সাহায্যেই বুঝানো যায়? অতএব, যে-দেহেই ইহার আদি উৎপত্তি সেই দেহের জবানীতেই, অর্থাৎ, নর-নারীর লৌকিক প্রেমের রঙে ও রেখায় উহাকে সাধারণ মানুষের হৃদয়-গোচর করিতে হয়। সেই দেহের বৃন্তেই যদি ঐ প্রেমের পদ্ম ফুটিয়া থাকে তবে তাহাকে বৃন্তহীন করিয়া কি ফল? বরং লোকচক্ষুতে তুলিয়া ধরিবার জন্য ঐ বৃন্তটিও আবশ্যক। বাংলার বৈষ্ণব-কবি সেই লৌকিক প্রেমের দেহ-রূপটাকেই রূপক করিয়া যে প্রেমের গান গাহিয়াছেন, তাহাতে কায়ার সেই ছায়াই প্রেমকে এমন নয়ন-মনোহর করিয়াছে; ঐ দেহের জবানীতেই, দেহাতীত—না, দেহাতীত নয়, দেহবাসী সেই পরমসুন্দর আমাদের ভাষায় কথঞ্চিৎ রূপময় হইয়াছেন। দেহই যে সেই পরমসুন্দরের অধিষ্ঠান-ভূমি! বৈষ্ণব এই দেহকেই দেবমন্দির-জ্ঞানে পূজা করে, তাহার সেই দেবতা প্রেমের দেবতা বলিয়া—নররূপধারী, দ্বিভুজ-মুরলীধর। প্রেমের শ্রেষ্ঠ লীলা—নর-লীলা। তিনি যদি আত্মা বা ব্রহ্ম হন, তবে মানুষের হৃদয়-রাধিকাই তাঁহার লীলাসঙ্গিনী। ঐ 'human soul' বা

মনুষ্যহৃদয়ের মত রসামৃত-মন্থনের এমন অতল অসীম সাগর আর আছে? রাধা সেই সর্ব্বমানব-হৃদয়ভূমি। ঐ পুরুষের নাম যদি 'আত্মা' হয়, তবে ঐ হৃদয়টাই তাহার 'দেহ'। ঐ দেহত্ব ঘুচিলে লীলারও অবসান হয়, এবং 'আত্মা'ও বেদান্তের সেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া শূন্যানন্দ ভোগ করেন। না, শেষ পর্য্যন্ত ঐ দেহটাকে চাই-ই; দেহ না থাকিলে সেই অপূর্ব্ব বেদনা, সেই মর্ম্মান্তিক জ্বালা—যাহা একই কালে বিষ ও অমৃত—যাহার তুল্য সুখ আর নাই—সেই বিরহ-মিলন-রসের আস্বাদ আর কোথায় পাওয়া যাইবে? তাই এই প্রেম অলৌকিক হইলেও ইহা এক পক্ষে লৌকিক; ঐ বৃন্দাবনের একপ্রান্ত আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে ঠেকিয়া থাকিবেই; সাধনার সজ্ঞানে না হইলেও, আমরা, অর্থাৎ এই সাধারণ নর-নারীও সেই জ্বালা আমাদের প্রেমে অনুভব করি,—স্বাদ না পাইলেও, তাহাতে সেই অমৃতের সৌরভ পাই। ঐ দেহের পিপাসা হইতেই আর এক পিপাসা জাগে—তাহার নাম, রূপ-পিপাসা; দেহ, অর্থাৎ কাম হইতে প্রেম এবং প্রেম হইতে রূপের পিপাসা জাগে, তাই প্রেমের দেবতাকে পরমসুন্দর হইতে হয়। তখন মনে হয়—

"সেই রূপ, সেই প্রেম, সেই নীল লাবণ্য-লালসে
মূর্চ্ছি' আছে চরাচর, ভাল নহে শুধু ভালবাসা!
সে সুধাসাগর-বারি উছলিছে যাহার কলসে—
ধরণীর এই ঘাটে তার বুঝি নাই যাওয়া-আসা।
এমন পূর্ণিমা-রাতে মৃত্যু বুঝি বার্ত্তা বহি আনে
জীবনের বাতায়নে—'ফুটিয়াছে স্বপন-দুর্ল'ভ
সুন্দরের পারিজাত কোন্ বনে, কোন্ নদীপার!'
—শুনি' পুনঃ সঙ্গিনীর পানে
চায় যবে, জ্বালা করে বল্লভের নয়ন-পল্লব,
পীরিতির খরতাপে ফোটে রূপ মৃগতৃষ্ণিকার!" [স্বপ্ন-গরল]

তবু বৈষ্ণব-কবিতার জন্মস্থান যে কবি-হৃদয়, সেই কবিকে সম্বোধন করিয়া এযুগের কবি বলিয়াছেন—

"সত্য করে' কহ মোরে, হে বৈষ্ণব-কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত? হেরি কাহার নয়ান
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?
বিজন বসন্তরাতে মিলন-শয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল দুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে

রেখেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি' লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হ'তে?"

দেহের প্রসঙ্গ এই পর্য্যন্ত। কথাটা বুঝাইতে কত সূক্ষ্ম চিন্তাই করিতে হইল। হয়তো, আমারই ক্ষমতা নাই, নহিলে আরও সহজ করিয়া বলা যাইত, আমিই জটিল করিয়া তুলিয়াছি। আসলে, ও জিনিষ ব্যাখ্যা করিতে যাওয়াই একরূপ ধৃষ্টতা। কমল-লতা নিশ্চয়ই এত ফিলজফি পড়ে নাই—সে এত সূক্ষ্ম-চিন্তার ধার ধারে না। আমরা যাহা এত চিন্তার সাহায্যেও বুঝিতে পারি না—সে তাহা বুঝিতে চায় না, একেবারে সোজা অনুভব করে, বুঝিবার প্রয়োজনই হয় না। ইহাকেই ইংরেজীতে বলে, mystic উপলব্ধি, এ উপলব্ধি জ্ঞানের নয়, জ্ঞানের সকল দুয়ার বন্ধ করিয়া সেই যে উপলব্ধি হয় তাহাই পূর্ণ উপলব্ধি, ইহা সেই—"বাহির-দুয়ারে কপাট লেগেছে, ভিতর-দুয়ার খোলা।"

কিন্তু কমল-লতার সাধনা ঐরূপ যোগ-সাধনা নয়। অনেক রকমের যোগ-সাধনা আছে,—কোনটা মনকে নিরোধ করার মনো-যোগ (যেমন, 'মনোনবদ্বার-নিষিদ্ধবৃত্তিঃ'), উহার দ্বারা দেহের মধ্যে, অর্থাৎ নিজের অন্তর-গহনে, আত্মার দর্শন-লাভ হয়, কোনটা ভাব-যোগ, যেমন কবিদের; কোনটা দেহ-যোগ, যেমন সহজিয়া-সাধকের,—সে এক প্রকার "ইন্দ্রিয়-যজ্ঞ"। এ সকলের প্রত্যেকটিতে উপলব্ধির তারতম্যও আছে, যে-সাধনায় যাহা ইষ্ট তাহাই লাভ হইয়া থাকে। সকলেই কিন্তু 'আলো' বা 'জ্যোতি'র কথা বলে, ঐ সহজিয়া সাধকও জ্যোতি-দর্শনের কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু কমল-লতার যে সাধনা, তাহা পরম-সুন্দরের সাধনা, তাহাতে রূপচর্য্যা আছে, সে রূপ কেবল একটা জ্যোতিঃ নয়; একটা রসের উপলব্ধি বলিয়া তাহার জন্য একটি বিগ্রহ চাই। সে প্রেমের আসন—হৃদয়, দেহেরই অঙ্গ; তাই দেহ—নর-নারী-দেহ—সেই সাধনার সহিত নিত্য-সম্পর্কিত, সেই দেহই আত্মময় হইয়া প্রেমের নিত্য-বৃন্দাবনে বাস করে। অতএব এই প্রেম-যোগকেও একরূপ দেহাত্ম-যোগ বলা যাইতে পারে; তাহাতে ঐ দেহের যতকিছু দুর্ব্বলতা ভস্ম হইয়া যায়, থাকে কেবল সেই আর্ত্তি—সেই বিরহ-কাতরতা; কিন্তু তাহাও বড় মধুর, সেই জ্বালাও অমৃতের ন্যায় উপভোগ্য। সে কান্না দুর্ব্বলের কান্না নয়,—তাহাতে সান্ত্বনার প্রয়োজন নাই; তেমন সান্ত্বনাই তো পরাজয়। অতএব, ঐরূপ সাধনায় দেহও আছে—হৃদয়ও আছে, জ্বালা ব্যথা সবই আছে,—কেবল, সে সকলই এক অপূর্ব্ব উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। এইবার বোধ হয়, কমল-লতার সেই প্রেম ও তাহার সাধনা কিরূপ, সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ কাহাকে বলে,—এবং শ্রীকান্তের সহিত সাক্ষাতের দিন হইতে সেই চির-বিদায়ের দিন পর্য্যন্ত তাহার যতকিছু আচরণ ও উক্তি, সে সকলই পাঠক-পাঠিকাদের কতকটা বোধগম্য হইবে।

নারীর প্রেম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১

পঞ্চম অঙ্ক—পূর্ণাহুতি

There is no fear in love ; but perfect love casteth out fear.

—*New Testament.*

এইবার রাজলক্ষ্মীর জীবন-নাটকের পঞ্চমাঙ্ক—তাহার প্রেমের পূর্ণাহুতিই এ অঙ্কের দৃশ্যবস্তু—যদিও তাহার শেষ পরিণাম অদৃশ্য হইয়া আছে। কমল-লতা তাহার প্রেমের সাক্ষাৎ প্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রতিনায়িকারূপে আবির্ভূত হয় নাই বটে—এই জন্যই তাহাকে নেপথ্যে, অর্থাৎ কতকটা আড়ালে থাকিতে হইয়াছে; তথাপি তাহার পশ্চাতে কমল-লতার ছায়া ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিয়াছে, সেই ছায়াকে রাজলক্ষ্মী গ্রাহ্য না করিলেও, শ্রীকান্ত তাহাতেই অপহৃত হইয়াছে। অতএব এই অঙ্কে রাজলক্ষ্মী আর একা নয়, তাহার অলক্ষ্যে কমল-লতা পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাও নিয়তি, নহিলে জীবনে ট্র্যাজেডির ছায়া ঘনাইয়া উঠিবে কেমন করিয়া? এইটুকু ভূমিকা করিয়া আমি এক্ষণে রাজলক্ষ্মীর পূর্ণ-রাজলক্ষ্মী-রূপের পরিচয় দিব।

এতদিন পরে, ঠিক এই সময়ে তাহার রুদ্ধ জীবনধারা পিয়ারী-বাইজী-রূপ দুর্লঙ্ঘ্য শিলা-রোধ ভাঙ্গিয়া পূর্ণস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে, সেই বালিকা রাজলক্ষ্মী আবার কৈশোর হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ণযৌবনে প্রবেশ করিয়াছে, সেই সঙ্গে তাহার প্রেমেরও নবজন্ম হইয়াছে। সে যেন আত্মারই নবজন্ম—সেই জন্মদিনই তো সত্যকার জন্মদিন! এই কথাটি—এক ইংরেজ নারী-কবি বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন; আশ্চর্য্য! উহা কি নারী-হৃদয়েরই বিশিষ্ট অনুভূতি? বৈষ্ণবের সেই সাধন-তত্ত্বই কি তবে সত্য?—সেই যে তত্ত্ব—ভালোবাসা নারীত্বেরই লক্ষণ, যে ভালবাসে সে-ই নারী! উহা যে কেমন জন্মদিন তাহাই বর্ণনা করিয়া সেই মহিলা-কবি যাহা লিখিয়াছেন, আমি এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।—

My heart is like a singing bird
Whose nest is in a watered shoot,
My heart is a like an apple tree
    Whose boughs are bent with thickest fruit.

My heart is like a rain-bow shell
    That paddles in a halcyon sea,
My heart is gladder than all these
    Because my love is come to me.

Raise me a dais of silk and down,
    Hang it with vair and purple dyes,
Carve it in doves, and pomegranates,
    And peacock with a hundred eyes;
Work it in gold and silver grapes,
    In leaves and silver fleur-de-lys,
Because the birthday of my life
    Is come, my love is come to me.

(*Christina Rossetti*)

ইংরেজী যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের জন্য ইহার একটি যেমন-তেমন বাংলা অনুবাদ করিয়া দিলাম।

আজি এ হৃদয় পাখীটির মত
    গান গেয়ে কচিশাখায় দোলে,
আপেল-তরুর মতন আজি সে
    ফলে-ফলে ডাল ভরিয়া তোলে।
যেন সে রঙীন ঝিনুক-তরীটি
    বাহিছে নিথর নীল সাগর,—
আজি মোর প্রাণে সুখ ধরে না যে,
    এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর!

শয়নের বেদী উঁচু ক'রে বাঁধি'
    ফুলমালা তায় দুলায়ে দে'!
সোনার সুতায় বোনা সে চাদরে
    মুকুতা-ঝালর ঝুলায়ে দে'।
আঁকি' তোল্ তায় পাখী-ফুল-ফল,
    লতায়-পাতায় সুমনোহর,—
আজি এ প্রাণের জন্মতিথি যে,
    এসেছেন প্রাণে প্রাণেশ্বর!

['হেমন্ত-গোধূলি']

এ কবিতা ইংরেজী নয়, ইহার ভাষা সর্ব্বদেশের প্রেমিক-হৃদয়ের ভাষা। এই ক্ষুদ্র কবিতাটির পরিসরে প্রেমের চরিতার্থতা—পূর্ণতাবোধের আনন্দ—শব্দে, অর্থে, উপমায় ও ছন্দে, কি সরল অথচ গভীর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে! এ কবিতাও বৈষ্ণব-কবিতা, ইহার রচয়িত্রীও খ্রীষ্টপন্থী বৈষ্ণবী। আমাদের বৈষ্ণবপদাবলীর

কবিতার সহিত ঐ কবিতার কোন পার্থক্য আছে? উহা কি সেই 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু, পেখনু পিয়মুখ-চন্দা'র প্রায় প্রতিধ্বনি নয়? তথাপি, উহাতে ঐ যে 'জন্মদিন' কথাটি রহিয়াছে, ঐ একটি কথায় এ কবিতা একটি নূতন ভাবের আধার হইয়াছে; এইজন্যই আমি রাজলক্ষ্মীর জীবনে, ঐ পরমক্ষণে, তাহার প্রাণের সেই আনন্দকে যথাযথ বর্ণনা করিবার জন্য, নিজ ভাষার পরিবর্ত্তে এই উৎকৃষ্ট কবি-ভাষার সাহায্য লইলাম।

ইহার পর গল্পাংশ বাদ দিলে ক্ষতি নাই। আমি ইতিপূর্ব্বে শ্রীকান্তের ভিতর-কার অবস্থা তাহার সেই অন্তর-গ্রন্থি মোচন ও বন্ধনের প্রয়াস, এবং তাহার প্রাণের সেই মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা—এ সকলের পরিচয় দিয়া রাখিয়াছি; এক্ষণে কয়েকটি দৃশ্য উদ্ধৃত করিলেই হইবে, হয়তো কিছু বেশিও করিতে হইবে, কারণ, এই অঙ্কের সকল দৃশ্যই মনোহর ও মূল্যবান্। প্রথমে রাজলক্ষ্মীর প্রেম-বিগলিত, কৃত-কৃতার্থ হৃদয়ের অপূর্ব্ব প্রেম-সম্ভোগ, এবং তাহার সেই রাহু-মুক্ত পূর্ণশশী-মুখ দেখাইব। রাজলক্ষ্মীর প্রেমোচ্ছ্বসিত আকুল আহ্বান শ্রীকান্তকেও যেন স্বপ্নাবিষ্ট করিয়াছে—সে যেন স্বপ্নে রাজলক্ষ্মীর দুই বাহু আপন কণ্ঠে ধারণ করিতেছে।—

"দুপুর-বেলা আমাকে সে খাওয়াইতে বসিলে বলিলাম, কাল পরনে ছিল আটপৌরে কাপড়, আজ সকাল থেকে বারাণসী শাড়ীর সমারোহ কেন বলো ত?

—তুমি বলো ত' কেন?

—আমি জানিনে।

—নিশ্চয় জানো। এ কাপড়খানা চিনতে পারো?

—তা পারি। বর্ম্মা থেকে আমি কিনে পাঠিয়েছিলাম।

রাজলক্ষ্মী বলিল, সেদিন আমি ভেবে রেখেছিলাম, জীবনের সবচেয়ে বড় দিনটিতে এটি পরবো,—তা, ছাড়া কখনো পরবো না।

—তাই পরেছ' আজ?

—হাঁ, তাই পরেছি আজ" [পৃঃ ১৪৮]

আমি যে ইংরেজী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত মিলিতেছে কি না? ইহার পর আর একটি ছোট দৃশ্য—

"ও কি, খাচ্চো না যে? সব দুধই পড়ে রইল যে।

—আর পারি নে।

—তবে কিছু ফল নিয়ে আসি?

—না, তা'ও না। * * *

—আনিনে দুটো ফল? ব'টি নিয়ে কাছে বসে' নিজের হাতে বানিয়ে অনেকদিন তোমাকে খেতে দিইনি—যাই?

—যাও।

রাজলক্ষ্মী তেমনি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।
আমার আবার নিশ্বাস পড়িল। এ আর সেই কমল-লতা।" [পৃঃ ১৫৩-৫৪]

এ শুধু রাজলক্ষ্মীর চিত্র নয়—ইহাই বাঙালীর সংসারে নিত্য-বৃন্দাবনেরই একটি লৌকিক চিত্র; নারীর এই রূপ বোধ হয় আর কোথাও, কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যাইবে না—বাংলার নিজস্ব বৈষ্ণব-সাধনার উত্তর-সাধিকা নয়—গুরু, স্নেহ-প্রেমের এই নারী-প্রতিমা। শ্রীকান্তও একটু বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ—রাজলক্ষ্মী কথাপ্রসঙ্গে যখন বলিল—

"আমি জানি, মেয়েদের প্রতি তোমার সত্যিকার আসক্তি এতটুকু নেই, যা আছে তা' লোক-দেখানো শিষ্টাচার। সংসারে কোন কিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বল্‌লে তোমাকে ফেরাবো কি দিয়ে?

বলিলাম, একটু ভুল হ'ল, লক্ষ্মী। পৃথিবীর একটি জিনিসে আজও লোভ আছে,—সে তুমি। কেবল ঐখানে 'না' বলতে বাধে। ওর বদলে দুনিয়ার সব-কিছু যে ছাড়তে পারি, শ্রীকান্তর জানাটাই আজও তুমি জানতে পারনি।" [ঐ পৃঃ ১৫৬]

না, রাজলক্ষ্মী তাহা জানিবে কেমন করিয়া? কিন্তু ঐ শ্রীকান্তই লিখিয়াছে—

"মনে মনে বলিলাম, শুধু কি রূপে? সংযমে, শাসনে, সুকঠোর আত্ম-নিয়ন্ত্রণে এই প্রখর বুদ্ধিশালিনীর কাছে ঐ স্নিগ্ধ সুকোমল আশ্রমবাসিনী কমল-লতা কতটুকু? কিন্তু ওই এতটুকুর মধ্যেই এবার যেন আপন স্বভাবের প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। মনে হইয়াছে, ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে মর্য্যাদা, আছে আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ। ও কখনো আমার সকল চিন্তা, ভালোমন্দ আপন হাতে লইয়া রাজলক্ষ্মীর মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না।"
[পৃঃ ১৩০-৩১]

তাই বলিতেছিলাম, শ্রীকান্তও রাজলক্ষ্মীর ঐ রূপ দেখিয়া একটু মোহগ্রস্ত হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী তাহার অন্তরের অন্তরে ইহার মিথ্যাটাকে জানে, কিন্তু তাহার প্রেমে ঐ মিথ্যাটার মূল্যও যে কম নয়। কমল-লতা হইলে তখনই শ্রীকান্তকে নিরস্ত করিয়া দিত, সে তাহার এই ভাববিলাসকে প্রশ্রয় দিত না—আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু রাজলক্ষ্মী কমল-লতা নয়; তাহার প্রেমের রাজ্য—প্রাণের রাজ্য, জাগর-স্বপ্নের লীলা-ভূমি। সেখানে স্বপ্নই জাগর হইয়া উঠে—এ সেই বৃন্দাবন নয়। মিথ্যাকেই আপনার প্রাণের রঙে সত্য করিয়া তোলার যে 'Divine Comedy' ও 'Human Tragedy'—তাহাই পার্থিব প্রেমের গৌরব; চোখ জলে ভাসিয়া যায়, তবু অধরের হাসি অটুট থাকে, ইহাই সে-প্রেমের চিরন্তন রীতি। কমল-লতার ঠাকুর কে তাহা আমরা জানি না; সে বলিয়াছে তাহার সেই ঠাকুর প্রত্যক্ষ সত্য; সত্য না হইলে সে ঐ ঠাকুরের প্রেমে আত্ম-নিবেদন করিত না। আমাদের ঠাকুর মিথ্যা হইলেও ক্ষতি নাই, সেই

মিথ্যাকেই আমরা সত্য করিয়া তুলি, তার কারণ বোধ হয় এই যে, যে-জিনিস যত মিথ্যা, যত ক্ষণিক, তাহাকেই তত বুকে জড়াইয়া ধরি। কিন্তু সত্য ও মিথ্যার মূল্য কি? সকল প্রেমই কি আপনাকে লইয়াই আপনার লীলা নয়? প্রেমের ঐ যে দুই পক্ষ—বৈষ্ণবশাস্ত্রে যাহাকে বিষয় ও আশ্রয় বলে, তাহারই বা অর্থ কি? সকলেই ভালবাসে বলিয়া—নারী; আর ভালবাসার পাত্র সেই এক জন—সেই এক পরম পুরুষ। তাহা হইলে, সেই পরমপুরুষ নিশ্চয় ভালবাসে না,—ভালবাসাটা এক-তরফা? কারণ, ভালবাসিলে সেই পুরুষও নারী হইয়া যাইবে। এই সঙ্কটময় প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য ঐ বৈষ্ণব-দর্শন শেষে 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ' নামে একটা তত্ত্বের স্থাপনা করিয়াছে, অর্থাৎ, ঐ যুগলের দুই জনেই নারী, আবার দুই জনেই পুরুষ—একই কালে ভালবাসার 'বিষয়' ও 'আশ্রয়'! কিন্তু এ সকল কথা রাজলক্ষ্মীর কথা নয়—কমল-লতার হইলেও হইতে পারে।

কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি! এ রহস্য রহস্যই বটে, উহার সত্য-মিথ্যা একই; তাই বৈষ্ণবী কমল-লতাও বিচার করে না, সে বিশ্বাস করে, কারণ, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর"। অতএব কমল-লতা ও রাজলক্ষ্মীর প্রভেদ এই যে, একজন মিথ্যা জানিয়াও ভালবাসিবে, আর একজনের বিশ্বাস চাই যে,—সত্য। রাজলক্ষ্মীর প্রেম এমন কথা বলে না যে, আমার 'আমি'টাই মিথ্যা, সেই 'আমি'কে তুমি তোমার সত্যে সত্য করিয়া এই 'আমি'টা ডুবাইয়া দাও; বরং ইহাই বলে যে, তুমি আমার হও, আমার মধ্যে তোমাকে লুকাইয়া রাখি; আমার দেওয়া সবকিছু তুমি গ্রহণ কর, করিয়া আমার 'আমি'টাকেই কৃতার্থ কর। সেই দানের দাতা যে আমি—দানের সঙ্গে সেই আমিটাও থাকিবে, তাহাকেও গ্রহণ করিতে হইবে; সে 'আমি' যদি মিথ্যা হয় তবে ঐ দানেরই বা মূল্য কি? তথাপি তুমি ভিখারীও নও, ভিখারী আমিই,—'আমার দান গ্রহণ কর' ইহাই আমার ভিক্ষা। প্রেমের সেই দান—তোমার অধরে আমার সেই চুম্বন—তাহাতে আমার সারা-আমিই যে পিপাসার্ত্ত হইয়া উঠে, সেই চুম্বনে—

"অয়স্কান্ত-মণিসম অধর-প্রবালে মম
শুষি' লব একরাশি কাঞ্চন-কিরণ!"

—সে পিপাসার সেই অতৃপ্তি-সুখ, জ্বালারই সেই মাধুরী—'আমি' না হইলে কে ভোগ করিবে? আবার সেই দেহের ভাষাই ব্যবহার করিতে হইল—উপায় নাই যে। কিন্তু উপরের ঐ উপমাটিতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ঐ কামনার

তীব্রতা দেহের গণ্ডি পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। রাজলক্ষ্মীর প্রেম এমনই, ঐ 'আমি'র পিপাসার জন্যই একটা 'তুমি'র প্রয়োজন; তাহার সেই পিপাসার পানীয় সে নিজেই সৃষ্টি করিয়াছে, সেই পানীয়কেই তাহার প্রাণের পছন্দমত একটি পাত্রে—ঐ শ্রীকান্তের মধ্যে স্থাপন করিয়াছে। এইজন্যই যেন শ্রীকান্তকে তাহার বড় প্রয়োজন; ইহার জন্য তাহাকে আর কিছু করিতে হইবে না, কেবল বিমুখ না হইলেই হইল। শ্রীকান্তকে সে যেন এই কথাই বলিতেছে—

বল শুধু 'বাসি তোমায় ভালো',—
　　বুকে যা থাক, মুখে হ'লেই হবে,
তোমার চোখে আমার চোখের আলো
　　সবটু' দেব, দুঃখ নাহি রবে।

* * *

আমি আমায় তোমার ভিতর দিয়ে
　　বাসবো এমন গভীর ভালোবাসা!
শূন্য কলস নিজেই ভরে' নিয়ে
　　কণ্ঠে তাহার তুলব কলভাষা।

রাজলক্ষ্মীর এখন তেমনই অবস্থা, যদিও সে নিশ্চয় ইহা আপন মনে স্বীকার করে না; আমাদের কিন্তু ইহাই মনে হয়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সকল শ্রেষ্ঠ প্রেমই তাই—ঐ যে 'দুইয়ের লীলা' উহা আসলে একেরই; একই দুই, দুইও এক, ইহাই 'আমি-তুমি'র সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ। তথাপি ঐ তত্ত্বের 'আমি' আর রক্তমাংসের 'আমি' এক নয়—উহাও নারীর 'আমি', এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। নারীর ঐ 'আমি'র যে 'মমতা' তাহাই রাজলক্ষ্মীকেও এমন মহিমান্বিত করিয়াছে। ঐ প্রবল মমত্ব বিশেষভাবে নারীরই ধর্ম্ম; নারীর যে স্বাভাবিক মাতৃত্ব, যেখানে তাহার সেই প্রকৃতিদত্ত সংস্কারই প্রবল, সেখানে তাহার সন্তান-স্নেহের মূল ঐ মমত্ব বা 'আমার'-বোধ; ঠিক সেই কারণেই তাহার আত্মবিসর্জ্জনও এমন অনায়াস-সাধ্য; ইহা হইতেই ঐ মমতার অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে। ঐ মমতাই যেন তাহার আদি নারীত্ব, সে উহা কখনও ত্যাগ করিতে পারে না। উহারই একটা রূপান্তর হয় প্রেমে। ঐ মমতার বশেই তাহার যতকিছু আত্মদান; সর্ব্বস্ব দিয়াও সে ঐ একটি অধিকার রাখিবে—ঐ 'আমার' কথাটা ছাড়িবে না, তাই তাহাতে এমন অপূর্ব্ব রসের সঞ্চার হয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে অধিকাংশ নায়িকার প্রেমে যে একরূপ স্নেহের আতিশয্য দেখা যায় তাহাও এই মমতাকে আশ্রয় করিয়া আছে—ঐ মমতাই তাহাদের প্রেমকে এমন

লক্ষণীয় করিয়াছে। আশ্চর্য্য এই যে, ঐ মমত্ববোধ, ঐ 'আমি'র অধিকার-বোধই নারীকে এমন অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের শক্তি দান করে। কবি-শিল্পী শরৎচন্দ্রকে—লেখক শরৎচন্দ্রকে ঐ 'রস' বড়ই মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্র নারীর ঐ মমত্ববোধ, ঐ অধিকার-স্পৃহা আদৌ সহ্য করিতে পারে না—যেন সেই খাঁটি প্রকৃতি-স্বভাবকে তাহার খাঁটি পুরুষ-স্বভাব বরদাস্ত করিতে পারে না; প্রকৃতি মমতাময়ী, পুরুষ উদাসীন। কিন্তু ঐ দুইয়ের মিলন বা সামরস্যই সেই "consummation devoutly to be wished." অর্থাৎ উহা উভয়েরই নিঃশ্রেয়স। কারণ, পুরুষের মধ্যে রহিয়াছে সেই শিব, সেই মহেশ্বর, আর নারীই সেই উমা—হৈমবতী। আবার, ঐ দ্বন্দ্ব যতক্ষণ ততক্ষণই এই মহানাটকের অভিনয়, এবং তাহাতেও আমরা মিলনান্ত অপেক্ষা বিয়োগান্তেরই পক্ষপাতী; অর্থাৎ প্রকৃতির জয় ও পুরুষের পরাজয়ই আমাদের প্রাণের জ্বালা প্রশমিত করে—counter-irritant-এর মত। 'প্রকৃতির জয়' বলিলাম এই জন্য যে, যতকিছু পরাজয় সবই তো পুরুষের, দৃষ্টান্ত—বাল্মীকির রাম, শেকস্‌পীয়রের ওথেলো; সীতা ও ডেস্‌ডিমোনারই জয় হইয়াছে। যে পুরুষের পরাজয় ঘটে না—সে বড় নয়, ছোট; কিম্বা এত বড় যে, সে মানুষই নয়। অতএব ঐ পরাজয়ের ট্র্যাজেডিই সবচেয়ে বড় কাব্য। কমল-লতার প্রেম যত বড়ই হউক, তাহার নারীত্বের রূপান্তর ঘটিয়াছে; তাহার প্রেমে দেহটা যেন ধূপবর্ত্তিকা হইয়া গন্ধধূমে একটি অপূর্ব্ব বাষ্পঘোর সৃষ্টি করিয়াছে; উহার নাটক নাই, উহা যেন জীবন-রঙ্গমঞ্চের একটা নেপথ্য-রাগিণী,—কাব্যও নহে, গান; উহার ঘটনা একটা স্থির মুহূর্ত্তে অনন্ত হইয়া আছে। রাজলক্ষ্মীর প্রেম নারীহৃদয়-ঘটিত বলিয়াই তাহার একটা নাটকীয় পরিণাম আসন্ন হইয়াছে—তাহার প্রেমে সেই 'আমি'টা এতদিনে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাই আনন্দের সীমা নাই—আমি ইহাকেই তাহার প্রেমের নবজন্ম বলিয়াছি। ঐ 'আমি' একটা দেহ-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি-আমি বলিয়াই তাহার হাসি-অশ্রু এত মনোহর। রাজলক্ষ্মী যে অর্থে প্রেমের শরীরী-বিগ্রহ, তাহাই 'loyalty to humanity,'; কমল-লতাও শরীরী বটে, কিন্তু সে দেহ ও আত্মার—স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের— অন্তরীক্ষ-চারিণী, যেন যে-কোন মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

আবার বলি, প্রসঙ্গক্রমে আমি এই যে সব তত্ত্বালোচনা করিতেছি, ইহাতে পাঠক-পাঠিকাগণ অসহিষ্ণু হইবেন না। মানুষের জীবন, মনুষ্য-প্রকৃতি ও মনুষ্য-হৃদয় কত জটিল ও সীমাহীন, আমি তাহারই একটা আভাস দিবার জন্য

এই সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আপনাদের সঙ্গে একটু তত্ত্বালোচনাও করিতেছি। কিন্তু ইহা দার্শনিক তত্ত্বই নয়, কবিদের হৃদয়ও এই সকল ভাবের আবেগে কিরূপ সাড়া দিয়াছে তাহারও সাক্ষ্য আমি যথাসাধ্য উদ্ধৃত করিতেছি—যাহাতে ঐ তত্ত্বকথাও কিঞ্চিৎ সরস হইয়া উঠে; ইহার দ্বারা তাঁহাদের কৌতূহল আরও উদ্রিক্ত হইবে। নহিলে, আমি পণ্ডিতও নই, তত্ত্ববিৎও নই; আমার এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধানের কারণ—সাহিত্য মনুষ্যজীবনেরই দর্পণ; কবিরা তাঁহাদের দৈবী প্রজ্ঞার বলে যেখানে সেই মহা-রহস্য যতটুকু আলোকিত করেন, তাহাতে সেই বিশালতা ও জটিলতারই ইঙ্গিত থাকে। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কাব্য একরূপ জীবন-দর্শন, তাহাতে সেই অসীমের রহস্য যত অধিক ঘনাইয়া উঠে, ততই তাহা গভীর। এই উপন্যাসে—বিশেষ করিয়া এই শেষ পর্ব্বে—সেই মানব-হৃদয়-রহস্যের অনেকগুলি প্রশ্ন উঁকি দিয়াছে, তাহাদের সরাসরি উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়—দেওয়াও সঙ্গত নয়, কারণ তাহাতে কাব্যসমালোচনার পরিবর্ত্তে দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমি কেবল প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া তাহাদের প্রসঙ্গে কতকগুলি তথ্য ও তত্ত্বের উল্লেখমাত্র করিতেছি—পাঠক-পাঠিকারা তাহা-হইতে আপন-আপন জ্ঞান-বুদ্ধি ও মানস-প্রকৃতি অনুযায়ী স্বাধীন ধারণা গড়িয়া লইতে পারিবেন। শ্রীকান্তের এই কাহিনী এমন স্থানে পৌঁছিয়া এমন একটা মোড় ফিরিয়াছে যে, তাহার নিজের মনোভাব যেমনই হোক, আমাদিগকে তাহার সেই বিবৃতির পৃথক ব্যাখ্যা করিতেই হইবে; ঐ মুরারিপুরের আখড়া এবং গহর ও কমল-লতাই যত নষ্টের মূল। উহাদের সহিত পরিচয় হওয়ার পর আমরা রাজলক্ষ্মীর কথা আর আগের মত স্বচ্ছন্দভাবে বলিতে পারিতেছি না; শ্রীকান্ত নিজেও যেমন ফাঁপরে পড়িয়াছে, আমাদিগকেও তেমনই ফাঁপরে ফেলিয়াছে। সে নিজে সব কথা বলে নাই, বলিবে না; কিন্তু এমনভাবে ঐ নূতন কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছে যে তাহাতে ইসারার অন্ত নাই—নিজে নির্লিপ্ত থাকিয়া চরিত্রগুলার জবানীতেই সে এমন সব কথা বলিয়াছে যাহার অর্থ অতিশয় গূঢ় ও ব্যাপক।

আমি পঞ্চমাঙ্কের অন্তর্দৃশ্য উন্মোচন করিয়া এইবার বহির্দৃশ্যগুলি একটু সবিস্তারে উদ্ঘাটিত করিব।

(২)

পঞ্চম অঙ্কের জের—ভাব-সম্মিলন

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু,
পেখনু পিয়া-মুখচন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু,
দশদিশি ভেল নিরদন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহুঁ সন্দেহা।

—বিদ্যাপতি

এইবার সেই হৃদয়-যমুনায় রাজলক্ষ্মীর অবগাহন,—তাহারই তীরে বসিয়া ভাবাবেগ-বিভোরতার কয়েকটি দৃশ্য। শ্রীকান্তও ভাব-বিভোর হইয়াছে—সেটা তাহার দুর্ব্বলতা; সে কখনও আত্মবিস্মৃত হয় না,—ঐ দুর্ব্বলতাকে সজ্ঞানে প্রশ্রয় দেয়। রাজলক্ষ্মীর ঐ প্রেম-নিবেদনে আত্মসম্মান ফিরিয়া পাইয়া সে কিরূপ আশ্বস্ত ও আত্মস্থ হইয়াছে সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এতদিনে রাজলক্ষ্মীর এই পূর্ণ-পরাজয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীকান্তের বড়ই আত্মপ্রসাদ হইয়াছে; সে বলিয়াছিল—"এতকাল ধরাই পড়িয়াছি ধরিতে পারি নাই। কিন্তু আজ ধরা পড়িল রাজলক্ষ্মীর সব চেয়ে দুর্ব্বলতা কোথায়"। আবার একথাও সে বলিয়াছে—

"এবার তাহাকে চিনিলাম। এই জোরই তাহার চিরদিনের সত্য পরিচয়। জীবনে এ আর তাহার ঘুচিল না,—এ হইতে কখনো কেহ তাহার কাছে অব্যাহতি পাইল না।" [পৃঃ ১৩০]

ইহাও বলিয়াছে যে, "কমল-লতা রাজলক্ষ্মীর মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে না"।

অব্যাহতি চাই, অথচ আচ্ছন্নও করে—করে বলিয়াই তো অব্যাহতির প্রয়োজন। ইহাই শ্রীকান্তের আত্মার আত্মকথা। ইহার পরে রাজলক্ষ্মীর ব্যবহারে তাহার সেই ভাববিভোরতা আমাদিগকে যেন বিস্মিত না করে।

রাজলক্ষ্মীর প্রেম ও রূপের সেই আকালিক, আকস্মিক রস ও শোভা শ্রীকান্তকে যদি ক্ষণিক "পরিলুপ্তধৈর্য্য" না করিয়া, সত্যই বিহ্বল করিয়া থাকে, অর্থাৎ যখন—

উমাপি নীলালকমধ্যশোভী
বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুতপল্লবেন
মূর্দ্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায়॥

—তখন সে যদি মহাযোগী মহাদেবের মত, তাহার সেই 'স্ফুরদ্বালকদম্বকল্প' তনু ও 'বিম্বফলাধরোষ্ঠ' দেখিয়া "চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশি"র মত কেবল একবার মাত্র উচ্ছ্বসিত হইয়া তখনই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া থাকে, সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যাইবে না, কারণ, সে মহাদেব নয়—মানুষ; দ্বিতীয়তঃ, এই উমাটিও কালিদাসের উমা নয়; তপস্যায় সে উমার সমকক্ষ হইলেও পাষাণ-হিমালয়ের কন্যা সে নয়, সে মানব-দুহিতা; তাহার প্রাণ জাহ্নবী-জলতরঙ্গের মতই প্রগল্‌ভ, সে তেমনই কল্লোলময়ী। কালিদাসের মহাদেব যদি এমন উমার হাতে পড়িতেন তবে তাঁহারও দুর্দ্দশার একশেষ হইত। এইবার দৃশ্যগুলি একে একে উদ্ধৃত করি।—

"রাজলক্ষ্মী বলিল, কি অতো দেখ্‌চো?
—দেখ্‌চি তোমাকে।
—নতুন নাকি?
—তাইতো মনে হচ্চে।
—আমার কি মনে হচ্চে জানো?
—না।
—মনে হচ্চে, রতন তামাক নিয়ে আসবার আগে আমার হাত দুটো তোমার গলায় জড়িয়ে দিই দিলে তুমি কি করবে বলো ত? বলিয়াই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, ছুঁড়ে ফেলে দেবে না তো?

আমিও হাসি রাখিতে পারিলাম না; বলিলাম, দিয়ে দেখ না। কিন্তু, এত হাসি—সিদ্ধি খেয়েছ নাকি?" [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ১৩৫]

* * * *

"আর একটা প্রবল হাসির ঝোঁক আসিতেছিল, সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলাম, এবার হাসলে ভয়ানক শাস্তি দেবো। কাল চাকরদের সামনে মুখ বার করতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী সভয়ে সরিয়া বসিল, কিন্তু বলিল, সে তোমার মত বীরপুরুষের কাজ নয়। নিজেই লজ্জায় মরে' যাবে। সংসারে তোমার মত ভীতু মানুষ আর আছে না কি?" [ঐ, পৃঃ ১৩৭]

"কিন্তু আমি দুঃখ তোমাকে কখনো দিয়েছি, লক্ষ্মী? রাজলক্ষ্মী অনাবশ্যক আমার কপালটা হাত দিয়া একবার মুছিয়া দিয়া বলিল, কখনো না। বরঞ্চ আমিই তোমাকে আজ পর্য্যন্ত

কত দুঃখই না দিলাম। নিজের সুখের জন্যে তোমাকে লোকের চোখে হেয় করলুম, খেয়ালের উপর তোমার অসম্মান হতে দিলুম,...

তাহার দুই চোখ জলে টলটল করিতে লাগিল আমি হাত দিয়া মুছাইয়া দিলে বলিল, বিষের গাছ নিজের হাতে পুঁতে এইবার তাতে ফল ধরল। খেতে পারিনে, শুতে পারিনে, চোখের ঘুম গেল শুকিয়ে, এলোমেলো কত কি ভয়, তার মাথামুণ্ড নেই,......গুরুদেব তখনো বাড়ীতে ছিলেন, তিনি কি একটা কবজ হাতে বেঁধে দিলেন।......এমনি সময় এলো তোমার চিঠি। এতদিনে রোগ ধরা পড়ল।

—কে ধরলে,—গুরুদেব? এবার বোধ হয় আর একটা কবজ লিখে দিলেন?

—হাঁ গো, দিলেন। বলে' দিলেন সেটা তোমার গলায় বেঁধে দিতে।

—তাই দিও, তাতে যদি তোমার রোগ সারে।

...আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, আমাকে এমন করে' বেঁধেছিলে কেন বলো ত?"

[ঐ, পৃঃ ১৪০-৪১]

"খবর পেলাম, তুমি এখুনি নাকি কালীঘাটে যাবে?

রাজলক্ষ্মী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, এখুনি? সে কি করে' হবে? তোমাকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তবে তো ছুটি পাবো।......

—আমি কি স্থির করেছি জানো? এখন থেকে তোমাকে কড়া শাসনে রাখবো, যা' খুসি তাই আর করতে পারবে না।

রাজলক্ষ্মী হাসিমুখে বলিল, তা' হলে তো বাঁচি গো মশাই। খাই দাই থাকি, কোন ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় না।

কহিলাম, সেইজন্তেই আজ তুমি কালীঘাটে যেতে পারবে না।

...শুধু আজকের দিনটির জন্তে হুকুম দাও, আমি মায়ের আরতি দেখে আসি গে। ...কতদিন হ'ল, ঠাকুর-দেবতা ভুলে ছিলুম, কিছুতে মন দিতে পারিনি,—লক্ষ্মীটি, আজ আমাকে মানা কোরো না,—যাবার হুকুম দাও।

—তবে চলো দু'জনে একসঙ্গে যাই। ...তোমার পথ চেয়ে আমি মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকব। আমার হয়ে দেবতার কাছে তুমি বর চেয়ে নিও।

—কি বর চাইবো বল?

...তুমি বলো ত', লক্ষ্মী, কি আমার জন্যে চাইবে?

রাজলক্ষ্মী বলিল, চাইবো আয়ু, চাইবো স্বাস্থ্য, আর চাইবো আমার ওপর এখন থেকে যেন তুমি কঠিন হ'তে পারো। প্রশ্রয় দিয়ে আর যেন না আমার সর্ব্বনাশ করো।" [ঐ পৃঃ ১৪৮-৫০]

বোধ হয় এ দৃশ্য আর অধিক উদ্ধৃত করিতে হইবে না। রাজলক্ষ্মী যে আর সে রাজলক্ষ্মী নাই, তাহার যে নবজন্ম হইয়াছে, তাহার চিরজীবনের স্বপ্ন সফল হইয়াছে—অন্ততঃ সেই স্বপ্ন সে জাগ্রত অবস্থায় দেখিতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; ইহাই নারীর পূর্ণ প্রেয়সী-মূর্ত্তি। ঐ শেষের কথাগুলিতে সে শ্রীকান্তকে তাহার আপন হইবার যে কামনা দেব-দুয়ারে জানাইবে বলিতেছে—তাহার অর্থ, শ্রীকান্ত যেন তাহাকে গ্রহণ করে, আর প্রত্যাখ্যান না করে;

ঐ কামনাই এখনও তাহার সবচেয়ে বড় কামনা, তার কারণ—সে জানে, এ লগ্ন তাহার জীবনে একবার আসিয়াছে,—ফুরাইতেও দেরী হইবে না; তবুও বিশ্বাস করিতে চায়! প্রেমের এই মোহ—ইহার মত হৃদয়ভেদী পরিহাস আর কি আছে—

এ ভুল প্রাণের ভুল,
মর্ম্মে বিজড়িত মূল—
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী!

ঐ প্রেমই বলে—

"আমার আকাঙ্খা সম এমন আকুল
এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল
এমন প্রবল বিশ্বে কিছু আছে আর!"
এত বলি' দর্পভরে করে সে প্রচার
"যেতে নাহি দিব"। তখনি দেখিতে পায়
শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে' যায়
একটি নিশ্বাসে তার হৃদয়ের ধন,
অশ্রুজলে ভেসে যায় দুইটি নয়ন,
ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথ্বীতলে
হতগর্ব্ব, নতশির।

তবু ঐ প্রেম অপরাজেয়, ঐ প্রেমই রাজলক্ষ্মীকে এমন মহিমময়ী করিয়াছে। শ্রীকান্ত ঠিকই বলিয়াছে—"এ আর সেই কমল-লতা!" একদিকে ভিখারিণী হইলেও আর একদিকে ইহাই প্রেমের অন্নপূর্ণা-রূপ, রাজরাজেশ্বরী-রূপ। প্রেমের ঐ যে প্রাণান্তক ক্ষুধা উহাই তো তাহাকে এমন ঐশ্বর্য্যময় করিয়াছে। ঐ যে উহার দান-তৃষ্ণা, এবং তাহাতে দাতার ঐ যে ঈশ্বর-ভাব, উহাই তো সর্ব্বত্যাগী শিবকেও ভিখারী-বেশ ধারণ করায়, পুরুষের পৌরুষ-গর্ব্ব ও স্বাতন্ত্র্য-মহিমাকে ধূলিসাৎ করিয়া দেয়; ঐ মহা-ঐশ্বর্য্যশালিনীর আনন্দ-মন্দিরে পীযূষ-পায়সান্নের লোভে নির্গুণ ব্রহ্মও সগুণ হইয়া, দুই করপুট অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া নতনেত্রে আসিয়া দাঁড়ান। কমল-লতার প্রেমে সেই ক্ষুধা নাই, যে-ক্ষুধা নিরাকার মহাশূন্যকে সৃষ্টিতে সাকার করিয়া তুলিয়াছে—অসীমকে সীমার অশেষ সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে। তাহার প্রেমে আছে ক্ষুধাহীন অসীমতা, তাহাতে মুক্তিই আছে—বন্ধন নাই; আর এখানে "মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা"। কমল-লতার প্রেমে পুরুষ ও নারী এক হইয়া গিয়াছে—নারীর মমতা ও পুরুষের মুক্তি; রাজলক্ষ্মীর প্রেমে আর যাহাই থাক, মুক্তি নাই। তার কারণ, তাহাকে দান করিতেই হইবে, কিন্তু গ্রহণ করাইতে না পারিলে দান সম্পূর্ণ হয় কেমন করিয়া?

ঐ দান-পিপাসাই তাহার বন্ধন। আজ সে তাহার সেই ভালবাসা অসঙ্কোচে, অকুণ্ঠিত আত্ম-বিশ্বাসে সমর্পণ করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছে—তাহার মনের সকল দ্বিধা, সকল গ্লানি ঘুচিয়া গিয়াছে; ইহাই তাহার প্রাণের মুক্তি, তাহার ভালবাসার জয়োৎসব। তাহার আর কোন দুঃখ নাই। শ্রীকান্তকে সে জানে, তাই তাহার নিকটে সে কেবল ঐ একটি অধিকার দাবি করিতেছে—শ্রীকান্ত যেন তাহার ঐ দানপত্রখানিতে একটা প্রতিগ্রহের স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দেয়।

শ্রীকান্ত তাহা দিল কি? বলিয়াছি, সে একটু বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে; এই অযাচিত ঐশ্বর্য্যের অকুণ্ঠিত দানে একটা নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ সকলের মধ্যেও রাজলক্ষ্মী যখন মাথা স্থির রাখিয়া বলিল—"সংসারের কোন কিছুতেই তোমার লোভ নেই, যথার্থ প্রয়োজনও নেই। তুমি 'না' বলিলে তোমাকে ফেরাবো কি দিয়ে?"—তখন তাহার বলিতে বাধিল না—"পৃথিবীর একটি জিনিসে আজও লোভ আছে, সে তুমি"। ঐ লোভ একটা লোভই বটে, কারণ লোভ-জিনিসটা কখনো সত্য হয় না। ইহার পরেও একস্থানে সে আপনাকে আপনি বলিতেছে—

"আমি শুধু জানি, যে রাজলক্ষ্মীকে একদিন না চাহিয়াই দৈবাৎ পাইয়াছি, আজ সে আমার সকল পাওয়ার বড়। কিন্তু সে কথা এখন থাক্।" [পৃঃ ১৬৮]

—এমনই তাহার ভাব-বিলাস, এমনই আত্ম-প্রতারণা! কিন্তু রাজলক্ষ্মীর দিক্ হইতে ইহার সত্য-মিথ্যায় কিছুই আসে যায় না; সে শ্রীকান্তকেও জানে, আপনাকেও জানে; তাহারও সেই এক কথা—

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও।

কমল-লতাও তাহা বলিয়াছিল, কিন্তু দুইয়ের কণ্ঠে ঐ গানের সুর কত ভিন্ন! রাজলক্ষ্মী আপনাকে ফিরিয়া পাইয়াছে, সেই সঙ্গে তাহার প্রেমকেও। শ্রীকান্তের সহিত এই যে তাহার নূতন করিয়া মিলন—এই মিলনে সে বিরহকেই গভীর করিয়া অনুভব করিতেছে, এমন বিরহ-বেদনা সে পূর্ব্বে কখনো পায় নাই। এ যেন মিলনের ভিতর দিয়াই বিরহের বিপুল বেদনা-সুখ। নাঃ, সেই বৈষ্ণব-সাধনতত্ত্বই আমাদিগকে যেন পাইয়া বসিয়াছে; রাজলক্ষ্মী তো বৈষ্ণবী নয়, তাহার পক্ষে সেই তত্ত্ব এমন সত্য হইয়া উঠে কেমন করিয়া? ইহার উত্তর আমাদের কবি দিয়াছেন, বৈষ্ণব তাহার ঐ তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছে আমাদেরই এই "নর-নারী-মিলন-মেলায়"; বৈষ্ণবী কমল-লতা রাজলক্ষ্মীর অগ্রজা নয়—অনুজা; আগে

রাজলক্ষ্মী, পরে কমল-লতা। এই মিলন-কালেও রাজলক্ষ্মী কেবলই হারাই হারাই করিতেছে; সে জানে এ সুখ বেশিদিন নয়, তাই স্বাধীনভর্তৃকা সমর্থা নায়িকার মত, সে তাহার প্রিয়তমকে লইয়া একটু লীলারস উপভোগ করিতে চায়, ইহার মত করুণ আর কি হইতে পারে? সেই প্রেম-লীলার যত কিছু অঙ্গ—আবদার-অভিমান, একাধিকারের ঈর্ষ্যা, প্রিয়তমের মনস্তুষ্টির জন্য সযত্ন প্রসাধন, তাহার অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠা—এক কথায়, ঐ ক্ষুদ্র সময়টির মধ্যে সে তাহার যতকিছু বাসনা চরিতার্থ করিয়াছে। ইহাই সেই 'হৃদয়-যমুনা'য় অবগাহন-সন্তরণ, গাগরি-ভরণ প্রভৃতির রসবিলাস। কিন্তু ইহার পর? কমল-লতা শ্রীকান্তকে বলিয়াছিল—"তুমি তাকে ভুলবে, কিন্তু সে তোমাকে না পারবে ভুলতে, না শুকোবে কখনো তার চোখের জলের ধারা।" তবে কি ভালবাসার নাম দুঃখ পাওয়া? তাহার উত্তরে কমল-লতা বলিয়াছিল—"দুঃখ তো বলিনি গোঁসাই, বলেছি, চোখের জলের কথা।" এ কথার ব্যাখ্যা আমি পূর্ব্বে সবিস্তারে করিয়াছি।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময়টির বর্ণনায় রাজলক্ষ্মীর যে পূর্ণপ্রস্ফুটিত প্রণয়িনী ও গেহিনী-রূপ শরৎচন্দ্র চিত্রিত করিয়াছেন, তেমনটি বোধহয় সমগ্র বাংলাসাহিত্যে আর কোথাও নাই; বঙ্গনারীর এ রূপ আর কেহ আঁকিতে পারেন নাই; বঙ্কিমচন্দ্রের চিত্রাবলীর সেই উজ্জ্বল বর্ণ-বিলাসের পর, একমাত্র শরৎচন্দ্রই তাহাতে সূক্ষ্মরেখাঙ্কন করিয়াছেন; বলাবাহুল্য, নারী-চরিত্র-সৃষ্টিতে, আর একদিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের কবিশক্তি অতুলনীয়। আমি বলিতেছিলাম, ঐ সকলের অন্তরালে রাজলক্ষ্মীর সেই চিরবিরহিনী-রূপই উঁকি দিতেছে।—

"তুমি বলো আমাকে ফেলে কখনো যাবে না?······এই বলিয়া—আমার হাতটাকে খুব জোর করিয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল।" [পৃঃ ১৫৮]

"এ জীবনে তোমাকে অসুখী করবো না আমি কখনো। বলিয়াই সে কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া পড়িল। চক্ষু নিমীলিত, শ্বাস-প্রশ্বাস থামিয়া আসিতেছে—সহসা সে যেন কোথায় কতদূরেই না সরিয়া গেল!

ভয় পাইয়া একটা নাড়া দিয়া বলিলাম—ওকি? রাজলক্ষ্মী চোখ মেলিয়া চাহিল, একটু হাসিয়া কহিল, কৈ না,—কিছু তো নয়।" [পৃঃ ১৬১]

এই দৃশ্যটি পূর্ব্বে আর এক প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছি—এখানে এই প্রসঙ্গেও উহা বড়ই অর্থপূর্ণ; তাহার প্রাণের সেই আকাঙ্ক্ষা-পূরণ, শ্রীকান্তের সহিত একত্র বাস—যে কারণেই হোক ঘটিবে না, ইহা তাহার অন্তরাত্মা জানে; এই ক্ষণিক মিলন-সুখের পশ্চাতে বিরহ-রজনীর অন্তহীন অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সে

অন্তরের অন্তরে সর্ব্বদা তাহাই অনুভব করিতেছে। তাই এ মিলন বিরহের মিলন,—বিরহ সত্ত্বেও মিলন! এ সেই "রতি হ'ল রাধা চিরবিরহিনী" নয়—চিরবিরহিনী রাধাই রতির অভিনয় করিতেছে! বাহিরের বাস্তব প্রতিপদে যে মিলনের মিথ্যাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে, ভিতরে একই কালে সেই মিথ্যাকে স্বীকার ও অস্বীকার করার এই যে রসাবস্থা—ইহা একরূপ 'ভাব-সম্মিলন'ই বটে; কিন্তু তাহারও এই 'বিচ্ছিত্তি' বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রে কোথাও বর্ণিত হইয়াছে কিনা জানি না, রাজলক্ষ্মী বৈষ্ণবী না হইয়াও তাহার প্রাণের সহজ সাধনায় প্রেমের ঐ পদবী লাভ করিয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর জীবনব্যাপী সাধনার ঐ সিদ্ধিলাভ কিরূপ তাহা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিলাম, পরে আরও বলিব। সেই সাধনায় যে অন্তর-সংগ্রাম আমরা দেখিয়াছি তাহা নারী-জীবন, তথা মানব-জীবনের ক্ষেত্রসীমায় আবদ্ধ আছে, সেই কারণেই তাহার একটা বিশেষ মূল্যও আছে। তাহাকে এক অর্থে সেই বৈষ্ণব-সাধনাও বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু, পূর্ব্বে বলিয়াছি—তাহা আত্ম-বিলোপের পরম সুখ নয়, আত্মচেতনারই অসীম স্ফূর্ত্তি। বৈষ্ণবের যুগল-প্রেমের সাধনায় পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ বা আত্ম-বিসর্জ্জন আছে, তাহাতে যুগলের অপরটি একটি ভাব-বিগ্রহরূপেই পরম-উৎকণ্ঠা নিবারণ করেন। সে সাধনার সবটাই ভাব-জীবনের, তাহাতে একদিকে যেমন ভাবের একনিষ্ঠা—বহিঃসংসার হইতে মনকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার শক্তিই প্রেমের প্রধান সাধনা, তেমনই, সেই কারণেই, অপরদিকে একটা বড় সুবিধাও আছে, সংসার ও সমাজ-জীবনের সহস্র আঘাত সহস্র বাধাকে জয় করিতে হয় না। রাজলক্ষ্মীর সাধনায় সেই বাধাগুলাকে জয় করিতে হইয়াছে। প্রথম-দিকে সে-ও একটা ভাব-বিগ্রহ গড়িয়া লইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সে একনিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই—সমাজ ও সংসার দুই-এরই সেবা করিতে হইয়াছে; অবশেষে হৃদয়ের বহির্দ্বার খুলিয়া রাখিয়া, কালে-অকালে অনাহুত অতিথিকে অভ্যর্থনা করিয়া পাদ্যার্ঘ্য দিতেও হইয়াছে। সেই পাদ্যার্ঘ্য-রচনা যে করিতেই হয়, নহিলে সারাজীবন ভরিয়া আক্ষেপের অন্ত থাকে না—

> "রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি',
> বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি';
> ত্রিযামা যামিনী একা বসে' গান গাহি—
> হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি!"

—পথিক হতাশ হউক, বা না হউক! সেই অপর প্রেমের বিগ্রহ ভাব-জগতের বিগ্রহ নয় বলিয়াই ঐ সাধনাকে সংগ্রাম বলাই সঙ্গত। এখানেও সেই পুরুষ

উদাসীন বিগ্রহবৎ বটে, কিন্তু যেহেতু সে একটা রক্ত-মাংসের বিগ্রহ, তাই তাহাকে লইয়া ভাবরসের সাধনায় প্রেম-পিপাসা নিবৃত্তি করা সহজ নয়। রাজলক্ষ্মী শেষপর্য্যন্ত তাহাতেও টলে নাই, সে ঐ অসাড় লৌহখণ্ডের চৌম্বক শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার কঠিন স্পর্শের দারুণ বেদনা সহ্য করিয়াছে, পরে নিজেরই প্রেমের বিশুদ্ধ স্বর্ণরসে সেই লৌহখণ্ডকে মণ্ডিত করিয়া তাহার সান্নিধ্যকে আর ভয় করিল না; কারণ, পূর্ব্বের সেই আকর্ষণ-পীড়া আর নাই, তাহারই দেওয়া স্বর্বণ-হাস্তে ঐ লৌহখণ্ডই তাহার পিপাসাকে মধুর করিয়া তুলিল। এমনই করিয়া সে আপনার মধ্যে পিপাসা ও পানীয়ের সেই ভাব-সম্মিলন ঘটাইয়াছে—তাহার অন্তরে সেই ভাব-সম্মিলনের এক অপূর্ব্ব মাধুরী-স্রোত বহিতেছে। সে শ্রীকান্তের প্রেমাভিনয় যেমন সত্য মনে করিয়া পুলক-বিহ্বল হইতেছে, তেমনই তাহার চির-অতৃপ্ত ক্ষুধা মিটাইয়া লইতেও সঙ্কুচিত হইতেছে না। ইহার কারণ, তাহার প্রেমের সেই আত্মজয়, তাহার অন্তরের সেই ভাব-সম্মিলন-সুখ।

নহিলে, রাজলক্ষ্মীকে আমরা যেমন চিনিয়াছি তাহাতে যদি ভুল না হইয়া থাকে, তবে একথা কখনো বিস্মৃত হইতে পারিব না যে, সে শ্রীকান্ত সম্বন্ধে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন আশা পোষণ করে নাই—তাহার নিজের পিপাসাকেই সত্য মনে করিয়াছে। তাই মুরারিপুরের আখড়ায় সে যখন নিজেই নিজের বধূ-বাসর বা ফুলশয্যা সাজাইয়া তাহার সেই একক-পরিণীত হৃদয়বল্লভকে নব-পরিণয়ের স্বয়ম্বর-মালা গানের সুরে গাঁথিয়া পরাইয়া দিল—এবং তাহার হৃদয়-সাগরের সেই পূর্ণিমা-উচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ও প্লাবিত করিয়া দিল, তখন তাহার মধ্যেও—রাজলক্ষ্মীর ঐ অতবড় আনন্দোৎসবের মধ্যেও, একটা অতিনিভৃত-নীরব বিয়োগ-রাগিণী আমাদের প্রাণ-কর্ণে অনুরণিত হইতে লাগিল। সে যেন একটা মায়া-নাট্য —রাজলক্ষ্মী যেন ঐ এক মুহূর্ত্তের জন্য সেই বাসর সাজাইয়াছে; এ লগ্ন আর আসিবে না, সে যেন ঐ একটিবার সেই মধুর মোহের রস আকণ্ঠ পান করিয়া লইবে—তারপর চির-বিরহের চির-মিলন তো আছেই। জীবনের যে কণ্টকময় দুর্গম পথ বাহিয়া সে তাহার ঐ প্রেমের অভিসার করিয়াছিল, আজ সেই দীর্ঘপথের দিক্‌ভ্রান্তি সে বুঝিয়াছে; তবু সেই ভ্রান্তিও কি মধুর! তাহার সেই ব্যথাকে—'দুতর পন্থা'র সেই দুঃখ-স্মৃতিকে—সে যেন প্রাণের গীতরসে গলাইয়া নিঃশেষে ঢালিয়া দিল। ঐ এক সাধনা, ঐ সঙ্গীত-কলাই যে জীবিকার ছলে তাহার নিঃসঙ্গ আত্মারও উপজীব্য হইয়াছিল! তাই আজ সেই সঙ্গীতকেই ব্যথার বাহন করিয়া—যেন সেই দুইয়ের পূর্ণমিলন ঘটাইয়া—সে যখন গাহিতে লাগিল—

একে পদপঙ্কজ পঙ্কবিভূষিত, কণ্টকে জর-জর ভেল।
তুয়া দরশন আশে কছু নাহি জানলু চিরদুখ অব দূরে গেল॥
তুহারি মুরলী যব শ্রবণে প্রবেশল ছোড়নু গৃহ-সুখ-আশ।
পন্থক দুখ তৃণহুঁ করি না গণনু, কহতঁহি গোবিন্দ দাস॥

[চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ১৭৫]

—তখন মনে হয়, ঐ ক্ষণে তাহার বাইজী-জীবনেরও পূর্ণ-পরিসমাপ্তি হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকল দুঃখের অবসান হইল। কারণ, ইহার পর শ্রীকান্তকে হারাইলেও আর দুঃখ নাই, সে এতদিনে নিজ হৃদয়ের মধ্যে অমৃতের উৎস পাইয়াছে—ঐ গানের কথাগুলিই নয়, তাহার কণ্ঠস্বরের ঐ দিব্যোন্মাদনাই তাহার প্রমাণ,—"She has drunk of the honey-dew of Heaven!" রাজলক্ষ্মীর জীবনে ঐ লগ্ন কেমন করিয়া কোন পথে আসিয়াছে, সেই নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট পথকেই কিরূপ প্রাণান্ত সংগ্রামে সে অতিক্রম করিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সঙ্গীত শেষ হইলেও যেমন তাহার রেশ থাকে, মোহ অবসান হইলেও যেমন একটা স্বপ্ন-স্মৃতির জের থাকে, তেমনই কামনার অন্ত ঘটিলেও তাহা একটা বাসনা-রূপে কিছুকাল থাকিয়া যায়, তখন তাহাতে সেই বিষ আর থাকে না, ব্যথাও সুখের মত হইয়া উঠে। আমরা রাজলক্ষ্মীর প্রাণের সেই সৌরভাকুল রসাবেশ—দুঃখের সেই দিব্যানুভূতির পরিচয় পাইয়াছি; সে মৃত্যুর অমৃত-রূপ দেখিতেছে, প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে—সে যে পাইয়াছে! সে তখন এমন কথাও এমন সুরে বলিতে পারে—

"কিন্তু এবার যখন সত্যিসত্যিই মরবো সেদিন, কিন্তু দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলো। বোলো পৃথিবীতে অনেক বর-বধূ অনেক মালাবদল করেছে, তাদের প্রেমে জগৎ পবিত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু তোমার কুলটা রাজলক্ষ্মী তার ন' বছর বয়সের সেই কিশোর বরটিকে একমনে যত ভালবেসেছে সংসারে তত ভালো কেউ কোনদিন কাউকে বাসেনি। আমার কানে-কানে তখন বল্‌বে বল এই কথাগুলি? আমি মরেও শুনতে পাবো।" [ঐ, পৃঃ ১৯৯-২০০]

—এ তাহার প্রেমের ব্যর্থতার হাহাশ্বাস, না পূর্ণ-মহিমার জয়-জয়ন্তী! ইহার পর আর একদিনের কথা—পূর্ব্বে আর এক প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছি, বাংলা-গদ্যের এমন লিরিক-মূর্চ্ছনা কাব্য-সাহিত্যেও বিরল; আবার প্রেমের ও প্রাণের এমন মর্ম্মস্পর্শী আত্মনিবেদন এই চতুর্থ পর্ব্বের মত এই উপন্যাসে আর কোথাও উদ্বেল হইয়া উঠে নাই; বস্তুত, 'শ্রীকান্তের' এই চতুর্থ পর্ব্বে শরৎচন্দ্র একাধারে উৎকৃষ্ট লিরিক কবি ও ঔপন্যাসিকরূপে এক অনন্যসাধারণ গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর এই কথাগুলিও হৃদয়ের রসমূর্চ্ছনায় প্রেমের নক্ষত্রলোক স্পর্শ করিয়াছে। শ্রীকান্তের সাধ, সে মুরারিপুরের আখড়াতেই তাহার শেষ জীবন কাটাইবে—কথা

হইতেছে রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে, ইহার অর্থ বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। সে কল্পনা করিতেছে—সেই আখড়ায় মৃত্যু হইলে, বকুলতলায় যে স্থানটিতে তাহার সমাধি হইবে, তাহার নিকটে কমল-লতা ঘুরিয়া বেড়াইবে; সে তাহার উপরে প্রতিদিন ফুল সাজাইয়া দিবে, আর যদি পরিচিত কেহ (অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী) পথ ভুলিয়া সেখানে আসে, তবে কমল-লতা তাহাকে সেই সমাধি দেখাইয়া বলিবে—"ঐখানে থাকে আমাদের নতুন গোঁসাই।"

এ কথোপকথন হইতেছে—রাজলক্ষ্মী সেই আখড়ায় যে উৎসব করিয়াছিল তাহার পরে।—

"রাজলক্ষ্মীর চোখ জলে ভরিয়া আসিল, জিজ্ঞাসা করিল, আর সেই পরিচিত লোকটি কি করবে তখন?

বলিলাম, সে জানিনে। হয়তো অনেক টাকা খরচ করে' মন্দির বানিয়ে দিয়ে যাবে।—

রাজলক্ষ্মী কহিল, না, হোল না। সে বকুলতলা ছেড়ে আর যাবে না। গাছের ডালে ডালে করবে পাখীরা কলরব, গাইবে গান, করবে লড়াই—কত ঝরিয়ে ফেলবে শুক্‌নো পাতা, শুক্‌নো ডাল, সে সব মুক্ত করার কাজ থাকবে তার। সকালে নিকিয়ে মুছিয়ে দেবে ফুলের মালা গেঁথে, রাত্রে সবাই ঘুমোলে শোনাবে তাঁকে বৈষ্ণব-কবিদের গান; তারপর সময় হ'লে ডেকে বল্‌বে, কমল-লতা দিদি, আমাদের এক ক'রে দিও সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে' চেনা না যায়। আর এই নাও টাকা, দিও মন্দির গড়িয়ে, কোরো রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা; কিন্তু লিখো না কোন নাম, রেখোনা কোন চিহ্ন,—কেউ না জানে, কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো।"

[ঐ, পৃঃ ২০৫]

—এই যে কাব্য মুখে মুখে রচনা করিল সে, ইহার ভাবের পূর্ণতায় কোথাও একটু অভাবের সুর আছে? কোথাও একটু খেদ, একটু অভিমান, একটু অনুশোচনা আছে? শ্রীকান্তের কথাগুলিতে যে ইঙ্গিতই থাকুক, রাজলক্ষ্মীর তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই, সে যেন তাহা গ্রাহ্যও করে না। ইহার কারণ কি? সে আপনার পথেই আপন তীর্থে পৌছিয়াছে, তাহার প্রাণে যে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সে প্রদীপের আলোয় কোথাও ছায়া পড়ে না। সেই অসীম প্রেম-সাগরে কোথাও আর এতটুকু কল্লোল নাই, সকল কামনা তাহাতে মিশিয়া লয় হইয়াছে। সেই সমুদ্রকে কিছুই আর ক্ষুব্ধ করিতে পারে না—যেন সকল কামনা বাসনা—হৃদয়ের সুগভীর আর্তিও—সেই নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের উপরে নিঝুম রাত্রির দিগন্তবিসর্পী জ্যোৎস্নার মত ঘুমাইয়া রহিয়াছে; অথবা—

"বোস্তান্ আর গুলেস্তানের রূপটি ধরেছে সব হায়াত্,
সাপ-শয়তান বুলবুল হ'য়ে গাহিছে সারাটি জ্যোৎস্না-রাত।"

[বোস্তান্ আর গুলেস্তান্—ফল ও ফুলের বাগান; হায়াত্—জীবন]

ইহার পর, রাজলক্ষ্মীর প্রেম-পরিণাম বা তাহার জীবন-শেষের শেষ অধ্যায় যেমনই হোক, তাহাতে কিছু আসে যায় কি? আমি ইহাকেই রাজলক্ষ্মী-জীবনের পরিসমাপ্তি মনে করি; কাহিনীর বাকি অংশ তাহার সেই পূর্ব্ব-জীবনের একটা জের মাত্র, সে পরিণাম তাহার জীব-জীবনের পরিণাম—প্রেম-জীবনের নয়, দেহ যতদিন থাকিবে ততদিন 'কর্ম্ম' ঘুচিবে না যে। আমি মুরারিপুরের আখড়ায় সেই যে মিলনোৎসবের একটি পরম লগ্নের কথা বলিয়াছি তাহারই ভাষ্য-স্বরূপ রাজলক্ষ্মীর নিজমুখের ঐ আত্ম-নিবেদন-বাণী, তাহার Last Testament উদ্ধৃত করিলাম। সে বলিতেছে, "আমাদের এক করে' দিও সমাধি, যেন ফাঁক না থাকে, যেন আলাদা বলে' চেনা না যায়"। তাহার অর্থ, সেই মিলন যেন পূর্ণ-মিলন হয়, সে সমাধি পূর্ণ-মিলনের সমাধি—ফাঁক যে সত্যই আর নাই। তারপর, "লিখো না কোন নাম, রেখো না কোন চিহ্ন—কেউ না জানে, কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো"। ইহাতেও তাহার সেই দুঃখময়-প্রেম-জীবনের জন্য কোন খেদ, কোন অভিমান নাই; ইহা সেই পরিপূর্ণতার—সেই সর্ব্ব-অভাব-মোচনের, কিছু না-চাওয়ার অকুণ্ঠিত উক্তি। সেই অনন্ত বাসর-রাত্রির মিলন-মন্দিরে আর কেহ উঁকি দিবে না—সমাজ-সংসারের কোন দাবি আর থাকিবে না। কি প্রয়োজনই বা তাহাদের? "কেবা, এরা কোথা থেকেই বা এলো?"—এ প্রশ্নের উত্তর সেই এক মহা-প্রেমই দিতে পারে—যে-প্রেম এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া নিজেই তাহার অণু-পরমাণুতে নিত্য-প্রবাহিত হইতেছে। সংসার-সমাজের দেনা-পাওনার হাট-বাজার সে পরিচয় রাখে না—পায়ও না, তাই এমন প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। রাজলক্ষ্মী তাহার কথা তাহার মত করিয়াই বলিয়াছে, আমরা আর একটু বেশি বলিব। ঐ যে প্রেম—মানুষের সকল বড় প্রেমই—কোনরূপ আত্মঘোষণা, কোন পরিচয়, কোন স্মৃতিরক্ষার প্রয়োজনই মানে না; জগৎময় তাহার যে লীলা চলিতেছে, সে তো সেই একেরই লীলা—পাত্রভেদ বই তো নয়। সেই প্রেম লীলার জন্য মানুষকে, ব্যক্তিকে চাই—নহিলে তাহার রস-রূপ অগোচর হইয়া থাকে; তথাপি তাহা আপনাতে আপ ধন্য, আপনাতেই আপনি সার্থক। একজন আধুনিক ইংরেজ লেখক এই কথাটি আর এক ভঙ্গিতে বড় সুন্দর, বড় গভীর করিয়া বলিয়াছেন—

"But the love will have been enough; all these impulses of love return to the love that made them. Even memory is not necessary for love. There is a land of the living and a land of the dead, and the only bridge is love, the only survival, the only meaning."

—*THORNTON WILDER.*

আমি বলিয়াছি, রাজলক্ষ্মীর জীবন-মরণ ঐখানেই এক হইয়া গিয়াছে, ইহার পরে যে মোহ অবশিষ্ট আছে তাহাকে তাহার পূর্ব্ব-জীবনের একটা জের বলা যাইতে পারে—সে একটা ছায়া, পরে সে ছায়াটারও মৃত্যু হইয়াছে। এ নাটক যে গভীরতর অর্থে মিলনান্ত—তাহা আমি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, কেবল সেই ছায়াটার মৃত্যুই ইহাকে বিয়োগান্ত করিয়াছে; ঐ ছায়ার মায়া সহজে ঘুচে না—এবং বিয়োগান্ত না হইলে আমাদেরও তৃপ্তি হয় না। নতুবা, রাজলক্ষ্মী ঐ যে বলিয়াছে, "কেউ না জানে, কে-ই বা এরা, কোথা থেকেই বা এলো", উহার পরে সত্যই আর কোন কথা নাই। কিন্তু তবু আমাকে আরও কিছু দূর চলিতে হইবে, নহিলে পাঠক-পাঠিকারা খুসী হইবেন না।

উপসংহার

(১)

রাজলক্ষ্মী ও কমল-লতা

"The saint sustained it, but the woman died,"

—*ALEXANDER POPE.*

এইবার আমি রাজলক্ষ্মীর সেই জীবন-নাটক নয়—তাহার বহির্জ্জীবনের কাহিনীর বাকি অংশ ও শ্রীকান্তের আত্মকাহিনীর শেষটুকু পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে একত্রে পাঠ করিব; কিন্তু সাধারণভাবে আর একবার যে কয়েকটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিব, তাহাতে আমার দৃষ্টিভঙ্গি বা বিচারপদ্ধতি একটু স্বতন্ত্র হওয়া স্বাভাবিক; তথাপি আমি পূর্ব্বের তথ্য ও তত্ত্বগুলির সূত্র যতদূর সাধ্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করিব।

সেই গানের আসর শেষ হইলে, এবং তাহাতে রাজলক্ষ্মীর দেহ ও মন-প্রাণের সেই পরিপূর্ণ দীপ্তি শ্রীকান্তের চক্ষু ঝলসিয়া দিবার পর, রাজলক্ষ্মীর সহিত শ্রীকান্তের এইরূপ প্রেমালাপ চলিতেছে—কমল-লতা তাহাদের জন্য যে নব-মিলনমালা গাঁথিয়া আনিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে কথা হইতেছে—

"তাহাকে অন্ধকারে একটু আড়ালে ডাকিয়া আনিয়া বলিলাম, ও মালা রেখে দাও; এখানে নয়; বাড়ী ফিরে গিয়ে তোমার হাত থেকে পরবো।

রাজলক্ষ্মী বলিল, এখানে ঠাকুরবাড়ীতে প'রে ফেললে আর খুলতে পারবে না—এই বুঝি ভয়?

—না, ভয় আর নেই, সে ঘুচেছে। সমস্ত পৃথিবী আমার থাকলে তোমাকে আজ তা' দান করতাম।

—উঃ, কি দাতা! সে তো তোমারি থাকতো গো।

—বলিলাম, তোমাকে আজ অসংখ্য ধন্যবাদ।

—কেন বলো ত?

—বলিলাম, আজ মনে হচ্ছে তোমার আমি যোগ্য নই। রূপে, গুণে, রসে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, স্নেহে, সৌজন্যে পরিপূর্ণ যে ধন আমি অযাচিত পেয়েছি সংসারে তার তুলনা নেই। নিজের অযোগ্যতায় লজ্জা পাই, লক্ষ্মী,—তোমার কাছে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ।" [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ১৭৬]

রাজলক্ষ্মী কমল-লতা নয়; তাহার জীবন যতই সার্থক হউক না কেন, আপনাতে আপনি সে যতই চরিতার্থ হউক না কেন, তবু সে দেহের মমতা ত্যাগ করিতে পারে না; সেই মমতার কান্নাই জগতের সব কিছুকে সুন্দর করিয়া তোলে,

কাঁদিবে বলিয়াই তো মানুষ সুন্দরের আরাধনা করে। তাই সে শ্রীকান্তের ঐ উচ্ছ্বাসের মর্ম্ম বুঝিলেও, তাহা না বুঝিবার চেষ্টাই করিবে। প্রেমের এই যে ছলা-কলা, ইহার কি অন্ত আছে ? ইহাই যদি না থাকিবে—যদি মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়াই পরিহার করিতে হয়, তবে এতবড় এই মিথ্যা—এই বিরাট সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল ? জ্ঞানী ইহাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেন, কিন্তু প্রেমিক জানে, ইহার মত প্রয়োজনীয় আর কিছুই নাই ; ঐ মিথ্যাই পরমসুন্দর ; সত্যকে যাহারা ভালবাসিয়াছে—'জানিয়া' ব্রহ্মানন্দ নয়, 'দেখিয়া' মুগ্ধ হইয়াছে—তাহারা ঐ মিথ্যাকেই সত্যের সুধাহাস্যজ্যোতি বলিয়া আশ্বস্ত হয়। কিন্তু সে কথা থাক—বারবার ঐ এক কথা বেরসিকের ভাল লাগিবে না। রাজলক্ষ্মীর আর কোন ভাবনা নাই বলিয়াছি, সে ঐ মিথ্যার খেলায় ভয় পাইল না, বরং নির্ভয়ে নেশাটাকে একটু গাঢ় হইতে দিল। আজ তাহার সারাজীবনের সেই শবরীর প্রতীক্ষা শেষ হইয়াছে ; যে জীবন সে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাহার সকল গ্লানি, সকল পঙ্ক ধৌত করিবার প্রয়োজনও তাহার নিজের আর নাই,—সে সকল সত্ত্বেও তাহার প্রেমের শুচিতা ঘোষণা করিতে তাহার আর কিছুমাত্র সঙ্কোচ নাই। মুরারিপুর হইতে ফিরিবার দিন কমল-লতা যখন একখানি থালায় করিয়া 'ঠাকুরের প্রসাদী চন্দন ও ফুলের মালা' আনিয়া তাহাদের ঐ যুগল-প্রেমকে যেন দেবতার আশীর্ব্বাদ-যুক্ত করিয়া একটা পবিত্র আধ্যাত্মিক-মিলনে উন্নীত করিতে চাহিল, তখন কমল-লতারই হার হইল—

"কমল-লতা বলিল, সেই ঠাকুরের মালা-চন্দন বড় গোঁসাই দিয়েছেন পাঠিয়ে, আজ ফিরে যাবার দিন তোমরা দু'জনে দু'জনকে পরিয়ে দাও।

রাজলক্ষ্মী হাতজোড় করিয়া বলিল, ওঁর ইচ্ছে উনি জানেন, কিন্তু আমাকে ও আদেশ করো না। আমার ছেলেবেলার সেই রাঙা-মালা আজও চোখ বুজলে ওঁর সেই কিশোর গলায় দুলচে দেখতে পাই। ঠাকুরের দেওয়া আমার সে-ই মালাই চিরদিন থাক্ দিদি।" [ঐ, পৃঃ ১৮৯]

এইখানে প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা বলিবার আছে। কমল-লতার ঐ কাজটিকে আমরা আমাদের প্রাকৃতজন-সুলভ সংস্কারে যেন ভুল না বুঝি,—শ্রীকান্তের প্রতি তাহার সেই ভালবাসা সে যে সম্পূর্ণ ফিরাইয়া লইয়াছে, সে যে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, এমনই একটা ধারণা আমাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণব-সাধনার তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁহারা এখানে কমল-লতাকে ললিতা-সখীর পদবীতে—প্রেমের সর্ব্বোচ্চ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। তবু রাজলক্ষ্মীর ঐ কথায় কমল-লতাকেও হার মানিতে হইল। রাজলক্ষ্মী ঐ মালা ফিরাইয়া দিল ; তার কারণ, তাহার ঠাকুর অনেক পূর্ব্বেই যে মালা নিজে তাহার

হাত দিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সত্যকার এবং পবিত্র মালা আর কি হইতে পারে?—তাহার সেই মালা যে আরও বড়! শ্রীকান্তই বা সেই মালার কি করিতে পারে? এ কত বড় অহঙ্কার! আজ সে তাহার সেই প্রেমের গর্ব্বে এমনই করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল; তাহার প্রেম যে কত বড়, একথা সে কিছুতেই ভুলিবে না, সে প্রেমের এতটুকু মর্য্যাদাহানি হইতে দিবে না। আর কিছুতে না হোক—শ্রীকান্তও রাজলক্ষ্মীকে এটুকু চিনিয়াছে, সে-ও বারবার ইহা স্বীকার করিয়াছে—

"এই জোরই তাহার চিরদিনের সত্য পরিচয়। জীবনে এ আর তাহার ঘুচিল না—এ হইতে কখনো কেহ তাহার হাতে অব্যাহতি পাইল না।"

আবার,—

"কি জানি কে উহার জন্মকালে সহস্র নামের মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া তাহার 'রাজলক্ষ্মী' নাম দিয়াছিল।" [পৃঃ ১৫৪]

আমিও রাজলক্ষ্মীর হৃদয়-কাহিনীকে যে পথেই অনুসরণ করি না—প্রেমের যত তত্ত্বই টানিয়া আনি না কেন, ঐ একটিতে ঠেকিয়া সব বানচাল হইয়া যায়—কিছুতেই তাহার ঐ 'জোর', ঐ অহং, ঐ আমি-টার সদর্থ করিতে পারি না। তার কারণ, প্রেম তো একটা দার্শনিক বিচার বা শাস্ত্রীয় বিধি-নিয়মের অধীন নয়; যখনই সেইরূপ কিছু বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, আমরা ব্যক্তিকে ছাড়িয়া তত্ত্বকে আশ্রয় করিতেছি। তত্ত্ব যদি সত্যও হয়, তবে জীবনের—নর-নারী-জীবনের—অনন্ত বৈচিত্র্যে তাহার যে সব ব্যতিক্রম ঘটে, সেগুলাও সেই এক সত্যের মহিমাই ঘোষণা করিবে; ব্যক্তি-চরিত্রে যদি কোনরূপ স্ব-বিরোধিতা দেখিতে পাই তাহাতে হতাশ হইলে চলিবে না, কারণ, ঐরূপ ব্যতিক্রমই ব্যক্তি-চরিত্রের নিদান। তথাপি তত্ত্বকে আমরা ছাড়িব না, ছাড়িলে আলোচনার সূত্রই মিলিবে না; ঐ ব্যতিক্রমগুলাকেও স্বীকার করিব—তত্ত্বকে সম্মুখে রাখিয়াই সেই নির্ব্বিশেষের বিশেষ রূপেই উহাকে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিব, তাহাতে তত্ত্বটাই আরও রহস্যময় হইয়া উঠিবে। রাজলক্ষ্মী-চরিত্রের একটা দিক—উহার ঐ 'আমি'-গ্রন্থিটা—তত্ত্ব-অনুসারে যদি ঠিকও হয়, তথাপি তাহার আদি-অন্ত মিলাইয়া একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খাড়া করা যাইবে না, যদি যাইত, তবে তাহা একটা সত্যকার চরিত্র হইত না, একটা নূতনতর 'সৃষ্টি' হইত না,—লেখকের মন-গড়া একটা কাব্য-পুত্তলিকা হইত মাত্র। এই কথা আমরা ভুলিয়া যাই। প্রত্যেক বড় কবির সৃষ্ট চরিত্র এইজন্যই এক একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তেমনটি পূর্ব্বে ছিল না—সে যেন

"an addition to creation", অর্থাৎ যাহা আছে তাহাতে আর একটি বাড়িল। মহাকবি শেকস্‌পীয়ারের সৃষ্ট চরিত্রগুলির কত ব্যাখ্যাই হইয়াছে, এখনও হইতেছে; এক এক অভিনেতা তাহাদের এক একটা নূতন রূপ উদ্ভাবন করিতেছেন, অর্থাৎ নূতনতর ব্যাখ্যা করিতেছেন। প্রত্যেকের ব্যাখ্যা সেই সেই দিক দিয়া সুসঙ্গত বটে, তথাপি মনে হয়, এই সুসঙ্গতির দ্বারা সেই চরিত্রগুলির রহস্যময়তা খণ্ডিত হইয়াছে; অর্থাৎ খুব সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করিবার প্রয়াসে তাহাদের ব্যক্তিত্বকেও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। ঐ ব্যাখ্যাগুলি আর কিছুই নয়—এক এক রসিক-চিত্তে তাহার যে রূপ প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই প্রতিরূপ। সেইগুলিকে আমরা যদি একত্র করিয়া দেখি, তবে কি মনে হয়? তাহাদের সমষ্টিগত একটা রূপ ফুটিয়া উঠে না নিশ্চয়, বড় জোর রহস্যটাই ঘনীভূত হইয়া উঠে। তথাপি, নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টিতে যদি বা কতকগুলি সুস্পষ্ট রেখা ফুটিয়া ওঠে, এইরূপ লিরিক হৃদয়-কাহিনীতে যে সব গূঢ়তর রশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত হয়, তাহার দ্যুতি বড়ই চঞ্চল, সেগুলিকে আমাদের মানসপটে একটা স্থির শিখারূপে ধরিতে পারা অসম্ভব। তাই এই আলোচনায় আমি যতই তত্ত্বের আশ্রয় লই না কেন,—রাজলক্ষ্মী বা কমল-লতার মত এমন দুইটি অসাধারণ নারী-চরিত্রের পরিচয় দিবার জন্য যে সকল দৃশ্য বা ঘটনা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে একটা সঙ্গতি-সূত্র থাকিলেও, আমি কোথাও কিছুকে প্রতিপাদ্য করি নাই।

রাজলক্ষ্মীর প্রেমে যতখানি আত্ম-সচেতনতাই থাকুক, তাহার দিক দিয়া সেই প্রেমের পূর্ণাভিষেক হইয়া গিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; সে যে বলিয়াছিল—

"আমার সমস্ত মনটি এখন আনন্দে ডুবে আছে, সবসময়েই মনে হয়, এ জীবনে সমস্ত পেয়েছি, আর আমার কিচ্ছু চাই নে। এ যদি ভগবানের নির্দেশ না হয় তো আর কি হবে বলো ত? প্রতিদিন পুজো করে ঠাকুরের চরণে নিজের জন্যে আর কিছু কামনা করিনে, কেবল প্রার্থনা করি, এমনি আনন্দ যেন সংসারে সবাই পায়।" [পৃঃ ২০৭-২০৮]

বিশেষ করিয়া ঐ শেষের কথাটি—উহার মত প্রমাণ আর নাই। কিন্তু তাহাতেও ঐ যে আমিটা রহিয়াছে তাহা কি প্রেমের সেই পূর্ণতার একটা প্রতিবন্ধক? এই প্রশ্নই বারবার না উঠিয়া পারে না—এইখানেই যেন আমাদের সেই তত্ত্বটার সঙ্গে একটা বিরোধ রহিয়াছে। আসল কথা, ঐ 'আমি'টা 'আমি' হইলেও উহা প্রেমের 'আমি', ঐটুকু আবরণ না থাকিলে মানুষের জীবনে আর দেবতার (Angel) জীবনে কোন প্রভেদ থাকে না। গহর যখন শ্রীকান্তকে তাহার প্রেম-সুখের সাক্ষী হইতে দিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন সে নিজের

'আমি'টাকে পরের মধ্যে প্রকাশ করিয়া এ আনন্দ উপভোগ করিতে চাহিয়াছিল—সে দেখিয়াই সুখী হইবে; সেখানেও এক প্রকার 'আমি'র পিপাসা ছিল; সে নিজে যাহা পায় নাই, পরের জন্য তাহা কামনা করিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী নিজে তাহা পাইয়া এত সুখী হইয়াছে যে, একা তত সুখভোগ করিতে সে যেন লজ্জা পায়। এ দুইয়ের মধ্যে বড় কে—বলা কঠিন; গহর সেই প্রেম-সুখকে এত বড় মনে করে যে, সে যেন তাহা পাইবার যোগ্য নয়—আর কেহ যদি তাহার চেয়ে যোগ্য হয়, তবে তাহার সেই সৌভাগ্য দর্শন করিয়াই সে ধন্য হইবে; সে প্রেমকে এত বড় করিয়া দেখিয়াছে, অর্থাৎ প্রাণে অনুভব করিয়াছে যে, সেই প্রেমের নিকটে আত্ম-নিবেদন করিয়াই সে পরমার্থ লাভ করিয়াছে,—সে প্রেমিকমাত্রেরই সেবা করিয়া ধন্য। ইহাকেও একরূপ প্রেমের আত্মবিলোপ বলা যাইতে পারে, প্রেমিক গহর অতি উচ্চস্তরের সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সে-ও পুরুষ, সে নারী নয়; এইরূপ বৈরাগ্যযুক্ত প্রেম পুরুষেরই আধ্যাত্মিক পিপাসার উপযুক্ত—এই যে আত্মত্যাগ ইহাতে আত্মারই একটা পরম পরিতৃপ্তি আছে। পুরুষের 'আমি' ও নারীর 'আমি'তে ইহাই প্রভেদ,—একজন ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করে, আরেক জন ভোগকেই ত্যাগের আনন্দে মহনীয় করিতে চায়, তাই আমিটাকে তার বড় প্রয়োজন; রাজলক্ষ্মীর সেই আমি চরিতার্থ হইয়াছে, এখন সে সেই আনন্দ সকলকে বিলাইতে চায়।

বৈষ্ণবী কমল-লতা ঐ 'আমি'টাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন করিতে চায়, সেই সাধনাই সে করিতেছে। সে কিছুর উপরে, কাহারও উপরে—সাক্ষাৎ বা গৌণভাবে কোন অধিকার, বা ঐ 'আমি'র লোভ রাখিবে না। আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি, সে তাহাতে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া, ঐ 'আমি'র আবরণ সরাইয়া, প্রিয়-বিরহকেও শুচি-শুদ্ধ করিতে চায়। তাহার সেই বিরহব্যথাও যে-বিরহের ব্যথা, তাহা সাধারণ মানবীয় সংস্কার অতিক্রম করিয়াছে; সে ঐ আমিটাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিতে চায়; রাজলক্ষ্মী তাহা করিবে না, সে তাহা আবশ্যক মনে করে না। তাহা হইলে—একজনের যাহাতে কুণ্ঠা নাই, আরেক জনের তাহাই সবচেয়ে ভয়ের কারণ। 'আমি'টার ঐ দর্পের জন্য যে দুঃখভোগ, রাজলক্ষ্মীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই; শেষ পর্য্যন্ত ঐ 'আমি'টাকে লইয়া সে মৃত্যুকেও জয় করিবে—এইরূপ মৃত্যুর ক্ষুধাই যেন তাহার জীবনে চির-জাগরূক ছিল, এক্ষণে সেই ক্ষুধাই প্রেমের শক্তিতে আরও বলবতী হইয়াছে। একদিকে সেই প্রেমের 'আমি'টার যেমন মুক্তি ঘটিয়াছে, অর্থাৎ তাহাতে কোন দীনতা, দুর্ব্বলতা আর নাই, অপরদিকে সেই মুক্ত 'আমি'টাই

স্বেচ্ছায় পাশবদ্ধ হইতে চায়। যে মুক্ত হইয়াছে, সে আবার ঐ বন্ধনের মোহ স্বীকার করে কেন, এবং কখন? বলা বাহুল্য, আমি এক্ষণে রাজলক্ষীর বহির্জ্জীবন-ঘটিত কাহিনীর অনুসরণ করিতেছি, তাহার অন্তর্জ্জীবনের গভীরতর ইতিহাস ইতিপূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে তাহার সেই 'আমি'টার স্বেচ্ছায় শাস্তিভোগ বা মৃত্যুবরণ—এ কাহিনীর সেই বিয়োগান্ত পর্ব্বটার পৃথক পর্য্যালোচনা করিতেছি, অথচ পূর্ব্বের সূত্রও টানিয়া চলিব, তাহাতে—শুধুই তাহার সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ নয়—সমগ্রজীবনের ধারা ও তাহার পরিণাম দেখিয়া লইব, তত্ত্বের ঊর্দ্ধলোক হইতে তথ্যের নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিব। রাজলক্ষী বলিতেছে—

"এবার গিয়ে (গঙ্গামাটীতে) আমি বদলাবো নিজেকে, আর সবচেয়ে বদ্‌লে' ভেঙে গড়ে' তুলবো নতুন করে' তোমাকে—আমার নতুন গোঁসাইজীকে। কমললতা দিদি আর যেন না দাবী করতে পারে তার পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী বলে'।" [পৃঃ ২১১]

শ্রীকান্ত নিশ্চয় তাহাকে কমল-লতার সেই আকুল আহ্বানের কথা বলিয়াছে, শুনিয়া রাজলক্ষী বড় ভয় পাইয়াছে; সে কমল-লতার হাত হইতে শ্রীকান্তকে উদ্ধার করিতে চায়—শ্রীকান্তের ভবঘুরে-স্বভাবকে বদলাইয়া নিজ কামনার অনুরূপ করিতে চায়। শ্রীকান্তকে কমল-লতা যে ঠিকই চিনিয়াছিল, এবং তাহার সেই জীবনকে তাহারই স্বভাব-অনুযায়ী একটা সার্থকতা দান করিতে চাহিয়াছিল, রাজলক্ষী তাহা বুঝিতে পারিয়া আরও উদ্বিগ্ন হইয়াছে। রাজলক্ষীর প্রেম তাহা হইতে দিবে না। তাহার ঐ কামনা যে কত স্বাভাবিক তাহাও আমরা বুঝি—বুঝিবার জন্য কোন গূঢ়তত্ত্বের আশ্রয় লইতে হয় না। যে-প্রেম তাহার প্রাণকে এমন পূর্ণ করিয়াছে তাহাকে সার্থক করিবার জন্য সে কঙ্কর-কণ্টকময় ধূলামাটির প্রান্তর-পথেই একটি পুষ্পকানন বিছাইতে চায়, একটা কিছু সৃষ্টি করিয়া সেই প্রেমের ব্যাকুলতা দূর করিতে চায়। দুঃখকে ভয় করা নয়—তাহাকে আত্মার শক্তি দ্বারা উপড়াইয়া ফেলাও নয়,—সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে তাহাকে সার্থক করার যে প্রতিভা তাহাই প্রেমের প্রতিভা। তাহাতে প্রেমের গৌরবহানি হয় না, কারণ এরূপ সৃষ্টিকার্য্যের কর্ত্তা যে-আমি, সে কেমন আমি তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। জগতের সকল শ্রেষ্ঠ মানুষ—কি ঋষি, কি কবি, কি কর্ম্মবীর—সকলেরই এই 'আমি' আছে; সে-আমি একাধারে ঐ যজ্ঞের হোতা ও হবি; সেই আমি নিজেকে নিষ্ফলা করিতে চায় না, পরের জন্য উৎসর্গ করিয়া 'আমি'টাকে বড় করিয়া ভোগ করিতে চায়। অতএব রাজলক্ষী যখন বলিল—

"তোমাকে কি বিনামূল্যে অম্‌নি নেবো;—তার ঋণ পরিশোধ করবো না?.........এম্‌নি নিষ্ফলা চলে' যাবো।" [পৃঃ ২১২]

—তখন তাহা এতই সত্য বলিয়া মনে হয় যে, কোনরূপ তত্ত্ববিচারের প্রয়োজন হয় না। ইহাই জীবনের সত্য।" কিছু সৃষ্টি করিয়া তাহার সেই সুখের মূল্য দিতে না পারিলে প্রেম তৃপ্তি বোধ করে না; সেই সুখ তাহাকে লজ্জা দেয়, এবং দুঃখকেই আরও সত্য বলিয়া মনে হয়। রাজলক্ষ্মী ঐ যে বলিল, "সবচেয়ে বদলে ভেঙে গড়ে' তুলবো নতুন করে' তোমাকে"—এমন কথা সে কি পূর্ব্বে কখনো বলিতে পারিত? এই যে প্রকাণ্ড বিশ্বাস ও সাহস, ইহা আসিল কোথা হইতে? কমল-লতাও শ্রীকান্তকে ডাকিয়াছিল আর এক পথে—সে তাহাকে ভাঙিয়া গড়িতে চাহে নাই, প্রয়োজন বোধ করে নাই। এই দুইয়ের কাহার প্রেম বড়? কমল-লতা তাহাকে ডাকিয়া ছাড়িয়া দিল, সে যেমন নিজে কোন বন্ধন সহিবে না, তেমনই পরকেও বাঁধিবে না; তার কারণ, তাহার আশা ও বিশ্বাস আরও দূরে নিবদ্ধ—আরও দৃঢ় ও নিঃসংশয়। সে জীবনের সুখ-দুঃখকে এমন করিয়া বুঝিয়াছে যে, তাহার আর কোন মোহ নাই—অন্যের থাকে তো আপনি কাটিবে, তাহার 'আমি' আপনাকে আপনি মুক্ত করিবে; সেই মুক্তি সে শ্রীকান্তকে আগে হইতেই দিয়া রাখিয়াছে। সে জানে, এ মানুষ মুক্ত, কেবল একটা স্বেচ্ছা-জড়িত জালে আপনাকে জড়াইয়া, মুক্ত-আমিটাকে বদ্ধ করিয়া মুক্তির অভিমান বা আস্ফালন করিতেছে। যেখানে সে মুক্ত—সেইখানে—সেই প্রেমের বৃন্দাবনে, মুক্তি ও বাঁধনের লীলায় সে তাহারই সহচর, এই জীবনে নহে। রাজলক্ষ্মী তেমন বৃন্দাবনের কথা জানে না, মানেও না; সে এই জীবনেই একটি প্রেমের সংসার গড়িয়া তুলিতে চায়; নিজেকে ও শ্রীকান্তকে তাহার সেই প্রেমের আগুনে গলাইয়া, নূতন করিয়া গড়িয়া একটি যে যুগল-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবে, সেই যুগ্ম-প্রেমপ্রবাহের উচ্ছ্বসিত আনন্দে সে "জীবের আননকেই চন্দ্রানন" করিয়া তুলিবে, কারণ তখন তাহার একমাত্র কামনা হইবে—"এমনই যেন সংসারে সবাই পায়"।

এইখানে আর একটি কথা বলিব। সকল নর-নারীর প্রেমেও একটা 'মন' বা চরিত্র-বিশেষের ছাপ থাকিবেই। রাজলক্ষ্মীর মনের পরিচয় শ্রীকান্ত অনেক ঘটনায়—শুধু তাহার নিজের সম্পর্কে নয়, রাজলক্ষ্মীর পরিজনদের, এবং বাহিরের বহুজনের সম্পর্কে—দিয়াছে, তাহাতে তাহার দুইটা গুণ, উদারতা ও দাক্ষিণ্য, সমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর মনের ঐ পরিচয় ছাড়াও তাহার অন্তর্দৃষ্টির যে পরিচয় আমরা পাই, তাহার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে একটা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি, এই দৃষ্টি মনের নয়—প্রাণের। গঙ্গামাটীর কাহিনীতে কুশারী-পরিবারের সুনন্দা ও তাহার জা' কুশারী-গৃহিণীর পরিচয় আমরা শ্রীকান্তের মুখে

একরূপ পাই,—শ্রীকান্ত সুনন্দার প্রশংসাতেই পঞ্চমুখ হইয়াছে; পরে রাজলক্ষ্মী তাহাদের সম্বন্ধে যে কথা বলিল, তাহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়; এমন বোধ বা বিচারশক্তি সে কেমন করিয়া লাভ করিল তাহা চিন্তা করিলে রাজলক্ষ্মীর ঐ মনটার আরও ভিতরে দৃষ্টি করিতে হয়; উহাই তো প্রেমের বীজ, সেই বীজ কি প্রাণের মধ্যেই নিহিত ছিল না? কমল-লতার ভাষায় উহাই তো তাহার সেই জন্মান্তরীণ বৃন্দাবনী সংস্কার। শ্রীকান্ত বলিল,

"কিন্তু সুনন্দার বিদ্যের তো দর্প নেই। রাজলক্ষ্মী বলিল, না, ইতরের মতো নেই,—আর সে কথাও আমি বলি নি। ও কত শ্লোক, কত শাস্ত্রকথা, কত গল্প-উপাখ্যান জানে; ওর মুখে শুনে শুনেই তো আমার ধারণা হয়েছিল, আমি তোমার কেউ নয়, আমাদের সম্বন্ধ মিথ্যে;......তবেই ত্যাখো, ওর বিদ্যের মধ্যে কোথায় মস্ত একটা ভুল আছে। তাই দেখি, ও কাউকে সুখী করতে পারে না, সবাইকে শুধু দুঃখ দেয়। ওর বড় জা' ওর চেয়ে অনেক বড়—শাদা-মাটা মানুষ, লেখাপড়া জানে না, কিন্তু মনের ভিতরটা দয়া মায়ায় ভরা।......ওর পুঁথির বিদ্যে যতদিন না মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, লোভ-মোহের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে' নিতে পারবে ততদিন ওর বইয়ে-পড়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানের ফল মানুষকে অযথা বিঁধবে, অত্যাচার করবে, সংসারের কাউকে কল্যাণ দেবে না—তোমাকে বলে' দিলুম।" [পৃঃ ২০৮-২০৯]

ইহার পর তাহার সেই কথা—"এম্‌নি নিষ্ফলা চলে' যাব"—তার মুখে কত সত্য, কত স্বাভাবিক! রাজলক্ষ্মীর প্রেম সম্বন্ধে শ্রীকান্ত নিজেও যে একটি মন্তব্য করিয়াছে, তাহা শ্রীকান্ত-রূপী শরৎচন্দ্রেরই একটি গভীর উক্তি; সে বলিতেছে—

"মনে মনে ভাবিলাম, হৃদয়ের বিনিময় নর-নারীর অতিশয় সাধারণ ঘটনা,—সংসারে নিত্য-নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে, বিরাম নাই, বিশেষত্ব নাই। আবার এই দান ও প্রতিগ্রহই ব্যক্তিবিশেষের জীবন অবলম্বন করিয়া কি বিচিত্র বিস্ময় ও সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, মহিমা তাহার যুগে যুগে মানুষের মন অভিষিক্ত করিয়াও ফুরাইতে চাহে না। এই সেই অক্ষয় সম্পদ, মানুষকে ইহা বৃহৎ করে, শক্তিমান করে, অভাবিত কল্যাণে নূতন করিয়া সৃষ্টি করে।" [পৃঃ ২১২]

'শক্তিমান' করে—'সৃষ্টি' করে,—এ প্রেমের লক্ষণ তাহাই। এতক্ষণে আমি রাজলক্ষ্মীর প্রেমে সেই 'আমি'টার একটা সহজ অর্থ করিতে পারিলাম। আমি ইহাকে একপ্রকার 'শাক্ত' প্রেম বলিব। ইহাতে ঐ 'আমি'টা দুর্ব্বল হইলে চলিবে না। বৈষ্ণবী কমল-লতার প্রেম সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু, তাহা শক্তি নয়,—একটি অপূর্ব্ব মাধুরীর আবেশে আত্মাকে শান্ত, পরিতৃপ্ত করে। সেখানে সংসার নাই, সমাজ নাই, অতএব ঐ 'আমি'ও নাই; তাই সৃষ্টি-সাফল্যের কথাই উঠিতে পারে না। একটিতে আছে প্রেমের শক্তি-চেতনার আনন্দ-স্ফূর্ত্তি, দুর্ব্বলতা-জয়ের আনন্দ—কামনার অসীম স্ফূর্ত্তিতেই কামনার উচ্ছেদ; আরেকটিতে আছে—প্রেমের পরিপূর্ণ রসাস্বাদ; 'রসাস্বাদ' বলিতে একপ্রকার নিষ্কামনার

কামনা-সুখ বুঝায়, সেই—"বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ—রসবর্জ্জং"; সাক্ষাৎ ভোগসুখ তাহাতে না থাকিলেও তাহার রসটুকু সূক্ষ্ম ভোগ্যবস্তুর আকারে থাকিয়া যায়। কবিদের কাব্যসাধনাও এইরূপ ভাবরস-পানের সাধনা। অতএব রাজলক্ষ্মীকে যদি শক্তির আনন্দরূপিণী বলা যায়, তবে কমল-লতাকে ভক্তির আরতিরূপিণী বলিলে অযথার্থ হইবে না।

এখন প্রশ্ন এই, আমাদের নিকটে—পাঠক-পাঠিকার নিকটে—কোন্ আদর্শ বড়? আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহা বলিতে পারি না; আমি এমনই অব্যবস্থিত-চিত্ত, অর্থাৎ নিষ্ঠাহীন যে, যখন যেদিকে চাই তখন তাহাকেই বড় বলিয়া মনে হয়। আমি রাজলক্ষ্মীর কথাই বেশি করিয়া বলিতেছি (এ কাহিনী মুখ্যতঃ তাহারই কাহিনী) বলিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, আমি ঐ বৈষ্ণবী কমল-লতাকে উপেক্ষা করিতেছি; বরং ইহাই সত্য যে, যখনই তাহার পানে চাই তখনই আমার বিচার-বুদ্ধি লোপ পায়। তথাপি যদি রাজলক্ষ্মীর প্রতি কিছু পক্ষপাত হইয়া থাকে তাহার কারণ, আমি সাধারণ মানুষ—রাজলক্ষ্মীর হৃদয়-বল, তাহার দেহ-মনের ঐ ঐশ্বর্য্য আমাকে সমধিক আকৃষ্ট করে,—ঐ যে ক্রমাগত বিড়ম্বিত লাঞ্ছিত হইয়াও তাহার প্রাণের ক্ষুধা কিছুতেই হার মানিবে না, এবং শেষ পর্য্যন্ত সেই বিজয়িনী নারীরও সংসারে যে পরিণাম ঘটিতে দেখি, তাহাতে সাধনার সিদ্ধি অপেক্ষা কামনার ট্র্যাজেডিই অধিকতর মুগ্ধ করে। কমল-লতাও হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—রাজলক্ষ্মীর চেয়েও অনেক বেশি অনল-দাহ সহ্য করিয়াছে, কিন্তু করিলে কি হয়, সে যে এক্ষণে পাকা-ঘুঁটি হইয়া গোলোকধাম-বাসিনী হইয়াছে, সে যে আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও সে এমন একটি হাসি হাসিতেছে যাহা দেখিলে, আমাদের মনে হয়—তাহার দেহটা অসাড় হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সে ঐ হাসি হাসিতে পারে; তাহাতে আমাদের মন মুগ্ধ হইলেও প্রাণ সাড়া দেয় না। কিন্তু রাজলক্ষ্মী তাহার সেই সিদ্ধিলাভের পরেও আমাদের এই জীবন-পথের পথিক; সে মৃত্যুজয়ী ও আত্মজয়ী হইয়াও জীবনের উপরেই সেই প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, মৃত্যুকে বরণ করিয়াও তাহাকে জীবনের মাথার মুকুট করিয়া তুলিবে। ইহাকেই আমি বলিয়াছি—প্রেমের শাক্ত-সাধনা। অথচ প্রেম এমনই বস্তু যে, তাহাতে যুদ্ধজয়ের নয়—পরাজয়ের আনন্দই বড়। রাজলক্ষ্মী সেই পরাজয়কে এখনও বরণ করিতে প্রস্তুত নয়। একদিকে কমল-লতাই হইয়াছে তাহার অলক্ষ্য প্রতিদ্বন্দ্বিনী, অপরদিকে শ্রীকান্তকে সে যেমন জানে সেই জানা সত্ত্বেও তাহাকে সে ছাড়িবে না, কমল-লতার সঙ্গে পথে-বিপথে তাহাকে ঘুরিয়া

বেড়াইতে দিবে না। তাহার প্রেমের সেই মুক্তি-সুখ সে ভোগ করিতে পারিল না—তাহার জীবনে ও চরিত্রে সেই যে কোথায় একটু দুর্ব্বলতা ছিল, তাহাই আবার তাহাকে এক নূতন সঙ্কটে টানিয়া আনিল, অর্থাৎ রাজলক্ষ্মী মরিয়াও মরিল না, অথবা, অমৃতের অধিকারী হইয়াও জীবনকে তুচ্ছ করিল না, তাই দেহের মৃত্যু না-হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধটাকে সে এড়াইল না।

আমার মনে হয়, ইহা যদি রাজলক্ষ্মীর দুর্ব্বলতাই হয়, তবে এ দুর্ব্বলতা, এ মোহ তাহার ঘুচিয়াছিল, সে তাহাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছিল; শ্রীকান্ত নিজেও একবার সে কথা বলিয়াছে, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিবার মত—

"অভয়া বলিল, তার মানে রাজলক্ষ্মী জানে আপনাকে তাহার হারাবার ভয় নেই।

আমি বলিলাম, শুধু ভয় নয়,—রাজলক্ষ্মী জানে, আমাকে তার হারাইবার যো নেই। পাওয়া এবং হারানোর বাহিরে একটা সম্বন্ধ আছে, আমার বিশ্বাস সে তাই পেয়েছে বলে' আমাকেও এখন তার দরকার নেই।" [দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১১৪]

কথাটা অনেক আগের বটে, অর্থাৎ তখনো প্রকৃতপক্ষে রাজলক্ষ্মীর সেই মুক্তি ঘটে নাই; তথাপি রাজলক্ষ্মী যে এই সাধনাই করিতেছিল, শ্রীকান্তের সে অনুমান মিথ্যা নয়। কিন্তু শ্রীকান্তই আবার সেই মোহ সৃষ্টি করিল, সে এমন করিয়া ধরা দিল যে, রাজলক্ষ্মীর যে-স্বপ্ন ভাঙিয়াছিল, যে স্বপ্নের আর প্রয়োজন ছিল না, সেই স্বপ্নকে সে আবার ফিরাইয়া আনিল,—না জানিয়া শ্রীকান্ত এই শেষ প্রবঞ্চনা বা বিশ্বাসঘাতকতা করিল। সে রাজলক্ষ্মীর বাহুপাশে, যেন পরম কৃতজ্ঞতাভরে, ঐ যে আপনাকে সমর্পণ করার অভিনয় করিল, তাহা একপ্রকার আত্মপ্রতারণাও বটে; কিন্তু তাহাতেই রাজলক্ষ্মীর জীবন-পিপাসা নূতন করিয়া উদ্রিক্ত হইল, ফলে, আমি যে ট্র্যাজেডির কথা বলিয়াছি, সেই ট্র্যাজেডিকে ঠেকাইয়া রাখা গেল না,—সে কথা পরে বলিব। এইখানে একটা কথা আমরা স্বীকার না করিয়া পারি না, তাহা এই যে, রাজলক্ষ্মীর জীবনে শুধুই প্রেম নয়—সে নারী বলিয়াই তাহার ব্যর্থ-জীবনে একটা বড় কামনার বস্তু ছিল, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-সুখ। অসম্ভবের এই অবোধ পিপাসাই তাহার ঐ দুর্ব্বলতার একমাত্র কারণ; প্রেম চরিতার্থ হইয়াছে, কিন্তু ঐ কামনা ঘুচে নাই, উহাই—"the last infirmity of a woman's mind"। ইহাও সত্য যে, শ্রীকান্ত তাহার নিজের ধারণা অনুসারে এই দিকটার উপরে একটু বেশি জোর দিয়াছে, এমন কি, পত্নীত্বের উপরে মাতৃত্বের লোভকে বড় করিতে চাহিয়াছে; কিন্তু আমরা তাহার চরিত্র ও তাহার সাধনা যেমন বুঝিয়াছি তাহাতে মনে হয় না যে, ঐরূপ কামনাই তাহাকে এতখানি অন্ধ করিয়া তুলিবে।

এক্ষণে রাজলক্ষ্মীর তুলনায় কমল-লতার প্রেম, ও তাহার সেই জয়-গৌরব আর

একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। এ কাহিনীর শেষে পৌঁছিলে, এমন কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, কমল-লতাই জয়ী হইয়াছে,—তাহার সেই জয়লাভ আমাদের জীবনাদর্শের দিক দিয়া যেমনই হোক। শ্রীকান্তকে দেখিয়া তাহার যে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে বুঝিতে পারি, তাহার সাধনা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই; কিন্তু কিছু পরেই দেখি, সে নিজেকে বেশ সামলাইয়া লইয়াছে, এমন একটা খুঁটিকে সে আশ্রয় করিয়াছে, যাহা আমাদের চক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইলেও, তাহার একটা বড় সহায়—

"সেদিন সে বলিয়াছিল, সুখেই আছি গোঁসাই। যাঁর পাদপদ্মে জীবনকে নিবেদন করে' দিয়েছি দাসীকে কখনো তিনি পরিত্যাগ করবেন না।"

—অর্থাৎ তাহার প্রেম কিছুতেই কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না; তার কারণ, প্রথমতঃ, সে উহাকে স্থাপন করিয়াছে এই জীবনের বাহিরে ও উর্দ্ধে; দ্বিতীয়তঃ, সেই প্রেমের ডোরটি সেই এক খুঁটিতে বাঁধা আছে; খ্রীষ্টান ভক্তেরা যেমন কাহাকেও প্রেম জানাইতে হইলে লেখে—"Yours in the Lord", ইহাও অনেকটা তেমনই; ঐ প্রিয়জন—যুগলের ঐ অপরটি—সেই পরমপুরুষের প্রেমের ভিতর দিয়াই প্রিয়তম হইয়াছে, তাই সে প্রেম অক্ষয় ও অচল; কমল-লতার কোন ভয় নাই, কোন সংশয় নাই। ইহাও দেখি যে, কমল-লতা বাহিরের সমাজ বা নর-নারীর জন্য কিছু মাত্র চিন্তিত নয়, তেমন চিন্তা তাহার ঐ প্রেম-সাধনার অন্তরায়—তাহাতে সেই এক লীলাময়ের লীলাকে অবিশ্বাস করিতে হয়। তাহা হইলে, কমল-লতা রাজলক্ষ্মীর তুলনায় মুক্ত—জীবন তাহাকে আর জড়াইতে পারে না। এ প্রেমে ট্র্যাজেডি নাই—নাটকও নাই; আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহা যেন একটি কাল-দেশ-হীন অনন্তব্যাপী লিরিক্-সুর। ঐ সুর আমাদের জাগ্রত জীবন-কর্ণে সহসা প্রবেশ করে না বটে, কিন্তু আত্মার নিশীথস্বপ্নে উহা কচিৎ আমাদিগকেও বিধুর করিয়া তোলে। আবার, কমল-লতার প্রেম একটা অশরীরী কিছু বলিয়া মনে হইলেও, মুরারিপুরের আখড়ায় সে যখন রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের মিলন-বাসর স্বহস্তে সাজাইয়া দেয়, থালায় ভরিয়া মালা ও পুষ্পচন্দন আনিয়া সে যখন সেই যুগল-প্রেমকে তাহারই প্রাণের প্রীতি-রসে চর্চ্চিত ও অভিনন্দিত করে, এবং ঐ দুইজনের সুখ অনিমেষলোচনে দেখিয়া অপরূপ তৃপ্তি বোধ করে, তখন বৈষ্ণবের সেই আদর্শ-গোপিনী, রাধিকার সখী, এবং রাধিকা অপেক্ষা গৌরববতী ললিতার কথা মনে হয়—যে-ললিতা কৃষ্ণ ও রাধার প্রেম-লীলা আড়াল হইতে দেখিয়াই ধন্য হয়, নিজে তাহার এক কণা ভোগ না করিয়া কেবল রাধার সেই

বিরহান্ত মিলন-সুখকেই আপনার সুখ বলিয়া মনে করে। আমাদের লৌকিক সংস্কারে ইহা নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয় বটে, তথাপি একটি অপরূপ ভাবের প্রতীকরূপে ঐ নারীকে আমরা অবশে হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারি না।

শ্রীকান্ত কমল-লতার এই প্রেমে-মুক্তি, প্রেমেরই এই অসীম শক্তি ও সামর্থ্য দেখিয়া যেমন মুগ্ধ হয়, তেমনই তাহাতে কামনারই সেই চরম নিষ্কামনা দেখিয়া ভয় পায়। ঐ কমল-লতার সঙ্গে সে যেন কোথায় একটা গূঢ় আত্মীয়-সম্পর্ক অনুভব করে, কিন্তু তাহার আজীবন-সংস্কার ঐ আক্রমণ সহ্য করিতে পারে না। রাজলক্ষ্মীর আত্ম-সমর্পণ যেই তাহাকে আত্মস্থ করিল—তাহার সেই বৈরাগ্য-অভিমান ও স্বাতন্ত্র্য বৃদ্ধি করিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এ কোন্ শক্তি তাহার পথরোধ করিয়া, ও হৃদয়ের অন্তস্তলে দৃষ্টিপাত করিয়া, মৃদু মৃদু হাসিতেছে! এ নারী অন্নদা-দিদি নয়, রাজলক্ষ্মী নয়, সুনন্দা বা অভয়াও নয়। এতদিন, যতই গভীর বা বেগবতী হউক—নারী-হৃদয়ের তটবদ্ধ তীরে সে বিচরণ করিয়াছে, কিন্তু এ তো নদী নয়—এ যেন সাগরসঙ্গম, ইহার জলরাশি একূলে আসিয়া ঠেকিলেও আর কূল দেখা যায় না, তাহার সেই অসীমতা বড়ই ভীতিজনক। তখন শ্রীকান্ত যেন নূতন করিয়া রাজলক্ষ্মীর পানে চাহিল, যে-রাজলক্ষ্মীকে সে নানা কারণে ছোট মনে করিয়াছিল, আজ তাহাকেই কল্যাণময়ী নারী-মহিয়সী বলিয়া, কমল-লতা হইতে আত্মরক্ষার জন্যই যেন, তাহারই শরণাপন্ন হইল। রাজলক্ষ্মীর সম্পর্কে তাহার এই আকস্মিক ভাবান্তরের প্রমাণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; পরে রাজলক্ষ্মী ও কমল-লতাকে পাশাপাশি তুলনা করিয়া সে তাহার প্রাণকে কিরূপ আশ্বস্ত করিতেছে, তাহার কথাও আছে—

"অকস্মাৎ দুটি মুখ পাশাপাশি যেন ভাসিয়া আসিল। একটি আমার রাজলক্ষ্মীর—কল্যাণের প্রতিমা; অপরটি কমল-লতার,—অপরিস্ফুট, অজানা, যেন স্বপ্নে-দেখা ছবি।

...নিরাশ্রয়, নিঃসম্বল পথে পথে সে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে মনে করিলেই চোখে জল আসিয়া পড়ে। দিশেহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে।"

[পৃঃ ২৭-২২৯]

আরও একদিন শ্রীকান্ত ঐ কমল-লতাকে স্মরণ করিয়া বলিয়াছিল—

"দ্বিধায় দুর্ব্বল সকল সংকল্প, সকল উদ্যমই আমার অনতিদূরে ঠোকর খাইয়া পথের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সবাই বলে অলস, সবাই বলে অকেজো। তাই বোধ করি ঐ অকেজো বৈরাগীর আখড়াতেই আমার অন্তরবাসী অপরিচিত বন্ধু অস্ফুট ছায়ারূপে আমাকে দেখা দিয়ে গেলেন, বাঁরবার রাগ করিয়া মুখ ফিরাইলাম, বারবার স্মিতহাস্যে হাত নাড়িয়া কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।"

[পৃঃ ১২৮]

এ দীর্ঘশ্বাস সে বার বার ফেলিয়াছে; কিন্তু কমল-লতার ডাক শুনিলে সে ভয় পায়, অবশেষে রাজলক্ষ্মীকে সে যেন প্রাণের দায়ে একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ বরণ করিতেছে। অথচ ইহা যে তাহার অন্তরের সত্য নয়, সে যে আপনাকে আপনি অস্বীকার করিতেছে, তাহার প্রমাণ—গঙ্গামাটীতে ফিরিয়া, রাজলক্ষ্মীর সহিত নূতন করিয়া সংসার পাতিবার কালে সে বলিতেছে—

"শুধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না। হয় তো এ আমার স্বভাব, হয় তো বা ইহা আর-কিছু-একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে।......

শুধু দেখি একটা বিষয়ে তন্দ্রাতুর মন কলরবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে, সে ঐ মুরারিপুরের দশটা দিনের স্মৃতির আলোড়নে।" [ঐ, পৃঃ ২২৮-২৯]

অতএব রাজলক্ষ্মীর সম্বন্ধে সে যখন নূতন করিয়া আশ্বস্ত হইতে চায়—সে আর কিছুই নয়, একটা সান্ত্বনার উপায় মাত্র,—একরূপ আত্ম-প্রতারণা; তাই যখন শ্রীকান্তের মুখে শুনি—

"করুণায়, মমতায় হৃদয়-যমুনা কূলে-কূলে পূর্ণ—নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের সর্ব্বব্যাপী মহিমায় আমার চিত্তলোকে সে (রাজলক্ষ্মী) যে আসনে অধিষ্ঠিত তাহার তুলনা করিতে পারি, এমন কিছুই জানি না। [ঐ, পৃঃ ২২৯-৩০]

—তখন ঐরূপ বন্দনাকে ভূতভয়গ্রস্ত ব্যক্তির উচ্চৈঃস্বরে রাম-নাম করা বলিয়াই মনে হয়। উপরের ঐ কথাগুলিতেও করুণা ও মমতার উল্লেখ আছে—'প্রেমের সর্ব্বব্যাপী মহিমা'র কথাও আছে, কিন্তু শ্রীকান্তের মুখে উহা একটা কবিত্বময় উচ্ছ্বাস মাত্র; রাজলক্ষ্মীর করুণা ও মমতা নূতন নয়, শ্রীকান্ত তাহা চিরদিন স্বীকারও করিয়াছে, কিন্তু আজ সেই করুণা ও মমতাই প্রেমের সর্ব্বব্যাপী মহিমায় তাহাকে মহিমান্বিত করিয়াছে! শ্রীকান্তের এই রাজলক্ষ্মী-বন্দনার সহিত তাহার কমললতা-বন্দনা একসঙ্গে পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—কোন্‌টা তাহার প্রাণের গভীরতর সুর; রাজলক্ষ্মীর গুণে সে মুগ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে ঐ কমল-লতা—কমল-লতাই তাহাকে তাহার নিদ্রাতুর প্রাণে 'নিশির ডাক'-এর মত ডাক দিয়াছে—

"আর ঐ কমল-লতা। ওর জীবনটা যেন প্রাচীন বৈষ্ণব-কবিচিত্তের অশ্রুজলের গান। ... ও যেন তাঁদেরই দেওয়া কীর্ত্তনের সুর—মর্ম্মে যাহার পশে সেই শুধু খবর পায়। ......আমাকে বলিয়াছিল, চলো না গোঁসাই, এখান থেকে যাই, গান গেয়ে পথে-পথে দুজনের কেটে যাবে।"

[ঐ, পৃঃ ১২৮-২৯]

—কমল-লতার জন্য এই যে আক্ষেপ, এই যে অন্তর-রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস, শ্রীকান্ত-জীবনের অন্ততঃ এই অধ্যায়ে, ইহার মত হৃদয়-সত্য আর কিছু আছে? মনে হয়, শ্রীকান্তের

'কৃষ্ণ'-অশ্রুসায়রের উপরে কমল-লতার 'রাধা'-পদ্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। অতএব, ঐ সময়ে, ঐ অবস্থায় শ্রীকান্ত যে রাজলক্ষ্মীর নিকটে ঐ ভাবে আত্মসমর্পণ করিল, তখনই তো সে জানিয়া-শুনিয়া একটা বড় মিথ্যাকে আশ্রয় করিতেছে—সে তাহার এতদিনের আত্মমর্য্যাদা ধূলায় লুটাইয়া দিল। রাজলক্ষ্মীকেও এইবার সে সত্যই প্রবঞ্চনা করিল। সেই রাজলক্ষ্মী যখন শ্রীকান্তের ঐরূপ কথায় ও আচরণে, তাহার সারাজীবনের আশা এতদিনে পূর্ণ হইয়াছে মনে করিয়া আনন্দে-বিশ্বাসে বলিয়া উঠে—"ভাবলেও ভয় হয়, সেদিনগুলো আমার কেটেছিল কি ক'রে?" —তখন "আমি উত্তর দিতে পারি না, কেবল নীরবে চাহিয়া থাকি।" —অর্থাৎ, শ্রীকান্ত যে কত বড় ছলনায় বাধ্য হইয়া যোগ দিয়াছে, তাহার অন্তরাত্মা সে কথা জানে। রাজলক্ষ্মীকে তাহার ঐ যে স্তুতি তাহা প্রেমিকের প্রেমারতি নয়, এক অসাধারণ গুণবতী রমণীর গুণগান মাত্র; মুরারিপুরের স্মৃতি ও কমল-লতার সেই দুর্ব্বোধ্য, দুর্জ্জেয় প্রেমই তাহার "সমস্ত প্রাণশক্তির" মূলোচ্ছেদ করিতেছে, এবং "দিশেহারা মন সান্ত্বনার আশায় ফিরিয়া চাহে রাজলক্ষ্মীর পানে"—ইহাই সত্য।

কিন্তু রাজলক্ষ্মী মজিল কেন? সে কথা আমি সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি; তাহার পরেও যদি উহাকে ভ্রান্তি বা মোহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহা হইলে রাজলক্ষ্মীকে ছাড়িয়া কমল-লতারই শরণ লইতে হয়, অর্থাৎ জীবনকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে হয়। কিন্তু আমরা তো তাহা পারি না, তাই রাজলক্ষ্মী-জীবনের এই শেষ ভ্রান্তিটাকে আমরা একটু ভিন্ন চক্ষে দেখিব।

(২)

শ্রীকান্তের পরাজয়

"Thou art weighed in the balances and art found wanting."

—*New Testament*

আমি বলিয়াছি, শ্রীকান্তই রাজলক্ষ্মীর ঐ দুরাশার জন্য দায়ী। লগ্ন ও ঘটনার যোগাযোগ এমনই যে, শ্রীকান্ত-চরিত্রের দুর্ব্বল দিকটাই তাহাকে এই ট্র্যাজেডির Villain করিয়া তুলিয়াছে,—রাজলক্ষ্মী যে-ভুল কখনো করে নাই এবং করিত না তাহাই করিল, সে শ্রীকান্তকে সংসারী করিবার আশায় নিজের সেই বুদ্ধিও হারাইল। একথা সত্য যে, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের নিকটে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া সেই যে পত্র লিখিয়াছিল, তার কারণ, তাহার মনে আর কোন গ্লানি বা সঙ্কোচ ছিল না; শ্রীকান্তকে যে বিবাহ করিতে সম্মত হইবে, ইহাও তাহার স্বপ্নাতীত। সে তাহার অর্থ অন্যরূপ বুঝিয়াছিল, তাই নিজের সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিতও করিয়াছিল। তথাপি সে ততটা আশা করে নাই, করিলেও নিরাশ হইতে প্রস্তুত ছিল; তাহার ভয় হইয়াছিল, পাছে শ্রীকান্ত কোন কারণে একটা গুরুতর হঠ-কর্ম্ম করিয়া বসে। তাহার বুদ্ধিলোপের আরও কারণ, সে কমল-লতাকে চিনিতে পারে নাই, এমন কি, ভিতরে ভিতরে তাহাকে একটু অবজ্ঞাও করিয়াছে। চিনিবে কেমন করিয়া? সে যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সে মনেও করে নাই, কমল-লতা শ্রীকান্তকে এমন জখম করিয়াছে, এবং পরাজিত শ্রীকান্ত তাহার সেই পরাজয়টাকেই রাজলক্ষ্মীর উপরে চাপাইয়া তখনকার মত আত্মরক্ষা করিতেছে। এই পরাজয়-তত্ত্ব রাজলক্ষ্মীর অজ্ঞাত ছিল, সে কমল-লতার জয়লাভকে নিজেরই জয়লাভ বলিয়া মনে করিল। শ্রীকান্তের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া সে এখন আশান্বিত হইয়াছিল, তাহা যে অন্যরূপ, এবং তাহা যে কমল-লতারই কাজ, —সেই কমল-লতাই যে অতঃপর শ্রীকান্তের মোহভঙ্গের কারণ হইবে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই রাজলক্ষ্মী অতঃপর মহা উৎসাহে শ্রীকান্তকে লইয়া সংসার পাতিবার আয়োজনে মাতিয়া উঠিল,—কাহিনীর সেই অংশ আমি নিষ্প্রয়োজন-বোধে বাদ দিলাম। রাজলক্ষ্মীর প্রেম-জীবনের—তাহার সেই

পারমার্থিক সাধন-জীবনের—সমাপ্তি পূর্ব্বেই হইয়াছে, সে পরিসমাপ্তি, তাহার জীবন-মরণের সেই মিলন-সন্ধিক্ষণের কথা আমি সবিস্তারে বলিয়াছি। এখন বাকি আছে জেরটুকুর অবসান, সে মৃত্যুও এ কাহিনীর বহির্ভাগে ঘটিয়াছে—শ্রীকান্ত তাহার ইঙ্গিতমাত্র নানা ভঙ্গিতে করিয়াছে (আমি তাহারও উল্লেখ করিয়াছি), অবতারণা করে নাই। আমরা একটা অনুমান মাত্র করিব, রাজলক্ষ্মীর জীবন ও তাহার চরিত্র যদি আমরা ঠিকমত বুঝিয়া থাকি তবে সে জীবনের পরিণাম ঐরূপ অবস্থাচক্রে কিরূপ হইতে পারে, তাহা কল্পনা করা দুঃসাধ্য নয়। তৎপূর্ব্বে শ্রীকান্তের কথা আরও কিছু বলিয়া লওয়া আবশ্যক।

আমরা দেখিয়াছি, মুরারিপুর হইতে রাজলক্ষ্মীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসার পর, শ্রীকান্ত যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। সে রাজলক্ষ্মীর গৃহিণী-মূর্ত্তি ও তাহার দাম্পত্য-লীলার যত কিছু মাধুর্য্য পরম ধৈর্য্যসহকারে উপভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছে—সে যেন ভিতরের একটা-কিছু চাপিয়া রাখিবার একমাত্র উপায়। সেইকালের তাহার পলাতক প্রাণ ভিতরে ভিতরে কমল-লতার প্রতি কিরূপ উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল,—রাজলক্ষ্মীর পত্রের উত্তরে কমল-লতার অতিসংক্ষিপ্ত পত্র সম্বন্ধে তাহার স্বগতোক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়—

"সে আমার নাম উল্লেখও করে নাই। কিন্তু এই কয়টি অক্ষরের আড়ালে কত কথাই না তাহার রহিয়া গেল। খুঁজিয়া দেখিলাম এক ফোঁটা চোখের জলের দাগ কি কোথাও পড়ে নাই? কিন্তু কোন চিহ্নই চোখে পড়িল না।" [ঐ, পৃঃ ২২৬]

তারপর গঙ্গামাটীতে দ্বিতীয়বার রাজলক্ষ্মীর সহিত বাস করিবার কালে, দাম্পত্যের সেই নিবিড় সুখভোগ করিতে করিতে শ্রীকান্তের মনের যে অবস্থা, তাহার পরিচয় শ্রীকান্তের জবানীতেই পূর্ব্বে দিয়াছি, সেই যে—"শুধু আমিই কেবল মনের মধ্যে উৎসাহ বোধ করি না।···হয় তো বা ইহা আর কিছু-একটা যাহা দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে আমার সমস্ত প্রাণশক্তির মূলোচ্ছেদ করিতেছে"। তারপর হঠাৎ নবীনের চিঠিতে সংবাদ পাইল—গহর মৃত্যুশয্যায়। শ্রীকান্তের যেন চমক ভাঙ্গিল, আবার সেই 'নিশির ডাক'; একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণে সে যেন আবিষ্টের মত পুনরায় সেই রহস্য-ঘন নিঃসঙ্গ নির্জ্জন পথে অভিসার করিল। এই তাহার শ্রীকান্ত-জীবনের শেষ-যাত্রা। এক্ষণে দেখা যাক, সেই পথ এবার তাহাকে কোথায় উত্তীর্ণ করে।

রাজলক্ষ্মীর প্রেমের পিঞ্জর-দ্বার খুলিয়া শ্রীকান্ত আবার আপনারই চিত্তাকাশে পক্ষবিস্তার করিল। আসলে কমল-লতাই তাহাকে টানিয়াছে, গহর সেই

অনির্দ্দেশের একটা উদ্দেশক মাত্র। সেখানে পৌঁছিয়া শ্রীকান্ত শুনিল, গহরের মৃত্যু হইয়াছে; তাহা অপেক্ষা বড় যে সংবাদটির জন্য সে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও শুনিল—সেই কয়দিন কমল-লতাই গহরের মৃত্যুশয্যা আগুলিয়া বসিয়াছিল, অনাহারে অনিদ্রায়। শ্রীকান্ত ইহার অর্থ যাহা বুঝিল, তাহাতে তাহার মনের সেই চিরন্তন প্রশ্নই আরও জটিল হইয়া উঠিল। অন্নদা-দিদির পাতিব্রত্যের অর্থ সে এতদিনে একরূপ বুঝিতে পারিয়াছে; রাজলক্ষ্মীর যে-প্রেমকে সে কখনও শুদ্ধচিত্তে গ্রহণ করিতে পারে নাই, আজ সে তাহাকে আর একদিক দিয়া শোধন করিয়া লইয়াছে,—যদিও তাহার অপরদিক, সেই যাচিয়া বাঁধন-পরার দিক, সে তেমনই সহ্য করিতে পারে না, তাই হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু গহরের সহিত কমল-লতার ব্যবহার সে সত্যই বুঝিতে পারে না; সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাবে একজন প্রেমার্ত্ত পুরুষের প্রতি নারীর এইরূপ আচরণ—একই কালে এমন কঠোরতা ও করুণা যে কেমন করিয়া সম্ভব হয়, শ্রীকান্তের আত্ম-দর্শন তথা জীবন-দর্শনে তাহা লেখে না। গহরের এতবড় প্রেমও কমল-লতাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিল না; অথচ গহরের প্রেম যে কেমন, তাহা কমল-লতার মত আর কে জানে? সেই কমল-লতা এমন জীবনকেও ব্যর্থ করিয়া দিল! এত বড় নিষ্ঠুর নির্ম্মম সে,—গহরের মৃত্যুকে সে যেন তাহারই পদতলে অর্ঘ্য-নিবেদনের মত গ্রহণ করিল! এ কেমন মনুষ্যত্ব? অভয়া তো এমন কাজ করিতে পারিত না—সে তো রোহিণীদাদাকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না, নিজে পিপাসার্ত্ত না হইয়াও, সে নিঃস্বার্থ পরদুঃখকাতরতার বশে, পরের পিপাসাকে কেমন চরিতার্থ করিল! ইহাই তো শ্রীকান্তের আদর্শ; ঐ প্রেম বড়, না মানুষের দুঃখ-নিবারণ বড়? যে-প্রেম ঐরূপ নিষ্ঠুর হইতে পারে তাহা তো এক রকম কুৎসিত আত্ম-পরায়ণতা। রাজলক্ষ্মীর ঐরূপ বাতিক আছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার নারী-হৃদয়ের উদারতা, বদান্যতা, ও পরকল্যাণচিকীর্ষা তাহার সেই দোষকে কতকটা মার্জ্জনীয় করিয়াছে। কিন্তু গহরের সম্পর্কে কমল-লতার ঐ মনোভাব বড়ই দুর্ব্বোধ্য; তাই শ্রীকান্ত সেই সংবাদটা সবিশেষ জানিয়া ও বিচার করিয়া, কমল-লতা সম্বন্ধে আরও অস্বস্তি বোধ করিল—তাহার আত্ম-ধর্ম্মে আর একটা বড় আঘাত পাইল। আমরাও ব্যাপারটা সহজ বলিয়া মনে করি না—তার কারণ, ইহা সাধারণ জীবন-যাত্রা বা সংসার-জ্ঞানের অনুমোদিত তো নহেই—ইহা সেই প্রেমের অবুঝপনা, যাহাকে সাধারণ মনস্তত্ত্বের বহির্ভূত বলিয়া আমরা অন্ধ বলি; উহার কোন অর্থ নাই; যদি উহার অর্থই করা যাইবে, তবে আজ পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রেম—

কাব্যে-নাটকে-উপন্যাসে এত রকমের কাহিনীতেও—পুরাণো হইল না কেন? তথাপি একটা অর্থ করিতেই হইবে, নহিলে আমাদের কাজ চলে না। আমরা বলিব, গহরকে রক্ষা করা কমল-লতার সাধ্যাতীত বলিয়াই সে তাহা পারে নাই। গহরের প্রেম এমন এক বস্তু,—তাহা গহরেরই আত্মার এমন একটা সত্য যে, সে-প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে আর একজনের আত্মার সত্যও রক্ষা করিতে হয়। প্রেম, স্বাধীনতা ও সত্য—এই তিন যেখানে এক—উহা সেই উর্দ্ধতম ভূমির প্রেম; অর্থাৎ উহাও সেই 'ব্রহ্ম'-এর মত, তাহার ঐ সৎ-চিৎ-আনন্দ যেমন তিনটি পৃথক বিশেষণ নয়—তিনে এক, ও একে তিন; তেমনই, প্রেমও ব্রহ্ম-সাধনার অঙ্গীভূত হইলে অর্থাৎ, জীবন নয়—জীবন্মুক্তির অভিমুখী হইলে, তাহা একাধারে প্রেম, মুক্তি, ও সত্য এই তিনই হইবে। কথাটা বড় তত্ত্বগন্ধী হইয়া উঠিল, তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু উপায় নাই; তবু প্রেমের ঐ তত্ত্ব আংশিক ভাবে সকল প্রেমে—নর-নারীর প্রেমে—বিদ্যমান আছে, কেবল তাহার মাত্রাটা ঐ ব্রহ্ম-মাত্রা নহে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে—সত্য ও মুক্তি, অর্থাৎ অন্তরের স্বাধীনতা—এই দুইটা যাহাতে নাই, তাহা প্রেম নয়—একটা রিপু, অর্থাৎ কাম ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। ঐ তত্ত্ব গহর ও কমল-লতা দুইজনেই তাহাদের প্রাণের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছিল—প্রেমের ঐ সত্য, এবং ঐ মুক্তি স্বীকার না করিলে, তাহাদের আত্মার মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। এ বিষয়ে পরস্পরেরর মধ্যে বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছিল। তবু গহর এমন করিয়া সেই নিরাশার সাধনায় শুকাইয়া গেল কেন? উহাই তপস্যা। কমল-লতা গহরের সেই তপস্যার উত্তর সাধিকা-রূপে তাহার সহায়তা করিয়াছে মাত্র; সে গহরের মৃত্যু-শয্যার পাশে বসিয়া সেই মহাপ্রাণের মহামুক্তির পল-অনুপল নিজ হৃদয়ের মধ্যে গণিয়াছে। সে জানে, তাহার নিজের মুক্তি এখনও দূরে; সে কেবল গহরের মহাযাত্রার পাথেয় গুছাইয়া দিয়াছে; মৃত্যুর সেই অমৃত-রূপের অর্চ্চনা করিয়া সে তাহার ললাটে তিলক-চন্দন পরাইয়া ধন্য হইয়াছে—এবং নিজের জন্য আশীর্ব্বাদ যাচঞা করিয়াছে। ইহার নাম কি নির্ম্মমতা? মমতা করিলে যে পূজ্য-পূজার ব্যতিক্রম ঘটিত। অভয়ার তো সে ভাবনা ছিল না, রোহিণীকে সে তো পূজ্য মনে করে না; সে তাহাকে কৃপা করিয়াছে, এবং তদ্দ্বারা নিজের ধর্ম্মবুদ্ধির জয়ঘোষণা করিয়াছে। আসল কথা, এ রাজ্যের পথ-ঘাট শ্রীকান্ত জানে না, জানিবার সুযোগ ঘটিলেই তাহার অস্বস্তি বৃদ্ধি পায়। সে হয় তো গহর ও কমল-লতা-ঘটিত এই শেষ সংবাদ পাইয়া কমল-লতা সম্বন্ধে একটু

আশ্বস্ত হইয়াছিল, গহরের অন্তিমকালে কমল-লতার ঐ সেবা যে কেবল করুণা ও নিঃস্বার্থতারই নিদর্শন, তাহাই ভাবিয়া কমল-লতার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা হয় তো বাড়িয়াছিল।

কিন্তু আখড়ায় পৌঁছিয়া যখন সে শুনিল—কমল-লতার ঐ আচরণে আখড়ার ধর্ম্মগুরুগণ তাহার ধর্ম্মভ্রষ্টতা বা চারিত্রিক শুচিতা-হানির প্রমাণ পাইয়া তাহাকে দেব-সেবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন—তখন শ্রীকান্ত এখানেও সেই ক্ষুদ্রতার—অন্যায় ও অবিচারের আধিপত্য দেখিয়া ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইল, কমল-লতার প্রতি সহানুভূতিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। কিন্তু ইহার পরেও কমল-লতা যে কিসের আশায় ঐ আখড়া ত্যাগ করে নাই, সেই তত্ত্ব যখন অবগত হইল, তখন সে একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। আবার সেই বিভীষিকা—সেই নারী-প্রেমের দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা! কমল-লতার সহিত শ্রীকান্তের কথা হইতেছে—শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করিল,

"সন্দেহ কি গহরকে নিয়ে?

—হাঁ, তাই।

কিছুই জানি না, তবু অসংশয়ে বলিয়া উঠিলাম, এ মিথ্যে,—এ অসম্ভব।

—অসম্ভব কেন গোঁসাই?

—তা জানিনে কমল-লতা, কিন্তু এত বড় মিথ্যে আর নেই। মনে হয়, মানুষের সমাজে এ তোমার মৃত্যুপথ-যাত্রী বন্ধুর ঐকান্তিক সেবার শেষ পুরস্কার।

তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, বলিল, আর আমার দুঃখ নেই। ঠাকুর অন্তর্য্যামী, তাঁর কাছে তো ভয় ছিল না, ছিল শুধু তোমাকে। আজ আমি নির্ভয় হ'য়ে বাঁচলাম, গোঁসাই।

—সংসারে এত লোকের মাঝে তোমার ভয় শুধু ছিল আমাকে? আর কাউকে নয়?

—না, আর কাউকে নয়, শুধু তোমাকে।" [ঐ, পৃঃ ২৩৭-৩৮]

সেই এক কথা! রাজলক্ষ্মীও তাহাই বলে। কিন্তু রাজলক্ষ্মীর কথা সে এক-রকম বুঝিয়া লইয়াছে। কিন্তু এ যে কিছুই চায় না, সত্যই সর্ব্বত্যাগ করিয়াছে, সকল কামনা-বাসনা হইতে মুক্ত হইয়াছে—এত বড় তিতিক্ষাও তো আর কাহারও নাই! এ যেমন কাহারও ভালো করিবার জন্য অধীর হয় না, তেমনই নিজেও সকল ভাল-মন্দকে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছে। তথাপি ইহার মুখেও ঐ কথা—"আর কাউকে নয়, শুধু তোমাকে"! এ কেমন বন্ধন-স্বীকার?

ইহার পর গহরের টাকার পুঁটুলিটি তাহার হাতে দিতে গিয়া যখন শুনিল—

"টাকা আমারো তো একদিন অনেক ছিল গো, কি কাজে লাগ্‌লো? তবু যদি কখনো দরকার হয় তুমি আছো কি করতে? তখন তোমার কাছে চেয়ে নেবো, অপরের টাকা নিতে যাবো কেন?…

…না গোঁসাই, আমার টাকা চাইনে, যাঁর শ্রীচরণে নিজেকে সমর্পণ করেছি তিনি আমাকে ফেলবেন না। যেখানেই যাই সব অভাব তিনিই পূর্ণ ক'রে দেবেন। লক্ষ্মীটি, আমার জন্য ভেবো না।" [ঐ, পৃঃ ২৩৯]

—তখন শ্রীকান্ত আবার বুঝিল, এ প্রেম কাহাকেও বাঁধে না, কারণ, কিছুই চাহে না সে। তথাপি ইহাতেও সেই একের ভজনা! এ প্রেম যেন পর-নিরপেক্ষ হইয়াছে—সেই পরকে একেবারে আত্মসাৎ করিয়া। এ প্রেম যেন বলে—যেখানেই যাক, যাহাই করুক—আমাকে ভুলিয়াই থাক্ বা গালিই দিক, জানুক বা নাই জানুক—ও যে আমারই, অতএব উহাকে বাঁধিবার প্রয়োজন তো নাই; উহার সম্পর্কে আমার প্রাণে তো কোন অভাব-বোধ নাই; উহার যাহা কিছু সবই আমার—আমাকে দিবেই বা কি, বঞ্চিত করিবেই বা কিসে? ও যাহা-কিছু করিবে তাহা আমারই করা, আমার বাহিরে ও যাইবে কেমন করিয়া? কমল-লতার ঐ কথায় শ্রীকান্ত একটা কিছুর ইঙ্গিত নিশ্চয় পাইল, তাহার মনের সেই দুশ্ছেদ্য গ্রন্থিতে একটা প্রবল টান পড়িল। তাই শেষ-বিদায়ের ক্ষণে—

"গাড়ী আসিলে দুইজনে উঠিয়া বসিলাম। পাশের বেঞ্চে নিজের হাতে তাহার বিছানা করিয়া দিলাম।

কমল-লতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—ও কি কোরচ গোঁসাই?

—করচি যা' কখনো কারো জন্যে করিনি,—চিরদিন মনে থাকবে বলে'।

—সত্যিই কি মনে রাখতে চাও?

—সত্যিই মনে রাখতে চাই কমল-লতা। তুমি ছাড়া যে কথা আর কেউ জানবে না।"

[চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ২৪২-৪৩]

শ্রীকান্তের ঐ শেষ কথা বড়ই অর্থপূর্ণ—বিশেষতঃ এ কাহিনীর একেবারে শেষে। রাজলক্ষ্মীর সহিত তাহার সম্বন্ধ কিরূপ, তাহাও এই একটি দৃশ্য এবং ঐ একটি কথায় নিঃসংশয় হইয়া উঠিয়াছে। রাজলক্ষ্মীকেও সে অনেকবার অনেক মিষ্ট কথা বলিয়াছে, কিন্তু এই অতি-সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথায় সে যেন নিজের নিকটে পরাজয় স্বীকার করিল; কমল-লতাই তাহার মানস-দিগন্তের শেষ তারা, সেই তারা আর অস্ত যাইবে না। ইহার পরে দৃশ্যটি আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে, ইহাই এ-নাটকের শেষ দৃশ্য—শ্রীকান্ত-জীবনে যবনিকা-পাত।

"রাত্রি তখনো পোহায় নাই, নীচে ও উপরের অন্ধকার স্তরে একটা ভাগাভাগি সুরু হইয়াছে, আকাশের একপ্রান্তে কৃষ্ণা-ত্রয়োদশীর ক্ষীণ জীর্ণ শশী, অপর প্রান্তে উষার আগমনী।* সেদিনের কথা মনে পড়িল যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এম্‌নি সময়ে তাহার সাথী হইয়াছিলাম। আর আজ?

---

*এই বর্ণনায় ভুল আছে। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ, তিথি যতই বাড়ে, ততই রাত্রির শেষ দিকে উদয় হয়; অতএব যেদিকে 'উষার আগমনী' চাঁদও সেই দিকে দেখা দেয়।

…কমল-লতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল. কণ্ঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া—বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাই নি,—আজ একটি কথা রাখবে ?

—হঁা, রাখবো, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম—

বলিতে তাহার এক মুহূর্ত্ত বাধিল, তারপরে কহিল, আমি জানি,—আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে' আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে স'পে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ কোরো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।"

[ঐ, পৃঃ ২৪৫]

ঠাকুরের ফুল তুলিবার সাথীই চাহিয়াছিল কমল-লতা, সে তাহাও হইতে পারে নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়া শ্রীকান্ত বলিতেছে—"আর আজ ?" শ্রীকান্তকে কমল-লতা একেবারেই ত্যাগ করিয়া গেল—এমন করিয়া গ্রহণ তাহাকে আর কেহ করে নাই, ত্যাগও নহে। সে ত্যাগ কেমন, শ্রীকান্ত তাহা বুঝিল। গহর না পাইয়াও যাহা পাইয়াছিল, শ্রীকান্ত পাইয়াও তাহা পাইল না। সে কমল-লতার এত বড় দান ফিরাইয়া দিল—তাহা গ্রহণ করিবার মত শক্তি তাহার ছিল না। সেই অক্ষমতা ঢাকিবার জন্য সে বলিয়া উঠিল—

"তোমাকে তাঁকেই দিলাম, কমল-লতা, তিনিই তোমার ভার নিন। ……আমার বলে' আর তোমাকে অসম্মান করবো না"।

এমনই করিয়া সে তাহার সাময়িক ভাবাবেগ দমন করে, রাজলক্ষ্মীরও এমনি হিত-কামনা সে কতবার করিয়াছে। কিন্তু যাঁহার উপরে সে কমল-লতার ভার দিল, তাঁহাকে শ্রীকান্ত কি জানে ? জানিলেও তাঁহার উপর কোন নির্ভর কখনো আছে ? এ যে কত বড় আত্মপ্রবঞ্চনা, শ্রীকান্তের তাহা অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু উপায় কি ?

এইখানেই এ কাহিনীর শেষ যে হয় নাই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না, আর একটু বাকি আছে, সেই বাকিটুকু শ্রীকান্ত আর বলিতে পারে নাই, আমাদিগকেই বুঝিয়া লইতে হইবে। কমল-লতার কথা ঐখানেই শেষ বটে, অথবা তাহা এমনই অশেষ যে, শেষ হওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু আমাদের হাতে ঐ যে আর দুইটি রহিয়া গেল—উহাদের একটা শেষ নিশ্চয় আছে। ইহার পর শ্রীকান্ত গঙ্গামাটীতেই ফিরিয়া গেল, কিন্তু তারপর ? সে কি রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে ঘরকরণা করিতে লাগিল ? পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় এমন কথা শুনিলেও হাসিয়া উঠিবেন। রাজলক্ষ্মীর মনে সে নিজেই যে মোহ সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ধাক্কা ইতিমধ্যেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। তারপর কমল-লতা এই যাহা করিয়া গেল, ইহার একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া শ্রীকান্তের স্বভাবে ঘটিবেই —তাহার আভাস আমি ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার দিয়াছি। নারী-পুরুষের প্রেমকে

সে এতদিন একটা দুর্ব্বলতা বা আত্মপরায়ণতার রস-বিলাস বলিয়াই জানিত—সেই বিশ্বাসই তাহার চরিত্রের একটা বড় গ্রন্থি হইয়া তাহার আত্মাভিমান বজায় রাখিয়াছিল। আজ সে সেই প্রেমকে বড়-কিছু বলিয়া অনুভব করিল; হৃদয়ে উপলব্ধি না করুক, তবুও তাহার একটা ভুল ভাঙিয়াছে, তাহা এই যে, ঐ প্রেম একটা বন্ধন না হইয়া আত্মার মুক্তিসাধন করিতে পারে—ঐ প্রেমেই আত্মার উচ্চতম মর্য্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব। কমল-লতা সেই কথাই তাহাকে বলিয়া গেল—শুধু বলা নয়, যেন চাক্ষুষ করাইয়া গেল। কিন্তু তাহাতে ফল হইল কি? শ্রীকান্তের সেই অভিমান যদি চূর্ণ হইয়া থাকে তবে তাহার স্থান পূরণ করিবে আর কোন্ শক্তির দ্বারা? সে কমল-লতার ভয়ে রাজলক্ষ্মীর প্রেমে আশ্রয় লইয়াছিল, বারবার রাজলক্ষ্মীর মহিমা-কীর্ত্তন করিয়া কমল-লতাকে আড়াল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তখনও কমল-লতার এই শেষ পরিচয় বাকি ছিল, সেই পূর্ণ-পরিচয়ের বজ্রালোকে তাহার দুই চক্ষু ধাঁধিয়া গেল, প্রথম কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া, পরে তাহার সেই স্বভাব-সিদ্ধ সেন্টিমেণ্টের উচ্ছ্বাসে মনে মনে সর্ব্বত্যাগের একটা সান্ত্বনা সৃষ্টি করিয়া লইল—রাজলক্ষ্মীর নিকটে হারিয়া সে যাহা করে। কিন্তু এবার এত সহজে এড়ানো যাইবে না।

এইখানে আমাদিগকে একটা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ তাহার উপরেই একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে। ঐ যে কমল-লতার সহিত শ্রীকান্তের শেষ-বিদায়—উহাতেই এই উপন্যাস সমাপ্ত বা অসমাপ্ত হইয়াছে, ইহার পরে শ্রীকান্ত যেন সহসা অদর্শন হইয়াছে। ঠিক ঐ ঘটনার পরেই এইরূপ যবনিকাপাত বড় অর্থপূর্ণ বলিয়াই মনে হয়, যেন ঠিক ঐখানে ঐরূপ নীরব হইয়া যাওয়ার দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, অতঃপর শ্রীকান্তের বাকি কাহিনী আমরা নিজেরাই অনুমান করিয়া লইতে পারিব। ঐ শেষ-বিদায়ের কালে কমল-লতার সেই কথাগুলিতে, এবং শ্রীকান্তের সেই আচরণে এই আত্ম-কাহিনীর অন্তটি বুঝিয়া লইতে হইবে; তাহা করিতে হইলে কমল-লতার ঐ কথা-কয়টির মধ্যেই শ্রীকান্ত-জীবনের গ্রন্থিমোচনের যে তত্ত্বটি উঁকি দিতেছে এবং তাহাতেই সেই জীবনের ঐরূপ অবসানের যে কারণ অনুমান করা দুরূহ নয়, তাহা উত্তমরূপে বিচার করিতে হইবে। আমি প্রথমে কমল-লতার ঐ শেষ কথাটি লইয়াই সেই বিচার করিব—"আজ বিশ্বাস করে' আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও,—নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে তুমি আর মন খারাপ কোরো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা"।

কমল-লতার এই প্রার্থনাও শ্রীকান্তের মর্ম্মমূলে আঘাত করিয়াছিল ; প্রথমতঃ—কমল-লতার ঐ প্রেম, এবং দ্বিতীয়তঃ—সেই প্রেমের দ্বারাই সে যেন অন্তর্য্যামীর মত শ্রীকান্তের অন্তরটা দেখিতে পাইয়াছে ; কমল-লতার ঐ কথাগুলি যেন বজ্রালোকের মত একটা নিবিড় অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়াছে। শ্রীকান্তকে সে নিশ্চিন্ত, নির্ভয় হইতে বলিল, তাহার জন্য মন খারাপ করিতে বারণ করিল। তাহার নিকটে শ্রীকান্তের সেই উদ্ধত হৃদয় পরাজয় স্বীকার করিয়াছে—যে হৃদয় আর কেহ জয় করিতে পারে নাই, ইহা কমল-লতা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। শ্রীকান্তের দুর্ব্বলতাও সে যেমন আবিষ্কার করিয়াছে, আর কেহ তেমন পারে নাই। শ্রীকান্ত কমল-লতার প্রেম স্বীকার করিলেও, সেই প্রেমের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সে পারিবে না, ঐরূপ অবস্থায় আত্মগ্লানি ও অনুশোচনা তাহার পক্ষে আরও অহিতকর হইবে। তাই সে শ্রীকান্তকে তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে বলিয়াছিল। শ্রীকান্ত বড় ছোট হইয়া গেল, ইহাই শ্রীকান্তের পরাজয়।

কমল-লতার প্রেম প্রেমাস্পদের মঙ্গল কামনাই করে, নিজের জন্য কোন কামনাই নাই,—সেই মঙ্গল কামনার বশে সে শ্রীকান্তকে তাহার সম্বন্ধে সকল চিন্তা ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল ; প্রকৃতপক্ষে, কমল-লতা শ্রীকান্তকে এমন একটা অনুরোধ করিয়াছিল, যাহা মানুষের পক্ষে অসম্ভব ; কমল-লতার যে কোন দুঃখ নাই, সে কথা বিশ্বাস করিলেও, সে আপনাকে ক্ষমা করিবে কেমন করিয়া? সেই আত্মাপরাধ ও সেই হীনতা-বোধ সে কখনো ভুলিতে পারিবে না ; কমল-লতা যে দুঃখ পাইবে না, সকল বিপদ ও সকল কষ্ট হইতে তাহার ঠাকুর তাহাকে রক্ষা করিবেন, সেজন্য শ্রীকান্তকে তাহার প্রয়োজন নাই—এই কথাটাও যে মর্ম্মান্তিক। কমল-লতার প্রেম এমনই, সেই প্রেমের ডাকেও সে সাড়া দিতে পারিল না!

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে যে একটা প্রশ্ন বার বার জাগে—পাঠক-পাঠিকার মনেও তাহা জাগিবে। আমরা কি কমল-লতার ঐ প্রেম সত্যই বুঝিতে পারি? যাহাকে ভালবাসি তাহাকে আমার সম্বন্ধে সকল ভাবনা ত্যাগ করিতে বলা এবং নিজেও তাহাকে ঐরূপ ত্যাগ করা—মানুষের প্রেমে কি সম্ভব? কেবল দান-প্রতিদান নয়, কোন সম্পর্কই থাকিবে না—সকল ভাবনা ভগবানকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া—ইহাকে প্রেম বলিব, না ভগবদ্ভক্তি বলিব? যাহাকে ভালবাসি তাহার হৃদয়ে একটু স্থান লাভ করিবার কামনা, এবং তাহার জন্য সদা চিন্তিত থাকা ইহাই তো মানবীয় প্রেম। মানুষ যে খাঁটি প্রেমের গর্ব্ব করে, সেই—

'ভালবাসিবে বলে' ভাল তো' বাসিনে।
আমার স্বভাব তোমাকে বই আর জানিনে।

তাহাতেও প্রেমাস্পদকে এমন করিয়া ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। অতি-গভীর, শুদ্ধ সাত্ত্বিক নিঃস্বার্থ প্রেমেও আমরা ঐ একটুখানি কামনাকে শেষ পর্য্যন্ত দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে দেখি—যেন সে আমাকে না ভুলিয়া যায়, আমাকে মনে রাখে, তাই প্রেমিকার এমন সর্ব্বত্যাগের উক্তিও কাতরোক্তি বলিয়া মনে হয়—

"And if thou wilt, remember,
And if thou wilt, forget."
[মন চায়, রেখো অভাগীরে মনে—
নাহি চায়, ভুলিয়ো তারে।]

কমল-লতা ঠিক ভুলিয়া যাইতে বলে নাই বটে, কিন্তু সে শ্রীকান্তকে তাহার জন্য সকল উদ্বেগ ত্যাগ করিতে বলিয়াছিল; যেন শুধু বাহিরের দুঃখ কষ্ট নয়—তাহার অন্তরেও কোন দুঃখ নাই, শ্রীকান্তকে সে কথাও জানাইয়া গেল। অতএব, এইরূপ দুঃখহীন প্রেম, এবং নর-নারীর ঐ দুঃখময় প্রেম—এবং সেই দুঃখেরই যে এক অপূর্ব্ব রস—নিশ্চয়ই এক নহে। দুঃখ নিবারণ করিতে হইলে প্রেমকেই উৎপাটন করিতে হয়, মানুষের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। সেই মানবীয় প্রেমের এক নিদারুণ অবস্থা-সঙ্কট এবং তাহাতে প্রায় ঐরূপ একটি উক্তি অনেকের মনে পড়িবে; বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের এক স্থানে, সেই 'অগাধ জলে সাঁতার' দিতে দিতে প্রতাপ শৈবলিনীকে এক ভীষণ শপথ করিতে বলিল—সে যেন প্রতাপকে মন হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলে। শৈবলিনী বাধ্য হইয়া (নহিলে প্রতাপ সেই জলে ডুবিয়া প্রাণত্যাগ করিবে) সেই শপথ করিল। শপথ করার পর শৈবলিনী উন্মাদ হইয়া গেল। কিন্তু যে ঐরূপ শপথ করাইয়াছিল, সেও উন্মাদ,—সেও শেষে যুদ্ধের নামে আত্মহত্যা করিয়া—শৈবলিনীকে তাহার সতীধর্ম্ম-পালনে নিশ্চিন্ত করিয়া গেল। শৈবলিনী নারী বলিয়া দুর্ব্বল, প্রতাপ পুরুষ বলিয়া শক্তিমান্? সে শক্তি এমনই যে, ঐরূপ আত্মহত্যার দ্বারাই সে তাহার প্রেমকে জয়ী করিল। ইহার নাম শৈলিনীর মঙ্গল-সাধন, না তাহারই সেই প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন! শৈবলিনী বাঁচিয়া থাকিয়া তাহাকে ভুলিবে, অর্থাৎ সে তাহার হৃদয়টাকে উপাড়িয়া ফেলিয়া দিবে, আর প্রতাপ নিজে সেই প্রেমকে বুকে করিয়াই মরিবে,—সহজ কাজটা শৈবলিনী করিবে, কারণ সে দুর্ব্বল, সে নারী? শৈবলিনী প্রথমে উন্মাদ হইয়া গেল, পরে সেই উন্মাদ-অবস্থায়, এক অনৈসর্গিক উপায়ে—যোগবল বা মন্ত্রবলের দ্বারা—তাহাকে প্রকৃতিস্থ করা হইল; তখন সে সতীধর্ম্ম গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু সেই প্রেমনামক 'পাপ' তখনও তাহাকে ছাড়িল না, তাই অর্দ্ধ-উন্মাদ

অবস্থায় সে প্রতাপকে তাহার জগৎ হইতে—সংসার হইতে অপসৃত হইতে কহিল। এমনই করিয়া একজন মরিল—আর একজন জীবন্মৃত হইয়া রহিল। ইহাই মানবীয় প্রেম—সেই প্রেমের আচার-আচরণ এমনই, মাত্রাভেদে তাহা স্তিমিত বা প্রখর হইয়া থাকে ; আমি প্রকৃত প্রেমের কথাই বলিতেছি, ঐ নামের অপর বস্তু—যাহা প্রায় সকলেই দাবী করে—তাহার কথা বলিতেছি না।

কমল-লতা শৈবলিনী নয় ; আবার, প্রতাপের মত সে পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করে না। শৈবলিনীর মত সঙ্কটও তাহার নহে—তাহার সমাজও নাই, তাহার সতীত্বও অন্যরূপ। তথাপি ভুলিবার প্রয়োজন তাহারও ছিল, কারণ, শ্রীকান্তকে সে পাইল না ; কিন্তু তাহাতেও তাহার দুঃখ নাই, সে তাহার প্রেমকে মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রকার সঙ্কট হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য, ভগবৎ-চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সে যখন শ্রীকান্তকে স্মরণ করে তখন তাহার ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান, কোন দুঃখ আর থাকে না। তাই শ্রীকান্তকে সে তাহার জন্য চিন্তিত হইতে নিষেধ করিল, পাছে তাহার কথা ভাবিয়া দুর্ব্বল শ্রীকান্ত মনের শান্তি হারায়—অনেকটা শৈবলিনীকে প্রতাপের মত ; ঐটুকু চিন্তা তাহার নিজের জন্য নয়, শ্রীকান্তের জন্য। কিন্তু শ্রীকান্ত যদি সত্যই তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে—ঐ বিদায়ের কালে শ্রীকান্তের মনোভাব যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে—তাহাতে, শ্রীকান্ত কি কেবল কমল-লতার ঐরূপ নিঃসঙ্গ নিরুদ্দেশ জীবনের কথা ভাবিয়াই দুঃখ পাইবে, না সে তাহাকে ফিরাইয়া দিল বলিয়া কমল-লতার যে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী তাহার জন্য অনুশোচনা করিবে ? ইহার কোনটাই গভীর বা স্থায়ী দুঃখ নয়, ইহার জন্য শ্রীকান্তকে ঐরূপ প্রতিশ্রুতি করাইবার প্রয়োজন ছিল না। কমল-লতার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আরও গভীর ; সে বিশ্বাস করে, শ্রীকান্ত কখনো তাহাকে ভুলিতে পারিবে না, তাহার প্রেমকে ফিরাইয়া দেওয়ার সেই আত্মগ্লানি সে কিছুতেই মোচন করিতে পারিবে না,—অর্থাৎ, যে বারি পান করিবার শক্তি তাহার নাই, সেই বারির পিপাসা তাহার জাগিয়াছে, ইহার ফল ভাল নহে। সেই অনুশোচনা হইতে সে কখনো অব্যাহতি পাইবে না। যদি ইহাই হয়, তবে কমল-লতাকে সে যে প্রতিশ্রুতি দিল তাহার মূল্য কি ? প্রেমের নক্ষত্রলোকবাসিনী ঐ কমল-লতা—তাহার ঐ আসক্তিহীন দেবী-সুলভ প্রেম—মানুষ শ্রীকান্তকে কি আরও গভীর-ভাবে উৎকণ্ঠিত করিবে না ? কমল-লতা তাহাকে ভুলিবে না, না ভুলিয়াও একটা অলৌকিক কৌশলে প্রেমের দুঃখহীন সুখ বা আনন্দ উপভোগ করিবে। কিন্তু শ্রীকান্ত তাহা না পারিয়া ঐ দুঃখের, এবং ঐ আত্মগ্লানির হাত হইতে পরিত্রাণ

পাইবার জন্য, নিজের জীবনটাকে ছিঁড়িয়া ছড়াইয়া দিবে, নিজের নিকটেই কোন জবাবদিহি—কোনরকমেই আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আর রাখিবে না। ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির মধ্যে সে যে-বস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়া নিজেকেও তাহার অধিকারী করিবার বাসনা করিয়াছিল, ঐ কমল-লতাই তাহাকে সেই অভিমান হইতে বঞ্চিত করিল। তাই তাহার চিত্ত সম্পূর্ণ আশ্রয়হীন হইয়া, ইহার পর সম্ভবতঃ একটা নাস্তিক্য-নীতিকেই বরণ করিয়াছিল; পরে সেই শূন্যের মধ্যেই হয়তো একটা অপর শক্তির সন্ধান পাইয়া সে আবার কতক পরিমাণে আত্মস্থ হইয়াছিল; তখন সে আর শ্রীকান্ত নহে—আর এক স্তরের মানুষ, অথবা সেই শ্রীকান্তের জন্মান্তর হইয়াছে।

কমল-লতার প্রেম কেমন প্রেম তাহা আমরা দেখিলাম। শ্রীকান্তের মত মানুষ—যে রাজলক্ষ্মীর প্রেমকেও অন্তরে গ্রহণ করে নাই, তাহার পক্ষে ঐ প্রেমই যেমন তাহার সেই প্রেম-বিমুখতার উপযুক্ত প্রতিষেধক, তেমনই, সাক্ষাৎ ফললাভ না হইলেও, উহাই তাহার মোহাবরণ ছিন্ন করিয়া শ্রীকান্তকে আত্মোপলব্ধির পথে ঠেলিয়া দিল। কমল-লতাকে সে কখনো ভোলে নাই, তাহার সেই প্রতিশ্রুতি সে হয়তো আর এক অর্থে পালন করিয়াছিল—কমল-লতার জন্য চিন্তিত হইবার, বা তাহাকে দুঃখী মনে করিবার স্পর্দ্ধা সে কখনো করে নাই। কিন্তু মনে রাখিয়াছিল; সেই যে—

"কমল-লতা ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—ও কি কোরচ গোঁসাই?
—করচি যা কখনো কারো জন্যে করিনি—চিরদিন মনে থাকবে বলে'।
—সত্যিই কি মনে রাখতে চাও?
—সত্যিই মনে রাখতে চাই, কমল-লতা। তুমি ছাড়া যে কথা আর কেউ জানবে না।"

ইহা তাহার আন্তরিক স্বীকারোক্তি। ইহার পর, রাজলক্ষ্মীর কপাল পুড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীকান্ত যখন গঙ্গামাটীতে ফিরিল তখন সে আর সেই শ্রীকান্ত নাই, ভিতরে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন হইয়াছে। —কি কারণে তাহা বলিয়াছি। এইরূপ আধ্যাত্মিক সঙ্কটের একটি অদ্ভুত কাহিনী মনে পড়িতেছে। ভিক্তর হুগো (Victor Hugo) তাঁহার সেই উপন্যাস-মহাকাব্যে (Les Miserables) প্রায় এমনই একটা অন্তর্বিপ্লবের বর্ণনা করিয়াছেন। পুলিশ-দারোগা জাভেয়ার (Javert) আইনের ন্যায়-নীতিকেই একমাত্র সত্যনীতি বলিয়া আজীবন নিঃসংশয়ে তাহাই পালন করিয়াছিল; তাহার মত আইন-নিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী আর কেহ ছিল না, সেই কর্ম্মই ছিল তাহার ধর্ম্ম। তারপর, একদা সে যখন সেই

শহরের সর্ব্বজনপূজ্য মহানুভব দেবচরিত্র ব্যক্তিকেও সেই নীতি লঙ্ঘন করিতে দেখিল এবং তাহাতেই এক অপূর্ব্ব মহিমা প্রত্যক্ষ করিল, তখন তাহার সেই আজন্ম-সংস্কারে একটা দারুণ আঘাত লাগিল, সহসা সে এক বিরাট শূন্যতা বোধ করিল; শেষে সেই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিল। শ্রীকান্ত-চরিত্রে এমন কঠোর নীতিনিষ্ঠা ছিল না, সে যেমন ভাবালু, তেমনই ভাবুকও বটে; সব-কিছুকেই সে আপন ভাবানুভূতির দ্বারা বিচার করে, এবং কোনটাকে চূড়ান্ত বলিয়া গ্রহণ করে না। তাহার ঐ আত্মাভিমানও একটা বিশ্বাস নয়—চারিত্রিক দৃঢ়তার বস্তুও নয়, বরং তাহাই একরূপ দৃঢ়তার উপায় হইয়াছিল—উহাই ছিল তাহার আত্মমর্য্যাদাবোধের একটা বড় সহায়। আজ তাহার সেই আত্মাভিমানটাই চূর্ণ হইয়াছে। ইহাও তাহার পক্ষে কম আঘাত নয়। কমল-লতা বলিয়াছিল, তোমার ঐ "বৈরিগী মনের মত সংসারে বড় অহঙ্কারী আছে?" কথাটা যে প্রসঙ্গে সে বলিয়াছিল আজ তাহার অর্থ অন্যরূপ দাঁড়াইল। সে 'বৈরিগী' অর্থাৎ উদাসীন বটে, কিন্তু সত্যকার মুক্তি-পিপাসা তাহার নাই; সে যে বন্ধন-ভীরু তার কারণ, সে দুর্ব্বল। প্রেমকে সে ভয় করে, এতদিন তাহাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া সে আত্মপ্রসাদ লাভ করিত, আজ যখন সে সেই প্রেমের অসীম শক্তি ও মহা-মহিমা প্রত্যক্ষ করিল, তখন বন্ধনের ভয় নয়—মুক্তির ভয়ই তাহাকে বিকল করিয়াছে। রাজলক্ষ্মীর যে-প্রেমকে সে উচ্চাসন হইতে কৃপার চক্ষে দেখিয়াছে—সেই উচ্চাসন ভাঙিয়া গেল, এবার রাজলক্ষ্মীর সম্মুখে তাহার হীনতা-বোধ ঢাকিবার কোন আবরণই আর রহিল না। একদিন রাজলক্ষ্মীর মোহমুক্তির তপস্যা দেখিয়া সে যাহা বলিয়াছিল—

> "আমাকে সে সমস্ত হৃদয় দিয়া ভালবাসে, আমার মোহ সে কাটাইতে পারে না। ...মনে মনে বলিলাম, আমি তাহাকে ছুটি দিব।" [তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৪১]

—সেইরূপ কৃপা করার মত মহত্ত্ব-বোধ তাহার আর নাই। আর তেমন কথা সে বলিতে পারে না। একদিকে, রাজলক্ষ্মীও তাহার প্রেমকে মোহ বলিয়া স্বীকার করে না, তাহার সেই প্রেমই মুক্ত ও জয়ী হইয়াছে; অপরদিকে সে নিজেও প্রেমকে আর তুচ্ছ করিতে পারে না। তাই এতদিনে সে সত্যই পরাজয় স্বীকার করিল, কমল-লতাই তাহার সেই ফাঁকি ধরাইয়া দিয়া গেল। এখন সে কি করিবে? আমি সেই আরেক উপন্যাসের একটি চরিত্রের কথা বলিতেছিলাম—শ্রীকান্তের অবস্থা অনেকটা সেইরূপ হইলেও, তেমন আধ্যাত্মিক সঙ্কট ইহা নহে; কেন, তাহা বলিয়াছি—শ্রীকান্তের চরিত্রে কোনরূপ নীতি-নিষ্ঠা বা নৈতিক দৃঢ়তা

নাই। আবার, সে সাধারণ বৈরাগী বা উদাসীন নয়, তাহার উদাসীনতা বিরাগের নয়—বিদ্রোহের। মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার অত্যাচার তাহাকে বিদ্রোহী করিয়াছে, সেই বিদ্রোহের বশে সে আপনাকে আপনি বঞ্চিত করিবে। অতএব ইহাও একরূপ আত্মহত্যা। পরের দুঃখে সে বিগলিত হয়—পরের দুঃখ বলিয়া; নিজের জন্য দুঃখ পাইতে বা দুঃখ স্বীকার করিতে সে লজ্জা পায়, তাই আপনাকে নষ্ট করিতেও তাহার দুঃখ নাই। এমন মানুষ একহিসাবে চরিত্রহীনই বটে, নিজের সম্বন্ধে যাহার কোন মমতাই নাই—তাহার কোন বন্ধনই নাই। কিন্তু ঐরূপ প্রেম-বিমুখতার একটা গর্ব্ব তাহার ছিল, তাই এতদিন সেই গর্ব্বেরও একটা বন্ধন ছিল, আজ তাহাও রহিল না; অতঃপর তেমন মানুষ ঐ পরাজয়ের লজ্জাকে কেমন করিয়া পরিহার করিবে, তাহা অনুমান করা দুরূহ নয়।

(৩)

রাজলক্ষ্মীর শেষ

Child, you know
How easily love leaps out to dreams like these,
Who has seen them true, And love that's weakened so,
Takes all too long to lay asleep again.

—*RUPERT BROOKE.*

এই শ্রীকান্ত গঙ্গামাটীতে রাজলক্ষ্মীর সেই নব-জাগ্রত ক্ষুধার—তাহার সেই 'হারাই-হারাই'-প্রেমের সুদৃঢ় আলিঙ্গন পাশে ফিরিয়া আসিল।

সম্ভবতঃ শ্রীকান্তের শ্রীকান্ত-জীবনের শেষ কয়টা দিন রাজলক্ষ্মীর আশ্রমেই কাটিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীর তীক্ষ্ণ চক্ষু তাহার ঐ গভীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিল, তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না, এবারকার এই ব্যাধি দুশ্চিকিৎস্য—একটা কি যেন তাহার ভিতর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। সে গহর ও কমল-লতার যে শেষ সংবাদ নিশ্চয়ই শ্রীকান্তের মুখে শুনিয়াছিল, তাহাতেই তাহার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শালিনী নারী কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু শ্রীকান্তের এমন ভাব সে পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই, কল্পনাও করে নাই। সে যে কমল-লতাকে চিনিতে পারে নাই তার কারণ, সে চিনিতে চাহে নাই—এক তন্ত্রের সাধক যেমন অপর তন্ত্রের সংবাদ রাখিতে চায় না। তবু কমল-লতা তাহাকে চিনিয়াছিল। কিন্তু যে চিনিলে রাজলক্ষ্মীর পরম উপকার হইত সে-ই তাহাকে চিনিল না, চিনিতে হইলে শ্রীকান্তকে তাহার প্রকৃতি আমূল বদলাইতে হয়। চিনিলেই বা কি হইত? সে বিস্মিত, বিমূঢ়, অভিভূত হইত মাত্র; কমল-লতাকে দেখিয়া যেমন হইয়াছিল। তবু রাজলক্ষ্মী কমল-লতা নয় বলিয়াই সে তাহাকে ততটা ভয় পাইত না। কিন্তু কমল-লতাই যে তাহাকে তাহার অনধিকার সম্বন্ধে মর্ম্মান্তিক দিব্যজ্ঞান দিয়া গিয়াছে। তাহার পর সে প্রেমকে আর অশ্রদ্ধা করিবে না বটে, কিন্তু দাবিও করিবে না। আবার, যে কমল-লতাকে ফিরাইয়াছে, সে কোন্ মুখে রাজলক্ষ্মীর ঐ প্রেম-কাতরতার প্রশ্রয় দিবে? প্রেমের ঐ যে 'আর্ত্তি',—ঐ পরমোৎকণ্ঠা, উহাই যদি সে বুঝিবে, তবে সে আপনাকে এমন করিয়া বঞ্চিত করিবে কেন?

শ্রীকান্তের 'বৈরিগী মন' তাহাই বুঝে না। তথাপি কমল-লতা রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে তাহার সেই সম্বন্ধ এবং তাহার প্রতি শ্রীকান্তের আচরণ দেখিয়া মনে করিয়াছিল, নতুন-গোঁসাই বোধ হয় ধরা দিয়াছে, তাহার সেই বৃন্দাবনের পথেই সে যাত্রা সুরু করিয়াছে। কিন্তু নিয়তি দুর্লঙ্ঘ্য, এবং 'Character is Destiny', তাই শ্রীকান্ত ভাঙিল, তবু মচকাইল না। সে যে কিছুদিন পরেই রাজলক্ষ্মীর পিঞ্জর ভাঙিয়া সেই শেষবার এবং চিরতরে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে সংশয়মাত্র নাই। কেন পলাইল? সে নিজের প্রতি আস্থা হারাইয়া আরও অস্বস্তি বোধ করিতেছিল। রাজলক্ষ্মীও তাহার চক্ষে কেমন একটা নূতন রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার সেই প্রেমকেও সে আর তুচ্ছ করিতে পারে না—তাহার নিকটেও সে ছোট হইয়া গিয়াছে। রাজলক্ষ্মী ইহার পর কতদিন কি ভাবে বাঁচিয়াছিল তাহা আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। সেই অনুমানের জন্য তাহার সেই পূর্ব্ববর্ত্তী জীবন ও তাহার চরিত্র আর একবার এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করিব। শ্রীকান্ত এ চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে চিত্রিত করিয়াছে, আমরাও তাহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কার্পণ্য করি নাই, তথাপি একবার সমগ্রভাবে তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। এই অবকাশে হয়তো দুই একটা নূতন দিকও চোখে পড়িবে; আরও একটা সুযোগ হইবে, প্রসঙ্গক্রমে নারীচরিত্র সম্বন্ধেও আরও কিঞ্চিৎ তত্ত্ব-আলোচনা করা যাইবে—পাঠক-পাঠিকা উভয়েরই তাহা রুচিকর হইবে বলিয়া মনে করি।

রাজলক্ষ্মী অসাধারণ বুদ্ধিমতী; এই বুদ্ধি অতি গভীর হৃদয়বত্তার সহিত যুক্ত হইয়া তাহাকে এমন শক্তিশালিনী করিয়াছে। স্ত্রীলোকের এই বুদ্ধি স্বভাবজ, উহা পুরুষের বুদ্ধি নয়, অর্থাৎ মস্তিষ্কজাত নয়—হৃদয়জাত। এই বুদ্ধির পূর্ণবিকাশ হইলে নারী সহজেই পুরুষকে সংসার-জ্ঞানে, এমন কি লোক-ব্যবহারে, হারাইয়া দিতে পারে। বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে নারীর এই বুদ্ধিই তাহাকে পুরুষ অপেক্ষা গরীয়সী করিয়াছে। বাংলা উপন্যাস-কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসগুলিতে নারীর ঐ শক্তির যে বিকাশ দেখাইয়াছেন তেমন আর কেহ পারেন নাই। এই বুদ্ধির সহিত মনের বল ও রসিকতা মিলিয়া নারীর যে রূপটি ফুটিয়া উঠে তাহাই লক্ষণীয়, আর যাহা-কিছু তাহা সেই চরিত্রে অবশ্যম্ভাবী। ঐ যে রসিকতার কথা বলিয়াছি উহা ঐ বুদ্ধিরই স্বচ্ছন্দ-দীপ্তি,—বঙ্কিমচন্দ্রের নারী-চরিত্রগুলির উহাই যেন একরূপ প্রতিভা। তাহার সম্মুখে পুরুষগুলা—যত বড় বীরপুরুষই হউক—বোকা বনিয়া যায়। ইহার কারণ পুরুষ স্বভাবতঃই Idealist;

নারী—Realist, অর্থাৎ সংসার-রস-রসিকা; তাই বুদ্ধিমতী নারীর নিকটে পুরুষ "grown-up child"-এর মতই সহজে পরাস্ত হয়। রাজলক্ষ্মীরও এই সহজ রসিকতা কোথাও সূক্ষ্ম, কোথাও স্থূলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, ঐ "sense of humour" তাহার একটা বড় গুণ, ইহারই বলে সে কোথাও কাহারও সহিত ব্যবহারে ঠকে না, উহা দ্বারাই সে সহজে সকলের দুর্ব্বলতা ও দোষ-গুণের কারণ বুঝিতে পারে। যুবক সন্ন্যাসী বজ্রানন্দকে সে এক নিমেষে চিনিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়াছে, তার কারণ ঐ সহৃদয়তার 'sense of humour'। ঐরূপ রসিকতা স্নেহ-প্রেমের সুগভীর আবেগে কেমন প্রগল্‌ভ হইয়া উঠে তাহার একটি নমুনা উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না—তাহাতে রাজলক্ষ্মী-চরিত্রের একটা বড় দিক নিমেষে দৃষ্টিগোচর হইবে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের মুখে কমল-লতার রূপগুণের পরিচয় লইতেছিল; রূপের বর্ণনা শেষ হইলে, রাজলক্ষ্মী বলিল—

"সে যাক্ গে, কিন্তু গুণে ?

গুণে? সে বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা আছে তা' মানতেই হবে।

—গুণের মধ্যে তো শুনলুম কেত্তন করতে পারে।

—হাঁ, চমৎকার!

—চমৎকার তা' তুমি বুঝলে কি করে'?

—বাঃ, তা' আর বুঝিনে? বিশুদ্ধ তাল, লয়, সুর—

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ গা, তাল কাকে বলে? বলিলাম, তাল তাকে বলে ছেলেবেলায় যা' তোমার পিঠে পড়ত, মনে নেই?

রাজলক্ষ্মী বলিল, নেই আবার! সে আমার খুব মনে আছে···কমল-লতা তোমার উদাসী মনের খবরটাই পেলে, তোমার বীরত্বের কাহিনী শোনে নি বুঝি?

—না, আত্মপ্রশংসা আপনি করতে নেই, সে তুমি শুনিয়ো। কিন্তু তার গলা সুন্দর, গান সুন্দর, তাতে সন্দেহ নেই।

—আমারও নেই। বলিয়াই সহসা তাহার দুই চক্ষু প্রচ্ছন্ন কৌতুকে জ্বলিয়া উঠিল, কহিল হাঁ গা, তোমার সেই গানটি মনে আছে? সেই যে পাঠশালার ছুটি হ'লে তুমি গাইতে, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতুম—সেই—"কোথায় গেলি প্রাণের প্রাণ বাপ দুর্য্যোধন রে-এ-এ-এ-এ—"

হাসি চাপিতে সে মুখে আঁচল চাপা দিল, আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। রাজলক্ষ্মী বলিল, কিন্তু বড্ড ভাবের গান। তোমার মুখে শুনলে গরু-বাছুরের চোখেও জল এসে পড়ত—মানুষ তো কোন্ ছার!" [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ১৪৫-৪৬]

এই রাজলক্ষ্মীর মনের বল কতখানি তাহাও আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু তাহা যতই অসামান্য হউক, আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমাদের দেশের মেয়েদের এই মনোবল প্রায় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তার কারণ, দীর্ঘযুগ ধরিয়া সমাজে ও সংসারে তাহারা পুরুষের কাপুরুষতা, অক্ষমতা, এমন কি যত-কিছু পাপের ভার নিজেরাই বহন করিয়া—দেহে যেমন সর্ব্বংসহা, মনেও তেমনই অসীম-সহিষ্ণু।

রাজলক্ষ্মীর ব্রত-উপবাস ও নানা কৃচ্ছ্রসাধন ঐ মনেরই একটা exercise বা ব্যায়াম মাত্র। অপর দেশের, অপর সমাজের পুরুষ ইহা বিশ্বাস করিবে কি না জানি না; আর কিছুদিন পরে আমাদের পুত্র-পৌত্রেরাই হয়তো বিশ্বাস করিবে না, কারণ, নবযুগে সেই নারী—আমাদেরই বধূ-কন্যারা—যে নব ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে তাহাতে সেইরূপ আত্মোৎসর্গের তপশ্চর্য্যা, আত্মবশ্যতার সেই অসীম শক্তি (শ্রীকান্তকে যাহা পদে পদে বিস্মিত করিয়াছে) আর থাকিবে না; কিন্তু সেই মূল নারী-স্বভাব যদি বিকৃত না হয়, অর্থাৎ 'প্রকৃতি-বিকৃতি' না ঘটে, তবে নারীর ঐ শক্তি একটা নূতন পথে, নূতনরূপে আপনাকে সার্থক করিবে, ইহাই সম্ভব। কিন্তু এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর। আমাদের দেশে নারীমাত্রেরই মধ্যে যাহা অল্প-বিস্তর স্ফুরিত হইয়া থাকে, রাজলক্ষ্মীর মধ্যে তাহা পূর্ণ-স্ফুরিত হইয়াছে। আবার, তাহার জীবনও সাধারণ নারী-জীবন নয়, একটা বড় দুর্ভাগ্য তাহার নারী-জীবনকে ব্যাহত করিয়া, সেই শক্তিকেও একটু আতিশয্য দান করিয়াছে—নারীত্বের বা নারী-ধর্ম্মের মূল গ্রন্থিতে আঘাত পাইয়া তাহার আত্মাভিমান উগ্র হইয়া উঠিয়াছে; হিন্দু-সমাজের নারী সে, তাই সতীত্বের সেই দৃঢ়মূল সংস্কার ও তাহার কারণে আত্ম-গ্লানির বিষম বিষ-জ্বালা সেই আত্মাভিমানকে একটা রিপু করিয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু এ সকলের মূলে ছিল তাহার বালিকা-বয়সের সেই প্রেম; এই প্রেমের সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, তথাপি অনেকের মনে হইবে, উহাতে কিছু বাড়াবাড়ি বা অস্বাভাবিকতা আছে। মোটেই নয়। প্রেমমাত্রেই অহেতুক—উহাও "নিয়তিকৃতনিয়মরহিত", যদিও উহাই একরূপ নিয়তি হইয়া উঠে। আবার, নারী-হৃদয়ের গঠনও স্বতন্ত্র। প্রেম বালিকাকেও প্রৌঢ় করিয়া তোলে। পুরুষের মস্তিষ্ক-শক্তির বৃদ্ধি ও বিকাশ আছে; নারীর অপর একটি অন্তরিন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহার কোন সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। রাজলক্ষ্মীর ঐ প্রেমের উৎপত্তি ও বিকাশকে শ্রীকান্ত এই কাহিনীতে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়াছে তাহাতে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। এতকাল পরেও যখন রাজলক্ষ্মী বলে—

> "সে দিন সবাই মিলে আমাদের বোন দু'টিকে যদি বলি না দিত, দিদি হয় তো মরতো না, আর আমি—এজন্মে এমন করে তোমাকে হয়তো পেতুম না, কিন্তু মনের মধ্যে তুমিই চিরদিন এম্নি প্রভু হ'য়ে থাকতে।" [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ২১৫]

—তখন আমরা তাহা বিশ্বাস না করিয়া পারি না। কিন্তু ঐ প্রেমই তাহার অতবড় আত্মাভিমানকে ধূলিসাৎ করিয়াছে, সেই বালিকা-হৃদয়ের অতৃপ্ত কামনাকে

সে কিছুতেই জয় করিতে পারে নাই; বরং তাহার জীবন-স্রোতের সেই গতি-ভ্রষ্টতাই তাহাকে আরও দুর্দ্দমনীয় করিয়াছে। সেই প্রেম বিশুদ্ধ হৃদয়-ধর্ম্ম হইলেও তাহাতে দাম্পত্য-পিপাসার সংস্কারও ছিল—তাহাই একটা জীবনব্যাপী অনুশোচনার কারণ হইয়াছিল। উহাই ছিল একমাত্র দুর্ব্বলতা, এবং উহাই শেষ পর্য্যন্ত তাহার বহির্জ্জীবনে একটা ট্র্যাজেডি ঘটাইয়া ছাড়িল। রাজলক্ষ্মীর সেই প্রেম এমন বিশুদ্ধ, এত গভীর, এমন সর্ব্বনিরপেক্ষ (absolute) হইয়াও, ঐ আরেকটা সংস্কার জয় করিতে পারে নাই, পারিলে সে কমল-লতার মত বিরাগিনী না হইয়াও—মন্দির বা তীর্থবাসিনী না হইয়াও, শুধু অন্তরে নয়, বাহিরেও পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে পারিত। ভিতরে সে জয়ী হইয়াছিল বলিয়াই বাহিরের এই পরাজয় আরও শোকাবহ হইয়াছে। শ্রীকান্তের মুখাপেক্ষা করিবার প্রয়োজন তাহার ছিল না, চির-বিরহের মধ্যেই চির-মিলনের অমৃত লাভ করিবার শক্তি সে অর্জ্জন করিয়াছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। শ্রীকান্ত তাহার হইবে না, সে জানিত; কিন্তু সে যে আর কাহারও হইবে না—হইতে কেন পারে না, তাহাও জানিত। ঐ কারণটা সে যেরূপ বুঝিয়াছিল, তাহাতেই শ্রীকান্তের প্রতি তাহার নারী-হৃদয়ের আকর্ষণ আরও প্রবল হওয়া স্বাভাবিক—সে শ্রীকান্ত-চরিত্রের ঐরূপ বৈরাগ্যের একটা মহিমা নিজ অন্তরে অনুভব করিয়াছিল, তাহার অনেক উক্তিতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। যদি তাহা সত্যও হয়, তবে রাজলক্ষ্মীর মত জীবনানুরাগিণী, হ্লাদিনী প্রকৃতিশক্তি-রূপিণী নারীকে সেইরূপ একটা আধ্যাত্মিক বৈরাগ্যের আদর্শ যে এমন গভীরভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহার হেতু কি? ইহাও নারী-পুরুষ ঘটিত একটা দুর্ভেদ্য রহস্য বটে। ঐরূপ উদাসীন প্রকৃতির পুরুষের প্রতি নারীর অবশ আকর্ষণের যে তত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ তাহারই আভাস দিয়াছেন তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট গল্পে—গল্পটির নাম, "চতুরঙ্গ"। ঐ গল্পটি রবীন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট রচনা—গল্পহিসাবে না হইলেও, পুরুষ ও নারীর প্রকৃতি-বৈষম্য, এবং জীবনের নাট্যশালায় উভয়ের ভূমিকায় যে একটি গভীর দ্বন্দ্ব-রস নিত্য উৎসারিত হইতেছে, তাহার সেই রহস্য-নির্দ্দেশে ঐ রচনাটি তাঁহার কবিদৃষ্টির একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন;—উহার তুলনায় 'ঘরে-বাইরে' একটা নিতান্তই সমাজ-সমস্যামূলক বিচার-বিতর্ক মাত্র; তাহাতে নর-নারী-জীবনের গভীরতম তলদেশের—সেই রহস্যরসের—ইঙ্গিতমাত্র নাই। ঐ 'চতুরঙ্গ' গল্পটিতে, রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটিকেই আমাদের দৃষ্টিগোচর করিতে চাহিয়াছেন, শচীশের প্রতি দামিনীর সেই যে অদ্ভুত আকর্ষণ, তাহাও যেন সৃষ্টির অন্তর্গত একটা নিয়তি-নিয়ম। অতএব এখানেও শ্রীকান্তের প্রতি

রাজলক্ষ্মীর ঐ যে দুর্ব্বার আকর্ষণ, উহা সেই একই কারণে; কেবল এখানে তাহা পরিপূর্ণ নারীত্বের হৃদয়রক্তরাগে আরও জীবন্তরূপ ধারণ করিয়াছে। এই রহস্যেরই একটি সুন্দর নিবেদন আর এক কবি পৌরাণিক রূপকের ছলে করিয়াছেন—নারীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

> তুমি শান্তি-স্বস্তি-দাত্রী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী,
> সৃজয়িত্রী, পালয়িত্রী, ভবদুঃখহরা,
> আত্মমধ্যা, স্বয়ংস্থিতা, সুন্দরে অপরাজিতা,
> মুগ্ধা আশ্লেষরূপা, বিশ্লেষ-কাতরা!
>
> আমি জগতের ত্রাস, বিশ্বগ্রাসী মহোচ্ছ্বাস,
> মাথায় মত্ততা-স্রোত, নেত্রে কালানল;
> শ্মশানে-মশানে টান, গরলে অমৃত-জ্ঞান,
> বিষকণ্ঠ, শূলপাণি, প্রলয়-পাগল!
>
> তুমি হেসে বসে' বামে, সাজাইয়া ফুলদামে
> কুৎসিতে শিখালে, শিবে, হইতে সুন্দর,
> তোমারি প্রণয়-স্নেহ, বাঁধিল কৈলাস-গেহ,
> পাগলে করিলে গৃহী, ভূতে মহেশ্বর!
>
> [অক্ষয়কুমার বড়াল]

এখানেও কবি নারী ও পুরুষের ঐ বিপরীত প্রকৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, এবং নারীর ঐ আকর্ষণই যে সংসার-রচনার, তথা সৃষ্টিরক্ষার হেতু, তাহাও বলিতেছেন। রাজলক্ষ্মীও এই নারী, কিন্তু তাহার সেই প্রকৃতি-শক্তি এখানে ব্যর্থ হইয়াছে, সে 'ভূত'কে মহেশ্বর করিতে পারিল না—ভূত ভূতই রহিয়া গেল।

কিন্তু আমরা এখন সে কথা বলিতেছি না, রাজলক্ষ্মীর প্রেমে সেই দুর্ব্বলতার কথা বলিতেছিলাম। তাহার সেই প্রেম জয়ী হইলেও, সে তাহার প্রেমের গর্ব্ব ত্যাগ করিতে পারে নাই—এই একটি খুঁটি তাহার চাই। কিন্তু বাদ সাধিল কমল-লতা; রাজলক্ষ্মী তাহাকে চিনিতে পারে নাই, সে তাহাকে দেখিয়া একটা অস্পষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনুভব করিল,—ঠিক শ্রীকান্তের বিষয়ে নয়, তাহার সেই প্রেম-সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব-বিষয়ে। আবার, ঠিক ঐ সময়েই শ্রীকান্ত তাহার নিকটে ধরা দিবার ভান করিল, তাহাতেও তাহার সেই প্রেমের গর্ব্ব বাড়িয়া গেল; ঐ মুরারিপুরের আখড়া, আর ঐ বৈষ্ণবী কমল-লতা তাহাকে অতিরিক্ত আত্ম-সচেতন করিয়া তুলিল, ফলে তাহার সেই পূর্ব্বেকার পুরাতন কামনা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। একদিন সে শ্রীকান্তকে বলিল—

"আমার বাঁচা কতটুকু বলো ত যখন চেয়ে দেখি তোমার পানে?
—কিন্তু কালই যে বললে, তোমার মনের সব কালি মুছে গেছে,—আর কোন গ্লানি নেই,—সে কি তবে মিছে?
—মিছেই তো। কালি মুছবে ম'লে,—তার আগে নয়। মরতেও চেয়েছি কিন্তু পারিনে কেবল তোমারই জন্যে।" [ঐ, পৃঃ ১৫৭]

আর একদিন বলিয়াছিল—"কমল-লতা দিদি আর যেন না দাবী করিতে পারে তাঁর পথে-বিপথে বেড়াবার সঙ্গী ব'লে।"

—সে অধিকার তাহার নাই; রাজলক্ষ্মীর প্রেম যে কি বস্তু তাহা ঐ বৈষ্ণবীরা বুঝিবে কেমন করিয়া? তাই কমল-লতার হাতের সেই প্রসাদী মালা সে সদর্পে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। ইহার একাধিক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু সে ঐ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের আধ্যাত্মিক প্রেম কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না, যেন তাহারই প্রতিবাদে তাহার সমস্ত রাজলক্ষ্মী-জীবন নিমেষে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে এমন বিবশ করিয়া ফেলিল। আখড়ার বড় গোঁসাইয়ের কথাও সে সহ্য করিল না; তিনি তাহার প্রেমকে আরও বড়, আরও সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য বলিলেন—

"সত্য প্রেমের কতটুকু বা জানি আমরা? কেবল ছলনায় নিজেদের ভোলাই বই তো নয়। কিন্তু তুমি জানতে পেরেছো ভাই। তাই বলি, তুমি যেদিন এ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করবে আনন্দময়ী—

শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন শিহরিয়া উঠিল, ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল, এমন আশীর্ব্বাদ কোরো না গোঁসাই, এ যেন কপালে না ঘটে। বরঞ্চ আশীর্ব্বাদ করো, এম্‌নি হেসে-খেলেই একদিন যেন ওঁকে রেখে মরতে পারি"। [চতুর্থ পর্ব্ব, পৃঃ ১৯০-৯১]

—এই রাজলক্ষ্মী পরকালের ভাবনায় গুরু-পদ আশ্রয় করিয়াছিল! কিন্তু তাহার ঐ কথা শুনিয়া দেবতাও বোধ হয় অলক্ষ্যে হাসিল। বড় গোঁসাই দুঃখিত হইলেন, হয়তো ইহাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন যে, এত বড় প্রেম একদিন আপনাকে আপনি চিনিবে, তখন কাহারও উপদেশের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু কমল-লতা সকলই বুঝিয়াছিল, সে শ্রীকান্তকে যেমন চিনিয়াছিল, রাজলক্ষ্মীকেও তেমনই চিনিয়াছিল। পরিণাম যে কি হইবে তাহাও সে বোধ হয় জানিত। কিন্তু পরের ভাবনা সে করে না—সে তাহার সাধনা-বিরুদ্ধ; শ্রীকান্তের জন্য তাহার যেটুকু ভাবনা তাহাও সেই পরম প্রেমময়ের চরণে নিবেদন করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মীর আর প্রয়োজন ছিল না—একথা বলিয়াছি, তার কারণ, সে তাহার প্রেমের সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রাণের মধ্যেই লাভ করিয়াছিল। তথাপি ঐ যে তাহার নারী-হৃদয়ের শেষ দুর্ব্বলতা উহাই তাহাকে নারীত্বের মহিমা দান করিয়াছে; দেবীত্ব বড়, কিন্তু নারীত্ব মর্ত্ত্যলোকের একটি মহার্ঘ সম্পদ, উহাই

জন্ম-জরা-মৃত্যুর বেদনাকে সুরভি করিয়াছে ঃ সেই বেদনাকে আপন হৃদয়বৃন্তে ধরিয়া নারীই তাহাতে মধু সঞ্চার করে,—মধু ভোগ করে পুরুষ, কাঁটাগুলি বুকে চাপিয়া রাখে নারী। রাজলক্ষ্মী অমৃতের দ্বারা মৃত্যুকে ঠেকাইবে না, যাতনা এড়াইবে না ; তাই এই জীবনের মৃত্যুভূমিতেই সে তাহার প্রেমের অন্তিম শয্যা পাতিল—শ্রীকান্তের প্রত্যাখ্যান-রূপ যে মৃত্যুকে সে চিরদিন অবধারিত বলিয়া জানিত, আজ সে অমৃত আস্বাদন করিয়াও সেই মৃত্যু-লোভ ত্যাগ করিল না—মোহই মুক্তি অপেক্ষা বড় হইয়া উঠিল।

এই মৃত্যুর ঘটনাটা আমরা উপন্যাসের অসমাপ্ত কাহিনীতে পাই নাই। উহার বাস্তব রূপটা অনুমান করিবার জন্য আমি আবার রাজলক্ষ্মীর পরিচয়—তাহার সেই জীবন, ও নারী-চরিত্রের সকল দিক সংক্ষেপে উপস্থাপিত করিলাম—তাহার বাহিরের ও অন্তরের সেই পরিপূর্ণ নারী-শ্রী পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলাম। শ্রীকান্ত যখন তাহাকে ত্যাগ করিয়া গেল তখন সে তাহার অনুমতি লইয়াই গিয়াছিল। রাজলক্ষ্মী আর কাঁদে নাই, ইহা নিশ্চিত; "বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী" হইবার মত হৃদয় তাহার লঘু নহে। কিন্তু সে কমল-লতাও নয়; এবার যে বিরহ তাহা জন্মান্ত-বিরহই শুধু নয়—আরও কিছু; ইহা একরূপ বৈধব্যও বটে, কারণ শ্রীকান্তও এতদিনে তাহার সেই শ্রীকান্ত-জীবন ত্যাগ করিল। এইরূপ বৈধব্যের নিঃসঙ্গ-বিধুরতা যে কি ভয়ানক, সে যে কতবড় শূন্যতা-বোধ, তাহা একটু চিন্তা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব। তাহার জগৎ যেন লুপ্ত হইয়া গেল, জীবনের কোন গ্রন্থিই আর রহিল না। যতদিন শ্রীকান্ত পুনরায় তাহার পথে আবির্ভূত হয় নাই ততদিন সে যে গ্রন্থিটি দৃঢ় করিয়া সংসারে আপনাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল, আজ এতদিনে তাহাও টুটিল। যে কিশোরী-বালিকা সেই বৈঁচির স্বয়ম্বর-মালায় তাহার বল্লভকে বরণ করিয়া সারা-জীবনকে একটি বাসক-শয্যা করিয়াছিল, সেই বালিকাই তো পিয়ারী বাইজীর মৃত্যুর পর, পূর্ণযৌবনা রাজলক্ষ্মীরূপে এক জন্মেই জন্মান্তর লাভ করিয়াছিল। তাহার হাতের সেই বৈঁচির মালা—যাহা ঠাকুরের প্রসাদী মালার চেয়ে মূল্যবান্—সেই মালা আজ পরাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া গেল। এ ধাক্কা কমল-লতা সহিতে পারে—রাজলক্ষ্মী পারে না।*

কিন্তু উহাই তো রাজলক্ষ্মীর সেই 'প্রাণের ভুল'—

মর্ম্মে বিজড়িত মূল,
—জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী!

—ঐ ভুলই তাহার জীবনকে এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। নহিলে সে তো জানিত, সেই বৈঁচির মালায় সে যাহাকে বরণ করিয়াছিল, তাহাকে বাহিরে পাইবার নয়; সে বিবাহে মন্ত্রপাঠ করিতে হয় নাই, সমাজকে সাক্ষী করিতে হয় নাই। সে নিজেই ছিল তাহার পুরোহিত, তাহার প্রাণ হইয়াছিল নারায়ণ-শিলা, আর সাক্ষী ছিলেন অন্তর্য্যামী। সেই বরও জানিত না, কে তাহাকে কখন বরণ করিল; সেই তাহার না-জানাটাই ছিল—হোমাগ্নিতে কন্যার লাজাঞ্জলি। এ প্রেম গৃহ-সংসারের দম্পতি-প্রেম নয়—ইহাতে ফুলই ফোটে, ফল ধরে না; নিষ্ফল বলিয়া নয়—ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া। রাজলক্ষ্মী সেই সাধনাই করিয়াছে, শ্রীকান্তকে না পাইয়াই সে আরও বড় করিয়া, বেশি করিয়া পাইয়াছে, এই কথা সে বারবার বলিয়াছে। তথাপি ঐ ভুলটাকে সে কিছুতেই লালন না করিয়া পারে নাই; ঐ দাম্পত্য দুইজনে একপাত্রে পান করার সেই যে পিপাসা—একটা জন্মান্তরীণ বাসনার মত তাহাকে বারবার বিফল করিয়াছে। আমার মনে হয়—সংসার ও সমাজ হইতে সেই নিষ্ঠুর নির্ব্বাসনও ইহার একটা কারণ। তাই তাহার জীবনের অন্তস্তলে দুইটি পৃথক ধারা বহিতেছিল; একটা—নারীজীবনের ঐ সহজ স্বাভাবিক ক্ষুধা, সেই ক্ষুধা ঐ দুর্ভাগ্যের পীড়নে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল; আর একটি—তাহার সেই প্রেম, যে-প্রেম সকল কারণ ও সকল বিশেষণ-বর্জ্জিত—যাহা স্বাতীনক্ষত্রের জলবিন্দুর মত কোন্ পুণ্যক্ষণে তাহার বক্ষের শুক্তিপুটে প্রবেশ করিয়াছিল। সারাজীবন তাহার হৃদয়ে এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল। তাহার বাইজী-জীবন ছিল ঐ প্রেমের শবাসন—তান্ত্রিক সাধন-পীঠ; কিন্তু জীবনের সেই অপর ধারা, তাহার সেই গৃহসুখ-পিপাসা ঐ পিয়ারী-বাইজীকে কখনো বরদাস্ত করিতে পারে নাই; অথচ ঐ বাইজী-জীবনের সাধনাই তাহার দেহ-মন-আত্মাকে মথিত করিয়া, সেই প্রেমকে এক মহাশক্তি দান করিয়াছে। মুরারিপুরের আখড়ায় সে যখন কীর্ত্তন গাহিতেছিল তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রেমের যে পরমানন্দ-দীপ্তি উদ্ভাসিত হইতেছিল, তাহা যে সেই সাধনারই শেষ ফল তাহা আমি বলিয়াছি; গৃহস্থ-বধূ হইলে রাজলক্ষ্মী তাহা লাভ করিতে পারিত না; ঐ বাইজী-জীবনই রাজলক্ষ্মী-জীবনের যতকিছু গ্লানি ও কলুষকে 'নিকষিত হেম' করিয়া তুলিয়াছে, উহারই নাম তান্ত্রিক সাধনা।

কিন্তু সেই যে অপর জীবনের পিপাসা—তাহার প্রাণের সেই অবুঝপনা, তাহাই রাজলক্ষ্মীকে কমল-লতা হইতে দেয় নাই; অর্থাৎ তাহার প্রেমকে তত্ত্বরসে শুভ্র-নিরঞ্জন না করিয়া ব্যক্তি-রসে রঙীন করিয়া তুলিয়াছে। উহাই সেই

দুর্ব্বলতা, সেই মোহ,—খাঁটি সোনার সেই খাদ, যাহা ব্যতিরেকে প্রেম সুন্দর হইয়া উঠে না—রূপময় হয় না। প্রেমের ঐ অপর সাধনায় সিদ্ধিলাভ যদি রাজলক্ষ্মীর একমাত্র গৌরব হইত, তবে তাহাকেও আমরা কমল-লতার মত একটা নিরুদ্দেশ মহাপ্রস্থানের পথে মিলাইয়া যাইতে দেখিতাম—তাহার সমগ্র জীবনই একটা রহস্যলোকে বিলীন হইয়া যাইত। অতএব, পিয়ারী বাইজীও যেমন, রাজলক্ষ্মীও তেমনি, দুইয়ে মিলিয়া এই নারীচরিত্রটিকে এমন অসামান্য করিয়াছে। শক্তির সহিত অশক্তির এই যে দ্বন্দ্ব, উহাই মানব-জীবনের রস-রহস্য—উহাই জীবন-মহাকাব্যের—চিরন্তন ট্যাজেডি। রাজলক্ষ্মী জয়ী হইয়াও—অমৃতের সাক্ষাৎ পাইয়াও, পরাজয়কে—মৃত্যুকে পরম আগ্রহে বরণ করিল।

শ্রীকান্ত চলিয়া গেল, কিন্তু সে যাওয়া অন্যবারের মত নয়। এবার সে পশ্চাতে কিছু রাখিয়া গেল না—রাজলক্ষ্মীর ভাব-সাধনার সেই বিগ্রহটাও ভাঙিয়া দিয়া গেল। সে শ্রীকান্তের ভিতরে এমন একটা কিছু দেখিল—যাহা পূর্ব্বে কখনো দেখে নাই, তাহার সেই আত্মগোপনের প্রয়াস; নিস্তেজ, পৌরুষহীন ভীরু মনোভাব। সেই উদাসীন, উচ্চাভিমানী, আত্মচিন্তাবিমুখ মানুষ আর সে নহে—কেমন যেন একটা আত্ম-ভীরু, পলাতক-প্রবৃত্তি অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার সেই অন্তর-দৈন্য রাজলক্ষ্মীর চক্ষু এড়াইল না—ঠিক সেই বস্তুই সে শ্রীকান্তের মধ্যে কখনো দেখে নাই। ইহার পর সে কি বলিবে, কি করিবে? আর একবার এই গঙ্গামাটিতেই সে শ্রীকান্তকে বলিয়াছিল—

"তুমি যাও, তোমাকে আমি কিছুতেই বারণ কোরব না। —এখানকার এই কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন জীবন তো তোমার পক্ষে আত্মহত্যার সমান। আমি চোখের উপর স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি।' [তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৯২]

আজ একথা তাহার মুখে আসিল না; সে স্পষ্টই দেখিতেছে, এ যেন আরেক মানুষ। এইখানে আর একবার শ্রীকান্তের কাহিনীও আদ্যন্ত স্মরণ করিলে ভালো হয়।

রাজলক্ষ্মীর সম্পর্কেই আমরা শ্রীকান্ত-চরিত্রের একটা বিকাশ এ পর্য্যন্ত কিছু বেশি করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি। তাহাতে দেখিলাম অন্নদা-দিদি ও ইন্দ্রনাথের সেই শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর হাতে অশেষ বিড়ম্বনা সহ্য করিয়া, শেষে কমল-লতার মধ্যে নিজ-আত্মার একটা ভিতরকার পরিচয় ধরা পড়িতে দেখিয়া, তাহার সেই শ্রীকান্ত-জীবনের যতকিছু আত্মাভিমান বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তার পরের ইতিহাস আমরা জানি না; কেবল, এই সকল হাঙ্গামের পর, তাহার চরিত্রে—

তাহার সেই বৈরাগ্য, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতির-ও অন্তরালে একটা পলাতক, দায়িত্ব-ভীরু, স্বৈরতান্ত্রিক মনোবৃত্তির—একরূপ নীতিহীনতার—সূক্ষ্ম গ্রন্থি রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। এই 'আমি'টার মুখামুখি সে নিজেও কখনো হয় নাই, তাহার ঐ প্রবল ভাবালুতা ও ভাবুকতা তাহাকে কখনো আত্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত করে নাই। তাহার মন বৈরাগীর মন বটে, কমল-লতা ঠিকই ধরিয়াছে—যদিও সে তাহার অন্তরটা আর এক দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল। রাজলক্ষ্মীও তাহার সেই মনকে একটা বড় মন বলিয়া জানিত, বৈরাগী-মন নয়—আত্মচিন্তাহীন পরার্থপর, স্বাধীনচেতা ও ন্যায়নিষ্ঠ মন বলিয়া জানিত। সেই মন এত বড় যে, সংসারের দুঃখ-দুর্দ্দশা তাহাকে আত্মসুখ-সন্ধানে এমন উদাসীন করিয়াছে, সংসার ও সমাজ-জীবনের প্রতি এমন বিতৃষ্ণ করিয়াছে। শ্রীকান্ত-চরিত্রের এই ধারণাও সত্য: রাজলক্ষ্মী তাহার নারীহৃদয়ের নির্জ্ঞান-বুদ্ধিতে, সেই বালিকা-বয়সেই, শ্রীকান্তের ঐ গুণের পরিচয় পাইয়াছিল, উহাই তাহার প্রেমকে পূজায় পরিণত করিয়া, বল্লভের দুর্ল্লভতাকে সহনীয় করিয়াছিল। আমি আর ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিব না। শ্রীকান্তকে সে চিরদিন বড় করিয়াই দেখিবে—নিজে ছোট হইয়া তাহাকে ছোট করিবে না, ইহাই ছিল তাহার আন্তরিক সংকল্প; অথচ প্রাণের পিপাসাও শান্ত হয় না, ইহাই আমরা দেখিয়াছি। গঙ্গামাটীতে সেই তপস্যার পর, সে যখন শ্রীকান্তকে নিজের জীবন হইতে শেষবার সরাইয়া দিতেছে তখনও তাহার মুখে সেই এক কথা—

"সুনন্দার হইয়া জবাব দিয়া কহিল, ওর ছেলেকে তুমি এই আশীর্ব্বাদ ক'রে যাও, যে বড় হ'য়ে ও তোমার মত মন পায়।" [তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ২০৮]

শ্রীকান্ত-চরিত্রের এই যে বৈশিষ্ট্য—মনের ঐ মহত্ত্ব উহা নারীচরিত্রের বিপরীত, কারণ, ঐরূপ মহত্ত্বের মূলে যে বৈরাগ্য আছে, সেইরূপ বৈরাগ্য নারীর নাই; নারীর মহত্ত্ব ও পুরুষের মহত্ত্ব একরূপ নয়। উহারই কারণের, ঐরূপ উদারতায় যে পৌরুষ তাহারই আকর্ষণে, নারী পুরুষের প্রতি অবশে আকৃষ্ট হয়—অনেক স্থলে আর কোন রূপ-গুণের প্রয়োজন হয় না; পুরুষ-হৃদয়ের মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐরূপ মহত্ত্বই নারীকে মুগ্ধ করে। শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে হয়তো ঐ এক গুণেই এমন 'বাঁধিয়াছিল'। এ তত্ত্বের আলোচনা পূর্ব্বে একবার করিয়াছি, এক্ষণে এই প্রসঙ্গে দার্শনিকপ্রবর শোপেনহাওয়ারের একটি উক্তি মনে পড়িল, তাহাতে ঐরূপ আকর্ষণের একটা প্রাকৃতিক, বা বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা এই—

"And so it happens that a woman frequently loves an ugly man, albeit she never loves an unmanly man, because she cannot neutralise his

defects. ...It is manly firmness of will, determination and courage, and may be honesty and goodness of heart that win a woman for ever; while intellectual qualifications exercise no direct or instinctive power over her, for the simple reason that these are not inherited from the father. A lack of intelligence carries no weight with her in fact a super-abundance of mental power, even genius, as abnormalities, might have an unfavourable effect."

—*Metaphysics of Love*

[তাৎপর্য্য :—"এই জন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, নারী বরং কুৎসিত পুরুষকেও হৃদয় দান করিবে, তবু কাপুরুষকে ভালবাসিবে না; তার কারণ, ঐ পৌরুষের অভাব (সন্তানে) সে নিজ চরিত্রের দ্বারা পূরণ করিতে পারে না।...পুরুষ নারীর হৃদয় জয় করে প্রধানতঃ তাহার চিত্তের দৃঢ়তা, সাহস প্রভৃতি গুণের দ্বারা; হৃদয়ের উদারতা এবং সৎস্বভাবও একটা কারণ হইতে পারে। কিন্তু মেধা বা মস্তিষ্কের গুণাবলী তাহাকে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট করে না; মেধার অভাব সে গ্রাহ্য করে না, বরং পুরুষের সেই শক্তি কিছু অধিক মাত্রায় থাকিলে এমন কি, যাহাকে প্রতিভা বলা হয়—তাহাও নারীর চক্ষে বিসদৃশ বা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তাহার ফল বিপরীত হইয়া থাকে।"]

শোপেনহাউয়ের এখানে সাধারণ নারী-প্রকৃতির কথাই বলিতেছেন, অর্থাৎ নারীমাত্রেরই সহজাত সংস্কারের কথা; আমরা উহারই পূর্ণতর বিকাশ লক্ষ্য করি অসাধারণের মধ্যে; রাজলক্ষ্মীর মধ্যেও সেই নারীস্বভাবের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। তথাপি, শ্রীকান্ত সম্বন্ধে রাজলক্ষ্মীর ঐ যে ধারণা তাহা সত্য হইলেও, উহা সে চরিত্রের একটা দিক—সবটা নহে। কমল-লতাও একপ্রকার রহস্যময় অনুভূতি-যোগে শ্রীকান্তের অন্তরটা যেরূপ দেখিয়া লইয়াছিল তাহাও সত্য, একথা আমরা স্বীকার না করিয়া পারি না। ঐ দুইটার মধ্যে সঙ্গতি স্থাপন করিতে যাওয়াও বৃথা—তাহা সম্ভব নয়। কোন মানুষকে তেমন করিয়া বুঝিয়া লওয়া যায় না, একথা আমি অনেকবার বলিয়াছি। মনুষ্যচরিত্রের এক একটা সাধারণ ছাঁচ বা টাইপ নির্ম্মাণ করা যায়, এবং ব্যক্তি-মানুষের একটা সুসঙ্গত চরিত্র, ঐরূপ ছাঁচে ফেলিয়াই দেখানো যাইতে পারে,—তাহাই আমরা করিয়া থাকি, এবং তাহাতেই কাজ চলিয়া যায়; নিকৃষ্ট কাব্য-নাটকে তাহাই করা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার ঐ সুসঙ্গতিই প্রমাণ করে যে, তাহা ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় নয়। অতএব আমি এই যে চরিত্র-ব্যাখ্যা করিতেছি তাহাতেও সুসঙ্গত বা সুসম্পূর্ণ কিছু আশা করা যাইবে না। তথাপি রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্ত হইতে কমল-লতার শ্রীকান্তে এই যে রূপান্তর, ইহার কারণ আমরা বুঝিয়াছি—উহা সে চরিত্রেরই development বা অবস্থার বশে তাহার একটা পরিণতি; পরিণতি অর্থে, ভিতরে যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল বাহিরে তাহারই বিকাশ। রাজলক্ষ্মী আজ তাহাকে যেমন দেখিতেছে তেমন বোধ হয় কখনো দেখিত না,—যদি ঐ ঘটনাগুলি না ঘটিত, শ্রীকান্তের জীবনও বোধ হয় অন্যরূপ হইত।

আমরা এক্ষণে রাজলক্ষ্মীর সেই দারুণ স্বপ্নভঙ্গের কথা বলিতেছি, তাহার সেই শ্রীকান্ত যতই সত্য হউক, আজিকার ঐ শ্রীকান্তও শ্রীকান্ত; কেবল মানুষটা ভাঙ্গিয়াছে। ভাঙ্গার কারণ, সে এতদিনে আপন জীবনের একটা মহৎ অভাব সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, এবং তাহা স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিয়াছে। সে যে আর রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্ত নয় তাহা সে বুঝিয়াছে, তাই ঐ মিথ্যা হইতে অব্যাহতি পাইতে চায়। ইহার পর রাজলক্ষ্মীর ও রাজলক্ষ্মী-জীবনের অবসান ঘটিবেই। আমরা তাহার যে দুইটা জীবনের কথা বলিয়াছি একটা পিয়ারী-বাইজী ও আর একটা রাজলক্ষ্মী—তাহার প্রথমটা পূর্ব্বেই মরিয়াছে, সে মৃত্যু তাহাকে অমৃতে উত্তীর্ণ করিয়াছে; এইবার রাজলক্ষ্মীরও মৃত্যু হইল, সে মৃত্যু যে কত বড় ট্র্যাজেডি, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইতে হইবে না—কারণ, তাহা অত বড় একটা নারী-জীবনের বাস্তব-ব্যর্থতার শোকাবহ সমাপ্তি। এতদিন শ্রীকান্তকে না পাইয়াও সে হারায় নাই। এবার শ্রীকান্তের শ্রীকান্ত-রূপই আর রহিল না! তাই শ্রীকান্তের শ্রীকান্ত-জীবনের যেই অবসান হইল, অমনি রাজলক্ষ্মীর জীবনেরও অবসান হইবে ইহাই স্বাভাবিক, কারণ, তাহার জীবনে ঐটুকুই অবশিষ্ট ছিল, আর কোন বন্ধনই ছিল না। তথাপি বজ্রদগ্ধ রসালের মত সে হয়তো আরও কিছুকাল খাড়া ছিল, সে কেমন?—

"ও যে হায় আশাহারা কোনমতে ছিল খাড়া,
প্রান্তরের বজ্রদগ্ধ রসালের প্রায়;
ভূমিকম্পে শুষ্কতরু ভূমিতে লুটায়।
চক্ষেতে চাহনি নাই অধরে কাঁপুনি নাই,
বিন্ধ্যাচলে গুহামাঝে বৌদ্ধ-মূর্ত্তি-প্রায়!"

—অশোকগুচ্ছ

তারপর একটা সামান্য অসুখ বা একটা সামান্য ধাক্কায় সে ভূমিসাৎ হইয়াছে—সেই বিবরণ আমরা নাই বা পাইলাম।

ইহার পর কোন একদিন শ্রীকান্ত যখন সেই সংবাদ পাইয়াছিল, তখন, ভূমিকম্পে যেমন ভূমির একদিক ধ্বসিয়া গিয়া আর একদিক ঠেলিয়া ওঠে, তাহার জীবনে তাহাই ঘটিয়া থাকিবে। অন্তরে অনাসক্তি, অথচ আশ্চর্য্য সহানুভূতি ও ভাবালুতা তাহাকে যে কল্পনাশক্তি ও ভাবুকতার অধিকারী করিয়াছিল, তাহাতে সে তাহার পূর্ব্ব-জীবনকে দূর হইতে এক নূতন দৃষ্টিতে দেখিল, জীবনে যাহা আপন করিতে পারে নাই, কবি হইয়া তাহারই অপূর্ব্ব স্বপ্ন সে দেখিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী তাহার ব্যথিত হৃদয়ের বিদ্যুৎ-দৃষ্টিতে ইহাই প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিল—

"আমি পারবো, তুমি পারবে না ; তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হয়েই থাকবে।,"—কি অব্যর্থ ভবিষ্যৎ-বাণী! তখন তাহার সেই দিব্য ভাবাবেশের অবস্থা, প্রেমের অমৃত-রসপানে সে তখন অমর হইয়াছে।

রাজলক্ষ্মীর কথা শেষ করিলাম, কিন্তু ঐ যে তাহার পরিণাম, উহা এক দিক দিয়া সত্য হইলেও, সে-জীবনের আর একটা দিকও আছে—বাহিরের ঘটনাকেই বড় করিয়া দেখিলে চলিবে না। রাজলক্ষ্মী মরিল—মৃত্যু অনিবার্য্য বলিয়াই মরিল, কেন অনিবার্য্য তাহাও আমরা বুঝি ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অতবড় প্রেম কি ব্যর্থ হইতে পারে? যদি মোহভঙ্গই তাহার সেই মৃত্যুর কারণ হয়, জীবনে বিতৃষ্ণা ঘটিয়া থাকে,—তবে সেই মোহভঙ্গে সে তাহার প্রাণের সত্যকেই ফিরিয়া পায় নাই? তাহার হাতের সেই বৈঁচির মালাখানি বাহিরে দুলাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া গেল,—সে আঘাত যত বড় হউক, ভিতরে সেই মালা কখনো শুকায় নাই, মৃত্যুকালেও তাহাই তাহার জপমালা হইয়াছিল,—ইহাই তো সম্ভব। বাঁচিতে সে আর পারে না, কারণ যে-জীবনে সেই মালা আর মিথ্যা হইবে না, সে এ জীবন নয়। তাই সে এখানে আর বসিয়া রহিল না। আমরা ঐ মৃত্যুটাকেই বড় করিয়া দেখি, বুকভাঙা হাহাকারটাই সত্য বলিয়া মনে করি—প্রাণ বিদীর্ণ না হইলে আমাদের প্রাণ তৃপ্তি বোধ করে না, বিরাট ব্যর্থতাকেই অন্তরের অর্ঘ্যদান করি ; যেন বিধাতার বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগকে যতদূর সম্ভব সত্য ও প্রাণস্পর্শী করিয়া তুলিতে পারিলেই, আমাদের জয়লাভ হয়। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর সেইদিকটা আমাদের হৃদয়বেদ্য ও বিশ্বাসযোগ্য বটে ; কিন্তু যে অর্থে ব্যথা ও বেদনা, দুঃখ ও হতাশা মানবতার নিদান বলিয়া মানবতার এত গৌরব, সেই অর্থে ঐরূপ ট্র্যাজেডি বড় ট্র্যাজেডি নয়। সকল দুঃখের উপরে মানুষের মানবতাই বড় হইয়া আছে—তাহা যে কিসের বলে, তাহা আমরা দেখিয়াছি,—সেই প্রেমের মহিমাই সর্ব্বদা ধ্যান করিতে হইবে। ঐ প্রেমই মানুষকে দেবতার অধিক করিয়াছে। ঐ প্রেমের রহস্য দুরবগাহ ; কোন কবি, কোন দার্শনিক, কোন বহুদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার সুসঙ্গত অর্থ করিতে পারেন না—কবি তাহার অসীম বৈচিত্র্য বা অন্তহীন রূপ-বিকাশ মাত্র দেখাইতে পারেন ; আমাদের মত ব্যক্তি উহার যে ব্যাখ্যাই করুক না কেন, তাহার মূল্য কতটুকু? কে বলিতে পারে, রাজলক্ষ্মী সেই মৃত্যুকালেও এমন কথা বলে নাই—

> "সত্যভঙ্গ হবে না বিধির, আমি তাঁর
> পেয়েছি স্বাক্ষর-করা মহা অঙ্গীকার—
> চির-অধিকার-লিপি" ?

তা'ছাড়া, ঐ নারী-হৃদয়-রহস্য বিধাতারও অগোচর। সঙ্গতি-হীনতাই উহার সঙ্গতি, আমরা কিন্তু একটা সঙ্গতি-সাধন করিতে না পারিলে—বুদ্ধির দাবি মিটাইতে না পারিলে—বড়ই অস্বস্তি বোধ করি। রাজলক্ষ্মীর সেই প্রেমকেও আমরা বুদ্ধির দ্বারা মাপিতেছি, হিসাব মিলাইতেছি—তথাপি, আমি তাহাতেও কতকগুলা অবুদ্ধিপনা, অর্থাৎ ভাব-তত্ত্বের আরোপ করিয়াছি, তাহা অনেক বুদ্ধিজীবী পাঠকের রুচিকর হইবে না। আমি ইচ্ছা করিয়াই ঐরূপ করি, না করিলে পাঠক-পাঠিকাকেও ভাবাইয়া তুলিতে পারিব না। আরও কারণ, আমি রাজলক্ষ্মীর এই পরিণাম সকল দিক দিয়াই ব্যাখ্যা করা সঙ্গত মনে করি। আসল কথা, নর-নারীর হৃদয়-রহস্য—সে হৃদয় যদি গভীর হয়—সকল সমাধানের অতীত। আর একটা কথা এই যে, পুরুষের তুলনায় নারী-প্রকৃতি সত্যই দুর্জ্ঞেয়, তাহাতে Contradiction বা বিরোধের অন্ত নাই। ইহার কারণ আমাদের দেশের দার্শনিক চিন্তায় যাহা পাওয়া যায় তাহা আরও রহস্যময়। যাহাকে অবুদ্ধির বুদ্ধি বলে—সেই শক্তি—সৃষ্টির অন্তরবাসিনী সেই 'দুরত্যয়া দৈবীমায়া' ঐ নারী-চরিত্রেই স্ফুরিত হইয়া থাকে; তাই সে চরিত্র বুদ্ধিজীবী পুরুষের চক্ষে চির-প্রহেলিকা হইয়াই আছে; সকল বড় কাব্যে ও নাটকে ঐ নারীই পুরুষকে কতরূপে মুগ্ধ বা বিভ্রান্ত করে! আমাদের তন্ত্রশাস্ত্রে নারীকেই 'প্রকৃতি' বলে, প্রকৃতিই 'শক্তি'; নারী শক্তিরূপিণী, পুরুষ তাহার তুলনায় শিশুর মত দুর্ব্বল, বা পশুর মত অজ্ঞান। ঐ শক্তিরূপিণী প্রকৃতিকে প্রণাম করিয়া আমাদের এক মহা-কবি যাহা বলিয়াছেন—তাহা এখানে স্মরণীয়; এমন কথা বাঙালী কবির মুখেই সম্ভব, ঐ প্রকৃতি-শক্তিকে বাঙালী নানা মন্ত্রে ও নানা তন্ত্রে অর্চ্চনা করিয়াছে। তাই নব্যতন্ত্রের কবি জড়া-প্রকৃতির মধ্যেও সেই শক্তির লীলাই দেখিয়াছেন—

"তুমি জড়-প্রকৃতি। তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, প্রেম নাই—তুমি অশেষ ক্লেশের জননী, অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্ব্বসুখের আকর, সর্ব্বমঙ্গলময়ী সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বকামনা-পূর্ণকারিণী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার।......কেন জীব লইয়া তুমি ক্রীড়া কর, তাহা জানি না; তোমার বুদ্ধি নাই, জ্ঞান নাই, চেতনা নাই; কিন্তু তুমি সর্ব্বময়ী, সর্ব্বকর্ত্রী, সর্ব্বনাশিনী, এবং সর্ব্বশক্তিময়ী। তুমি ঐশী মায়া, তুমি ঈশ্বরের কীর্ত্তি, তুমিই অজেয়। তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম।"

[চন্দ্রশেখর, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ]

—এ কাহার স্তুতি? আশ্চর্য্য নয়!—তন্ত্র নারীকে ঐ শক্তির বিগ্রহ বলিয়াছে। ঐ শক্তি শুধুই বহুরূপা নয়, এক এক রূপেও বহু,—তাই তাহার বিশেষণগুলিতে কোন সঙ্গতি নাই। তাই উহা বুদ্ধির অতীত, বুদ্ধির অতীত

বলিয়াই উহার নাম 'মায়া'। জ্ঞানীর নিকটে ঐ শক্তিই অবিদ্যা। কিন্তু শক্তি-সাধক ঐরূপ জ্ঞানকেও একটা মিথ্যা সংস্কার বলিয়া মনে করেন, এবং ঐ শক্তির আরাধনা করিয়াই সর্ব্বসংস্কারমুক্ত হইতে চান। আমরা বলিব, ঐ শক্তিকে বুদ্ধিগোচর নয়, হৃদয়গোচর করা যায়, তাহার একমাত্র উপায়—প্রেম।

তত্ত্ব যেমনই হউক—এ কথা সত্য যে, পুরুষের যুক্তিশাস্ত্র ও নীতিজ্ঞান নারী-চরিত্রের কিনারা করিতে না পারিয়া উহাকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছে। পুরুষের বুদ্ধি যতই ক্ষুরধার হউক, তাহার কল্পনা যতই বিরাট হউক, এবং চরিত্র যতই ব্যক্তিতে বিশিষ্ট হউক, তথাপি তাহার কার্য্যকলাপের একটা কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু নারীর সম্পর্কে ইহার ব্যতিক্রম প্রায়ই চোখে পড়ে। এইজন্য 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী', 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্' প্রভৃতি নীতিবাক্য বড়ই উপাদেয় হইয়াছে; এইজন্য নারী-প্রকৃতি অতিশয় 'irrational,' এমন কি, উহাদের নাকি আত্মা নাই—এমন সকল গভীর উক্তিও প্রচলিত হইয়াছে। জর্ম্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ের নারীর মধ্যে প্রকৃতির একটা কারসাজি মাত্র দেখিয়াছেন। মহাকবি শেকস্‌পীয়ার তাঁহার "এ্যাণ্টনী ও ক্লিওপেট্রা"-নাটকে নারীর যে মূর্ত্তি তাঁহার দিব্যদৃষ্টির বলে সেই একটিবার মাত্র আভাসে ধরিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে পাশ্চাত্য রসিক-মনীষিগণ—বিশেষ করিয়া, বৈষয়িক বুদ্ধিতে যাহারা অগ্রগণ্য সেই সু-নীতিনিষ্ঠ ইংরেজ-সমাজ হতচকিত হইয়াছে; নারী-প্রেমের সেই ভৈরবী লীলার কোন সদর্থ করিতে না পারিয়া তাহাকে কবি-কল্পনার একটা দিব্যোন্মাদ বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছে। কিন্তু কবির ঐ সৃষ্টি একটা খেয়ালী সৃষ্টি নয়, সর্ব্বনীতি ও সর্ব্বযুক্তির নিরসনকারী একটা তত্ত্ব ঐ নারী-চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধারণ পুরুষ এ সত্যের নাগাল পাইবে না, যোগীরাও উহা দেখিতে চাহিবে না; একমাত্র তন্ত্রে উহার ব্যাখ্যা মিলিবে। শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসে যে কয়েকটি বিশিষ্ট নারীচরিত্রের ভূমিকা আছে, তাহারা সকলেই এমনই রহস্যময়ী,—অন্নদা-দিদি, কমল-লতা, রাজলক্ষ্মী, ইহাদের কেহই পুরুষ-বুদ্ধির বিদ্যা, নীতিজ্ঞান বা যুক্তিশক্তির অধিগম্য নয়, শ্রীকান্তের দুর্ভাগ্য যে, সে তাহার খাঁটি পুরুষাভিমান লইয়া একে একে এইগুলির সম্মুখীন হইতে বাধ্য হইয়াছে; 'অভয়া' যাহার চক্ষে আদর্শ-নারী, সে যে ইহাদের মধ্যে পড়িয়া এমন বিড়ম্বনা লাভ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? তথাপি, এই নারী-চরিত্রগুলির যে-চিত্র শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্র, অর্থাৎ পরবর্ত্তী কালের শিল্পী শরৎচন্দ্র যে-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে একাধারে শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্র এই দুইয়ের

শক্তি—একের সাক্ষাৎ অনুভূতি, ও অপরের কবি-দৃষ্টি যুক্ত হইয়াছে; নায়ক শ্রীকান্ত ও লেখক শরৎচন্দ্র, দুইয়ের এই সহযোগিতা বড়ই হিতকর হইয়াছে,—চরিত্রগুলি আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য, এগুলিতে নারী-চরিত্রের ঐ রহস্য রহস্য হইয়াই আছে, সেই রহস্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উহাদের মধ্যে রাজলক্ষ্মীই আমাদের আদর্শ অনেক পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে; তার কারণ, তাহার হৃদয়ের গভীরতাও যেমন, তেমনই সে সমাজনীতি ও ধর্ম্ম-নীতির শাসন মানিয়াছে, অর্থাৎ সে বুদ্ধিমতীও বটে। তাই তাহাকে আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে। রাজলক্ষ্মী জীবনধর্ম্ম পালন করিয়াছে; কিন্তু নারীর সেই বিশুদ্ধ প্রকৃতি-ধর্ম্ম অন্যরূপ; তাই কমল-লতাকে আমরা বুঝি না, রাজলক্ষ্মীকে বুঝি—তাহার জীবনের ঐ ট্র্যাজেডি আমাদিগকে অভিভূত করে।

কিন্তু রাজলক্ষ্মীর জীবনের ট্র্যাজেডি এত সরল নয়; ঐ ক্রুশকাষ্ঠে বদ্ধ থাকিয়াই সে তাহার নারী-প্রকৃতিকেও চরিতার্থ করিয়াছে, তাহাও আমি দেখাইয়াছি—তাহার জীবনে ঐ দুই ধারার দ্বন্দ্ব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি, পারিয়াছি কিনা জানি না। ঐ দ্বন্দ্বই সেই অসঙ্গতি, এবং নারীপ্রকৃতিতে তাহা আদৌ বিস্ময়কর নহে। জয় ও পরাজয়, মৃত্যু ও অমৃত, মোহ ও দিব্যজ্ঞান—তাহার জীবনে একই সঙ্গে বরাবর বিদ্যমান; তাহাতে আমাদের বুদ্ধি বিব্রত হয়, কিন্তু নারীর পক্ষে উহাই স্বাভাবিক। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি—সঙ্গতিহীনতাই উহার সঙ্গতি; অতএব যুক্তিতর্কের বন্ধনমুক্ত হইয়া যাঁহারা স্বাধীন ভাবলোকেও একটু বিচরণ করিতে রাজী আছেন, তাঁহারা—আমি যদি রাজলক্ষ্মীর কাহিনীতেও, সর্ব্বশেষে একটু ভাব-তত্ত্বের আমদানি করি, তবে তাহা যেন প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া না দেন, রাজলক্ষ্মীর মধ্যেও যদি সেই কমল-লতা উঁকি দেয় তবে তাঁহারা যেন শিহরিয়া না উঠেন। না, রাজলক্ষ্মী এই হিসাবে কমল-লতা নয় যে, সে শেষ পর্য্যন্ত সংসারকে, জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে নাই; তথাপি খুব ভিতরে দৃষ্টি করিলে আমরা কি সেই একই তত্ত্বের আভাস পাই না?—সাধনার পন্থা যতই ভিন্ন হউক। সেই তত্ত্বকে যে-কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখা যায় না—মন বারণ করিলেও, প্রাণ সে বাধা মানে না। উপায় কি? একদিকে জীবনের প্রখর দিবালোক, আর একদিকে মৃত্যু-নিশীথের অপরূপ রহস্য-গম্ভীর ছায়া; একদিকে কামনার ভাস্বর দেহকান্তি, অপরদিকে ঐ প্রেমের—আত্মার আত্মোৎসর্গের—একটি অশরীরী দিব্যদ্যুতি। তাই আমি, এত কথার পরেও রাজলক্ষ্মীর ঐ পরিণামকে আরতি করিবার জন্য, এবার আর একজন লেখকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া এ প্রসঙ্গ

শেষ করিব ; পাঠক-পাঠিকারা মিলাইয়া দেখিবেন—ইহাও রাজলক্ষ্মীর ঐ জীবন ও জীবন-শেষের পক্ষে সত্য কিনা।—

"চণ্ডীদাস বলিয়াছেন, 'প্রণয় করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-অঙ্গ পায় না সে'। যাহাকে প্রেম দিয়াছ তাহা হইতে সে প্রেম আর ফিরাইয়া লইতে পারিবে না—সে ব্যভিচারী হউক, আর ব্যভিচারিণী হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। সাংসারিক সুখ হয়তো হইল না, হয় তো প্রেমের পাত্র বা পাত্রী পুনরায় নির্ব্বাচন করিলে ঘরকন্না সুখের হইত। কিন্তু সহজিয়া সে সুখ চায় না।··· দানধর্ম্ম ইহা নহে, দান করিয়া তুমি নিঃস্ব হইতে পার দ্বিতীয় হরিশ্চন্দ্রের মত ; কিন্তু প্রেমকে যিনি সাধনার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া গিয়াছেন। দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া তাঁহাকে সাধনার পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে ; প্রেম আদান-প্রদানের—কারবারের বা বিনিময়ের সামগ্রী নহে। যিনি শেষ রক্ষা করিতে পারিবেন না, তিনি সাধন-অঙ্গ পাইবেন না"।

[দীনেশচন্দ্র সেন, "বৃহৎবঙ্গ" পৃঃ ৭৭৫]

ইহাই নাকি প্রেমের সহজিয়া সাধনা। কিন্তু উহার ঐ মূল তত্ত্বটা নারীর জীবনে কোন সাধন-মার্গের সাধনা নয়—নারীর পক্ষে উহা এমনই 'সহজ'। তাহার জীবনই তো ঐরূপ সাধনা, পৃথক একটা সাধন-পন্থার প্রয়োজন কি? উপরের ঐ কথাগুলি অন্নদা-দিদির পক্ষেও যেমন, রাজলক্ষ্মীর পক্ষেও তেমনই সমান সত্য নয় কি? কেবল ঐ সুখ-দুঃখের অতীত হওয়ার কথাটা একটু ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের দুঃখটা উভয়ের পক্ষেই সত্য,—উহাদের কেহই সুখ-দুঃখের অতীত হইতে পারে নাই; কিন্তু সেইজন্য তাহাদের প্রেম আরও গরীয়ান। ঐ দুঃখকে উহারা বুক পাতিয়া লইয়াছিল, তাহাকেই সম্বল করিয়া এক অপূর্ব্ব সুখ আস্বাদন করিত। উহাকে যদি সাধনা বলা যায়, তবে সেই সাধনা ভাবজীবনের নয়—বাস্তব-জীবনের ; ঐ তত্ত্বটাও জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নয়—রক্তমাংসের দেহ-সম্পর্ক তাহাতে আছে, সেই সম্পর্কই তো দুঃখকে ভুলিতে দেয় না। কমল-লতা দেহ ছাড়িয়া ঐ তত্ত্বটাকে আশ্রয় করিয়াছে : কিন্তু তত্ত্ব একই। আমরা আশ্চর্য্য হই এই ভাবিয়া যে, উহা কি তবে নারী-প্রকৃতির স্বভাব-ধর্ম্ম? সেই প্রকৃতি হইতেই কি ঐ তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে? পুরুষের বুদ্ধিতে যাহা আদিতে তত্ত্ব, পরে একটা সাধনাগত উপলব্ধি,—নারীর পক্ষে তাহাই 'সহজ'। অন্নদা, রাজলক্ষ্মী ও কমল-লতা—তিন নারীই তাহাদের সেই এক নারী-প্রকৃতির একই গূঢ় ও প্রবলতম প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়াছে ; দুইজন দুঃখকে স্বীকার করিয়া প্রেমকে জীবনের সহিত যুক্ত করিয়া,—রক্তমাংসের বিগ্রহরূপে তাহার ভজনা করিয়াছে ; আর ঐ একজন দুঃখকে অস্বীকার করিয়া প্রেমকে নক্ষত্রলোকে স্থাপন করিয়াছে ; অথবা, তাহার দুঃখ এত বড় যে, সংসারে কোথাও তাহাকে বসাইবার স্থান নাই, ঐরূপে স্বীকার করিলেই তাহাকে ছোট করা হয়। অতএব, এই কাহিনীতে আমরা, প্রেম, নারী ও দুঃখ—এই তিনকে অবিচ্ছেদ্যরূপে দেখিলাম, এবং ঐ তিনের কোনটাই কম 'মিষ্টিক' নহে।

(৪)

অভয়া

"দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি' রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই ; অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি।"

—চিত্রাঙ্গদা

এই কাহিনীর মধ্যে যে আরও কয়েকটি নারী-চরিত্র আছে তাহাদের মধ্যে একটি—মূল-কাহিনীর পক্ষে না হইলেও, শ্রীকান্তের আত্মচরিতের উপকরণ হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। আমি অভয়ার কথা বলিতেছি। এই অভয়া-চরিত্রটি অবলম্বন করিয়া শ্রীকান্ত—সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালের শরৎচন্দ্র—তাহার একটি মানস-ধর্ম্ম ব্যক্ত করিয়াছে। অন্নদা, রাজলক্ষ্মী ও কমল-লতায় এই উপন্যাসের রসধারা যে পথে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং তাহাতেই ইহাকে ভাবের একটি গভীরতর ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া যে একরূপ সম্পূর্ণতা দান করিয়াছে—শ্রীকান্তের ঐ একান্ত নিজস্ব ব্যক্তিগত মনোভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; সেই দ্বন্দ্ব এখানে অন্তরের দ্বন্দ্ব না হইয়া একটা বাদানুবাদের আকার ধারণ করিয়াছে ; তাই নর-নারীর চিরন্তন হৃদয়-রহস্যকে ঘনীভূত না করিয়া উহা একটা সামাজিক সমস্যাকেই তীক্ষ্ণ ও উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছে। এইজন্যই আমি এ পর্য্যন্ত ঐ অভয়া-চরিত্রটিকে সাবধানে দূরে রাখিয়া, সেই হৃদয়ারণ্যের গভীর গহনে বিচরণ করিয়াছি। কিন্তু যেহেতু ঐ চরিত্র একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে, অতএব সেই সমস্যার দাবী স্বীকার করিয়াই আমি উহাকে একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিব, এবং সেই উপলক্ষ্যে আমাদের সেই রস-দেবতাটিকেও আর একবার প্রদক্ষিণ করিয়া লইব।

অভয়ার যে চরিত্র আমরা এই কাহিনীতে এমন বড় করিয়া চিত্রিত হইতে দেখি, তাহাতে আর একটি নারী-চরিত্রের সম্বন্ধে শ্রীকান্তের অনুরূপ মনোভাব লক্ষ্য না করিয়া পারি না। অভয়া ও সুনন্দা এই দুইটি নারীর প্রতি তাহার একটা স্বাভাবিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে—ঐ দুইটির মধ্যে সে যেন নিজ চিত্তের

একটা নিঃশ্বাস ফেলিবার স্থান পাইয়াছে। শ্রীকান্ত নারীর দুঃখ সহ্য করিবার শক্তিকে শ্রদ্ধা না করিয়া পারে না, কিন্তু সেই শক্তির মূলে যদি একটা মোহ থাকে তাহা হইলে সে স্বস্তি বোধ করে না। কিন্তু যেখানে ঐ প্রেমেরও উপরে ন্যায়নিষ্ঠা, আত্মমর্য্যাদা-বোধ বা সত্যপরায়ণতার মনোবল তাহাকে ঐরূপ দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দান করে, সেইখানে সে বড়ই চিত্তপ্রসাদ অনুভব করে, তেমন নারীকে সে অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন না করিয়া পারে না। অন্নদা, সুনন্দা ও অভয়া এই তিনের মধ্যে যে দুঃখের তিনটি রূপ দেখিয়াছিল; অন্নদাকে সে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার সেই আত্মোৎসর্গ—আগুনের মধ্যে পদ্মাসন করিয়া বসার সেই অলৌকিক বা অমানুষিক সহ্য-শক্তি—শ্রীকান্তকে এমন একটা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল যে তাহার প্রভাব সে সারাজীবনে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। আমার বিশ্বাস, সেই হইতেই সে এক-তরফা দাম্পত্যকে একরূপ অন্ধসংস্কারের বশ্যতা বলিয়াই মনে করিত; অথচ ঐ অন্ধসংস্কার নারীকে এতখানি ত্যাগশক্তির অধিকারিণী করে বলিয়া তাহার প্রতি একটা সভয় ভক্তি কখনো ত্যাগ করিতে পারে নাই। সে বলিয়াছে—

"পতিই সতীর একমাত্র দেবতা কিনা, এ বিষয়ে আমার মতামত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নাই, তাহার আবশ্যকতাও দেখি না। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীণ সতীধর্ম্মের একটা অপূর্ব্বতম দুঃসহ দুঃখ, ও একান্ত অন্যায়ের মধ্যেও তাহার অভ্রভেদী বিরাট মহিমা—যাহা আমার অন্নদা-দিদির স্মৃতির সঙ্গে চিরদিন মনের ভিতরে জড়াইয়া আছে, এবং চোখে না দেখিলে যাহার অসহ্য সৌন্দর্য্য ধারণা করাই যায় না—যাহা একই সঙ্গে নারীকে অতিক্ষুদ্র এবং অতিবৃহৎ করিয়াছে,—আমার সেই যে অব্যক্ত উপলব্ধি—তাহাই আজ এই অভয়ার চিঠিতে আবার আলোড়িত হইয়া উঠিল।"

[দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ৯৫]

—ঐ যে বলিয়াছে "নারীকে অতিক্ষুদ্র এবং অতিবৃহৎ করিয়াছে'—উহাতেই তাহার সেই মনোভাব পূর্ণ ব্যক্ত হইয়াছে। ঐ অন্ধসংস্কারটাকে সে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারে না, তাহাতে—এতখানি শক্তি যুক্ত হইতে দেখিয়া তাহার সংশয় রহিয়া যায়। সুনন্দার জীবনে ঐ প্রশ্নের কোন বালাই নাই, দাম্পত্যের দিক দিয়া কোন চিন্তার কারণই তাহাতে ছিল না। তাই সেখানে ঐ নারীর চরিত্রে ন্যায়বুদ্ধির যে মুক্ত-স্বাধীন বিকাশ সে দেখিয়াছিল—একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐ অবলা পল্লীবাসিনী, প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষিতা রমণীর যে দৃপ্ত প্রতিবাদ ও তজ্জন্য যে অসীম আত্ম-নিগ্রহ সে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহাতে বড়ই মুগ্ধ হইয়াছিল। অন্নদাকে সে বুঝিতে পারে না, তাহার সেই আত্মনিগ্রহ সকল নীতিশাস্ত্র ও যুক্তিশাস্ত্রকে ব্যর্থ করিয়াছিল। কিন্তু এখানে শুধুই ত্যাগের কৃচ্ছ্রতাসাধন নয়—

ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ন্যায়নিষ্ঠার তেজস্বিতা আছে, শ্রীকান্ত উহাকেই প্রেম প্রভৃতির উচ্চে স্থান দিবে। আমি এই কাহিনীতে সুনন্দা সম্বন্ধে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন বোধ করি নাই; শ্রীকান্ত-চরিত্র বুঝিবার পক্ষে ঐ মেয়েটির কথা এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু অভয়াকে এত সংক্ষেপে বিদায় দেওয়া যাইবে না, তার কারণ, শ্রীকান্ত এই নারীকে তাহার বিদ্রোহ বা যুদ্ধের একটা বড় অস্ত্র করিয়া তুলিয়াছে। একটা অন্যায় ও হৃদয়হীন সমাজব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট ঐ যে অন্ধসংস্কার—নারীর ঐ নিরর্থক ও নির্ব্বিচার দুঃখসহনশীলতা—শ্রীকান্ত অভয়ার মধ্যেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার তেজস্বিতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া সেই প্রথম বড় আশ্বাস ও উৎসাহ বোধ করিয়াছে। নারীর এই নৈতিক তেজস্বিতাকে সে সুনন্দার মধ্যেও আর এক রূপে দেখিয়াছিল, কিন্তু সেখানে সমাজের সহিত এমন যুদ্ধ করিতে-হয় নাই। এই যে তেজস্বিতা, ইহাতে মনের মুক্তিও যেমন, হৃদয়ের উদারতাও তেমনই একসঙ্গে যুক্ত থাকে—অন্ততঃ অভয়ার চরিত্রে সে তাহাই দেখিয়াছিল। ইহার সহিত তুলনায় রাজলক্ষ্মী নিতান্তই মোহাচ্ছন্ন; রাজলক্ষ্মীর হৃদয়ের গভীরতা থাকিলেও প্রশস্ততা নাই, সে মুক্ত নয়—বদ্ধ।

কিন্তু এই অভয়ার চরিত্র সে যেরূপ চিত্রিত করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না যে, এই একটি জায়গায় শ্রীকান্ত বাহিরের মানুষকে আত্মভাবমুক্ত হইয়া দেখিবার সেই শিল্পী-মন হারাইয়াছে। সে তাহাকে আপনার মনোগত একটা কামনার প্রতীক করিয়া লইয়াছে। অতিশয় কল্পনাপ্রবণ চিত্ত যদি কোন একটা ভাবকে বাস্তবে সাক্ষাৎ-দর্শন করিতে উদ্‌গ্রীব হয়, তবে কোথাও তাহার একটু ইঙ্গিত বা আভাসমাত্র পাইলে, তাহাকেই সেই ভাবের পূর্ণ প্রতিকৃতি বলিয়া বরণ করে; এইরূপ অবাস্তবে বাস্তব-বুদ্ধি সাধারণ জীবনে ক্ষুদ্রতর ব্যাপারেও ঘটিয়া থাকে। রাজলক্ষ্মীর সেই প্রেমের তপস্যা ও আত্মনিগ্রহ তাহাকে আরও অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে ঐ অভয়াকে দেখিয়া, তাহার সহিত সামান্য পরিচয়েই সে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিয়াছিল, এই নারীই তাহার 'মানসী'। শ্রীকান্তের মানসী এইরূপ শরীরী হইয়া উঠার প্রসঙ্গে একটি বিখ্যাত সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত মনে পড়িয়া গেল। ইংরেজ কবি শেলীও এইরূপ একটি রক্তমাংসের মানবীর মধ্যে তাঁহার সেই আকাশবাসিনী মানসীকে আবির্ভূত হইতে দেখিয়া আহ্লাদে অধীর হইয়াছিলেন। অবশ্য তুলনাটা কিছু অতিরিক্ত হইয়া গেল, কিন্তু আসলে শ্রীকান্ত তাহার Amelia Viviani-কেও ঐ অভয়ার মধ্যে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়াছিল, তাহার প্রাণ তাহাতে চরিতার্থ হইয়াছিল। কেবল, তাহার

কল্পনা শেলীর মত নিতান্তই আকাশমুখী নয় বলিয়া, তাহাতে খড়-মাটীর অংশও ছিল, তাই সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নভঙ্গ হয় নাই। অভয়ার দাম্পত্য-জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাস কি তাহা আমরা জানি না, শ্রীকান্তও বোধ হয় তাহা জানিতে চাহে নাই; তবে কাহিনীর শেষের দিকে, সেই কমললতা-পর্ব্বে সে যে একবারও তাহাকে স্মরণ করে নাই, ইহা নিশ্চিত।

অভয়ার দুইটি গুণ তাহাকে এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী করিয়াছিল; প্রথম, তাহার অতিশয় সপ্রতিভ, নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার; দ্বিতীয়, তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কর্ম্মকুশলতা। আসলে তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তাই তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য; কারণ, শ্রীকান্ত ইতিপূর্ব্বে যে দুইজন নারীকে উত্তমরূপে দেখিবার ও চিনিবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাতে নারীর ঐ প্রকৃতি যে আদৌ অসাধারণ নয়, বরং উহাই সকল সুস্থ নারীপ্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ—অতিশয় লজ্জাশীলা কুলবধূও বিপদে পড়িলে ঐরূপ সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকে, সকল অভ্যস্ত সংস্কার মুহূর্ত্তে ঝাড়িয়া ফেলে—ইহা তাহার অজ্ঞাত থাকিবার কথা নয়। নারী-বিদ্বেষী শোপেনহাউএর-ও ও নিন্দার ছলে নারীর এই স্বভাবের প্রশংসা করিয়াছেন, যথা—

"To consult women in matters of diffiiculty as Germans used to do in old times, is by no means a matter to be overlooked, for their way of grasping a thing is quite different from ours ; chiefly because they like the shortest way to the point, and usually keep their attention fixed upon what lies nearest ; while we as a rule, see beyond it, for the reason that it lies under our nose......This is why they see nothing more in things than is really there ; while we, if our passions are roused, slightly exaggerate or add to our imagination".

—*Essay on Woman*

অভয়ার চরিত্রে এই নারীসুলভ সাধারণ লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের আরও কারণ এই যে, শ্রীকান্ত অন্নদা ও রাজলক্ষ্মীর মত নারী দেখিয়াছে; অন্নদার কথা ছাড়িয়া দিলেও, রাজলক্ষ্মীর শুধু হৃদয় নয়, তাহার বুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা, মনের শক্তি ও চরিত্রের সংযম অতুলনীয় বলিলেও হয়। কিন্তু শ্রীকান্ত যাহা যেমনটি চায় উহাদের মধ্যে তাহা পায় নাই,—সেই তেজস্বিতা; সমাজ-নীতি বা সমাজ-শাসনের উপরে নারীর মর্য্যাদাকে জয়ী করিবার দৃপ্ত তেজ ও তদনুযায়ী মনস্বিতা তাহাদের নাই। সে নারীর মধ্যে নারী-শক্তির বিকাশ দেখিলে খুসী হয় না, বরং সেই নারীত্বই তাহাকে হতাশ করিয়াছে। সে চায়

নারীর মধ্যে পুরুষের মত পৌরুষ, বিচার-বুদ্ধি ও নৈতিক দৃঢ়তা। কিন্তু অভয়া কি সত্যই সেইরূপ পুরুষপ্রকৃতিসম্পন্না নারী? শ্রীকান্ত তাহাকে সেইরূপ একটি চরিত্ররূপেই চিত্রিত করিয়াছে, সে তাহাকে—তাহার সকল আচরণকে দোষমুক্ত করিবার জন্য, তাহার পত্নীজীবনের অমানুষিক নিগ্রহ নিপুণ ঔপন্যাসিকের মতই হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু অপর দিকে তাহার মুখে এমন সকল বক্তৃতা সন্নিবিষ্ট করিয়াছে, যাহা নারীহৃদয়ের অনুভূতি-প্রসূত নয়, পুরুষসুলভ মস্তিষ্ক-প্রসূত। বস্তুতঃ, তাহার মুখের ঐ বক্তৃতাগুলিতে শ্রীকান্ত কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে, নিজেই নিজেকে ডিঙাইয়া ভাবের ডিগ্‌বাজি খাইয়াছে। উপরে শোপেনহাউএরের ঐ উক্তিতে যে আছে—"Women are more sober in their judgment than we," এবং "if our passions are roused, we slightly exaggerate or add to our imagination"—ইহা যে কত সত্য, শ্রীকান্ত তাহাই প্রমাণ করিয়াছে। সে সাধারণ পুরুষের চেয়ে অনেক বেশি সেন্টিমেণ্টাল, তাই slightly নয়, অত্যধিক exaggerate করিয়াছে।

পাঠক-পাঠিকাগণ যেন মনে না করেন যে, আমি ঐ সমাজ-নিগৃহীতা, স্বামী-পরিত্যক্তা, অসহায়া বঙ্গনারীর প্রতি, আমার গোঁড়া হিন্দু-সংস্কারের বশে বড়ই কঠোর হইয়াছি। আদৌ নহে। আমি অভয়ার বুদ্ধিমত্তা ও সৎসাহস এই দুয়েরই প্রশংসা করি, এবং সে তাহার ঐ অবস্থায় যাহা করিয়াছে তাহার যদি সমর্থন নাও করি, তথাপি শ্রীকান্তের মতই, আমি তাহাকে কোন শ্রেয়ঃপন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারিতাম না। অভয়া তাহার ঐ অবস্থা-সঙ্কটে যাহা করিয়াছে তাহা জীবধর্ম্মের বশেই করিয়াছে,—বাঁচিবার অধিকার সকলেরই আছে। সে যে অতিশয় নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছিল, একটা আশ্রয় তাহার চাই-ই, এবং সেই আশ্রয় তাহাকে নিজেই করিয়া লইতে হইবে—অর্থাৎ সমস্যাটা মূলে economic, নারীর জীবিকা-সমস্যা,—তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু সেই সমস্যাকে ঐ নারী যে মহত্তর আদর্শ ও উচ্চ-নীতির মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে—তাহা ঐ চরিত্রে, ঐ অবস্থায় এবং ঐ ঘটনায় সত্য হইয়া উঠে নাই। স্বামীর প্রতি প্রেম তাহার ছিল না নিশ্চয়; থাকিবার কোন হেতু নাই, কয়জন স্ত্রীর সেইরূপ প্রেম থাকে? প্রেম কখনই এমন সুলভ নয়। প্রেম বলিতে যাহা বুঝায় তাহার দাবি সমাজ বা বিবাহিত জীবন কখনো মিটাইতে পারে না; আবার যদি তাহা কোথাও জন্মে তাহার সম্পর্কে নীতিজ্ঞান বা ন্যায়-অন্যায়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। অভয়া তথাপি কেবল সতীধর্ম্ম-পালনের জন্যই স্বামীর সন্ধানে ছুটিয়াছিল, এমন কথা বলা যায় না;

সে একটা আশ্রয় ও জীবিকার প্রয়োজনেই উহা করিয়াছিল,—ঐ স্বামীই সমাজবিধি অনুসারে তাহার জন্য দায়ী। তাই প্রথমে, সে যে-স্বামীকে ভালবাসে না সেই স্বামীর ভর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া, অর্থাৎ তাহার সেবা করিয়া নিজের ভরণ-পোষণ আদায় করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাকে ধরিতে গিয়াছিল। সে নিজে সমাজের বিধি শিরোধার্য্য করিয়া, তাহার স্বামীকেও সেই বিধি পালন করিবার সুযোগ দিবে—নিজের ঐ মোকদ্দমাটি উত্তমরূপে গড়িয়া তুলিবার যে সতর্কতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় সে দিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে বিস্মিত করে। সে নিজে একটা বড় ত্যাগ স্বীকার করিবে,—ভালবাসা তো পরের কথা—যাহাকে সে শ্রদ্ধা করে না, করিতে পারে না—তাহার দাসীত্ব করিবে। ঐরূপ নারীর পক্ষে (আমরা পরে যে পরিচয় পাই) এমন সঙ্কল্প সত্য বা আন্তরিক হইতে পারে না। তাহার স্বামী যে তাহাকে গ্রহণ করিবে না তাহা সে জানিত; যদি বা সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকিয়া থাকে তবু যখন সে শ্রীকান্তের মুখে তাহার স্বামীর বর্ত্তমান জীবন-যাত্রার বিবরণ শুনিল, তখন সে যে সকল আশা ত্যাগ করিয়াছিল ইহা নিশ্চিত। কিন্তু সে তাহার মোকদ্দমাটি পাকা করিয়া লইতে চায়; পরে কি করিবে তাহাও সে জানিত, শুধু জানা নয়, একেবারে সকল ব্যবস্থা বহুপূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, নহিলে রোহিণীর সঙ্গেই গৃহত্যাগ করিত না। রোহিণীর সহিত তাহার সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা বাহিরে প্রকাশ না করিলেও সে ভালরূপই জানিত, স্ত্রীলোকমাত্রেই সে বিষয়ে ভুল করে না। স্বামীর জীবন ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ঐ সংবাদ পাওয়ার পরেও সে যখন তাহার গৃহে যাইতে সম্মত হইল, এবং পরে সেই স্বামীর দ্বারা লাঞ্ছিত ও বিতাড়িত হওয়ার পর সে যখন রোহিণীর নিকটে ফিরিয়া আসিল, তখন ইহাই কি সত্য বলিয়া মনে হয় না যে, রোহিণীকেই সে শেষ আশ্রয় বলিয়া জানিত, অর্থাৎ সে রোহিণীকে অনেক পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিল? তবে যে এত কাণ্ড সে করিল তার একাধিক কারণ ছিল; সতীত্ব ও সমাজ-শাসন এই দুইকেই মোকদ্দমায় হারাইয়া সে নিজের অপরাধ ক্ষালন করিয়া লইল—ন্যায়-ধর্ম্মের, স্বাধীন বিবেকের উপরে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিল। ঐ স্বাধীন-বিবেক বা ন্যায়ধর্ম্মের প্রতি যাহার এমন নিষ্ঠা, সেই ব্যক্তিও সমাজ-বিধানের পাতিব্রত্য-পালনে—মনে না হউক দেহে—সাধ্যমত প্রস্তুত ছিল, ইহার জন্যই সে এত বিপদ, এত কষ্ট, এবং শেষে এত লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াছিল—কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। যদি তাহাই হয়, তবে অভয়ার মত নারীর পক্ষে উহা একটা মিথ্যাচার নহে কি? তাহার ঐরূপ আচরণ—স্বামীর জন্য ঐরূপ কষ্ট ও লাঞ্ছনা সহ্য করিবার আরও একটা

বড় কারণ ছিল বলিয়া মনে হয়; সে যে সাধারণ লঘুচিত্ত কুলত্যাগিনী নারী নয়—তাহার চরিত্রে দৃঢ়তা এবং আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান আছে, ইহা রোহিণীর মত প্রণয়ীকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল,—ঐরূপ প্রেমে প্রেমিকের শ্রদ্ধাও গভীর হওয়া চাই, নহিলে আশ্রয়হিসাবে তেমন পুরুষ প্রায়ই নির্ভরযোগ্য হয় না; ইহাও সত্য যে, অভয়ার মত নারীর সেই হৃদয়দৌর্ব্বল্য বা বুদ্ধিহীনতা নাই যাহার বশে মেয়েরা ঐ অবস্থায় পরপুরুষে আসক্ত হয়। সে তৎপূর্ব্বে রোহিণীকে উত্তমপরূপে অগ্নি-পরীক্ষিত করিয়া লইবে, রোহিণীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উদ্রেকের জন্যও সে ঐরূপ একটা নিপুণ নাটকীয় প্ল্যান প্রস্তুত করিয়াছিল। আমি এখানে তাহার ঐ স্বামীকে কিছুমাত্র সমর্থন করিতেছি না, কিন্তু সে কথা পরে।—এখন অভয়ার কথাই বলি।

আমাদের সমাজে স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ঐরূপ আচরণ আদৌ বিরল নহে; যে কারণে উহা শুধু সম্ভব নয়—এমন সহজ হইয়াছে, তাহাও আমরা জানি। কিন্তু উহাদ্বারা নারীর সতীধর্ম্মের কোন বিচার বা মীমাংসা করা যাইবে না—প্রেম বা ন্যায়-অন্যায়-বুদ্ধির কথা স্বতন্ত্র। ঐ সতীধর্ম্ম-টা আমাদের এই হিন্দুসমাজে—শুধু সমাজে নয়—হিন্দুর ধর্ম্মে বা অধ্যাত্মজীবনে এমন একটা মূল্যে মূল্যবান্ হইয়া আছে যে, সমাজব্যবস্থায় তাহা যতই পীড়ন বা নিগ্রহমূলক হউক না কেন, এ পর্য্যন্ত কোন হৃদয়বান, উদার ও জ্ঞানী হিন্দুও উহা বর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী নহেন—আমি গোঁড়া হিন্দুদের কথা বলিতেছি না। এই সতীধর্ম্ম নারীর পক্ষে একটা সহজ সংস্কার না অন্ধসংস্কার, তাহা বিচার-সাপেক্ষ বটে; কিন্তু ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ সংস্কার অত্যন্ত দৃঢ় হইলে নারী এক মহতী শক্তির অধিকারিণী হয়: উহা প্রেমের শক্তি নয়—একরূপ আত্মিক শক্তি; তাহা প্রেম-নিরপেক্ষও হইতে পারে, সে যেন নারীর নিজ আত্মার প্রতি আত্মার নিষ্ঠা। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি। এখানে আমার বক্তব্য এই যে, স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবনে ঐ সতীত্বের শাসন নারীর পক্ষে ভাল কি মন্দ—তাহা ন্যায়-সঙ্গত কিনা, এরূপ বিচার অবান্তর; উহা প্রত্যেক নারীর নিজ ধর্ম্ম-বোধের উপরে ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল; অভয়ার ঐ মোকদ্দমায় সেই সতীত্বকে আনিয়া সমাজব্যবস্থাকে আক্রমণ করিবার প্রয়োজন নাই, বিচার করিবার যথেষ্ট উপায় আছে। তাই মনে হয়, শ্রীকান্ত নয়—শরৎচন্দ্রই এখানে একটু বেশি বিচলিত হইয়াছেন, ফলে উপন্যাসের দিক দিয়া রসহানি হইয়াছে। অভয়ার প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতের বশে তিনি তাহার ঐ স্বামীটার যে চিত্র আঁকিয়াছেন,

প্রতিষ্ঠা করিতেও পারিয়াছেন ; সেই তত্ত্ব জীবনের উপরিতলে যেমনই হোক, ঐ দেহ-ভিত্তিটার সম্বন্ধে অনেকাংশে সত্য। আমি, উহার উপরে—হয়তো উহাকেই ভিত্তি করিয়া—নারীর যে আত্মিক শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে, এবং তাহা যে নারী-চরিত্রেই সহজ—সে শক্তি পুরুষের নাই, ইহাই বলিতেছিলাম। অতএব ঐরূপ দাম্পত্য-বিপাকের বিচারে পুরুষ ও নারীকে একই কাঠগড়ায় দাঁড় করানো উচিত বলিয়া মনে করি না। শ্রীকান্ত যে ন্যায়-অন্যায়-বোধের তীব্র উত্তেজনায় ঐরূপ পক্ষপাতের বশবর্ত্তী হইয়াছে তাহাও পুরুষ-প্রকৃতির লক্ষণ, সে নারীকে তাহার নিজের পুরুষ-ধর্ম্মে মণ্ডিত করিয়া দেখিতেছে। তথাপি সে-ও ঐ সতীত্বের সংস্কারটা ত্যাগ করিতে পারিতেছে না, নারী ও পুরুষের মধ্যে এই প্রকার দ্বন্দ্বে সে কোথায় যেন একটা অসঙ্গতিও অনুভব করিতেছে, তাহা কবুলও করিয়াছে—

"অভয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি কি এই বল্‌তে চান যে আমি একা নই—এম্‌নি দুর্ভাগ্য মেয়ে-মানুষের অদৃষ্টে চিরদিন ঘটে' আস্‌চে, এবং সে দুঃখ সহ্য করাই তাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ?

আমি কহিলাম, আমি কিছুই বল্‌তে চাইনে। শুধু এইটুকু আপনাকে জানাতে চাই, মেয়ে-মানুষ পুরুষমানুষ নয়। তাদের আচার-ব্যবহার এক তুলাদণ্ডে ওজন করাও যায় না, গেলেও তাতে সুবিধা হয় না।...আমার জীবনে আমি যে ক'টি বড় নারী-চরিত্র দেখতে পেয়েছি, সবাই তাঁরা দুঃখের ভেতর দিয়েই আমার মনের মধ্যে বড় হ'য়ে আছেন। আমার অন্নদা-দিদি যে তাঁর সমস্ত দুঃখের ভার নিঃশব্দে বহন করা ছাড়া জীবনে আর কিছুই করতে পারতেন না, এ আমি শপথ করেই বল্‌তে পারি। সে ভার অসহ্য হ'লেও তিনি যে কখনো আপনার পথে পা দিতে পারতেন একথা ভাবলেও হয়তো দুঃখে আমার বুক ফেটে যাবে।"

[দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১১৩-১৪]

কিন্তু শ্রীকান্ত এখন সেই কারণেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে ; দুঃখকে সে যেমন একটা বড় অবিচার বলিয়াই মনে করে, তেমনই ঐ দুঃখের কারণটাকে, অন্ততঃ নারীর জীবনে—একটা অন্ধ, অজ্ঞানজনিত সংস্কার মনে করিয়া সে তেমন সংস্কারকে ঘৃণা করে ; বরং সতীত্ব-সংস্কারও ভালো, কিন্তু ঐরূপ নিঃস্বার্থ আত্ম-নিগ্রহের সংস্কার না হইয়া উহা যদি প্রেম-নামক একটা আত্মবিগলিত রসের পিপাসা হয়, তবে তাহার দুঃখকে সে কিছুমাত্র বরদাস্ত করিতে পারে না। এখানেও সে রোহিণী-দা'কে শ্রদ্ধা করে না—অভয়াকে করে ; তার কারণ, অভয়ার ঐ যে আচরণ—রোহিণীদা'র প্রতি তাহার ঐ মনোভাব—তাহাতে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য আদৌ নাই ; বরং একটা বড় ন্যায়, সত্য ও মহানুভবতার প্রেরণা আছে,—অভয়া যেন একটা অতি-উচ্চ আসনে বসিয়া বেচারী রোহিণীকে রাজ্ঞীর মত কৃপা করিতেছে, কৃপার জীবকে উদ্ধার করিতেছে। ইহার নাম প্রেম নয়—মনের মুক্তি, তেজস্বিতা, ও ন্যায়বুদ্ধির সৎসাহস। সে রাজলক্ষ্মীর জবানীতেও নিজের

সেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছে—এমন একটু-আধটু অবৈধ সুযোগ সে এই কাহিনীতে মাঝে মাঝে লইয়াছে—

"তোমার মুখে যদি তিনি আমার নাম শুনিয়া থাকেন ত' আমার অনুরোধে একবার দেখা করিয়া বলিও যে, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে সহস্র কোটি প্রণাম জানাইয়াছে। তিনি বয়সে আমার ছোট কি বড়, জানি না, জানার আবশ্যকও নাই; তিনি শুদ্ধ মাত্র তাঁহার তেজের দ্বারাই আমাদের মত সামান্যা রমণীর প্রণম্য।"

[দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৩৬]

শ্রীকান্ত পত্রে অভয়ার যে পরিচয় দিয়াছিল, তাহাই পড়িয়া রাজলক্ষ্মী অভয়ার সম্বন্ধে এমন ধারণা করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নয়—শ্রীকান্ত কেমন পরিচয় দিয়াছিল তাহা অনুমান করিতে হইবে না।

অথচ এই রাজলক্ষ্মীই একবার অভয়ার প্রসঙ্গে শ্রীকান্তকে যাহা বলিয়াছিল (পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি) তাহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, সে ভুল করে নাই; সে ঐ প্রেমের দিকটাই দেখিয়াছিল, এবং তাহাতে রোহিণীকেই অভয়ার চেয়ে বড় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিল। আসল কথা, ঐ অভয়ার কাহিনীতে শ্রীকান্ত তাহার সেই শিল্পীসুলভ মনোভাব হারাইয়াছে—টগর-বৈষ্ণবীর মত একটা চরিত্রকে আমাদের চোখের সমুখে তুলিয়া ধরিবার সেই বাস্তব-রস-রসিকতাও ভুলিয়াছে। এ শ্রীকান্ত যেন সেই শ্রীকান্ত নহে, তাহার পার্শ্বচর যে আরেক ব্যক্তি তখনো আত্মপ্রকাশ করে নাই—পরে শরৎচন্দ্ররূপে করিয়াছে—এ সেই ব্যক্তি। তাই অভয়া-চরিত্রটিকে সে প্রাণ ভরিয়া আপনার মনের রঙে রঞ্জিত করিয়াছে, একজন সাধারণ না হইলেও—অসাধারণ নয়, এমন স্ত্রীলোককে সে অসাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞান ও সৎসাহসের অধিকারিণী করিয়াছে।

অভয়া-চরিত্র যে কতখানি অতিরঞ্জিত বা অতিশয়িত হইয়াছে তাহার দুই-একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। স্বামীর দর্শনলাভ, ও তাহার হস্তে সেই নির্দ্দয় লাঞ্ছনার পর অভয়ার ঐ মতি-পরিবর্ত্তন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সে যে স্বামি-সন্ধানের অভিযানে ঐ রোহিণী-নামক যুবকটির সঙ্গে গৃহত্যাগ করিয়াছিল উহার অর্থ বা অভিপ্রায় শ্রীকান্ত চাপা দিয়াছে; তাই অভয়ার ঐ মতি-পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক হইলেও, ঐরূপ আঘাতের ফলেই যে তাহার সেই সুপ্ত নারী-আত্মা সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে, এমন মনে করিবার হেতু নাই; তাহার সেই আত্মা অনেক পূর্ব্বেই জাগিয়াছে। কিন্তু অভয়াকে নারী-বিদ্রোহের একটি আদর্শ-বীরাঙ্গনা রূপে খাড়া করা তাহার চাই-ই, এইজন্য সে তাহাকে লইয়া একটু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। যে-অভয়া একদিন তাহাকে বলিয়াছিল, "আমি

সতীন নিয়ে খুব ঘর করতে পারবো”—সেই অভয়ার মুখে—অর্থাৎ এমন একজন সতী-লক্ষ্মীর মুখে—আমরা অতঃপর এমন সকল বক্তৃতা শুনিতে পাইলাম, যাহাতে নারীসুলভ হ্রী তো নাই-ই—যাহা পুরুষকেও হার মানায়, সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ও সমাজ-সংস্কারক নেতাকেও লজ্জা দেয়—ইহাতে বুঝিতে বাকি থাকে না যে, শ্রীকান্ত এই চরিত্রটিকে তাহার নিজেরই মনের শাণ-যন্ত্রে শাণিত করিয়া একখানি তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে পরিণত করিয়াছে; অভয়া-রোহিণীর বাস্তব কাহিনী, এবং ঐ দুর্ব্বৃত্ত স্বামী সেই প্রয়োজনেই এমন অতি-বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। অভয়ার একটি বক্তৃতা এইরূপ—

“একটা রাত্রির বিবাহ-অনুষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছেই স্বপ্নের মত মিথ্যে হ’য়ে গেছে, তাকে জোর করে’ সারাজীবন সত্য বলে’ খাড়া রাখবার জন্যে এই এতবড় ভালবাসাটা (রোহিণীর) একেবারে ব্যর্থ করে’ দেবো? যে-বিধাতা ভালবাসা দিয়েছেন তিনি কি তাতেই খুসী হবেন? আমাকে আপনি যা’ ইচ্ছে হয় ভাববেন, আমার ভাবী সন্তানদের আপনারা যা খুসী বলে ডাকবেন, কিন্তু যদি বেঁচে থাকি, শ্রীকান্তবাবু, আমাদের নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানেরা মানুষ হিসেবে কারও চেয়ে ছোট হবে না—এ আমি আপনাকে নিশ্চয় বলে’ রাখলুম। আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটা তারা দুর্ভাগ্য বলে’ মনে করবে না। তাদের দিয়ে যাবার মত জিনিস তাদের বাপ-মায়ের হয়তো কিছুই থাকবে না; কিন্তু তাদের মা তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যাবে যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে, সত্যের বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই। এ বস্তু থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাদের কিছুতে চলবে না। তা’ হলে তারা একেবারে অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে।”

[দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১১৬]

এই যে বক্তৃতা, ইহাতে যেমন স্বভাবের সত্য নাই, তেমনি ইহাতে তত্ত্ব বা নীতির সত্যও নাই। স্বভাবের সত্য নাই এই জন্য যে, ইহা নারীর পক্ষে—বিশেষ করিয়া অভয়ার মত নারীর পক্ষে অস্বাভাবিক। এই ধরণের কথা যে মেয়েমানুষ বলিতে পারে, সে বাঙালী-পল্লীসমাজে মানুষ হয় নাই—কোন মিসনারী স্কুলে পড়িলেও সে এমন কথা বলিতে পারিত না। সে যদি কোন তান্ত্রিক গুরুর ভৈরবী-শিষ্যা হইত তবে এমন কথা হয়তো সে বলিতে পারিত—কিন্তু সে তাহাও নহে। বিবাহ-বিধিটাকেই এমন করিয়া উড়াইয়া দেওয়া পুরুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, নারীমাত্রেরই সংস্কারে বাধে—সে যে-সমাজের নারীই হোক। আমরা দেখিয়াছি, রাজলক্ষ্মীর অতবড় প্রেমও—কেবল উহারই কারণে চির অশান্তি ভোগ করিয়াছে; কেবল হিন্দু-সংস্কার বলিয়াই নহে,—“the devotion of a married wife” কথাটি একজন অতিশয় স্বাতন্ত্র্যবাদী স্বৈরতান্ত্রিক ইংরাজ লেখকের মুখেও বাহির হইয়াছে;—উহা যে একটা কত বড় Sacrament বা সংস্কার, তাহার প্রমাণ নারীর জীবনেই পাওয়া যায়। বিখ্যাত ইংরেজ লেখিকা

জর্জ্জ এলিয়ট—জর্জ্জ লিউয়েস-এর অবিবাহিত পত্নীরূপে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াও, তাঁহার উপন্যাসগুলিতে এই বিবাহ সম্বন্ধে একটা গভীর ভক্তির ভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই; শেষে বৃদ্ধ বয়সে, মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে, লিউয়েসের পত্নীবিয়োগ হইলে, তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া প্রাণের সেই ক্ষোভ, বা মনের অশুচিতা-বোধ দূর করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, কোন নারীর মুখে বিবাহের বিরুদ্ধে ঐরূপ শ্রদ্ধাহীন উক্তি স্বাভাবিক নয়; উহাই যদি তেজস্বিতা হয়, তবে তাহা বক্তৃতামঞ্চের তেজস্বিতা ছাড়া আর কিছুই নহে—সে এমনই তেজস্বিতা যে, তাহা লজ্জা বা শালীনতাকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছে। আবার অভয়া তাহার ভাবী সন্তানদের চরিত্র ও জন্ম-শুচিতার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করিতেছে তাহাতে মনে হয়, সে তাহার ঐ সঙ্কল্পের বলেই কয়েকটি শাপভ্রষ্ট দেবতার জননী হইবে—সেই সন্তানেরা আদর্শ মানুষ হইতে বাধ্য, এই পতিত-সমাজের কোন সংস্কার বা প্রভাব তাহাদিগকে কিছুমাত্র কলুষিত করিতে পারিবে না! অভয়ার ভয়ে বিধাতা-পুরুষও সশঙ্কিত হইয়া থাকিবে। অভয়ার আত্মপ্রত্যয় এমনই যে, সকল নীতি, সকল যুক্তি তাহাতে নস্যাৎ হইয়া গিয়াছে। তা' হউক, তথাপি তাহার ঐ তেজস্বিতা আজিকার দিনে, শুধু প্রশংসনীয় নয়—পূজনীয় হইয়াছে।

তথাপি ঐ আদর্শের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই, বরং আমাদের বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে ঐরূপ নারী-বিদ্রোহের একটা সুফল যে আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সামাজিক অন্যায়-অবিচার মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকে যদি আঘাত না করে, এবং তাহার প্রতিবিধানে মানুষ যদি উদ্যোগী না হয়, তবে নারী বা পুরুষ কেহই মনুষ্যনামের যোগ্য নহে। উহার জন্য যে-সমাজ দায়ী তাহার সংশোধন আবশ্যক। কিন্তু জীবনের, তথা নর-নারী-হৃদয়ের আলেখ্য-রচয়িতা কবি-শিল্পীর পক্ষে এই সকল বাদ-বিতর্কের খণ্ড-সত্য লইয়া মাতামাতি করাও একরূপ ধর্ম্মভ্রষ্টতা। তাহার ফলে, আমরা অভয়া বা তাহার স্বামীর চরিত্র-চিত্রণে কোন রস-সত্যকে অপরোক্ষ করি না। অভয়ার ঐ বিদ্রোহ নারী-হৃদয়ের সহজ সরল—instinctive বিদ্রোহ নয়; তাহার চরিত্রে অতিরিক্ত যুক্তিশীলতা ও মননশীলতা আরোপিত হওয়ায়, আমরা তাহাকে একটি জীবনধর্ম্মী নারীরূপে না দেখিয়া নারীত্বের একটা নৈতিক আদর্শরূপে বুঝিবার চেষ্টা করি। সে চরিত্রে ঐরূপ তেজস্বিতা ও মনস্বিতাই আছে, এবং তর্ককুশলতার ঝাঁজ এতই উগ্র যে, তাহার অন্তরের স্বতঃপ্রকাশিত রূপটিকে, তাহার ব্যক্তি-হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যকে আমরা দৃষ্টিগোচর করি না—যেন সে বস্তুটাই তাহার নাই। যাঁহারা

জীবন-রস-রসিক নহেন, উপন্যাসও এইরূপ সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতামঞ্চ হইলে যাঁহারা সমধিক তৃপ্তিলাভ করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু আমরা এই উপন্যাসটিকে আরও উচ্চ-অঙ্গের "human document" বা মানুষের হৃদয়-সত্যের কাহিনী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। মানুষের জীবনে—নারীই হোক, আর পুরুষই হোক—তাহার যে দুঃখ, সেই দুঃখই আত্মার অসীম-অতলকে আমাদের চক্ষুগোচর করে, কারণ—"Behind every sorrow there is always a soul"; উৎকৃষ্ট কাব্যে আত্মার সেই দুঃখও যেমন, তাহার রসরূপও তেমনই সুপ্রকাশিত হওয়া চাই। ঐ দুঃখের সঙ্গেই—মানব-জীবনের মহত্তম সম্পদ যে প্রেম, তাহার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে; যাহার প্রেম যত বড় তাহার আত্মার শক্তিও তত বড়; এইজন্যই ট্র্যাজেডি-কাব্য আমাদিগকে আত্মার ঊর্দ্ধলোকে তুলিয়া এমন আশ্বস্ত করে, কারণ সকল ট্র্যাজেডির মূলে কোন-না-কোন বড় প্রেম আছে।

আমি এইবার সেইদিক দিয়া ঐ দুইটি চরিত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিব; বলা বাহুল্য, আমি এক্ষণে, সমাজতত্ত্ব নয়—সাহিত্যিক জীবন-দর্শনের আলোচনা করিতেছি। প্রথমে ঐ মহীয়সী মহিলার চরিত্র। অভয়ার মত নারীর সেই প্রেম নাই, তাই তাহার কোন দুঃখ নাই; অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ঐ যে আক্রোশ তাহার মূলে সত্যকার প্রেম নাই, আছে একটা বিরাট আত্মাভিমানের লাঞ্ছনা-বোধ। অভয়া যখন শ্রীকান্তের মুখে রাজলক্ষ্মী ও অন্নদার কাহিনী শুনিল, তখন সে যাহা বলিয়া উঠিল তাহা খুবই সত্য, সে বলিল—

"অন্নদাদিদি ও রাজলক্ষ্মী এঁরা দুঃখটাকেই জীবনে সম্বল পেয়েছেন। কিন্তু আমার তা'ও হাতে নেই। স্বামীর কাছে আমি পেয়েছি অপমান—শুধু লাঞ্ছনা আর গ্লানি নিয়েই আমি ফিরে এসেছি। এই মূলধন নিয়েই কি আমাকে বেঁচে থাকতে বলেন?" [দ্বিতীয় পর্ব্বঃ, পৃ ১১৫]

আমরা শ্রীকান্তের হইয়া ইহার উত্তর দিব—"নিশ্চয়ই নয়!" যে অপর মূলধন রাজলক্ষ্মী ও অন্নদার ছিল তাহা অভয়ার নাই, একথা সে স্বীকার করিয়াছে; অর্থাৎ, সে তাহার স্বামীকে ভালবাসে নাই, তাই প্রেমের যে দুঃখভোগ তাহা সে করিতে পারে না। ইহার অর্থ এই নয় যে, স্বামীকে তাহার ভালবাসিতেই হইবে—আমরা সে কথা বলিতেছি না। কিন্তু অভয়ার মত নারী কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না,—তাহার এমন একটি পতি চাই, যে হয় রোহিণী-দা'র মত তাহার শ্রীচরণে সর্ব্বসমর্পণ করিবে, নয়—যে তাহার সহিত একটা উচ্চ ন্যায়নীতির সাম্যমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, সংসাররূপ business বা কারবারে তাহার

partner বা অংশীদার হইবে। সেখানে প্রেমের কথাই উঠিতে পারে না। তাহার ঐ যে প্রেম-মোহ-যুক্ত দুর্জ্জয় আত্মমর্য্যাদাবোধ, উহাই রাজলক্ষ্মী অন্নদা প্রভৃতির সেই দুর্ব্বোধ্য প্রেম-বিভীষিকা হইতে শ্রীকান্তকে কতকটা রক্ষা করিয়াছে।

অভয়ার আর একটা উক্তি এখানে উদ্ধৃত করিলে তাহার সেই বর্ম্মা-অভিযান অর্থাৎ স্বামী-সন্ধানে যাত্রা করার আদি অভিপ্রায় বুঝিতে পারা যাইবে। সে এক সময়ে শ্রীকান্তকে বলিল—

"রোহিণীবাবুকে তো আপনি দেখে গেছেন? তাঁর ভালবাসা তো আপনার অগোচর নেই? এমন লোকের সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে' দিয়ে আর আমি সতী-নাম কিনতে চাইনে, শ্রীকান্তবাবু!"

[ঐ, পৃঃ ১১৫]

শ্রীকান্তবাবু ইহাতে কি বুঝিলেন তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি, কিন্তু আমরা অন্যরূপ বুঝিলাম। প্রথমতঃ, অভয়া রোহিণীর ঐ প্রেম-মোহ উত্তমরূপেই অবগত ছিল, গৃহত্যাগের অনেক পূর্ব্বেই তাহার সহিত অভয়ার ঐরূপ আন্তরিক পরিচয় যে হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সে অবশ্য রোহিণীর সহিত একটা অবৈধ সম্পর্ক করিতে রাজি ছিল না, কারণ তত সহজে আত্মদান করিবার মত দুর্ব্বলতা তাহার নাই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, অর্থাৎ রোহিণীর ঐ infatuation সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াও, এবং তাহার প্রতি ঐরূপ অনুকম্পা সত্ত্বেও, সে যখন তাহার সতীধর্ম্ম-পালনের জন্য, তাহাকেই সঙ্গী করিয়া স্বামীসন্দর্শনে বাহির হইয়াছিল, তখন সে কি নির্ব্বোধ রোহিণীর মনে কোন আশা জাগাইতে চাহে নাই? দ্বিতীয়তঃ, উপরের ঐ কথাগুলিতে সে রোহিণী সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্যবোধটাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে, তাহাতেও প্রেমের কোন দুর্ব্বলতা নাই—আছে শুধু প্রেম-শরাহত একটি দুর্ব্বল জীবের প্রতি সুগভীর করুণা। ঐ যে নারী—উহার যে পরিচয় আমরা পাইলাম, তাহাতে উহাকে একরূপ 'পুরুষায়িত' নারী বলাই সঙ্গত। এ নারী সাধারণ বাঙালীঘরের ঘরণী হইবার মত নয়—গৃহসংসার অপেক্ষা সমাজের রণক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা অধিক; শ্রীকান্তের মত যাহারা সংসারবিমুখ, এবং গৃহসুখ অপেক্ষা সমাজের হিতচিন্তাই যাহাদের অধিকতর প্রেয়, এইরূপ নারী তাহাদেরই সহযোগিনী ভগিনী হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ পুরুষ—যাহারা "ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি" বলিয়া দেবতার নিকটে বর প্রার্থনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই এমন স্ত্রী কামনা করিবে না।

অন্যায়ের প্রতিকার ও মানুষের দুঃখনিবারণ

"If the world has indeed, as I have said, been built of sorrow, it has been built by the hands of love, because in no other way could the soul of man, for whom the world was made, reach the full stature of its perfection"

—*OSCAR WILDE* : *De Profundis*

এইবার আমরা অভয়ার স্বামীবেচারীর দিকেও একটু চাহিয়া দেখিব। বেশ বুঝিতে পারা যায়, সে একটি অতিশয় দুর্ব্বলচিত্ত পুরুষ। শ্রীকান্ত তাহার যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছে তাহাতে আমরা বিস্মিত হই না, পুরুষের এমন অধঃপতন আমাদের সমাজে (বিলাতী সমাজের কথা জানি না) সর্ব্বদাই ঘটিতে দেখা যায়। তথাপি ঐ পুরুষের স্বপক্ষে কি কিছুই বলিবার নাই?—যদি না থাকে তবে বলিতে হইবে, ঐরূপ চরিত্র মানুষের চরিত্র নয়। তেমন চরিত্রও আছে, কিন্তু তাহা নিয়ম নয়—নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহার দ্বারা কোন একটি সমাজকে বিচার করা যায় না। ক্ষুদ্র মানুষ, দুষ্ট মানুষ, পাজী মানুষ—সব মানুষই মানুষ; সেই মানুষকে আমরা দেখিতে পাই না; আমাদের নানাবিধ সংস্কার তাহাতে বাধা দেয়। পাজী বা দুর্ব্বৃত্ত বলিয়াই যদি আমরা কোন মানুষকে মন হইতে দূর করিয়া দিই, তবে মানুষকেই দেখা হইল না। সেই 'মানুষ' দেখিবার দৃষ্টি অবশ্য সকলের নাই—তাহার জন্য যে ধরণের সহানুভূতি চাই তাহা কয়জনের আছে? শ্রীকান্ত ঐ যে একটি ক্ষুদ্র, নীচাশয় মানুষকে এমন গভীর পঙ্কলিপ্ত করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছে—সে ঘৃণ্যই বটে—আমরা তাহাই মনে করিব। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র, তথা জীবনকে দেখিবার যে-দৃষ্টি কবি-শিল্পীর পক্ষে অত্যাবশ্যক শ্রীকান্তের তাহা থাকিলেও সে অনেক স্থানেই তাহা হারাইয়াছে, তার কারণ, অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতার বশে সে স্থির থাকিতে পারে না—দৃষ্টির সেই অপক্ষপাত রক্ষা করিতে পারে না; সে মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার (বিশেষ করিয়া আমাদের সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের) দেখিবামাত্র উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করিতে পারে না। এই যে স্থিরদৃষ্টির অভাব, ইহার জন্য তাহার এত বড় কবি-শক্তিতেও একটা দুর্ব্বলতা বা অসম্পূর্ণতা আছে—তাহার

জীবন-দর্শন একমুখী বা একদেশদর্শী হইয়া পড়ে। শ্রীকান্তের মত অনুভূতি-কাতর কবিশিল্পী—জ্ঞানের সেই তিতিক্ষা, অথবা আর্টিষ্টের সেই "acceptance of all experiences" বা জীবনের সব-কিছুকে মানিয়া লইবার শক্তি দাবি করিতে পারে না, পারিলে তাহার কাব্য শুধুই আমাদের হৃদয়বৃত্তিকেই এমন গভীরভাবে নাড়া দিত না, জীবনকে আরও সুসম্পূর্ণরূপে—সকল সংশয় ও প্রশ্নকাতরতার ঊর্দ্ধে—সেই রসিকতায় মণ্ডিত করিত, যাহাতে জ্ঞানের ও প্রেমের সমন্বয় হয়। তথাপি শ্রীকান্ত এই যে একটি চরিত্র এমন ভাবে অঙ্কিত করিয়াছে, উহাতে আমরা একটা সুযোগ পাইয়াছি,—এই প্রসঙ্গে আমরা একটা বড় তত্ত্ব—ঐ প্রেমেরই তত্ত্ব—আরও গভীর করিয়া আলোচনা করিতে পারিব।

এই গ্রন্থে আমি ঐ পরম বস্তু—ঐ প্রেমেরই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রহস্যচিন্তাকে মুখ্য করিয়াছি, তাহা বোধ হয় পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই প্রেমের একটি নারী-প্রতিমাকে ইতিপূর্ব্বে যেমন দীপহস্তে প্রদক্ষিণ করিয়াছি, তেমনই, সেই প্রেমের যতকিছু তত্ত্বও সাধ্যমত অন্বেষণ করিয়াছি। এইবার আমি তাহারই এক পরমতত্ত্ব—যাহাকে নিখিল মানব-জীবনের ও জগতের অমৃত-কথা বলা যাইতে পারে, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব, নহিলে ঐ প্রেমদেবতার পূজা অঙ্গহীন হইবে। অভয়ার ঐ পাপিষ্ঠ স্বামীটার কথা বলিতে গিয়াই আমি এই পরমতত্ত্বে আসিয়া পড়িয়াছি, পাঠক-পাঠিকারা তাহাতে আশ্চর্য্য হইবেন না। এখন আর শুধুই কাব্যসৃষ্টির আর্ট বা কবি-কল্পনার সত্য-মিথ্যা নয়,—তাহারও এক ধাপ উপরে উঠিতে হইবে। সেই প্রেম মানুষেরই মানব-প্রেম, না, ভগবৎ-প্রেম? মানুষকেই মানুষের ভালবাসা, না মানুষকে ছাড়াইয়া ভগবান-নামক এক পরমপুরুষকে ভালবাসা? ইহার উত্তরে একজন ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসীর উক্তি এইরূপ—"Above all, I believe in my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races."—অর্থাৎ, "সবচেয়ে আমি আমার সেই ভগবানে বিশ্বাস করি যিনি বিরাজ করেন পাপীর মধ্যে, তাপীর মধ্যে, সর্ব্বজাতির—সকল দীন-দুঃখীর মধ্যে।" আবার ঠিক এই কথাই একজন বিখ্যাত ইংরেজ লেখক তাঁহার আত্মকথার একস্থানে লিখিয়াছেন—যীশুখ্রীষ্টের মানব-প্রেম স্মরণ করিয়া বলিতেছেন—

"It is man's soul that Christ is looking for. He calls it 'God's kingdom,' and finds it in everyone......

"He saw that love was the first secret of the world for which the

wisemen had been looking, and that it was only through love that one could approach either the heart of the leper or the feet of God."

—*OSCAR WILDE* : *De Profundis*

[প্রেমই জগতের আদি রহস্য, যাবতীয় ঋষি-মনীষিগণ এতকাল ঐ রহস্যেরই সন্ধান করিতেছিলেন। যীশুই সেই তত্ত্ব আবিষ্কার করিলেন এবং বুঝিলেন যে, ঐ প্রেমের পথেই, কুষ্ঠরোগীর হৃদয়ে যেমন, ভগবানের চরণেও তেমনি পৌঁছিতে পারা যায়।]

ইহাই প্রেমের পরমতত্ত্ব—উহাই মানবহৃদয়ের শেষ-তীর্থ। তথাপি, আমি বলিব, প্রেমের দুই পথই আছে—একটি ঊর্দ্ধমুখী, আরেকটি নিম্নমুখী। মানুষের প্রেম ঊর্দ্ধমুখী; নর-নারীর যে প্রেম-লীলা আমরা সংসার-নাট্যমঞ্চে, কতরূপে—বিষামৃতের অপূর্ব্ব রসে বিলসিত হইতে দেখি—তাহাই ঊর্দ্ধমুখী; তার কারণ, সেই প্রেমই সোপানপরম্পরায় নর-নারীকে পরমতীর্থে উত্তীর্ণ করে। কবি যে বলিয়াছেন—

"এই প্রেম-গীতিহার
গাঁথা হয় নর-নারী-মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।"

—ইহাও ঠিক নয়; ঐ প্রেম-গীতিহার সকলেই 'দেয় তাঁরে', বঁধুর মধ্যেও তিনিই রহিয়াছেন, কেবল সেই জ্ঞান তখনো হয় নাই। আমি এই সাধনাকেই প্রেমের ঊর্দ্ধমুখী সাধনা বলি। আর ঐ যে নিম্নমুখী প্রেম—সেই প্রেমই ভগবানের প্রেম; তাহা সেই অতি ঊর্দ্ধ হইতে অতি নিম্নে এই মানুষের উপরেই নামিয়া আসে; সেই প্রেমই কুষ্ঠরোগীকে, অর্থাৎ মহাপাপীকে বক্ষে জড়াইয়া ধরে, সেই প্রেমই বলে—

Whom wilt thou find to love ignoble thee,
Save Me, save only Me ?

প্রেমের এই দুই পথ—একটি মানুষের, অপরটি ভগবানের। মানুষের প্রেম যখন মানুষকে ছাড়াইয়া একেবারে ভগবানের অভিমুখী হয় তখন তাহা আর 'ঊর্দ্ধমুখী' নয়—ঊর্দ্ধগত হইয়াছে। তাহাতে আর জীবন-পিপাসা থাকে না, তাই তেমন প্রেমকে আমরা মানবতার প্রেম বলিব না। আবার মানুষেরই প্রেম যখন ঐ 'নিম্নমুখী' ভগবৎ-প্রেমের অনুরূপ হয়, তখন তাহাকে আমরা প্রেম বলি না—'করুণা' বলি; কিন্তু ভগবানের প্রেম শুধুই 'করুণা' নয়, তাহারও অধিক, সে যে কি বস্তু তাহা আমাদের ধারণাই হয় না। তাই মানুষের ঐ করুণা নিছক করুণা-মাত্র; উহাতে পরদুঃখকাতরতা আছে, প্রেমরস-পিপাসা নাই—পরদুঃখমোচনের

আনন্দপিপাসা আছে। উহা ব্যক্তি-সম্পর্কিত নয়, সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক; ব্যক্তি-হৃদয়ের রং উহাতে নাই বলিয়া, উহা মানবীয় নহে। উহা 'উর্দ্ধমুখী'ও নয়, 'নিম্নমুখীও' নয়; উহাও একরূপ বৈরাগ্য। উহার যে মহত্ত্ব আমরা স্বীকার না করিয়া পারি না, তাহা বন্ধন-মুক্তির মহত্ত্ব; আমরা বদ্ধ ও দুর্ব্বল বলিয়া ঐরূপ করুণাকে পূজা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। কিন্তু যে সেই 'উর্দ্ধমুখী' প্রেমের সাধনা লাভ করিতে পারিয়াছে, সে ঐরূপ করুণার কাঙালও যেমন নয়—তেমনই ঐ ধর্ম্ম বা আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। তথাপি উহা সেই 'নিম্নমুখী' প্রেমের অনুরূপ বটে, কিন্তু সে প্রেম ভগবান ছাড়া মানবের পক্ষে সম্ভব নয়।

মানুষ আমরা ঐ ভগবানের প্রেম ধারণ বা ধারণা করিতে পারি না বটে, কিন্তু সমাজে, সংসারে যাহা পারি না—কবি বা আর্টিষ্টের রসসৃষ্টির মারফতে—ঐ কাব্য-জগতে তাহার কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারি। আমি পূর্ব্বে ঐ যে "acceptance of all experiences" বলিয়াছি, শ্রেষ্ঠ কবিরা তাহাই করিয়া আমাদিগকেও ক্ষণেকের জন্য সেই প্রেমের অধিকারী করেন। কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে আমরা আমাদের বন্ধু বা শত্রুকে দেখি না—দেখি মানুষটাকে। সেই মানুষ যে কত অবস্থায়, কত রকমের অদৃষ্টজালে জড়িত হইয়া কত বিড়ম্বনা সহ্য করে, এবং তাহাতে—কেহ শক্তি, কেহ অশক্তি, কেহ ত্যাগ কেহ লোভ, কেহ প্রেম কেহ হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া—সেই এক মানুষেরই নানা রূপান্তরের দ্বারা, মানব-মহানাটকের রসপুষ্টি করিতেছে, ইহাই অনুভব করি; যাহারা তাহা পারে না তাহারা রসিক নহে, বেরসিক। যে কাব্যে-নাটকে দুষ্ট ও দুর্ব্বৃত্তের মধ্যেও আমরা সেই মানুষকে দেখিতে পাই না, সেই কাব্যের কবিদৃষ্টিও পূর্ণ রসদৃষ্টি নয়।

এইবার অভয়ার ঐ স্বামীটির দিকে ভাল করিয়া চাহিলেই আমার এই আলোচনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীকান্ত বা শ্রীকান্তরূপী শরৎচন্দ্র ঐ মানুষটাকে আমাদের চক্ষে যতদূর সম্ভব ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে সেই রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। কিন্তু যদি সেই অপর প্রেম আমাদের চিত্তে রস-কল্পনার আকারেও উদ্রিক্ত হইতে পারিত, তবে আমরা ঐ মানুষটাকেও ক্ষমা করিতে পারিতাম। তখন মানুষটাকে সমাজ হইতে পৃথক করিয়া দেখিতাম, এবং প্রথমে মানুষটাকে দায়ী না করিয়া সমাজকেই দায়ী করিতাম। অভয়ার ঐ নির্য্যাতন যদি নির্দ্দোষীর নির্য্যাতন হয়, তবে নির্য্যাতনকারীর ঐ দোষটার হেতু যে তাহার জন্মগত পাপপ্রবৃত্তিই নয়, একটা বিশেষ অবস্থাচক্রেই যে তাহার ঐরূপ অধঃপতন হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতাম। ওখানে কোনপক্ষেই প্রেম নাই, না-থাকার

জন্য কাহাকেও দায়ী করা যাইবে না, কারণ ও বস্তু কাহারও আদেশ বা নীতি-শাস্ত্রের অধীন নয়। কিন্তু যদি কোন পক্ষে প্রেম থাকিত তবে ঐ বন্ধন এমন দুঃসহ হইত না। ঐ স্বামীটাকে গালি দিয়া, আমরা ঐ স্ত্রীর যতই প্রশংসা করি না কেন, এবং পরের বিচারে আমরা যতই উদার ও ন্যায়পরায়ণ হই না কেন, অভয়ার মত স্ত্রীর স্বামী হইবার উপযুক্ত এ সমাজে কয়জন আছে? কয়জন পুরুষ কেবল নৈতিক কর্ত্তব্যবোধ বা স্বামীর দায়িত্ববোধের জন্য ঐরূপ বিরূপা স্ত্রী লইয়া সুখী হইতে পারে? যেরূপ ঘটিয়াছে তাহার কথা না ভাবিয়া, সেইরূপ ঘটনার মূলে যে চরিত্রগত কারণ আছে তাহাই ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এখানে ঐ দম্পতি-মিলনটাই বড় বিষম হইয়াছে; একদিকে এক সবলা, আত্মাভিমানিনী নারী, অপর দিকে তাহার ঠিক বিপরীত—এক অতি দুর্ব্বলচিত্ত, শিথিলচরিত্র পুরুষ। একেই তো আমাদের এক বড় কবির ভাষায়—

> "নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা,
> তাহার উচিত বনবাস।"

তার উপর, স্বামী-ব্যক্তিটি অতিশয় ভীরু। শ্রীকান্ত তাহার যে দুষ্কৃতিগুলার উল্লেখ করিয়াছে তাহার কোনটাই মিথ্যা না হইতে পারে, কিন্তু সে-ও বলিতে পারিত—"Strike, but hear!"—সে অবকাশ সে পায় নাই, পাইলেও সে অতিশয় নির্ব্বোধ বলিয়া, অভয়ার মত তাহার মোকদ্দমাটি এমন পাকা করিয়া তুলিতে পারিত না; শরৎচন্দ্র নিজে যদি তাহার ওকালতনামা লইতেন, তবে বোধ হয় সে-ই মোকদ্দমায় জিতিয়া যাইত। অতএব, আমরা তাহাকে অন্ততঃ এই "benefit of doubt" দিতে পারি যে, সে যতই মন্দ হউক, ঐরূপ স্ত্রীকে সহ্য করিতে না পারিয়াই ফেরার হইয়াছিল, এবং পরে অতিশয় দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া ধাপে ধাপে নামিয়া ঐরূপ অ-মানুষে পরিণত হইয়াছে। "There is some soul of goodness in things evil" ইহাও যেমন সত্য, তেমনই, মানুষকে বিচার করিবার অধিকার কোন মানুষেরই নাই, কারণ, তাহার জন্য সেই প্রেম আবশ্যক, যাহা দ্বারা—"One could approach either the heart of the leper or the feet of God."

এখন বাকি থাকে শুধু সমাজ। ঐ সমাজ না থাকিলে মানুষের জীবন অচল হইয়া উঠে; ঐ সমাজই 'ব্যক্তির' স্বার্থ বা সুখদুঃখের উপরে 'বহুর' স্বার্থ বা সুখদুঃখকে স্থাপন করিতে বাধ্য। ব্যক্তির সহিত বহুর স্বার্থ-সাম্য যে কেন হইতে পারে না, তাহা মানুষের শত শতাব্দীর ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে।

তথাপি, এতকাল পরে এইকালে যে সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্য জগৎময় কোলাহল হইতেছে—তাহাতেও দেখা যাইবে, ঐ সাম্য-রক্ষার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তি-অধিকার—তাহার আত্মার স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইতেছে, সমাজের বা বহুর কল্যাণকে একান্ত করিয়া মানব-কল্যাণকেই অতিশয় সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করা হইতেছে। তার কারণ, মানুষ এখন বলিতেছে, আমরা দুঃখকে স্বীকার করিব না; দুঃখকে স্বীকার করিতে হইলে মানুষের আত্মাকেও স্বীকার করিতে হয়, তাই ঐ আত্মাকেও আর স্বীকার করা হইতেছে না। বুদ্ধও তাহাই করিয়াছিলেন, তিনিও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য আত্মাকে 'নাস্তি' করিয়া দিয়াছিলেন—তফাৎ এই যে, তিনি আরও সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা, ঐ আত্মার সঙ্গে সঙ্গে সকল অস্তিত্বই নস্যাৎ করিয়াছিলেন। সে যাহাই হোক, ইহা হইতে একটা তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে, তাহা এই যে, আত্মা আর দুঃখ এই দুইয়ের একটা নিত্য-সম্বন্ধ আছে। আবার, ঐ দুঃখকে হজম করিতে পারে আত্মারই সেই শক্তি যাহার নাম প্রেম, এবং সেই প্রেমের সাধনও ঐ দুঃখ; তাই আত্মাকে অনাত্মার দ্বারা জয় বা দমন করিবার জন্য দুঃখকে জগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে। কিন্তু আত্মাকে যেমন হত্যা করা যায় না, তেমনই দুঃখকেও মানুষের জীবন হইতে কিছুতেই বহিষ্কার করা যাইবে না। এতদিন মানুষের সমাজ ঐ দুঃখকে স্বীকার করিয়াই, ব্যক্তি ও বহুর সম্বন্ধ এবং পরস্পরের অধিকার নির্দ্ধারিত করিয়াছে; সেই সমাজের নানা কুপ্রথা, অন্যায় ও অনাচার অতিশয় নিন্দার্হ ও সংশোধনযোগ্য হইলেও, এবং যতদূর সম্ভব ও সাধ্য—কালে কালে তাহার উচ্ছেদ-চেষ্টা করিলেও, দেখা গিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত একটা অবিচার এবং তজ্জন্য ঐ দুঃখ অনিবার্য্য, সে যেন মূল জগৎ-বিধানেরই একটা বিধি বা নীতি। দুঃখ মানুষকে পাইতেই হইবে, জীবনে দুঃখ থাকিবেই; তাহাকে জয় করিবার জন্য মানুষের শক্তিও নিরন্তর উদ্যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই সেই বিধি; ন্যায়-অন্যায়, সুখ-দুঃখ, কল্যাণ ও অকল্যাণ—এইরূপ দ্বন্দ্বই সৃষ্টিকে গতিমান প্রবহমান রাখিয়াছে; ঐ দ্বন্দ্বই আশ্লেষ-বিশ্লেষ, আকর্ষণ-বিকর্ষণের মত সৃষ্টির সেই মূল-শক্তিকে জাগ্রত ও সঞ্জীবিত করিয়া প্রলয়ের সুষুপ্তি নিবারণ করিতেছে। আত্মার সেই শক্তিই—সেই প্রেমই মানুষকে অহরহ মৃত্যু হইতে উদ্ধার করিতেছে, সেই মৃত্যু হইতেই অমৃতের উদ্ভব হইতেছে; এইজন্যই "Love is the first secret of the world"। মানুষ মানুষের প্রতি অত্যাচার করিবে না, সমাজে কোথাও পক্ষপাত থাকিবে না, ইহাই সত্য,—কিন্তু তাই বলিয়া কোথাও দুঃখ থাকিবে না, এবং একটি নর

বা নারীও দুঃখ পাইবে কেন—এমন দাবী নিরর্থক। আবার, যে বলে—সংসারে দুঃখ থাকিতে পারিবে না, মানুষের হৃদয় সকল সমাজ-শাসনের উপরে; প্রত্যেক মানুষের—পুরুষ বা নারীর—সেই হৃদয়ধর্ম্মকে অসম্মান করিয়া কোন সমাজ-বিধি রচিত হইতে পারিবে না—তাহার এইরূপ কামনা একটা নিছক sentimentalism বা ভাবাবেগের দুর্ব্বলতা মাত্র। কারণ, একটা বড় ও সার্ব্বজনীন কল্যাণের জন্য, সমাজ-রক্ষার জন্য, ব্যক্তি-মানুষকে বহু কঠোরতা, বহু দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, তাহার জন্য আত্মাকে শক্তিমান হইতে হইবে—প্রেমের বলে বলীয়ান হইতে হইবে। ইহা যাহারা মানে না, তাহারাই নাস্তিক,—কারণ, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত আত্মাকেই অস্বীকার করিবে; তাহারা আত্ম-দমনের সেই moral শক্তিকেও স্বীকার করে না—ব্যক্তির স্বৈর-সুখসাধনের যে immorality তাহাকেই জয়যুক্ত করিয়া ক্ষীণপ্রাণ দুর্ব্বল মানুষকে আশ্বস্ত করে; আমাদের দেশে একদল গল্পলেখক কেবল ইহারই কৌশলে বড়ই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

ঐ যে সমাজ—যাহার বিবাহ-বিধি এমন কঠিন ও পক্ষপাতপূর্ণ, তাহাকে গালি দেওয়া সঙ্গত, ঐ অন্যায় নিবারণ করাও উচিত। শরৎচন্দ্র এই গ্রন্থে বাঙালী হিন্দু-সমাজের যে অধঃপতন চিত্রিত করিয়াছেন তাহা যেমন সত্য, তেমনই তাহার একটা ঐতিহাসিক কারণও আছে বলিয়া মনে হয়। পল্লীসমাজের নানা বিধি-নিষেধ—বিশেষ করিয়া, এক শ্রেণীকে আর এক শ্রেণীর উপরে প্রাধান্য দেওয়া—এবং প্রত্যেক উপরকার শ্রেণীর সেই প্রাধান্য তাহার নিম্নস্থ শ্রেণীর পক্ষে সহনীয় করিবার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা—ইহাই বাঙালী-সমাজকে কোন এক সময় হইতে অধঃপাতের দিকে ঠেলিয়াছে। ইহার একটা বড় কারণ,—মুসলমান-শাসনকালে, রাজশক্তির আশ্রয়চ্যুত হইয়া, এবং সেই শক্তির অত্যাচার হইতে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার প্রয়োজনে, সমাজকেই একটা পৃথক শক্তির অধিকারী করিতে হইয়াছিল—সমাজপতিরাই হইয়াছিলেন প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। এইরূপ শক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়ে—কারণ, বিজাতীয় রাজার অত্যাচার অধিকতর অনিষ্টকর বলিয়া তাহাকে অধিকতর ভয় করিয়া, সমাজ ঐ স্বদেশীয় সমাজপতিদের সকল অন্যায়-অবিচার সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল। সমাজপতিরা সেই শক্তির অপব্যবহার করিতে লাগিল, তখন দুই অত্যাচারের মধ্যে পড়িয়া জাতিটা ঘোরতর 'demoralised' বা ভীরু ও নিঃসাহস হইয়া পড়িল, ক্রমে পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া গেল। পরে যখন ইংরেজী-শিক্ষার ফলে, ঐ অত্যাচারকারী উপরিতলের মানুষগুলাই অতিশয় লজ্জা পাইতে লাগিল, তখন তাহারাই নিজেদের ঐ অন্যায় শাসন

ও কুৎসিত বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল। কিন্তু তখন সমাজের ভিতর হইতেই তাহার সংস্কার অসম্ভব; এমনই করিয়া এ জাতির সর্ব্বনাশ আসন্ন হইয়া উঠিল। যখন সেই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাই অচল হইয়া উঠিয়াছে, তখন তাহার মূলটাও নূতন করিয়া রোপণ করিতে হইবে।

কিন্তু আমরা বলিতেছিলাম—মানুষের দুঃখ ও তাহার প্রতিকারের কথা। ঐ যে সমাজ-সংস্কার উহা অত্যাবশ্যক হইলেও, তাহাতে বাহিরের বাধা ও কষ্টের কারণ দূর হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেই নর-নারী কি সত্যই সুখী হইবে? অভয়া সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, তাহার স্বামীই দোষী, তাহাই মানিলাম, তথাপি সমান নির্দ্দোষ হইলেও উহারা সুখী হইত কি? বিবাহে সুখী হইবার কথা বলিতেছি —সে যেমন বিবাহই হৌক; বিবাহ বিচ্ছেদের পর পুনরায় বিবাহ করিয়া—অর্থাৎ, সমাজ তাহাতে কোন বাধা না দিলেও—উহারা সুখী হইত, এমন কথা বলা যায় কি? অবশ্য ঐরূপ স্বাধীনতা এবং তদ্দ্বারা যেটুকু সন্তোষ—তাহাই যদি কাম্য হয়, তবে কোন প্রশ্নই নাই। কিন্তু আমরা যে সব সুখী-দম্পতি দেখিতে পাই, তাহারা কি ঐরূপ মিলনে পরস্পরের সমান অধিকার অটুট রাখিয়াছে? সুখ নয়—যে শান্তি অনেক সংসারে বিরাজ করিতেছে, তাহার কারণ কি কি হইতে পারে, আমি পূর্ব্বে সে আলোচনা করিয়াছি। স্বার্থ বজায় রাখিয়া তাহার সংঘর্ষ নিবারণ করিতে পারিলে জীবন-যাত্রা একরূপ নির্ব্বিঘ্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতেই সুখী হওয়া যায়—দুঃখ নিবারণ হয়—এমন কথা নিশ্চয় সত্য নয়; কষ্ট নিবারণ হইতে পারে, কিন্তু দুঃখ নিবারণ হয় না। আবার, দুঃখকে একেবারে বহিষ্কার করিতে পারাই সুখী হইবার উপায় নয়,—তাহাকে জয় করিবার, বা হাসিমুখে সহ্য করিবার শক্তিই সুখের কারণ হইয়া থাকে; সেই শক্তি যাহার নাই সে দুঃখী হইবেই। যেখানে সত্যকার সুখ আছে সেখানে প্রেম আছে; প্রেমে বিষও অমৃত হইয়া উঠে, সেই দুঃখ নর-নারীর আত্মাকে প্রতি মুহূর্ত্তে শুচি-স্নানে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। সমাজ একটা যন্ত্র মাত্র, সেই যন্ত্র যতই সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত হউক না কেন, তাহার শাসন অন্ধ, যান্ত্রিক শাসন হইতে বাধ্য; মানুষ সেই শাসন স্বীকার করিয়াও অন্তরে স্বাধীন, ঐ যন্ত্রটার উপরে তাহার হৃদয় সর্ব্বদা জয়ী হইয়া থাকে। আমি এমন কথা বলি না যে, সমাজ কোন কারণেই দায়ী নহে, কিম্বা সমাজের শাসন সর্ব্বত্র সকল কালে শিরোধার্য্য; অথবা সমাজকে উন্নত ও উদারতর করিয়া মানুষের জীবনকে শুচি ও সুন্দর করা যায় না। আমার বক্তব্য এই যে, সমাজকে গালি দিয়া, মানুষকে—ব্যক্তি-মানুষকে—বড় করা যায়

না ; সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা একটা বড় কাজ বটে, কিন্তু মূল ব্যাধির ঔষধ—প্রেম। সকল অত্যাচার, অবিচারের মূলে আছে যে অ-প্রেম, মানুষকে বিচার করিবার কালেও আমরা যেন সেই অ-প্রেমকে প্রশ্রয় না দিই। সমাজকে বিচার করা সহজ, কিন্তু মানুষকে বিচার করিবে কে? সমাজের পক্ষপাত, অবিচার অত্যাচারের জন্য মানুষেরই হাতে-গড়া কতকগুলা কু-বিধিই দায়ী বটে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঐ যে একটা নিষ্ঠুর ও কদর্য্য সম্পর্ক উহার মূল যেমন গভীর, তেমনই দুশ্চেছ্য—পূর্ব্বে বলিয়াছি, উহা প্রকৃতি বা সৃষ্টির নিয়তি-নিয়মের অনুগত। ঐ অবস্থায় দুঃখভোগ অনিবার্য্য ; যদি প্রেম না থাকে, তবে ধূম, অগ্নি ও অঙ্গারই সার হয় ; যদি থাকে, তবে সেই নিয়তিও দিব্যপ্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠে।

পরিশিষ্ট

(১)

শ্রীকান্ত-কাহিনী—পুনর্বিচার

And when the stream
Which overflowed the soul passed away,
A consciousness remained that it had left
Deposited upon the silent shore
Of memory, images and precious thoughts
That shall not die, and cannot be destroyed.

—*WORDSWORTH*

আমি এই কাহিনীর ঘটনাপরম্পরায় নানা দিক দিয়া শ্রীকান্ত-চরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিচার করিয়াছি, এবং সে সম্বন্ধে এতবার এত কথা বলিয়াছি যে, নূতন কিছুই বলিবার নাই। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে আমরা কি একটা সুসঙ্গত বা সুসম্বদ্ধ ধারণা করিতে পারিয়াছি? নিশ্চয়ই নয়; ইহার কারণ আমি পূর্ব্বে একবার আলোচনা করিয়াছি, আর একবার সেই কথাটাই পাঠক-পাঠিকাকে স্মরণ করাইতেছি। কোন মানুষের চরিত্রই আমাদের বিচার বা বুদ্ধিগোচর নয়—গোটা মানুষকে তেমন করিয়া পড়িয়া ফেলা যায় না। যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে কবির এইরূপ কাব্যসৃষ্টির কোন মূল্য থাকিত না। কবিরাও ব্যাখ্যা করেন না, বর্ণনা করেন না—কেবল দেখান, বাক্যের সাহায্যে চরিত্রগুলা চিত্রিত করেন মাত্র। সেই চিত্রগুলা আমরা অনুভূতি-যোগে অপরোক্ষ করি—সেই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয়। আসল কথা, আমরা যে এত চরিত্র-চর্চ্চা করি,—সমাজেই হোক, আর কাব্য-নাটকেই হোক, তাহা আমাদের মানস-কণ্ডূয়ন নিবৃত্তি করিবার জন্য। অথবা, ঠিক যতটুকু আবশ্যক, মানুষের সঙ্গে ততটুকুই পরিচয়-সাধনের সুবিধা হয়; তাহা সম্পূর্ণ ব্যাবহারিক, কোন মানুষকে তাহার বেশি জানিবার প্রয়োজন তাহাতে নাই। একটা ব্যক্তি-মানুষের চরিত্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা কতকগুলা দোষ ও গুণের সমষ্টি; এই সমষ্টি বা যোগ-ফল আমাদেরই কতকগুলা সংস্কার বা চিন্তা-পদ্ধতি অনুসারে আমরা রচনা করি; অতঃপর, যাহা অতিশয় অনন্যসদৃশ, অসাধারণ, যাহার কোন দুইটা একরূপ নয়—তাহাকেও সাধারণের পর্য্যায়ে ফেলিয়া, কতকগুলা সর্ব্বনামীয় বিশেষণের ছাপ দিয়া আমাদের কার্য্য নির্ব্বাহ

করি, যেমন—কেহ কাপুরুষ, কেহ বীর, কেহ উদার, কেহ নীচাশয়; কেহ মিথ্যাচারী, কেহ সচ্চরিত্র, কেহ লম্পট, কেহ নিষ্ঠুর, কেহ দয়ালু; এমনই কত কি! এইরূপ এক একটি বিশেষণ হইতেই সেই গুণের অনুষঙ্গী গুণ, বা দোষের অনুষঙ্গী দোষ অনুমান করি; অর্থাৎ একজন যদি এইরূপ হয়, তবে সে ঐরূপ হইতে পারে না; যদি এই দোষ থাকে, তবে ঐ দোষও আছে, ইত্যাদি। উহাতেই আমাদের কাজ চলিয়া যায়—একটা ব্যাবহারিক সত্য-ধারণা উহা দ্বারা সম্ভব হয়। আবার কাব্যনাটকের চরিত্রগুলির সমালোচনাও আমরা ঐ প্রণালীতেই করিয়া থাকি। চরিত্র-বিশেষের সমগ্রতা-বোধই আমাদের রস-চেতনাকে তৃপ্ত করে, তখন ঐরূপ বিচার আমরা করি না। কিন্তু বিচার করিতেও হয়, কারণ, সেইরূপ সুগভীর রসবোধ সকলের নাই; তা' ছাড়া, আমাদের সেই প্রাথমিক সংস্কার অনুযায়ী একটা সাক্ষাৎ সঙ্গতি-রক্ষার উপায় না করিলে, চরিত্র-চিত্রণের ঐ রসাস্বাদ বাধা পায়, কবিকেও মুস্কিলে পড়িতে হয়; চরিত্রগুলার আচরণ স্থলবিশেষে যতই অপ্রত্যাশিত হউক, তাহা আমাদের মনের অন্তর্নিহিত বা পূর্ব্ব-সঞ্জাত সম্ভব-অসম্ভবের ধারণাকে লঙ্ঘন করিলে আমরা তাহা অবিশ্বাস করি, ফলে, আমাদের চিত্ত বিরূপ হইয়া উঠে—রস মাঠে মারা যায়। এইজন্যই কথাটা সত্য যে—'fact stranger than fiction' হইতে পারে, কিন্তু 'fiction stranger than fact' হওয়া উচিত নয়। মানুষের সংস্কার এমনই প্রবল ও দৃঢ়মূল। একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কথাশিল্পী এই প্রসঙ্গে একটি বড় যথার্থ কথা বলিয়াছেন—

"Individuals know that they constantly give way to impulse, but an audience insists that every action must have its cogent reason."

[পৃথকভাবে, ব্যক্তি-হিসাবে, প্রত্যেকেই স্বীকার করে যে, কাহার কখন কি মতি হয় তাহা বলা যায় না; কিন্তু নাটকাভিনয় দেখিবার কালে তাহারা পাত্র-পাত্রীর প্রত্যেক আচরণটির সঙ্গত কারণ বুঝিতে চাহিবে।]

এইজন্য আমরাও যখন কোন উপন্যাসগত চরিত্রের বিচার করি, তখন সেই চরিত্র যেমনই হোক, তাহার গুণ-দোষের একটা সঙ্গতি সন্ধান করি। আমাদের মনে কতকগুলি ছাঁচ তৈয়ারি হইয়া আছে, তাহার কোন-না-কোনটাতে উহার খাপ খাওয়া চাই। এই বিচারকে আমি ব্যাবহারিক বিচার বলিয়াছি; জীবনের ব্যবহার-ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র উহাতেই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। কাব্য-নাটকের চরিত্র-সমালোচনাতেও ঐরূপ কতকগুলা ছাঁচ বা শ্রেণীবিভাগ যে কিরূপ আরামজনক, আমাদের সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে নায়ক-নায়িকার কয়েকটি সাধারণ শ্রেণী-নাম তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু নাটকে বা বাস্তব-সমাজে, এই যে এক এক প্রয়োজনে,

মনুষ্যচরিত্রের একটা বুদ্ধি-সম্মত পরিচয় আমরা চাই—সেইরূপ প্রয়োজন যেখানে থাকে না, সেইখানেই আমরা চরিত্র-বিশেষের মধ্যেই মানবাত্মার সেই অবোধগম্য রহস্য-গভীর সত্তার চকিত আভাস পাই—যাহা যুক্তি-তর্কের অতীত, এমন কি কল্পনাকেও অতিক্রম করে। তাহাই সেই পূর্ণ রসানুভূতির সহায়। তখন কবিও মনুষ্য-চরিত্রের সেই গভীর গহনে দৃষ্টিপাত করিয়া এমনই স্তোত্রচ্ছন্দে তাহার বন্দনা করিতে বাধ্য হন—

"Not Chaos, not
The darkest pit of lowest Erebus
Nor aught of blinder vacancy scooped out
By help of dreams—can breed such fear and awe,
As fall upon us often when we look
Into our minds, into the mind of Man".

["প্রলয়ের একাকার,
তলাতল পাতালের অন্ধতম গুহা,
কিম্বা যেই অনাসৃষ্টি, আরও শূন্যময়,
খুঁড়ে তুলি স্বপনের খনিত্র সহায়ে—
সেও নাহি পারে হেন করিতে বিহ্বল
ভয়-ত্রাসে, যথা যবে করি আঁখিপাত
আপনার চিত্তমাঝে—মানব-মানসে!"]

—ইহা সত্য। সংসার-সমাজের বাস্তব জগৎ, বা কাব্য-নাটকের ভাব ও রূপ-জগৎ—সর্ব্বত্রই আমরা আমাদের প্রয়োজনে একটা বাক্যার্থ-গোচর সঙ্গতি স্থাপন করিতে বাধ্য হই; আবার রস-সৃষ্টির প্রয়োজনেও কাব্য-উপন্যাস-নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গতি না থাকিলে—চরিত্রটিকে একটা ছাঁচে ফেলিতে না পারিলে, তাহা বড় বিসদৃশ বোধ করি; সকল চরিত্রকেই একটা চরিত্র হইতে হইবে—চরিত্রহীনতাও চরিত্রের ঠিক বিপরীত হইতে হইবে। কিন্তু মানুষের সেই অন্তরতম ব্যক্তি-সত্তার যত কিছু বাসনা-কামনা, তাহার যতকিছু প্রবৃত্তি, তাহার সুপ্ত ও জাগ্রত, মুক্ত ও নিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা-আকুতি—সব লইয়া যে একটা মানুষ, তাহার পরিচয় কোন্ যুক্তি বা নীতিশাস্ত্রে আছে? তেমন পরিচয়ের প্রয়োজনও হয় না; আমরা কোন মানুষকে—অন্তরঙ্গ আত্মীয়কেও—তেমন চেনা চিনি না। আপনাকেই কি চিনি?

আমি বলিয়াছি, কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির সদৃশ নয়—প্রত্যেকেই অনন্যসদৃশ। তথাপি কয়েকটা সাধারণ সাদৃশ্য নিরূপণ করিয়া আমরা সেইগুলার এক একটা ছাঁচ নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছি, মানুষকে তাহারই সাহায্যে সাধারণ

পরিচয়ে পরিচিত করি। ঐরূপ ছাঁচ-রচনা যে সম্ভব, তাহাতে কেবল ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সকল মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ মনুষ্য-প্রকৃতিও আছে— ব্যক্তিহিসাবে যতই স্বতন্ত্র হউক। কিন্তু সেই সাদৃশ্য অন্তরূপ, তাহা চারিত্রিক সাদৃশ্য নয়—চরিত্র বলিতে আমরা এখানে যাহা বুঝিতেছি। আমরা যখন সেই সাদৃশ্য দেখি, তখন ব্যক্তিকেও নয়—মানুষকেও নয়—আর একটা বস্তুকে দেখি, তাহা মনুষ্যজীবন, মনুষ্যমাত্রেরই সেই এক নিয়তি। ব্যক্তির চরিত্র যেমনই হোক, তাহাকে মনুষ্য-সাধারণের সেই এক নিয়তি-শাসন মানিতেই হইবে; কাব্য-নাটকে আমরা পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের অন্তরালে সেই নিয়তির লীলা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করি। কবি বলিয়াছেন—"One touch of nature makes the whole world kin"; আমি বলিব, মানুষে মানুষে সেই 'nature' বা স্বভাবের সগোত্রতা নয়—ঐ নিয়তির সম-বন্ধনই মানুষকে কান্না-হাসির সাদৃশ্য দান করিয়াছে। ব্যক্তির চরিত্র যেমনই হউক—যত শক্তি বা অশক্তি, বুদ্ধি বা নির্ব্বুদ্ধি, মহত্ত্ব বা ক্ষুদ্রতার অধিকারী সে হউক না কেন, একটা বিষয়ে সকল মানুষ এক, সকলকেই সেই এক নিয়তির দাস হইতে হইবে—ঐ দুর্ব্বলতা হইতে অব্যাহতি কাহারও নাই; সর্ব্বশক্তি, সর্ব্ববুদ্ধি সত্ত্বেও তাহার পরাজয় অনিবার্য্য। কবির ভাষায়, মানুষকে গড়িবার সময়ে দেবতারা তাহার জীবনে এইগুলি মিশাইয়া দিয়াছিলেন—

"They gave him light in his ways,
    And love, and a space for delight,
And beauty and length of days,
    And night, and sleep in the night.
His speech is a burning fire,
    With his lips he travaileth,
In his heart is a blind desire,
    In his eyes foreknowledge of death;
He weaves and is clothed with derision,
    Sows, and shall not reap;
His life is a watch or a vision
    Between a sleep and a sleep."

—*SWINBURNE*: *Atalanta in Calydon*

—এই সত্যকেই আমরা যেন উপলব্ধি করিতে চাই, এবং করি বলিয়াই নাটকে ও কাব্যে মানুষকে দেখিয়া এত হাসি এবং এত কাঁদি। কিন্তু তথাপি একটা 'চরিত্র'ও গড়িয়া তুলিতে হয়—সেটা অন্য প্রয়োজনে, নাটকীয় বা উপন্যাসীয় কথাবস্তুর সঙ্গতি রক্ষার জন্য; কারণ, সেখানে ঘটনা ও চরিত্রবস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতেই সেই

কথাকে আদ্যন্তযুক্ত, বা সুগ্রথিত করিতে হয়; নহিলে নাটক বা উপন্যাসের রস-রূপ সুডৌল হইয়া উঠে না। কিন্তু যেখানে ঠিক সেই প্রয়োজন নাই, সেখানে ব্যক্তি-মানুষের চরিত্র, আপন স্বাতন্ত্র্যে, সর্ব্ববিধ অসঙ্গতির স্বাধীনতায় বিকাশ লাভ করিতে পারে, এবং চরিত্র বলিতে সম্পূর্ণ অন্য বস্তুই বুঝায়। শ্রীকান্ত-চরিত্রে আমরা সেই স্বাধীন মুক্ত স্বভাবের বিকাশ দেখিতে পাই; তাহা কেমন করিয়া সম্ভব হইয়াছে সে কথা সবিস্তারে বলিয়াছি, আর একবার সংক্ষেপে বলি।

এই আত্মচরিত-লেখক নিজেকে একটা চরিত্র-রূপে খাড়া করিবার কোন সজ্ঞান চেষ্টা করে নাই, নিজের সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র মমতা-বোধ নাই—থাকিলে, আমরা তাহার যে পরিচয় শেষ পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছি তাহা করা সম্ভব হইত না। শ্রীকান্ত সংসার ও সমাজের বন্ধন ত্যাগ করিয়াছে, তাহার অন্তর সে হিসাবে স্বাধীন। এই কাহিনীও তাহার নিজের কাহিনী ততটা নয়, যতটা অপরাপর কয়েকজন নরনারীর; অতএব তাহার দৃষ্টি মুখ্যতঃ নিজের দিকে নয়। তাহার এই আত্মকাহিনীতে কোন প্রকার ধর্ম্মনীতি, বা ধর্ম্মবিশ্বাস, কোন বৈষয়িক বা অন্যবিধ কর্ম্ম, জীবনে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা কামনাসিদ্ধির প্রয়াস প্রভৃতির কথা নাই—ঐ সকলের দ্বারাই মানুষের স্বভাব একটা বিশেষ ছাঁচে বিশেষ আকার গ্রহণ করে; শ্রীকান্তের তাহা ঘটে নাই। অতএব আমি তাহার যে চরিত্রহীনতার কথা বলিয়াছি তাহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ঐজন্য সে জ্ঞাতসারে তো নহেই, অজ্ঞাতসারেও একটা সেইরূপ চরিত্র-রূপ ধারণ করে নাই, এবং ঠিক সেই কারণেই আমরাও—ঠিক চরিত্র নয়—একটা ব্যক্তি-মানুষের প্রাণের পরিচয় পাই, তাহার অন্তর-পুরুষটাকে দেখি; তাহাতে কোন নীতি বা যুক্তির সঙ্গতি নাই। এমন করিয়া একজনের মধ্যে মানুষের সেই আদি প্রকৃতিটার মুক্ত লীলা দেখিবার সুযোগ অতিশয় দুর্ল্লভ নহে কি?

এখানে ঐ 'চরিত্র' কথাটার সম্বন্ধে আরও কিছু বলিলে ভাল হয়। আজকাল আমরা ইংরেজী অর্থেই ঐ শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকি। বিলাতী 'চরিত্র' বলিতে বিলাতী 'morality' বা সুনীতি-তত্ত্ব আসিয়া পড়ে—তাহার মূলে আছে একটা প্রবল অহং-সংস্কার; উহাও একপ্রকার আত্মপ্রতিষ্ঠা—উচ্চ স্বার্থ-চেতনার সহিত সংযুক্ত। 'Character' বলিতে যে 'Individuality' বুঝায় তাহা সেই স্বাতন্ত্র্য-বোধ, যাহা আত্মপর-ভেদ-মূলক; ঐরূপ চরিত্র-নিষ্ঠা আত্মগৌরব-বোধের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। অতএব 'moral' বলিতে যাহা বুঝায় তাহাতে একটা প্রবল আত্মাভিমান থাকিবেই। কিন্তু 'spiritual' বা 'আধ্যাত্মিক'—ইহার বিপরীত। তাহাতে

ঐরূপ অহংচেতনা বা ক্ষুদ্র 'আমি'টার অভিমান থাকে না। 'আমি বড়', 'আমি নিষ্পাপ'; 'আমি অপরের মত নহি'; 'আমি অঋণী', 'আমি পরপ্রত্যাশী নহি'; 'আমি কর্ত্তব্যপরায়ণ'—ইত্যাকার আত্মপ্রসাদ তাহাতে থাকে না, থাকে সেই আমি-টার ব্যাপ্তি বা বিস্ফারের আনন্দ; যেন সেই 'আমি'র পরিধিটা বিশাল হইয়া তাহার কেন্দ্রবিন্দুকে—সেই 'অহং'কে, অস্পষ্ট করিয়া তোলে। এই যে আমির বিস্ফার—ইহারই মাত্রাভেদে প্রেমের নানারূপ বিকাশ হইয়া থাকে। ঐ spiritual চেতনায় morality-র সংস্কার নাই, উহা এক অর্থে unmoral। হিন্দুর সাধনা মুখ্যতঃ spiritual; এবং বৌদ্ধ, জৈন, সেমিটিক প্রভৃতি ধর্ম্ম মুখ্যতঃ moral বলিয়া হিন্দুর হিন্দুত্ব সকল অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের চক্ষে যেমন দুর্ব্বোধ্য, তেমনই ঘৃণার্হ—বিশেষতঃ সেমিটিক ধর্ম্মগুলির মতে এমন অমেধ্য আর কিছু নাই। চরিত্র বলিতে ঐরূপ একটা moral ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-মহিমা বুঝায়, ইহাও মনে রাখিতে হইবে।

এই আলোচনাটুকুও এ প্রসঙ্গে অবান্তর নয়। Morality বা চারিত্র-সংস্কার যতই প্রয়োজনীয় বা হিতকর হউক, উহা আত্মার সংস্কার নহে; ঐ রূপ সচেতন চিন্তাও আত্মোপলব্ধির পরিপন্থী। আত্মোপলব্ধি বা আত্ম-পরিচয়ের প্রথম সোপান—অন্তরের অনুভূতি; সেই অনুভূতি ঐরূপ সংস্কারমুক্ত হইলেই তাহাকে বিশুদ্ধ অনুভূতি বলা যাইতে পারে। শ্রীকান্তের এই আত্মকাহিনীতে আমরা মুখ্যতঃ সেইরূপ অনুভূতির বর্ণনাই পাই। নিজের সেই অনুভূতিগুলাকেই সে যেন এই রচনাটিতে পুনর্ব্বার অনুভব করিতেছে, এবং সেই অনুভূতি যে সত্য, আমাদিগকে তাহা বিশ্বাস করাইবার জন্য সে তাহার কবিশক্তির শরণাপন্ন হইয়াছে। সে কি, বা কেমন মানুষ—সে কথা সে যেমন নিজেও চিন্তা করে না, তেমনই আমাদিগকেও চিন্তা করিতে বলে না। সে যাহা তাহাই, তজ্জন্য সে নিজের কাছে বা পরের কাছে জবাবদিহি করিবে না। সে তাহার চরিত্রের সমালোচনা আমাদিগের নিকটে প্রত্যাশা করে না—সে প্রয়োজনই তাহার নাই। সে কেবল তাহার স্মৃতির মণিমঞ্জুষা খুলিয়া, কতকগুলি অত্যুজ্জ্বল রত্ন-ভূষণ তাহা হইতে বাহির করিয়া, একটির পর একটি—অঙ্গুলিমুখে ঘুরাইয়া দেখিতেছে; তাহার যেন সেই কামনা—

> "Still may Time hold some golden space
> Where I'll unpack that scented store
> Of song and flower and sky and face,
> And count, and touch, and turn them o'er,
> Musing upon them;"
>
> —*RUPERT BROOKE*

সেগুলি তাহার পূর্ব্বজীবনের অভিজ্ঞান; তাহাদের সেই রশ্মিচ্ছটার দিকে চাহিয়া তাহার চক্ষে স্বপ্নের ঘোর লাগিয়াছে, কানেও শুনিতেছে—যেন এক জন্মান্তর-নদীর ওপার হইতে—

> "বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি—
> 'এসো এসো' সুরে, করুণ মিনতি-মাখা!"

—ইহার আবার সমালোচনাই বা কি? চরিত্র-বিচারই বা কি? তোমরাও তাহার সেই স্মৃতিমঞ্জুষার রত্নরাজিকে পারো তো মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখ।

(২)

ফলশ্রুতি

A good book is the precious life-blood of a master-spirit embalmed and treasured up on purpose to a life beyond life.

—*MILTON*

তবু, শ্রীকান্তের চরিত্র না হউক—তাহার জীবনটাকে একবার আদ্যন্ত দৃষ্টি বুলাইয়া লইতে হইবে, নহিলে এই গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি বলিয়া কিছুই থাকিবে না। তাহার চরিত্র যাহা তাহাতো দেখিলাম, কিন্তু তাহাতে কিছুই যায় আসে না—শ্রীকান্তের কাহিনী তাহার চরিত্র-কাহিনী নয়; বাহিরের সংস্পর্শে ও সংঘাতে একটি মানুষের অন্তরবাহিনী ভাব-স্রোতস্বিনীতে যে সকল তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেই তরঙ্গগুলি হইতেই একটা জীবন-ধারার যেটুকু পরিচয় করা সম্ভব, তাহার অধিক কিছু আশা করা যাইবে না। আমি বলিয়াছি, শ্রীকান্তের দোষগুণ, তাহার শক্তি ও অশক্তি—তাহার জীবনের ভাব ও অভাব, এই সকলকে একটা সুসঙ্গত চরিত্র-সূত্রে গাঁথিয়া লওয়া যায় না, কেন তাহাও বলিয়াছি। তৎসত্ত্বেও তাহার জীবনে একটা যে দ্বন্দ্ব রহিয়াছে দেখা যায়, সেই দ্বন্দ্বের সূত্র ধরিয়া একটা কালক্রমিক বিকাশ—সেই জীবনের একটা আরম্ভ ও পরিণাম—নির্ণয় করা দুরূহ নয়। মানুষের চরিত্রে—চরিত্র না বলিয়া তাহার স্বভাব বা প্রকৃতি বলাই আরও যথার্থ—সেই প্রকৃতিতে বহু বিপরীত প্রবৃত্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, আপাতদৃষ্টিতে বিপরীত হইলেও তাহার একটা অর্থ আছে। শ্রীকান্তের জীবনে সবচেয়ে যাহা আমাদের বিস্ময়ের কারণ তাহা এই যে, এতবড় কোমলহৃদয়, করুণাকাতর মানুষও সংসারবিমুখ, উদাসীন, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী হয় কেমন করিয়া? শ্রীকান্ত যে প্রেমকে কখন স্বচক্ষে দেখে নাই, তাহারই বা অর্থ কি? তাহার ঐ পরদুঃখকাতরতা—উহাও কি একটা বড় প্রেম নয়? কিন্তু সেই প্রেমের বশে সে কোন লোকহিতব্রত গ্রহণ করে নাই। যুবক-সন্ন্যাসী বজ্রানন্দের মত তাহার প্রেমে সেই কর্ম্মনিষ্ঠা নাই, অথচ ঐ বজ্রানন্দের চরিত্র সে গভীর সহমর্ম্মিতা ও শ্রদ্ধার সহিত চিত্রিত করিয়াছে। আরও অনেক ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়, সে যেন তাহার স্বভাবে কোথাও একটা

দ্বন্দ্বকে কিছুতেই উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছে না—তাহার অন্তরের অন্তরে এমন একটা গ্রন্থি পড়িয়া গিয়াছে যাহা সে কিছুতেই ছিন্ন করিতে পারিতেছে না। শ্রীকান্ত-জীবনের মূল-তত্ত্ব ইহাই; ঐ দ্বন্দ্বই তাহার সেই উদাসীন নিস্তরঙ্গ জীবনকেও বিক্ষুব্ধ করিয়া শেষে একপার হইতে অপর পারে ঠেলিয়া দিয়াছে।

এই উপন্যাসের কাহিনী-অংশেও, তাহার সেই নাটকীয় ঘটনাধারায়, আমরা সেই দ্বন্দ্বের একটা বহির্গত রূপ দেখিয়াছি—একদিকে নারীর প্রেম, অপরদিকে এক উদাসীন পুরুষের বিমুখতা। আমাদের এই আলোচনায় আমরা মুখ্যতঃ সেই প্রেমেরই আরতি ও তত্ত্বালোচনা করিয়াছি—ঐ বৈরাগ্যের দিকটায় ততটা মনোযোগ দিতে পারি নাই; এক্ষণে শ্রীকান্ত-জীবনের একটা শেষ হিসাব-নিকাশ করিবার জন্য, তাহার ঐরূপ পরিণামের কার্য্যকারণ-তত্ত্ব বুঝিবার জন্য, এই কাহিনী হইতেই কয়েকটি সূত্র পুনরায় উদ্ধৃত করিব।

শ্রীকান্তের ভিতরে, তাহার আদি-স্বভাবে, যে একটা বড় প্রেমের পিপাসা ছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি—সে আসলে বৈরাগী নয়; প্রেম তাহার জন্মগত স্বভাব-ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়, সেই সঙ্গে বাঙালী-সুলভ একটা বড় Idealism তাহার সেই বালক-হৃদয়ে অতি অল্পবয়সেই স্ফুরিত হইয়াছিল। এই দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ ঘটিবার কারণ নাই; কিন্তু অবস্থাচক্রে উহার একটিতে আঘাত লাগায় ঐ প্রেম একটা দুর্জ্জয় ঔদাসীন্যে পরিণত হয়; পরে দৈবচক্রে সেই Idealism অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সেই বাল্যজীবনে তাহার মত অনুভূতিপ্রবণ হৃদয় বারবার যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতেই একটা কঠিন আত্মাভিমান যেমন তাহার বর্ম্মস্বরূপ হইয়াছিল, তেমনই তাহার স্বভাবসুলভ সেই Idealism নিরুদ্ধ ও পর্য্যস্ত প্রেমের সেই আত্মাভিমানকে একটা সহায় পাইয়াছিল। সেই বালক-বয়সে, তাহার মত বেদনাশীল ও উচ্চ-আদর্শ-পিপাসুর চিত্তে, ইন্দ্রনাথের মত মহাশক্তিমান্ সেই বয়োজ্যেষ্ঠ বালক কিরূপ দৃঢ় ও গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সে কথা আমি বলিয়াছি; কিন্তু সেই একই কালে, একই সঙ্গে, অন্নদাদিদির সেই তপস্বিনী ভৈরবী-মূর্ত্তি শ্রীকান্তের হৃদয়-তন্ত্রীতে যে নিদারুণ আঘাত করিয়াছিল, তাহাতেই তাহার প্রাণের সহজ ধারাটি বিপরীতমুখী হইয়াছিল। শ্রীকান্তের সেই পূর্ব্ব-নিরুদ্ধ প্রেম—অতিশয় কোমল স্পর্শকাতর হৃদয়ের সেই অভিমানসঞ্জাত উদাসীনতা—সকল প্রেমের আদি বা মূল যাহা, তাহার প্রতি ঘোরতর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। ঐ অন্নদাদিদিকে দেখিয়া, তাহার স্বভাবে যাহা গূঢ়-নিহিত ছিল, তাহা একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল; নিজ হৃদয়ের সেই শূন্যতাকে

ভরিয়া লইবার সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল, সে ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া বড়ই আশ্বস্ত হইল। অন্নদা-দিদিই তাহাকে দাম্পত্য-প্রেমের সেই ভীষণ নিষ্ঠুর বন্ধন, এবং ঐরূপ প্রেমের ভয়ঙ্কর মোহ সম্বন্ধে, এমন এক প্রতীতির বশীভূত করিল যে, সে সম্বন্ধে আর কোন বিচার, কোন চিন্তাই সে মনে স্থান দিতে পারিল না। কিন্তু তাহাতেই দ্বন্দ্বেরও সূত্রপাত হইল; প্রেমকে সে তাহার স্বভাব হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিল না—তাহার অন্তশ্চৈতন্যে সে একটা ভয়ের মত বিরাজ করিতে লাগিল, সেই ভয়কে ভুলিবার জন্যই সে ইন্দ্রনাথকে সর্ব্বদা তাহার রক্ষীরূপে তাহার শক্তিমন্ত্রের আদর্শরূপে খাড়া রাখিয়াছিল; প্রেমকে সে যেমন ভয় করিত এমন আর কিছুকে নয়। মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা জীবন-বিধাতার মানুষকে লইয়া কি নিদারুণ পরিহাস-লীলা!

আবার ঐ অন্নদাদিদিই একদিকে যেমন তাহাকে সমাজের বিরুদ্ধে আজীবন বিদ্রোহঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তেমনই, যে-সমাজের জল-মাটীতে নারী-চরিত্রের ঐ অপরূপ পুষ্পোদ্গম হয়,—যাহার বাহিরে আর-কোন সমাজে নারীর ঐ লোকোত্তর তপঃশক্তির মহিমা দৃষ্টিগোচর হয় না—সেই সমাজের প্রতিও একটা প্রচ্ছন্ন-গভীর শ্রদ্ধা সে ত্যাগ করিতে পারে না; এ দ্বন্দ্বও তাহার জীবনে কখনো ঘুচে নাই। ঐ প্রেমও যেমন তাহার জন্মগত সংস্কার, সতীত্বের ঐ আদর্শও তেমনই তাহার একটা অর্জ্জিত সংস্কার; এই জন্যই সে ঐ অতিজীর্ণ, বহুপাপ-জর্জ্জর প্রাচীন সমাজটাকে আধুনিকদের মত সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। নিজ হৃদয়ের এই যে দ্বন্দ্ব, ইহাই পরবর্ত্তী কালের শ্রীকান্তকে—ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে—এমন শক্তিমান কবি-শিল্পী করিয়া তুলিয়াছে; তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসের নায়িকাস্থানীয় নারীর চরিত্রে যে-ট্র্যাজেডির ছায়াপাত আছে, তাহাতেই উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টি হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের আধুনিক ভক্ত-পাঠক ও অতি-বিদ্বান রসপণ্ডিত সমালোচকেরা ঐ উপন্যাসগুলিতে কেবল সমাজ-বিদ্রোহের ও নারী-স্বাধীনতার যুদ্ধ-ঘোষণাই বড় করিয়া দেখেন, এবং তাহাতেই মুগ্ধ-পুলকিত হইয়া কেহ শৃঙ্গ, কেহ বা লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া থাকেন; কিছু বলিবার যো নাই, ভোটাধিক্যে তাঁহাদেরই জয়-জয়কার! কিন্তু সমগ্র শরৎ-সাহিত্যে যে একটি রস উজ্জ্বল হইয়া আছে—তাঁহার শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে যে রসের স্বাদ আমরা পাই, তাহা তাঁহারই সৃষ্টি; তাহাতে শরৎচন্দ্র একদিকে যেমন তাঁহার সেই অসীম সমবেদনার আশ্চর্য্য দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছেন,, তেমনই ঐ অত্যাচারিত নিগৃহীত নারীর মধ্যে যে শক্তি ও অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ দেখিয়া, শুধুই নারী-পুরুষ ভেদ নয়—আরও একটা বড়

কিছুর কারণে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমবোধ করিয়াছেন, তাহার জন্য ঐ সমাজের প্রতিই একটুকু শেষ মমতা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন নাই; যদি পারিতেন, তবে ঐ দ্বন্দ্বও যেমন থাকিত না, তেমনই শরৎচন্দ্র এতবড় কবি না হইয়া আজিকালিকার সাহিত্য-বিপণির ভাড়াটিয়া গল্প-লেখক হইতেন। অতএব, ঐ দ্বন্দ্ব জীবনে তাঁহাকে যতই উদ্‌ভ্রান্ত করুক না কেন, সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে বড়ই হিতকর হইয়াছিল।

শ্রীকান্ত-জীবনের ঐ দুই দ্বন্দ্ব বা দুই মূলগ্রন্থির সন্ধান করিয়া এইবার আমি, সেই জীবনের যেটুকু বিকাশ ও যে পরিণাম এই কাহিনীতে আছে, তাহার আভাস দিব। তাহার বাল্যজীবনের কাহিনীতে আমি তাহার চরিত্রের বা স্বভাবের একটা ভিত্তি নির্ণয় করিয়াছিলাম। তারপর, যুবক শ্রীকান্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—একমাত্র পরিবর্ত্তন তাহার জীবনযাত্রার। তখন সে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়াছে, তাই তাহার সেই স্বভাবও পূর্ণ প্রকাশিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে; সে তখন সত্যই একটা ভবঘুরে,—আত্মচিন্তাহীন, দুঃসাহসী, পরদুঃখকাতর, সর্ব্বপ্রকার নিয়ম-শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। রাজলক্ষ্মীর সহিত সেই সাক্ষাৎকালে এবং তাহার কিছু পরে পর্য্যন্ত, আমরা যুবক শ্রীকান্তের যে পরিচয় পাই তাহাতে ইন্দ্রনাথকে স্মরণ হইয়াছিল; সেই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যেও যে তেজস্বিতা, ভয়হীনতা ও স্বাধীনতার স্পৃহা লক্ষ্য করা গেল, তাহাতে মনে হইল, এ সেই ইন্দ্রনাথ-শিষ্য শ্রীকান্তই বটে, কেবল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে স্বাধীন-জীবন যাপন করিতেছে। ইহার পর তাহার জীবনে একটা নূতন অধ্যায় সুরু হইয়াছে; যে ধরণের প্রেমকে সে আর প্রশ্রয় দিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সেই প্রেম তাহাকে আক্রমণ করিল, একরূপ দৈব-পরিহাসের মতই রাজলক্ষ্মীর সহিত তাহার সেই ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হইল; শেষে এমন হইল যে, সে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না, গ্রহণ করিতেও পারে না; সেই দীর্ঘ অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাসই এ কাহিনীর প্রধান অংশ। শেষে অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে একটা সন্ধি করিতেও সম্মত হইল। ঠিক এই সময়ে আর একটা—আরও বড়, আরও প্রধান ধাক্কা তাহাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল; কমললতার মধ্যে সে যাহা দেখিল তাহাতে সে নিজেরই অন্তরতম অন্তরের এমন একটা পরিচয় পাইল যে, আর কোন অভিমান টিকিল না; অন্নদা, রাজলক্ষ্মী ও অভয়া—এই তিনের মধ্য দিয়া সে যে একটা সমস্যা ও তাহার সমাধান, দুই বিষয়েই প্রায় নিশ্চিন্ত হইতে যাইতেছিল, এবং তাহার সেই আত্মাভিমান—সেই একমাত্র রক্ষা-কবচটিকে ফিরিয়া পাইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ তখনকার মত মিথ্যা হইয়া গেল। সংক্ষেপে

ইহাই তাহার শ্রীকান্ত-জীবনের ইতিহাস, আমি তাহার সেই পরিণামের কথা সবিস্তারে বিবৃত করিয়াছি।

কিন্তু এতবার এত আলোচনার পরেও সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইবে না; শ্রীকান্তের চরিত্র আমাদের মতে অপরাপর ব্যক্তি-চরিত্রের মত যতই দুর্ভেদ্য হউক, একটা প্রশ্ন আমাদের মনে শেষ পর্য্যন্ত অমীমাংসিত থাকিয়া যায়, তাহা এই যে, এতবড় হৃদয়বান্ পরদুঃখকাতর যে, তাহার বৈরাগ্য সাধারণ বৈরাগ্য নয়,—অর্থাৎ সে খাঁটি উদাসীন সন্ন্যাসী নয়, তবে তাহার ঐরূপ প্রেম-বিমুখতার কারণ কি? ইহার একটা উত্তর পূর্ব্বে দিয়াছি—পরে সে সম্বন্ধে শেষ মন্তব্য করিব। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা মনস্তত্ত্ব-ঘটিত তত্ত্ব আমাদের মত করিয়া কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়; চরিত্রের কথা নয়, মানুষের সেই আদি স্বভাবের কথা নয়,—তাহার উপরে যে আর একটা আচ্ছাদন পড়ে, যে আচ্ছাদন সেই স্বভাবকেও চাপিয়া রাখিয়া মানুষের মানসাভিমানকেই উদ্ধত করিয়া জীবনটা জটিল ও ছন্নছাড়া করিয়া দেয়, তাহার কথা। আমরা দেখিয়াছি, কমল-লতা শ্রীকান্তের সেই আদি-স্বভাবকে মুহূর্ত্তে চিনিয়াছিল, আবার উপরকার ঐ আচ্ছাদনটাকেও মানিয়া লইয়াছিল; কিন্তু তজ্জন্য কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হয় নাই। পরে সে কথা আর একবার উল্লেখ করা আবশ্যক হইবে, এক্ষণে সেই মনস্তত্ত্ব অনুসারে ঐ প্রশ্নের যে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে তাহাই করিব। শ্রীকান্তের ঐ যে প্রেমবিমুখতার কথা বারবার বলিতে হইয়াছে, উহা সেই প্রেম নয়—আমরা যাহাকে গভীর হৃদয়বত্তা বলি, যাহার নাম নিঃস্বার্থ মানব-প্রেম। শ্রীকান্তের সেই হৃদয়বত্তা যে কত গভীর, তাহার সেই পরদুঃখ-কাতরতা যে কত আন্তরিক তাহা আমরা দেখিয়াছি; করুণার সেই আত্মহারা আবেগ—আর্ত্তত্রাণের প্রাণময় উৎকণ্ঠা—কয়েকটি ঘটনায় জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐরূপ করুণা ও প্রেম একবস্তু নয়—পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, এখানে আরও কিছু বলিব। করুণায় ও প্রেমে (আমরা যে-প্রেমের এত আলোচনা করিতেছি) তফাৎ এই যে, একটাতে নিজের বেদনা নাই, পরের বেদনায় সমবেদনা আছে; অপরটিতে নিজের বেদনাই পরের বেদনায় যুক্ত হয়, তাই শুধু সমবেদনা নয়—একাত্মীয়তা জন্মে। যাহাকে আমরা করুণা বলি, তাহাতে ব্যক্তির নিজ-আত্মা মুক্ত ও স্বাধীন থাকে—ধরা দেয় না, তাই যাহারা আত্মমমতাহীন বৈরাগী তাহারাও করুণাপরবশ হইতে পারে। ঐরূপ আত্মনির্লিপ্ত ভাবে মানুষের প্রতি যে অনুকম্পা তাহাতেও একটা সূক্ষ্ম আত্মাভিমান আছে—আমার জন্য নয়, পরের জন্য, অতএব একপ্রকার মহত্ত্ববোধ আছে। যাহার নিজের কোন দুঃখ নাই,

থাকিলেও স্বীকার করে না, তাহার করুণা আছে—প্রেম নাই। প্রেমের মূলে আছে নিজ-আত্মার ক্ষুধা, এই ক্ষুধা (তন্ত্রের ভাষায়) মানুষের দেহেরই স্বাধিষ্ঠানে নিহিত থাকে, উহাই বীজরূপে কাম, পুষ্পরূপে প্রেম। প্রত্যেক মানুষকে অতিশয় স্বতন্ত্র একটি অহংচেতনার মধ্য দিয়া সবগুলি সোপান উত্তীর্ণ হইতে হয়; উহার যে ব্যথা, যাহাকিছু পাপ-তাপ—'sin and sorrow'—তাহাই সেই অহংটাকে মানুষের আত্মা বা অন্তরপুরুষের সহিত মুখামুখি করিয়া দেয়, সেই ক্ষুধাই শেষে মানুষকে একটা আধ্যাত্মিক বেদনায় আকুল করিয়া তোলে। তাই প্রেম যত বড় হউক, তাহাতে ঐ 'আমি'র ব্যথা থাকিবেই। সেই ব্যথা শুধু পরের সহিত সমবেদনা নয়,—নিজের সেই বেদনাও তাহাতে যুক্ত থাকে, নহিলে সত্যকার ব্যথার ব্যথী হওয়া যায় না। আমার 'আমি'র ব্যথা দিয়াই পরের ব্যথা বুঝি। শ্রীকান্ত কেবল পরের 'দুঃখ'টাকেই বুঝে—সে দুঃখ যাহারই হোক, তাহার তীব্রতাও অনুভব করে। ঐ দুঃখ কোন ব্যক্তি-আত্মার দুঃখ নয়, উহা সার্ব্বজনীন মানবীয় দুঃখ,—দেহ-মনের নিগ্রহকাতরতা। কিন্তু যে দুঃখ সার্ব্বজনীন দেহ-দুঃখই নয়, আরও গভীর; সেই যে sorrow—যাহার পিছনে আছে একটা soul ("Behind every sorrow there is always a soul")—শ্রীকান্ত সেই ব্যথার ব্যথী হইতে পারে না। তাই সে অন্নদা, রাজলক্ষ্মী, এমন কি গহরের সেই ব্যক্তি-আত্মার পিপাসা বুঝিতে পারে নাই; সে তাহাদের বাহিরের দুঃখটাকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে, এবং সেই দুঃখ সহ্য করিবার শক্তিকে দেখিয়া যেমন প্রফুল্লিত তেমনই করুণাপরবশ হইয়াছে। সেই দুঃখের অন্তস্তলবাহিনী রসধারা—সেই বিষেরও অমৃত-মধু—সে হয়তো কল্পনা করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না; তার কারণ, সে-বস্তু সে নিজের বক্ষে ধারণ করে নাই। অতএব, আমি যে বলিয়াছি, শ্রীকান্তের ঐ পরদুঃখকাতরতা খুব বড় ও গভীর হইলেও উহার মূলে একটা প্রবল সেন্টিমেণ্ট বা ভাবাবেগ আছে, উহাতে করুণার সমবেদনা থাকিলেও, প্রেমের সেই সম-ব্যথানুভূতি ছিল না, দয়া ছিল—আত্মার আত্মীয়তা ছিল না, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে; ইহার কারণ, শ্রীকান্ত নিজের ক্ষুধাকে—নিজ আত্মার আর্ত্তিকে কখনও আমোল দেয় নাই; সেই আত্মার সম্বন্ধে সে নাস্তিক।

কিন্তু প্রেমিকের কথা স্বতন্ত্র। সে ঐ দুঃখের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করে না—দুঃখটাকেই বড় করিয়া দেখে না, ব্যথার মর্ম্মও বোঝে; সেই ব্যথাকে প্রণাম করে, অতি দীনভাবেই সেই ব্যথার ব্যথী হইয়া দুঃখীর সহিত হৃদয়ের রাত্রি-জাগরণ

করে। আমি মানব-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা বলিতেছি না; অন্নদা, রাজলক্ষ্মী, গহর, কমল-লতার যে দুঃখ তাহারই কথা বলিতেছি। শ্রীকান্ত ইহাদের দুঃখকে সেই সাধারণ দুঃখেরই একটা নিষ্ঠুর প্রকাশরূপে দেখিয়াছে, তাহার পিছনকার সেই soul-টার সন্ধান করে না। তাই কলেরা, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর আক্রমণে—আমাদের দেশের অতি-দুঃস্থ অসহায় নর-নারীর সেই অবস্থায় সে করুণায় বিহ্বল হয়, নিজের প্রাণটা ছিঁড়িয়া তাহাদের সেবায় উৎসর্গ করিতে অধীর হয়,—এই কাহিনীতে সেই সকল চিত্র যে তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে, তেমন তুলিকাও যেমন সাহিত্যের চিত্রশালায় বিরল, তেমনই শ্রীকান্তের ঐরূপ মানব-প্রেম তাহাকে একটি অনর্ঘ মহিমা দান করিয়াছে। কিন্তু সেই শ্রীকান্তই অন্নদা, রাজলক্ষ্মী, কমল-লতার নিকটে ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে,—কেন, কি কারণে, আর একবার তাহারই আলোচনা করিলাম।

শ্রীকান্তের ঐ মানব-প্রেমের প্রসঙ্গে ইন্দ্রনাথকে মনে পড়া স্বাভাবিক; নদীর কিনারায় সেই কলেরায়-মরা শিশুটিকে ভাসিতে দেখিয়া ইন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব্ব অনুকম্পা, এবং তাহার কথায় ও আচরণে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল, পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয়ই তাহা ভুলিয়া যান নাই—সে চিত্র ভুলিবার নয়। শ্রীকান্তের জীবনে ইন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা বলিয়াছি, সে প্রভাব এমনই যে, ইন্দ্রনাথের চেয়ে ছোট কোন পুরুষকে প্রণাম করিতে তাহার বাধিত—ঠিক যেমন অন্নদাদিদির আসনে সে আর কোন নারীকে বসিতে দেয় নাই। কিন্তু ইন্দ্রনাথের প্রভাবে তাহার পুরুষাভিমান বৃদ্ধি পাইলেও, সেই হৃদয়বল তাহার ছিল না; ইন্দ্রনাথের সেই অমিতবীর্য্য ও অকুতোভয়ের মূলে ছিল যে প্রেম ও আত্ম-প্রত্যয়—শ্রীকান্তের তাহা ছিল না; তাই অন্নদাদিদিকে ইন্দ্রনাথ যেমন বুঝিয়াছিল, শ্রীকান্ত তেমন বুঝে নাই। কিন্তু ঐ ইন্দ্রনাথই শ্রীকান্তের স্বভাব-নিহিত কয়েকটি গুণ বা দোষ বর্দ্ধিত করিয়াছিল—ইন্দ্রনাথের সেই নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা, সেই দুর্দ্দান্ত সাহস, এবং সর্ব্ব-বন্ধনমুক্তির সেই উগ্র পিপাসা শ্রীকান্তের আদর্শ হইয়াছিল, সে তাহার সেই বালক-গুরুর আদর্শকে নিজের জীবনে কিছুতে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। কিন্তু ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তের মত ভাবপ্রবণ ছিল না, তাহার আত্মার আত্মপ্রত্যয় ছিল দুর্দ্ধর্ষ; সে কোন সূক্ষ্ম চিন্তা বা ভাবুকতার ধারও ধারিত না। অতএব শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও, তাহার একটা সজ্ঞান আত্মাভিমান ছিল, হৃদয়-বল অপেক্ষা চিত্তের অস্থিরতাই অধিক ছিল। আমরা শ্রীকান্তের মস্তিষ্ক-শক্তি বা বিচার-শক্তি অপেক্ষা ভাবুকতা-শক্তিই যেমন অধিক হইতে দেখি, তেমনই faith বা বিশ্বাসের

যে আরেক প্রকার দৃষ্টি ইন্দ্রনাথের ছিল—যে-দৃষ্টি প্রেমিকেরও আছে—কোন-কিছুকে অপরোক্ষ করিবার সেই দৃষ্টি শ্রীকান্তের ছিল না। উহাকেই একরূপ দিব্যজ্ঞান বলা যাইতে পারে; প্রেমিকের পক্ষে ঐ জ্ঞান আরও সহজ, কারণ, তাহার দেহের সেই ক্ষুধাই—সেই অগ্নিই—অন্তরের জ্যোতিতে পরিণত হয়। অতএব, ইন্দ্রনাথের প্রভাব শ্রীকান্তের শক্তির দিকটাও যেমন, তেমনই অশক্তির দিকটাও বাড়াইয়া দিয়াছিল, তাহার আত্মাভিমান বৃদ্ধি করিয়াছিল; তাহার সেই সৎপ্রবৃত্তি-গুলির সহিত বিশ্বাসের হৃদয়-বল ছিল না, সেন্টিমেন্টের সংশয় ও দুর্ব্বলতা ছিল।

এইবার শ্রীকান্ত-জীবনের সেই পরিণাম অতিশয় স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সেই দীর্ঘ হৃদয়-সংগ্রামের পর রাজলক্ষ্মী শেষে শ্রীকান্তের নিকটে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিল—তাহাতে শ্রীকান্তেরই জয় হইল; তাই শ্রীকান্তও রাজলক্ষ্মীকে তাহার সকল পাপ সকল মোহ মার্জ্জনা করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইল আরও যে সকল কারণে, তাহা সবিস্তারে পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু শ্রীকান্ত এত সহজে নিস্তার পাইল না; রাজলক্ষ্মীকে ঐরূপ মার্জ্জনা করিয়া তাহার সেই স্নেহ-ভালবাসার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা, তাহার গুণরাশির প্রতি মুক্ত-হৃদয়ের শ্রদ্ধা প্রভৃতির দ্বারা সে আপনারই উদারতার বিষয়ে যে একটি মহত্ত্ব অনুভব করিতেছিল, তাহা তৎক্ষণাৎ মিথ্যা হইয়া গেল,—দৈবের এমনই পরিহাস যে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে এমন আরেক নারী তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, যাহার নিকটে তাহার নিজের সেই পুরুষাভিমান অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। কমল-লতাকে দেখিয়া সে প্রথমে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, তারপর সে যখন তাহার জীবনের কাহিনী ও তাহার সাধনা—একটা শুনিল, এবং অপরটা চাক্ষুষ করিল, এবং প্রেমের একটা অতি-মানস, অধ্যাত্ম-রূপ—ঠিক না বুঝিলেও, সংশয়-বিস্ময়ে তাহাকে বিচলিত করিল, তখন সেই প্রথম তাহার সেই কঠিন আত্ম-প্রসাদ একটা বড় আঘাত পাইল। অন্নদাদিদির শুচিতা, রাজলক্ষ্মীর পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি—সকল শুচিতা ও অশুচিতাকে উড়াইয়া দিয়া, বরং অশুচিতার গাঢ়তম পঙ্ক সর্ব্বাঙ্গে মাখিবার পর এই নারী প্রেমের কোন্ তীর্থে অবগাহন-স্নান করিয়াছে! ইহার মন-প্রাণের কি অভ্রস্বচ্ছ শুচিতা!—মুখে-চক্ষে উষালোকের মত আনন্দদ্যুতি! কমল-লতা যখন অসঙ্কোচে অকুণ্ঠিত কণ্ঠে তাহার সকল দুর্গতি—জীবনের যতকিছু কলঙ্ক-পঙ্ক দুই হাতে তুলিয়া দেখাইল, তখন শ্রীকান্ত আত্মারই একটা নূতন প্রকাশ দেখিল, প্রেমের এই রূপ সে কখনো কল্পনাও করে নাই। প্রেমকে সে একটা বন্ধন বলিয়াই বিশ্বাস করে,—তাহার শুচিতা-অশুচিতা সম্বন্ধে

সেই সংস্কারও কিছুতে ঘুচিবে না। তথাপি কমল-লতা শ্রীকান্তের ভিতরে কি দেখিয়াছিল তাহা সেই জানে ; সে তাহাকে নাস্তিক বলিয়া বিশ্বাস করিল না, বরং সেই প্রেমের অমৃত পান করিবার জন্য তাহাকেই নিমন্ত্রণ করিল ; পরে তাহার সঙ্কোচ ও ভীরুতা দেখিয়া, সেই প্রেমেরই পরম স্নেহে তাহাকে স্বচ্ছন্দে মুক্তি দিল। কমল-লতার ঐ প্রেমে-মুক্তি শ্রীকান্ত চোখে দেখিল,—সেই প্রেমকে না বুঝিলেও সে অবিশ্বাস করিতে পারিল না, সেই সঙ্গে নিজের ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা নিজের নিকটে আর ঢাকা রহিল না। ইহাতেই শ্রীকান্তের শ্রীকান্ত-জীবন ছিন্ন হইয়া গেল—না হইয়া পারে না।

এ সব কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, তবু আর একবার সংক্ষেপে পাঠক-পাঠিকাদের গোচর করিলাম—তার কারণ, ইহাই এই উপন্যাসের ফলশ্রুতি, ইহাই উহার মর্ম্মকথা। কমল-লতার ঐ প্রেম যেমনই হোক, শ্রীকান্ত তাহাকে স্বীকার বা গ্রহণ করিতে পারুক বা নাই পারুক—অন্ততঃ শ্রীকান্তের দিক দিয়া উহাই এ কাহিনীর শেষ গ্রন্থি। উহার পর আর কিছু নাই ; গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে, কি অসমাপ্ত আছে, সে প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে ঐ কমললতা-পর্ব্বের গৌরব বা অর্থ-গূঢ়তার উপরে। *অতএব ঐ পরিণাম-তত্ত্বটি উত্তমরূপে বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।* এ কথা সত্য, যে আমরা এই উপন্যাসে মুখ্যতঃ যে-প্রেমের বিকাশ ও প্রকাশ দেখি, সেই সাধারণ মানবীয় প্রেমের বহু উর্দ্ধে এই অপর প্রেমের সাধন-পীঠ। কিন্তু শ্রীকান্তের মত প্রকৃতি যাহার—তাহার সেই আত্মজ্ঞান-বিমুখ, ও পরদুঃখসর্ব্বস্ব নাস্তিক্যবুদ্ধির অবিশ্বাসকে আঘাত করিবার জন্য ঐ প্রেমের ঐ রূপটারই প্রয়োজন ছিল। এজন্য ঐ কমললতা-চরিত্র এবং তাহার ঐ প্রেম-সাধনার কাহিনী এই উপন্যাসের এমন একটি অঙ্গ হইয়াছে, যাহাতে একাধারে কাব্যরস ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বরসের চূড়ান্ত হইয়াছে। ঐ চতুর্থ-পর্ব্বে শ্রীকান্ত আর্টেরও তুরীয়লোকে প্রবেশ করিয়াছে ; একদিকে যেমন রাজলক্ষ্মী-জীবনের বাসন্তীপূর্ণিমা, অপরদিকে তেমনই কমল-লতার হৃদয়-নিশীথের গাঢ়-গম্ভীর ছায়া—এই দুইয়ে মিলিয়া যে রসের সৃষ্টি করিয়াছে, এবং শ্রীকান্তও এই শেষপর্ব্বে যেমন করিয়া তাহার আত্মার নিকটেই আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহাতে ঐ শেষপর্ব্বে সমগ্র কাব্যখানির মূল-প্রেরণা সার্থক হইয়াছে। কাব্যরসেরও এমন একটি নিগূঢ় ধারা উহাতে রহিয়াছে, যাহা অপণ্ডিতেও আস্বাদন করিবে। কিন্তু আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিতেরা—বিশেষ করিয়া বিশ্ব-পণ্ডিত অধ্যাপকেরা করিবে না ; তার কারণ, ঐ রস 'intellectual' নয়, অর্থাৎ কিনা, পুঁথি-নিংড়ানো বিদ্যা ও মস্তিষ্কের পালোয়ানী

উহাতে কসরৎ করিবার সুযোগ পায় না। উহা সেই হৃদয়তলবাহিনী ভোগবতীর রসধারা, যাহাতে আত্মার গভীরতর আকুতি—মহাপ্রাণের মাধুরী-পিপাসা চরিতার্থ হয়।

শ্রীকান্তের ঐ পরিণামের বিচার এই পর্য্যন্ত। রাজলক্ষ্মীর দিক দিয়াও আমরা তাহার জীবনের অনেক 'হইতে-পারিত' কল্পনা করিতে পারি। তাহার এমন সুস্থ, স্বাভাবিক ও পরিপূর্ণ প্রেমও ব্যর্থ হইল কেন? একটা কারণ অবশ্য—রাজলক্ষ্মীর ঐ জীবন, তাহার ঐ সামাজিক অপমৃত্যু। শ্রীকান্তের মত মানুষকে সুখী করিবার, তাহার ভিতরকার সেই শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া দিবার, হয়তো বা জলমগ্ন ব্যক্তিকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়ার দ্বারা সঞ্জীবিত করার মত শ্রীকান্তের সেই সংজ্ঞাহীন প্রেমকে উজ্জীবন করিবার—সকল সামর্থ্যই তাহার ছিল। কিন্তু শ্রীকান্তের যে উচ্চ আত্মাভিমান রাজলক্ষ্মীকে এমন শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল—তাহাই সে পথ রুদ্ধ করিল; অথচ রাজলক্ষ্মী ঐ শক্তি ও সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছিল তাহার সেই সমাজ-বহির্ভূত বাইজী-জীবনেরই প্রসাদে। যদি সেই বালিকা-বয়সেই শ্রীকান্তের সহিত তাহার বিবাহ হইত, তাহা হইলে রাজলক্ষ্মীর অবস্থা ও তাহার মনের বিকাশ কিরূপ হইত, তাহা আমরা ঐ-সমাজের দরিদ্র-গৃহে নারীর বিভীষিকাময় জীবনযাত্রা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিব। ইহাও আমি দেখাইয়াছি যে, দম্পতি-জীবনকে শ্রী ও শুচিতাসম্পন্ন করিতে হইলে ঐ পুরুষের দ্বারা তাহা হইত না—নারীকেই তাহা করিতে হইত, কারণ এখানেও সেই—

> "তোমারি প্রণয়স্নেহ বাঁধিল কৈলাস-গেহ
> পাগলে করিলে গৃহী, ভূতে মহেশ্বর।"

ইহার জন্য রাজলক্ষ্মীর ঐ প্রতিভা, বুদ্ধি ও হৃদয়—এই তিনের বিকাশে যে পূর্ণ-স্বাধীনতা আবশ্যক হইত, তাহা নিশ্চয়ই ঐ সমাজের বিবাহিত পত্নীরূপে কখনই লাভ করা সম্ভব হইত না। যে-রাজলক্ষ্মীকে আমরা দেখিয়াছি, যাহার সেই নারীচরিত্রের অপূর্ব্ব শ্রী ও শক্তি দেখিয়া আমরা সেই নারীকে ভিখারী শিবের ভিক্ষাপাত্র ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অন্নপূর্ণা-রূপিণী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি—সে কোন্ রাজলক্ষ্মী? সে বাংলার সেই পল্লীসমাজের দারিদ্র্য ও অত্যাচারপীড়িত বিবাহ-বিড়ম্বিত কুলীন-কন্যা নয়; সেই কুলীন-কন্যাই পিয়ারী-বাইজী হইয়া তাহার নারীত্ব এমন পূর্ণ প্রস্ফুটিত করিতে পারিয়াছে—ইহার মত লজ্জাকর ও শোচনীয় আর কি হইতে পারে? অতএব সে সম্ভাবনাও ছিল না। তারপর, একদিকে পুরুষ-জীবনের ঐ শূন্যতা এবং নারী-জীবনের ঐ পূর্ণতা, এই দুইয়ের

মধ্যে একটি বিশাল বিচ্ছেদের নদী দুস্তর হইয়া রহিল; ঐ যে চির-বিরহ উহা নিয়তির মতই দুর্লঙ্ঘ্য। একজন হারাইয়া পাইল, কারণ পূর্ণতা তাহার মধ্যেই বিরাজ করিতেছিল; আর একজন পাইয়াও হারাইল, তার কারণ শূন্যতাই তাহার সারা জীবনের সম্বল; ইহাও এ কাহিনীর ফলশ্রুতি।

তথাপি সর্ব্বশেষে, ঐ শ্রীকান্ত জীবনের পরিণামেরও পরিণামে, এই আত্মকাহিনীর মারফতে, আমরা যে একটি তত্ত্ব আভাসে আবিষ্কার করি, তাহাও একটু গভীর করিয়া বুঝিয়া লইবার প্রয়োজনও আছে। এই কাহিনীতে শ্রীকান্তের আত্মাভিমান যত বড় হইয়া উঠুক না কেন, আমরা শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম, উহাও তাহার স্বভাবের ব্যতিক্রম—তাহার স্বধর্ম্ম নহে, উহা একটা মোহ; সেই মোহ সে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই কাহিনীতে সেই চরিত্র-গ্রন্থির পরিচয় কোথাও নাই—শ্রীকান্ত তেমন একটা চরিত্র নয়, সে কথা বলিয়াছি; তবে ঐ আত্মাভিমান সত্য হয় কেমন করিয়া? উহাও একরূপ মনের ব্যাধি; সেই ব্যাধিও তাহার পক্ষে সত্য নয়—সত্য হইলে সে এমন লক্ষ্যহারা—ঘরেও নয়, পথেও নয়—জীবনযাপন করিত না। আমি যে তাহার সেই প্রেম-বিমুখতার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাই সত্য; তাহার ঐ পরদুঃখকাতরতা এবং সংসারে সমাজে মনুষ্য-হৃদয়ের সেই অপমান-লাঞ্ছনাই তাহাকে আত্ম-ধিক্কারে পূর্ণ করিয়াছে—সে যেন শপথ করিয়া ঐ প্রেমের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যাহাকে সে এমন করিয়া ত্যাগ করিয়াছে, তাহার দিকে চাহিয়া প্রাণ হা-হা করিয়া উঠে—জানে, উহা তাহার জন্য নহে, তাই ওদিকে বেশিক্ষণ চাহিতেও ভয় পায়। এই কাহিনীর একস্থানে সে রোহিণীকে দেখিয়া বলিতেছে—

"আজ বুঝিলাম, কেন সে এই জনারণ্যের মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে এবং আমি পাই নাই।··· কেন জানিনা, এইবার অশ্রুজলে আমার দু'চক্ষু ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। চাদরের খুঁটে মুছিতে মুছিতে পথের একধার দিয়া ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিলাম, এবং নিজের মনেই বারবার বলিতে লাগিলাম, এই ভালবাসাটার মত এত বড় শক্তি, এত বড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না এত বড় কাজও বুঝি কিছু নাই।" [দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ৭৯]

কিন্তু প্রমাণ শুধু এইরূপ নয়, সমগ্র উপন্যাসখানিতে সে নারীর ঐ প্রেমকে কেমন আত্মনির্লিপ্ত ভাবে দেখিয়াছে তাহাও ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যাহার ভিতরে সেই অনুভূতি নাই, সে কেমন করিয়া আমাদিগকে তাহা এমন অনুভব করাইতে পারিয়াছে? ইহার একটা কারণ এই হইতে পারে যে, অনুভূতিটা তাহার পূর্ণমাত্রায় আছে—কেবল তাহাতে সেই আত্ম-চেতনার যোগ নাই; আমি পূর্ব্বে

বলিয়াছি, সে তাহার সেই অনুভূতিময় জীবনটাকেই আমাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছে—তাহাতে আর কোন সজ্ঞান অভিপ্রায় নাই। তাই বলিতেছিলাম, এমন মানুষের কোন সত্যকার আত্মাভিমান থাকিতে পারে না। ঐ প্রেমের বিরুদ্ধে সে যে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাও আপনারই সহিত যুদ্ধ; ঐ অনুভূতি-জীবনই তাহার সত্যকার জীবন—এই কাহিনীও সেই অবশ-অজ্ঞান আত্মপ্রকাশের কাহিনী। প্রেমকে সে সজ্ঞানে প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু অজ্ঞানে সে তাহাকে পূজা করে, এবং ভয় করে। শ্রীকান্ত-জীবনেও সে সজ্ঞানে অ-প্রেমিক,—অজ্ঞানে সে তাহার মাধুরী আস্বাদ করিয়াছে, নহিলে সে প্রেমের ঐ নারী-বিগ্রহগুলিকে এমন প্রাণের রঙে রঞ্জিত করিতে পারিত না। উপরে তাহার ঐ যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার পরে তাহার আর একবারের কয়েকটি কথাও উদ্ধৃত করিতেছি—

"কিন্তু আনন্দ সন্ন্যাসী। তাহার মমতাও নাই, মোহও নাই। নারী-হৃদয়ের বেদনার রহস্য তাহার কাছে মিথ্যা বই আর কিছুই নয়।" [তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৬১]

এই কথাগুলিতে শ্রীকান্তের নিজের সম্বন্ধে একটা দুর্ব্বলতা-স্বীকার আছে। সে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে—"আহা, যদি আনন্দের মত হইতে পারিতাম!"

এই শ্রীকান্তই শেষে কমল-লতার আঘাত সহিতে পারিল না; সে যে প্রেম-বিদ্বেষী নয়—প্রেম-ভীরু! এমন একটা কিছু তাহার ভিতরে ছিঁড়িয়া গিয়াছে যাহার জন্য সে রোহিণী বা আনন্দ কাহারও মতই হইতে পারে না, ইহাই সহসা বজ্রদীপ্তির মত উপলব্ধি করিয়া, অতঃপর সে নিজেকে স্রোতের মুখেই সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছে।

তথাপি যে-শ্রীকান্ত এই কাহিনী রচনা করিয়াছে, সে সেদিনের সেই-শ্রীকান্ত নয়; সেই কাহিনীর শ্রীকান্ত—যাহা যেমন অনুভব করিয়াছিল, এ শ্রীকান্ত স্মৃতির সাহায্যে তাহাই পুনরায় অনুভব করিতেছে বটে—কিন্তু সেই জীবন আর এই স্মৃতি এক নহে; সেই শ্রীকান্ত মরিয়াছে, আজ আরেক শ্রীকান্ত—সেই মৃত শ্রীকান্ত—যে-চক্ষে তাহার বিগত জীবনকে অপর পার হইতে দেখিতেছে, সেই চক্ষু তাহার নিজের হৃদয়কেও দেখিতেছে। ভুল করিয়াছে বলিয়া কোন আক্ষেপ তাহাতে নাই, যে-প্রেম তাহাকে বাঁধিতে চাহিয়াছিল তাহাকে স্বীকার না করিয়া সে নিজ প্রকৃতির সততা রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু সেই প্রেমের যে প্রতিমাগুলি সে এমন করিয়া গড়িয়াছে তাহাতে একটা হৃদয়-রাগের অনুরঞ্জন আছে, না থাকিলে এ কাহিনী এমন রসোজ্জ্বল হইতে পারিত না। তাহার জীবনে যে-প্রেমের

স্থান ছিল না, যে-প্রেমের অর্ঘ্য সে গ্রহণ করে নাই, সেই প্রেমকেই সে নিজে অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছে—সেই নারীগুলিরই আরতি করিয়াছে। নিজে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া তাহার কোন দুঃখ নাই, কিন্তু সেকালের শ্রীকান্ত একটা কঠিন আত্মাভিমানের বশে যাহাকে শ্রদ্ধা করে নাই—আজ মুগ্ধহৃদয়ে তাহারই রহস্য ধ্যান করিতেছে। কমল-লতা ইহার কারণ জানিত,—সে জানিত, শ্রীকান্ত যে ক্ষুধায় কাতর তাহা অতিশয় বৃহৎ বলিয়াই তাহার ঐ আত্মাভিমান,—বরং সে তাহা অস্বীকার করিবে, তবু তাহাকে ছোট করিবে না। রাজলক্ষ্মী ইহার আভাস পাইয়াছিল—বারবার সে সেই গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু সে কমল-লতা নয়, তাহার নিজ হৃদয়ের ক্ষুধাকে—তাহার সেই নারী-প্রাণের কাতর কামনাকে সে জয় করিতে পারে নাই; তাই শেষ পর্য্যন্ত সে শ্রীকান্তকে ত্যাগ করিতে না পারিয়া স্বপ্নভঙ্গের দারুণ দুঃখ ভোগ করিয়াছে। তথাপি রাজলক্ষ্মীর সেই অভিযোগ 'তোমার আঁকা কথার ছবি শুধু কথা হ'য়েই থাকবে'—তাহার প্রাণের পক্ষে সত্য হইলেও, আমাদের পক্ষে সত্য নয়; ঐ "কথা গেঁথে ছবি" মিথ্যা হয় নাই, সেই ছবিতে সে নিজের প্রাণ দিয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। সে রাজলক্ষ্মীকে কিছুমাত্র ছোট করে নাই। নিজের স্মৃতি-ফলকে যে ছবি সে আঁকিয়াছে তাহা এত সত্য যে বাস্তবের চেয়ে তাহা দীর্ঘজীবী। কমল-লতা তাহার মোহভঙ্গ করিয়াছে; তাহার সেই প্রেমকেই সে পরাজয়ের প্রণতি জানাইয়াছে। তথাপি রাজলক্ষ্মীর প্রেমই তাহার পিপাসা উদ্রিক্ত করিয়াছিল, কমল-লতাকে দেখিবার পর সে লজ্জায় সেই পিপাসা সম্বরণ করিল; ঠিক এই ভয়েই কমল-লতা শ্রীকান্তের নিকটে তাহার সেই শেষ প্রার্থনা জানাইয়াছিল। আজ সে তাহার সেই চির-নিরুদ্ধ পিপাসা মিটাইতেছে আর এক উপায়ে—তাহাকে ঐ বাণী-রূপ দিয়া; সেই প্রেমকে প্রাণের অতল হইতে তুলিয়া, তাহাকে সকল আক্ষেপ হইতে মুক্ত করিয়া, সে তাহার রসরূপের অমৃত পান করিতেছে।

(৩)

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র

"To look fearlessly into the darkness and to bear unflinching the burden of the mystery what had he ?...The supreme poet is he who can accept the fact that the mystery must be, and wait for the moment when he can comprehend it by the faculty of poetic intuition, instead of impatiently turning for aid to faculties less potent than his own."

—*MIDDLETON MURRY* : *Keats and Shakespeare.*

"শ্রীকান্ত"-উপন্যাসে, শরৎচন্দ্রের আত্মকাহিনী বা তাঁহার নিজেরই প্রাণ-মনের একটি গভীরতর পরিচয় সন্ধান করিবার জন্য, আমি তাহার পাশাপাশি এই আর এক কাহিনী রচনা করিলাম। সকল উপন্যাসে তাহা হয় না, হইবার কারণ বা প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই রচনাটিতে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র কতকগুলি ঘটনা ও কয়েকটি নর-নারী-চরিত্রের বর্ণনায় তাঁহার তূলির মুখে নিজ হৃদয়-শোণিতের বর্ণও যে একটু অধিক মাত্রায় লিপ্ত করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; সেই হৃদয়-শোণিতের গাঢ় বর্ণ-ই আখ্যান বস্তুকে যেমন—তেমনই উহার ঐ নর-নারী চিত্রকে এমন অনুভূতির বাস্তবতায় মণ্ডিত করিয়াছে। আমি বলিয়াছি ইংরেজীতে যাহাকে 'Autobiographical Novel' বলে, ইহা সেই শ্রেণীর উপন্যাস তো বটেই—কিন্তু তাহারও অধিক। ইহা যেমন রীতিমত উপন্যাস নয়, তেমনই ইহাতে নায়করূপী লেখকের আত্মপরিচয়দানের সজ্ঞান অভিপ্রায়ও নাই, এজন্য তাহার আত্মপ্রকাশ আরও স্বাধীন, আরও অকপট হইয়াছে। আবার, শরৎ-চন্দ্র তাঁহার কবিশক্তির পূর্ণস্ফূর্তির কালে উহা রচনা করিয়াছেন, এজন্য ইহাতে সেই আত্মার অভিব্যক্তি এমন অনবদ্য হইয়াছে,—সেই আর্ট বা লিপি-কৌশলই তেমন অভিব্যক্তির সহায় হইয়াছে। সকল বড় সাহিত্য বা কাব্যের আর্ট একটা কল্প-কারুশিল্পই নহে, অনুভূতির গাঢ়তা ও আন্তরিকতা সেই আর্টের জননী। এজন্য ঐ আর্ট শুধুই সুন্দর নয়, তাহা সত্য হইতে বাধ্য। অতএব সকল শ্রেষ্ঠ কাব্য যেমন রসের দিক দিয়া অপৌরুষেয় (impersonal), তেমনই ভাব-সত্যের দিক দিয়া পৌরুষেয়ও বটে। যে রচনা খাঁটি lyrical বা আত্মভাব-প্রধান

তাহাতে সেই এক রস-সত্যই ব্যক্তি-মানস বা ব্যক্তি-হৃদয়ের পরকলার মধ্য দিয়া একটি বিশেষ রঙে রঙীন হইয়া ওঠে—আমরা ব্যক্তিটাকেই দেখি। কিন্তু সেই ব্যক্তির আন্তরিকতা অর্থাৎ তাহার সেই দৃঢ় ব্যক্তিত্ব-নিষ্ঠাই সেই বিশেষকেও নির্ব্বিশেষের রস-সত্যে প্রতিষ্ঠিত করে। এখানেও, শ্রীকান্তের ঐ ব্যক্তি-স্বভাবের ভাব ও অভাব যে-তত্ত্বের প্রতিবাদ বলিয়া মনে হয়, তাহাতেই সেই বস্তু আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—তার কারণ, তাহার অনুভূতির সেই আন্তরিকতা—তাহার সত্যনিষ্ঠা। ইহাই পরম রহস্য; আমরা যাহাকে 'Universal' বা নির্ব্বিশেষের তত্ত্ব বলি, তাহা ঐ 'Particular' বা বিশেষের মধ্য দিয়াই,—অর্থাৎ সেই তত্ত্বের বিরোধী যাহা তাহার মধ্য দিয়াই—আরও উজ্জ্বল আরও মহিমময় হইয়া ওঠে। ইহা একটা বড় তত্ত্ব; ঐ যে বিরোধ, ঐ যে দ্বন্দ্ব—উহা জ্ঞানের দিক দিয়া যেমন মিথ্যা, রসের বা প্রেমের দিক দিয়া উহাই সত্য। যাহারা লীলা মানে না, নিত্যকেই মানে—তাহারা ঐ বিরোধটাকে পার হইতে চায়; যাহারা নিত্যকেও মানে না, লীলাকেও মানে না—সত্য বলিতে কেবল বাস্তব অনিত্যকেই বুঝে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার বিরোধকেই বড় করিয়া দেখে; আবার যাহারা অনিত্যকে নিত্যেরই লীলারূপে বুঝিতে চায়, তাহারা ঐ বিরোধটাকেই রসের উৎস বলিয়া মনে করে। ইহাদের নাম যথাক্রমে—ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক, জড়বাদী নাস্তিক, এবং রসবাদী বৈষ্ণব। ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিক ব্রহ্মকেও রসস্বরূপ বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্ববিরোধ-নিরসনের রস, বিরোধের মধ্যেই যে রস—সে রস নহে। আমাদের এই সাহিত্যিক আলোচনা-প্রসঙ্গেও এই যে তত্ত্বটির উত্থাপন করিলাম, ইহা সম্পূর্ণ অবান্তর নয়। সাহিত্যের সত্যও যে সেই একই তত্ত্বের প্রকাশ-ভেদ, তাহা ঐ Universal ও Particular—বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ—ব্যক্তি ও বহু—প্রভৃতির দ্বন্দ্ব, এবং তাহার সাহিত্যিক রস-প্রমাণ হইতেই বুঝিয়া লইতে পারা যায়; কেবল, ঐ রসের সত্য ও জ্ঞানের সত্যকে উপলব্ধি করিবার পন্থা এক নয়। সাহিত্যিক আলোচনাতেও এই তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে ভয় পাইবার কারণ নাই—সে আলোচনাও কিছুমাত্র কম গুরুতর নয়; দর্শন-শাস্ত্র অপেক্ষা এই সাহিত্য যে বিদ্যা হিসাবেও নিকৃষ্ট নয়, বরং গভীর করিয়া দেখিলে—তদপেক্ষা মহত্তর, প্রসঙ্গক্রমে তাহারই একটু আভাস দিলাম।

কিন্তু এই আত্মকাহিনী সম্বন্ধে এখনও একটা শেষ-প্রশ্ন আছে। প্রথমতঃ, ঐ যে শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র উহা কোন্ শরৎচন্দ্র? লেখার মধ্যে লেখকের—সেই 'Style is the man' বলিতে যে 'man' বা পুরুষ বুঝায়—তাহার পরিচয় তো থাকিবেই,

সে কথা পরে বলিতেছি। কিন্তু এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে যে, আমরা যে শরৎচন্দ্রকে জানি, ঐ শ্রীকান্তই সেই শরৎচন্দ্র; ইহার দুইটা কারণ দেখাইতেছি। প্রথম, ঐ আত্মকাহিনী একরূপ আত্মার কাহিনী, উহা সমাজ-সংসারের ব্যবহার-পরিচিত সেই মানুষটার পরিচয়-কাহিনী নয়। মানুষের সেই ভিতরকার পরিচয় আমরা কখনই পাই না, পাইতেও চাই না; সেই অন্তর্জ্জীবনের ধারা যেমন নিঃসঙ্গ তেমনই নীরব; জীবনের হাটে-বাজারে সভায়-বৈঠকে তাহাকে টানিয়া আনা যায় না—আনিলে তাহার দুর্গতির সীমা থাকিবে না। এ সকল কথা আগেও বলিয়াছি। শরৎচন্দ্রের সেই আত্মকাহিনীও তাই উপন্যাসের আব্রু রক্ষা করিয়াছে, এবং এত বড় শিল্পী বলিয়াই তিনি তাহাকে এমন সুপ্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। ঐ যে প্রকাশ, উহা তাঁহার অন্তর-পুরুষের প্রকাশ—সেই পুরুষটিকে চিনিতে হইলে ঐ কাহিনীতেই যতটুকু সম্ভব চিনিয়া লইতে হইবে; কিন্তু তাহার পরে ফিরিয়া সেই বহু-পরিচিত অপর মূর্ত্তিটার পানে চাহিলে বিশেষ কিছু লাভ হইবে না। মানুষের সেই সমাজ-পরিচিত মূর্ত্তিটার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন—

"এমনি করিয়া সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন এক রকম কাটিয়া যায়,—খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়: জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া, প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক ও বাস্তবিক।"

[গল্পগুচ্ছ]

দ্বিতীয়তঃ, একই জীবনে মানুষের শুধুই পরিবর্ত্তন নয়, যেন জন্মান্তর ঘটে,—অন্ততঃ কাহারও কাহারও ঘটে। যাহাদের তাহা ঘটে তাহারা সাধারণের পর্য্যায়ভুক্ত নয়। শ্রীকান্ত যদি শরৎচন্দ্রের পূর্ব্ব-চরিত্র হয়, তথাপি সে তাঁহার জন্মান্তরের 'আমি', সেই 'আমি'টা তাঁহাকেও কম বিস্মিত করে না—সেই দুই 'আমি'র তুলনা করিয়া তিনি নিজেই কত বৈসাদৃশ্য দেখিতে পান! ঐ শ্রীকান্ত-জীবন যদি তাঁহারই পূর্ব্ব-জীবন হয়, তবে আমরাও বুঝিতে পারি, সে জীবনে কোথাও একটা বড় ছেদ পড়িয়াছিল; অতঃপর তাহার গতি ও দিক্-পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার ইঙ্গিত এই কাহিনীতেও আছে, আমি তাহার স্পষ্ট আভাস দিয়াছি। অতএব, শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র বলিতে আমরা এক শরৎচন্দ্রই বুঝিব বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে এই দুইটি কথাও মনে রাখিব; এক—শ্রীকান্তের কাহিনী মুখ্যতঃ অন্তর্জ্জীবনের কাহিনী; দুই—ঐ কাহিনী বাল্য ও যৌবনের কাহিনী, এজন্য তখনো তাহাতে সেই অন্তর্জ্জীবন পূর্ণ-বিকাশ লাভ করে নাই, জীবনের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ ছিল।

কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ঐ কাহিনীগত পরিচয়কে মিথ্যা না ভ্রমপূর্ণ মনে করিব না। যাঁহারা শরৎচন্দ্রকে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে একটু ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারাও যাহাতে এই আত্মকাহিনী আরও সাবধানে ও শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিতে পারেন, আমি তাহারই কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি।

আরও একটা কথা মনে রাখিবার প্রয়োজন আছে। ঐ শ্রীকান্ত ও এই শরৎচন্দ্রে আরও তফাৎ এই যে, শরৎচন্দ্র শুধুই নিপুণ কথাশিল্পীই নহেন—একজন ভাবুক ও চিন্তাশীল, মতবাদী লেখক। তাই সেই পূর্ব্বজীবন পুনরায় যাপন করিবার কালে তিনি তাহাতে প্রৌঢ় শরৎচন্দ্রের অনধিকার-প্রবেশ অনেক স্থলে নিবারণ করিতে পারেন নাই; আমি সেইগুলিকেই উভয়ের এক-ব্যক্তিত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিব না, বরং শ্রীকান্ত হইতে পৃথক করিয়া দেখিব। শ্রীকান্তের মধ্যে আমরা যে স্বভাবের পরিচয় পাই তাহা আরও মুক্ত, স্বচ্ছন্দ; তখনও তাহার অনুভূতিগুলা স্পষ্ট মতবাদে পরিণত হয় নাই। একটা দৃষ্টান্ত দিব। শরৎচন্দ্রের রচনাবলীতে, মানুষের সর্ব্ববিধ ন্যায্য দাবীর সমর্থন, ও প্রাচীন সমাজের প্রতি যে দৃঢ় মনোভাব দেখিতে পাওয়া যায়, 'শ্রীকান্তে' তাহা এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠে নাই, বরং সেই সমাজের প্রতি মমতাই তাঁহাকে বিমূঢ় করিয়া তোলে; তাহারও একটা কারণ, শ্রীকান্ত তখনও মানুষের দুঃখের হেতুটা সম্পূর্ণ বহির্গত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে নাই—মন তাহা বলিলেও প্রাণ সম্পূর্ণ সায় দিত না; তাই মনুষ্যজীবনের নিয়তি,—মনুষ্যহৃদয়ের অন্তস্তলে দুঃখের সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে ('burden of the mystery') সে তাহার অনুভূতি-কল্পনার মোহাবেশে মহনীয় করিয়া তুলিত। নির্জ্জন শ্মশানের নিশীথান্ধকারকে যে শরৎচন্দ্র, 'Hail, holy light!'-এর সেই জ্যোতির্বন্দনার সমান করিয়া বন্দনা করিয়াছেন, সেই শরৎচন্দ্রই শ্রীকান্ত। ঐ অন্ধকার—শূন্যতা ও রূপহীনতার ঐ রূপ—উহাই মৃত্যু বা চরম দুঃখের প্রতীক। তথাপি সেই অন্ধকার সহসা তাহাকে এক অপূর্ব্ব রসাবেশে বিভোর করিয়াছে—শূন্যই পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! এই যে ভাবের আকস্মিক বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবন, উহা যতই একটা স্থান-কাল ও মানসিক অবস্থার কারণে ঘটুক না কেন—শরৎচন্দ্রের সেই আদি বা আদিম স্বভাবে উহার সংস্কার বিদ্যমান ছিল; হয়তো ঐ শাক্ত-মনোভাবই তাঁহার প্রকৃতিগত ছিল; কিন্তু উহার সহিত একটা বিপরীত সংস্কারের দ্বন্দ্বও ছিল, সেই দ্বন্দ্বই তাঁহাকে আত্মদ্রোহী করিয়া সংসারে ও সমাজে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইতে দেয় নাই। আমি এই দ্বন্দ্বের কথা বারবার উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু ঐ দ্বন্দ্ব শ্রীকান্ত-জীবনে যতটা পরিস্ফুট, পরবর্ত্তী জীবনে ততটা

নহে—তখন শরৎচন্দ্র একটা মতকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। তখন তিনি সমাজের প্রতি তেমন মমতাবান নহেন, নর-নারীর দুঃখকে একটা নিছক দুঃখ-রূপেই স্বীকার করিয়াছেন; যে মনোভাবের বশে দুঃখও একটা মহৎ বস্তু বলিয়া পূজার যোগ্য হইতে পারে, সেই মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়াছেন। এই শরৎচন্দ্রকে আমরা পরে অতিশয় সুস্পষ্টভাবে আত্মঘোষণা করিতে দেখিয়াছি, তখন সেই দ্বন্দ্ব তাঁহার জীবনে প্রায় ঘুচিয়াছে। ঐ দ্বন্দ্ব ছিল বলিয়া, সেই দ্বন্দ্ব-অবস্থার যে অনুভূতি—সেই শ্মশানব্যাপী অন্ধকারের রূপ-পিপাসা—নর-নারী-চরিত্রেও এক অপূর্ব্ব আত্মনিগ্রহের মাধুরী সঞ্চারিত করিয়াছে। সেই দ্বন্দ্ব ছিল বলিয়াই দুঃখকে অস্বীকার বা অশ্রদ্ধা করা নয়, তাহার সেই চেতনাকে তীব্রতর করিয়া ঐরূপ রসাস্বাদনের আকাঙ্ক্ষা ছিল,—তাই 'পল্লীসমাজে'র রমা সমাজ-বিধি শিরোধার্য্য করিয়াই তপস্বিনী উমা অপেক্ষা মহিমময়ী হইয়াছে। শ্রীকান্ত তাহার এই চিত্তের দ্বন্দ্বসম্বন্ধে প্রথম সচেতন হইয়াছিল—অভয়ার সহিত পরিচয়-কালে। এই অভয়া সম্বন্ধে সে যাহা কিছু বলিয়াছে তাহাতে একটা স্পষ্ট আত্ম-বিরোধ আছে, তাই তাহাতে একটা উগ্রতাও প্রকাশ পাইয়াছে। আমি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি, ইহাও বলিয়াছি যে, ঐ অভয়ার কাহিনীতে পরবর্ত্তীকালের শরৎচন্দ্রের হস্তাক্ষর খুব স্পষ্ট হইয়া আছে; কিন্তু শ্রীকান্তের হস্তাক্ষরও রহিয়াছে, তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে, ঐ শ্রীকান্তের মধ্যে ভাবী শরৎচন্দ্র কতখানি উঁকি দিতেছেন; অথবা, শ্রীকান্তের সেই মনোভাব ক্রমে কিরূপ একটা মতবাদে রূপান্তরিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই শ্রীকান্ত-রূপটি দেখাইব। অভয়াকে দেখিয়া শ্রীকান্ত যেন একটা নূতন জগতে প্রবেশ করিল; তাহার যেন একটা নূতন দৃষ্টিলাভ হইয়াছে—সে অভয়ার গুণগানে পঞ্চমুখ। ইহার কারণ আমরা জানি; সমাজকর্ত্তৃক নারী-নিগ্রহের একটা জীবন্ত ও শক্তিমান প্রতিবাদ এই অভয়া; তাহাতে শ্রীকান্তের অন্তরবাসী সেই অপর মানুষটি সাতিশয় জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আরেকটা মানুষ তখনও সজাগ আছে, তাই দ্বন্দ্ব বেশ ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীকান্ত বলিতেছে—

"যাই হোক্, তাহার সম্বন্ধে আজও যে আমার মনের দ্বিধা ঘুচে নাই, এ কথা ঠিক। যতই আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিতাম,—এ ছাড়া অভয়ার আর কি গতি ছিল, ততই মন যেন তাহার বিরুদ্ধে বাকিয়া দাঁড়াইত। যতই নিজেকে বলিতাম, তাহাকে অশ্রদ্ধা করিবার লেশমাত্র অধিকার আমার নাই,—ততই যেন অব্যক্ত বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া উঠিত।" [দ্বিতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১২৫-২৬]

এবং—

"তাহার চিন্তার স্বাধীনতা, তাহার আচরণের নির্ভীক সততা, তাহাদের পরস্পরের অপরূপ ও

অসাধারণ স্নেহ আমার বুদ্ধিকে সেই দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত, ইহাও ঠিক ; কিন্তু তবুও আমার আজন্মের সংস্কার কিছুতেই সেদিকে পা বাড়াইতে চাহিত না। কেবলই মনে হইত, আমার অন্নদা-দিদি একাজ করিতেন না।...আমি জানিতাম তিনি ভগবানে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সাধনার ভিতর দিয়া তিনি পবিত্রতার যে ধারণা, কর্ত্তব্যের যে জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন —সে কি অভয়ার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির মীমাংসার কাছে একেবারে ছেলেখেলা ?" [ঐ, পৃঃ ১২৩]

এ কোন্ শরৎচন্দ্র ? আমরা কি তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যেও এই শরৎ-চন্দ্রকেই গোপনে অবস্থান করিতে দেখি নাই ? আবার, উত্তরকালের যে শরৎচন্দ্র প্রগতিবাদের পুরোহিতরূপে আধুনিক তরুণ-তরুণীর উচ্ছ্বসিত বন্দনা লাভ করিয়াছেন, সেই শরৎচন্দ্র কোন্ শরৎচন্দ্র ?

আমার এই দীর্ঘ আলোচনা আরও দীর্ঘ করিব না। শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্রকে লেখক ও নায়ক উভয়রূপে আমি যে পরিচয়ে পরিচিত করিয়াছি তাহা হইতে পাঠক-পাঠিকাগণ উভয়ের মধ্যে একাত্মতা কতখানি, তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এই আত্ম-কাহিনীতে এমন সকল ঘটনারও বর্ণনা আছে, যাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতিরেকে এমন মর্ম্মস্পর্শী হইতে পারে না—তাহার রসও খাঁটি কাব্যরস নয়—হৃদয়ক্ষত শোণিতরাগে তাহারা সমুজ্জ্বল। আমি ইহার অনেকগুলি ইচ্ছা করিয়া উদ্ধৃত করিলাম না, কারণ, এমন কোন পাঠক বা পাঠিকা নাই যাঁহারা সেই সকল চিত্র স্মরণ করিবেন না। ইহাদের সকলের মধ্যেই যে emotion বা হৃদয়াবেগ অতিশয় বাস্তব হইয়াও এমন মর্ম্মান্ত রস-মূর্চ্ছনায় পৌঁছিয়াছে—রক্ত-মাংসের, স্নায়ুশিরার জ্বালাই বাণীতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—তাহার কি নাম দিব ? তাহা রস-ব্রহ্ম নয়—দেহ-ব্রহ্মেরই অপূর্ব্ব প্রীতি-রস, মানবতার হৃদয়-পদ্ম-মধু ! শ্রীকান্তের 'চরিত্র' যেমনই হোক, উহাই তাহার আত্মার ষ্টাইল ; লেখক শরৎচন্দ্রের প্রতিভাও উহারই যাদুশক্তি। আমি রাজলক্ষ্মীর কাহিনীতে শ্রীকান্তের যে দুর্ব্বলতা বা অভাবের দিকটা দেখাইয়াছি—মনে রাখিতে হইবে, উহাই তাহার সমগ্র পরিচয় নহে। অন্নদা ও ইন্দ্রনাথের শ্রীকান্ত কমল-লতার নিকটে পরাজয় মানিয়াছে বটে, কিন্তু সেই পরাজয়ের দ্বারাই সে আপন অন্তরের সত্যকে আরও উত্তমরূপে জানিয়াছে ও স্বীকার করিয়াছে ; তারপর সে তাহার বাস্তব জীবনেই সন্তুষ্ট থাকিয়া সর্ব্ব অভিমান ত্যাগ করিয়াছে, এবং শেষে, সমাজে-সংসারে ফিরিবার পরেও তাহার সেই উদাসীন, নিঃসঙ্গ, ভবঘুরে জীবনকে আর্টের সাহায্যে অমর করিয়া গিয়াছে,—তাহারই মধ্যে সে আপনাকে খুঁজিয়াছে, চিনিয়াছে ও পাইয়াছে। সেখানেও সে তেমনই নিঃসঙ্গ, সে জীবনেও কেহ কখনো প্রবেশ করিতে পারে নাই। রাজলক্ষ্মী ও কমল-লতাকে যে ফিরাইয়া দিয়াছে—সে সংসারকেও যেমন,

স্বর্গকেও তেমনই তুচ্ছ করিয়াছে; তাহার কোন সাধন নাই, কোন মন্ত্র নাই; গুরু নাই, ইষ্ট নাই; ধর্ম্ম নাই, কর্ম্ম নাই; আছে এক অসীম বৈরাগ্য, হৃদয়ের অন্তস্তলে এক নিরবচ্ছিন্ন হাহাকার। শ্রীকান্ত-জীবনে যেটুকুও আত্মপ্রত্যয় ছিল, শরৎচন্দ্র-জীবনে তাহা একটা নৈরাশ্য-করুণ ভৈরবী-গানে পর্য্যবসিত হইয়াছে—

"হায় অতৃপ্ত যত মহৎ বাসনা
গোপন মর্ম্মদাহিনী,
এই আপনা মাঝারে শুষ্ক-জীবন-
বাহিনী।
* * *
কাঁদে শিশিরবিন্দু জগতের তৃষা
হরিতে!"

কিন্তু সেই নিষ্ফলতা, জীবনের সেই পরাজয় আর এক জগতে সার্থক হইয়াছে; পরাজিত শ্রীকান্ত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র-রূপে আত্মার ক্ষুধা মিটাইয়াছে। তবু পূর্ব্ব-জীবনের যে পরিচয় এই কাহিনীতে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা শরৎচন্দ্র-জীবনে একেবারে লুপ্ত হয় নাই। যশোদা-বৈষ্ণবীর সেই অনাথ কুকুরটার প্রতি—পশুর প্রতিও—মানুষের দুঃখ-সগোত্রতার সেই সর্ব্বব্যাপী অনুকম্পা শরৎচন্দ্রের জীবনেও আছে; যাঁহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার আরও কত সাদৃশ্য নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই বার আমি শ্রীকান্ত ও শরৎচন্দ্র উভয়ের মধ্যে একটা গভীরতর ঐক্যের সন্ধান করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিব। আমরা রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্তকেও দেখিয়াছি, কমল-লতার শ্রীকান্তকেও দেখিয়াছি; একের স্বপ্ন অপরের ধাক্কায় ভাঙিয়াছে তাহাও দেখিয়াছি; কিন্তু আসলে দুইজনেই সেই এক শ্রীকান্তকেই দেখিয়াছিল—দুই জনে দুই ভাবে; এক জন তাহাকে বাঁধিতে গিয়া নিজেই আছাড় খাইয়াছে, আরেক জন তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াই আছাড় খাওইয়াছে। কমল-লতার জয়-পরাজয় দুই-ই সমান, রাজলক্ষ্মীর তাহা নয়। রাজলক্ষ্মী তাহাকে ঠিকই চিনিয়াছিল, কিন্তু মোহ ত্যাগ করিতে পারে নাই; শ্রীকান্তের যে বৈরাগী মন তাহাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই মন কেমন? শ্রীকান্ত নিজেই তাহা কতবার কত রকমে প্রকাশ করিয়াছে। একদা রাজলক্ষ্মীর ব্যবহারে হঠাৎ আত্ম-সচেতন হইয়া সে বলিয়াছিল:—

"চোখ দিয়া আমার সহজে জল পড়ে না, ভালবাসার কাঙালবৃত্তি করিতেও আমি পারি না। জগতে কিছুই নাই, কাহারো কাছে কিছু পাই নাই, দাও দাও বলিয়া হাত বাড়াইয়া থাকিতে আমার লজ্জা করে। বইয়ে পড়িয়াছি, এই লইয়া কত বিরোধ, কত জ্বালা, মান-অভিমানের কতই না,

প্রমত্ত আক্ষেপ—স্নেহের সুধা গরল হইয়া উঠার কত না বিক্ষুব্ধ কাহিনী! এ সকল মিথ্যা নয় জানি কিন্তু আমার মনের মধ্যে যে বৈরাগী তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ চমক ভাঙিয়া বলিতে লাগিল, ছি ছি ছি!"

[তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৩৬]

—ইহাই কি শ্রীকান্তের আত্মার আত্মকথা নয়? আর এক স্থানে সে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া বলিতেছে—

"ভাবিলাম, আমার অদৃষ্টই এমনি। না হইলে রাজলক্ষ্মীই বা আসিত কিরূপে, অভয়াই বা আমাকে দিয়া তাহার দুঃখের বোঝা বহাইত কেমন করিয়া?......কোন ব্যক্তির পক্ষেই ত এ সকল ঝাড়িয়া ফেলিতে এক মুহূর্ত্তের অধিক সময় লাগিত না। আর আমিই বা সারা জীবন বহিয়া বেড়াই কিসের জন্য?"

[তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৪৬]

সে পরের দুঃখের বোঝা না বহিয়া পারে না কেন?—তাহার নিজের কি কোন সুখ-দুঃখ নাই? এই কয়টি কথায় যে দীর্ঘশ্বাস রহিয়াছে—উহাই তাহার সারাজীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আর একবার, অভয়াকে এক পত্রে সে লিখিয়াছিল (রাজলক্ষ্মীর চেয়ে অভয়াকে সে বড় মনে করে কেন)—

"উভয়ের সেবার মধ্যে, নির্ভরের মধ্যে, অন্তরের অকপট শুভ কামনার মধ্যে, তোমাদের নিবিড় স্নেহের মধ্যে গভীর ঐক্য রহিয়াছে; কিন্তু তোমার মধ্যে একটি স্বার্থলেশহীন সুকোমল নির্লিপ্ততা, এমন অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্য ছিল যাহা কেবলমাত্র সেবা করিয়াই আপনাকে আপনি নিঃশেষ করিয়াছে।......হয়ত অত্যন্ত স্নেহ আমার সহে না বলিয়াই,—হয়ত' বা স্নেহের যে রূপ একদিন তোমার চোখে-মুখে দেখিতে পাইয়াছি, তাহারই জন্য সমস্ত চিত্ত উন্মুখ হইয়াছে।"

[ঐ, পৃঃ ১২১]

ইহারও বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করিতে হইবে না। সমগ্র শ্রীকান্ত-কাহিনীতে আমরা কি কেবল ইহাই দেখিতে পাই না? এই সকল কথা কি উপন্যাসের নায়কের মুখের কথা, না—লেখকের আত্মকথা? ঐরূপ আত্মকথাই কি এই উপন্যাসের গল্পাংশকে ছাপাইয়া সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত হইতেছে না? এখন, যাঁহারা শরৎচন্দ্রকে—তাঁহার পরবর্ত্তী কালের জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহারকে ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন—যাঁহারা তাঁহার সেই বাহিরের জীবনটার ভিতরে একটু দৃষ্টি দিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আমার এই শ্রীকান্ত-পরিচয় হইতেই বুঝিতে পারিবেন, আমি এই গ্রন্থের নাম—'শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত' না দিয়া "শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র" দিয়াছি কেন? এই উপন্যাসের গল্প বা কল্পনা-অংশ ত্যাগ করিয়াও যাহা থাকে তাহা অল্প নহে, সেই গুরুতর অংশ কি অর্থে কতখানি বাস্তব, আশা করি আমি তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি। এইবার পাঠক-পাঠিকারা এই গ্রন্থের অবতরণিকা আর একবার পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন—উপন্যাসের আকারে এমন আত্মকাহিনী সাহিত্যে অতিশয় বিরল।

গ্রন্থ শেষ করিলাম, হয়তো আরও অনেক প্রশ্ন রহিয়া গেল,—হয়তো ঘটনা ও কাহিনীর এমন অনেক কথা বাদ দিয়াছি, যাহার সাক্ষ্য অনেক স্থলে আমার সিদ্ধান্তের বিরোধী বলিয়া মনে হইবে; উপন্যাসের সম্পূর্ণ পরিচয় হিসাবেও দুই চারিটা অপর চরিত্রের উল্লেখ করা হয়তো উচিত ছিল। কিন্তু আমি মুখ্যতঃ শ্রীকান্ত-চরিত্রেরই পরিচয় করিয়াছি, গৌণতঃ—উপন্যাসের নয়—রচনার কাব্য-গুণের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছি; তাহারও মূলে আছে ঐ একটি অসাধারণ চরিত্র, কারণ, এখানে আর্ট ও জীবন, মানুষ ও কবি এক হইয়া আছে। যে সকল ঘটনা বাদ দিয়াছি তাহাও আমার সুবিধার জন্য নয়—আমার অভিপ্রায়ের পক্ষে অবান্তর বলিয়া; সে সকলের মধ্যে শ্রীকান্তের আত্মকথা অপেক্ষা পর-সম্পর্কিত কথাই আছে, আবার অনেক স্থলে শ্রীকান্ত এমন সকল ভাব বা মত প্রকাশ করিয়াছে যাহা স্পষ্টই সাময়িক বা প্রাসঙ্গিক আবেগের কথা—ঐরূপ ভাবোচ্ছ্বাস এক প্রকার দুর্ব্বলতারই লক্ষণ; কোন্‌গুলা তাহার অন্তরের কথা, কোন্‌গুলা নয়, তাহাই তো আমাদিগকে বিচার করিতে হইবে, এবং ভিতরের মানুষটাকে যদি চিনিয়া লইতে পারি তবে সে বিচারে ভুল হইবে না।

সর্ব্বশেষে 'শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র' বলিতে যে আর একটি অর্থও বুঝায় সেই দিক দিয়াও সংক্ষেপে দুই-চারি কথা বলিব। এ উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক পরিচয় —তাঁহার বাণী-প্রতিভা ও ভাবুকতার কি পরিচয় পাই? একথা বলিলে ভুল হইবে না যে, এই একটি রচনাতেই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তির সকল লক্ষণ আছে, এক হিসাবে ইহাকে সমগ্র শরৎ-সাহিত্যের ভূমিকা ও মানদণ্ড বলা যাইতে পারে। প্রথমত, ইহার ভাষা; ওস্তাদ সুরশিল্পী প্রথমে যেমন যন্ত্রটি নির্ব্বাচন করিয়া পরে তাহার তারগুলিকে আপনার প্রয়োজনে সুতন্ত্রিত করিয়া লয়, শরৎচন্দ্রের শিল্পী-মন তেমনই তাঁহার প্রাণের সুরটি বাজাইবার জন্য ভাষার তার-গুলি তাহার উপযোগী করিতে পারিয়াছিলেন,—এইখানে সাহিত্য-শিল্পীর প্রথম ও শেষ কৃতিত্ব। ভাষা ও ভাবের সাযুজ্য না হইলে সাহিত্যের সত্য—যে রস, তাহা রূপময় হইয়া উঠে না; আবার, যাহার সেই সত্যকার রস-সংবেদনা হইয়াছে সে ঐ সাযুজ্য-সাধনের জন্য যে তপস্যা করে, তাহারই উপরে তাহার সমগ্র সাহিত্য-কীর্ত্তির সাফল্য নির্ভর করে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস বাঙালীকে যে এত মুগ্ধ করিয়াছে তার কারণ ঐ ষ্টাইল—ভাষার রসনৈপুণ্য। সাহিত্য-সৃষ্টিতে ভাষার সৌন্দর্য্য বলিতে ভাবেরই রূপ বা বাঙ্‌ময়ী মূর্ত্তি বুঝায়। তাহা হইলে, যেহেতু ভাষা ভাবেরই রূপ, অতএব ভাষা সুন্দর হইতে হইলে, ভাবও সত্য-সুন্দর হওয়া চাই। ভাষা সুন্দর,

অথচ ভাব সুন্দর বা গভীর নয়,—এইরূপ হইলে বুঝিতে হইবে, ঐ ভাষা অনুকরণ-মূলক, কৃত্রিম ; উহাতে আন্তরিকতা নাই, ভান বা চাতুর্য্য আছে। তেমন লেখক রসজ্ঞানহীন, লঘুচিত্ত পাঠকের মনোরঞ্জন করিয়া জনপ্রিয় হইতে পারেন, কিন্তু সে রচনা ক্ষণজীবী, তাহার চটক অল্প কালেই মুছিয়া যায়, সাহিত্যের ধ্রুবলোকে তাহার প্রবেশ-অধিকার নাই। শরৎচন্দ্রের ভাষা সেই সুন্দর-সত্যকে অবিকল প্রতি-ফলিত করিয়াছে,—সে এমনই স্বচ্ছ যে, ভাবের আলোক তাহাতে কিছুমাত্র বাধা পায় নাই। ইহার পর, আমরা ঐ ভাষাকে পৃথক করিয়া—বাংলা ভাষার একটা রীতিহিসাবেও উহাকে পরীক্ষা করিতে পারি। তাহাতে কি দেখি ? শরৎচন্দ্রের ভাষা যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক ভাষা, তেমনই উহা কথ্য-ভাষারও অতিশয় নিকটবর্ত্তী ; একদিকে তাহা যেমন শিষ্ট ও সুমার্জ্জিত, অপরদিকে তাহা জীবনের স্বাভাবিকতা ও সজীবতাকেও রক্ষা করিয়াছে। এক কথায়, সাধু ও চলিত-ভাষার যে দ্বন্দ্ব, এবং তাহার যে সমতা-সাধন বঙ্কিমচন্দ্র হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল, শরৎচন্দ্রে তাহা শেষ সিদ্ধির কোঠায় পৌছিয়াছে। ঐ ভাষাই প্রমাণ করিয়াছে যে, আধুনিক যে কথ্য-ভঙ্গির ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইবার দাবিকে এমন উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছে, তাহা শুধুই অনাবশ্যক ভয়—অক্ষমতার দম্ভ। শরৎচন্দ্র তাঁহার ঐ ভাষা-নির্ম্মাণে এমন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তার কারণ, তিনি স্ব-সমাজের নর-নারীর একেবারে বুকের নিকটে কান পাতিয়া-ছিলেন—তাহাদের মুখের বুলিই শুধু শোনেন নাই, সেই বুলির প্রাণসঞ্চারী রসধ্বনিও শুনিয়াছিলেন ; তাই কথ্যভাষার রূপ, তাহার accent বা স্বর-বৈচিত্র্যের সূক্ষ্মতম ধ্বনি আর কেহ এমন করিয়া কানে ও প্রাণে প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই। ইহার একটা বড় প্রমাণ এই রচনাতেই বেশি করিয়া পাওয়া যায়। বাংলা উপন্যাসে 'dialogue' অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর বাক্যালাপকেই তাহাদের মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ বা চিত্র-চিত্রণের এত বড় উপকরণ করিতে তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে আর কেহ পারে নাই ; সেই মুখনিঃসৃত কথাগুলিতেই তাহাদের মুখ-চোখের ভঙ্গিমার সহিত মনোভঙ্গিমাও ফুটিয়া উঠিয়াছে—অবশ্য, যেখানে লেখকের সেই প্রয়োজন হইয়াছে। এক একটি ক্ষুদ্র দৃশ্যের ক্ষুদ্র পরিসরে, স্বল্পকালে ও সামান্য পরিচয়ে, ঐ কথার ভঙ্গিতেই একটা সম্পূর্ণ চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে—এমন বহু চিত্র এই উপন্যাসে আছে। আবার, ইন্দ্রনাথ, রাজলক্ষ্মী, অন্নদা ও কমল-লতার কাহিনীতে, এক একটি situation বা সংঘটনায় তাহাদের কোন কোন কথার ভঙ্গি এমন যে, তাহাতেই তাহাদের অন্তরের অন্তস্তল উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। শরৎচন্দ্র ভাষার ঐ

রূপটিকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন কোন্ কৌশলে? আমি বলিয়াছি—নর-নারীর বুকের অতি নিকটে কান পাতিয়া। ইহারই ফলে তাঁহার ভাষার সাধারণ রীতি সাধুতা রক্ষা করিয়াও কথ্য-রীতির দিকে ঝুঁকিয়াছে,—সেই ভঙ্গিই ভাষাকে এমন মেদুর করিয়াছে। এই উপন্যাসখানি বার বার পড়িয়া ইহার ভাষার ঐ রূপ বা রীতির সহজ শ্রী সম্বন্ধে এমনই নিঃসংশয় হইয়াছি যে, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, বাংলা ভাষার প্রাণবস্তু বা genius-কে আয়ত্ত করিতে হইলে, এই 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসখানি নিষ্ঠাসহকারে বারবার পাঠ করিলেই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না। উহার ঐ চারিটি পর্ব্বে রং-বেরঙের চিত্রাঙ্কণ ও ভাবচিন্তার অনবদ্য প্রকাশ কৌশলে বুকের সহিত মুখের সম্বন্ধ যেমন স্বাভাবিক তেমনই নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীকান্ত-উপন্যাসের কাব্য-গৌরব সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিব না, এ পর্য্যন্ত নানা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই সাহিত্যরসিক পাঠক-পাঠিকা ইহার অনন্যসাধারণ কাব্যগুণের মর্ম্মজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারিবেন। আরও একটি বড় লক্ষণ ইহার আছে, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি—এই আত্মকাহিনীর তলে তলে বহিতেছে এক অতি-গভীর অবিমিশ্র humanity বা মানুষের দুঃখদুর্দ্দশার প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি; সে সম্বন্ধে তর্ক বা বিচার-বিসম্বাদ পরে। সে যেন এক অশান্ত ক্রন্দন, অসহায়ের নৈরাশ্য-বেদনা,—কোন সমাধানের চিন্তা নাই, কেবল অনুভূতির জ্বালা আছে। এই কারণেই তাহা এমন মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছে। যাঁহারা ইহাতেও একটা সমাজ-সমস্যা ও তাহার সমাধানের যুক্তি-তর্ক সন্ধান করিবেন, তাঁহারা সেই প্রাণের সুরটি ধরিতে পারিবেন না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঐরূপ অতি-তীব্র সমবেদনশীলতা এবং ন্যায়বুদ্ধি বা বিচারশক্তি কখনো একত্র অবস্থান করিতে পারে না, কবিশিল্পীর নিকটে আমরা তাহা দাবি করিতেও পারি না। কবিরা কেবল সেই ব্যথার তাড়নায় বড় জোর একটা অভিশাপ উচ্চারণ করিতে পারেন, সেখানেও তাঁহাদের কবিশক্তি বিচলিত হয়,—সে বাণী আবেগ-গভীর কবিত্বময় হইলেও তাহা উৎকৃষ্ট কবি-ভাষণ বা দিব্যবাণী নহে। তেমন অবস্থায় মানুষের হৃদয়কে আশ্বস্ত করিবার জন্য তাঁহারা এইরূপ ভবিষ্যৎবাণী করিতেও পারেন, যথা—

For we are afar with the dawning
And the sun that is not yet high,
And out of the infinite morning
Intrepid you hear us cry—

How spite of your human scorning
Once for God's future draws nigh,
And already goes forth the warning
That ye of the past must die."

—*A. W. E. O'SHAUGHNESSY*: *Ode.*

[আমরা দাঁড়াই—খসি' পড়ে যেথা আঁধারের নির্ম্মোক,
সকলের আগে উদয়-দুয়ারে আমরা অর্ঘ্য আনি।
কণ্ঠ মোদের পার হ'য়ে যায় অসীম সে উষালোক—
গাই নির্ভীক, ছন্দ-ধনুতে ভীম টঙ্কার হানি'।
মানুষের হীন অবিশ্বাসের ভ্রূকুটিরে করি' জয়,
বিধাতার আশা পূর্ণ যে হবে—ওরে তার দেরী নাই!
তোরা পুরাতন জড়-পুত্তলি হয়ে যাবি ধূলিময়—
বার্ত্তা সে ধ্রুব গগনে-গগনে এখনি শুনিতে পাই!]

কিন্তু শরৎচন্দ্র তাহাও করিতে পারেন নাই, তাঁহার সেই ব্যথা এমনই দুর্ব্বিষহ! শ্রীকান্ত বলিতেছে—

"মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে। এ যেন আমি সহিতেই পারি না।......

মানুষকে পশু করিয়া লইতে না পারিলে পশুর কাজ আদায় করা যায় না।"

[তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৫০-৫১]

এই অনুভূতি ও দৃষ্টি যে হৃদয় হইতে সে লাভ করিয়াছে তাহা যে কত গভীর সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এমন বাণী মানবজীবন-সংহিতায় স্থান পাইবার উপযুক্ত। আজ এই ১৩৫৬ সালের শেষভাগে শরৎচন্দ্রের দেশে যাহা ঘটিতেছে তাহা শুধুই মনুষ্যত্বের মৃত্যু নয়—মানুষকে পশু করিয়া লওয়াই নয়, একেবারে পিশাচে পরিণত করার দৃশ্যই আমরা দেখিতেছি; একদিকে, এক অপধর্ম্মের আবরণে, প্রভুত্ব ও ঐশ্বর্য্য-পিপাসার তাণ্ডব চলিতেছে, হৃদয়-হীনতা ও কাপুরুষতার এমন রাজকীয় মহোৎসব জগতের ইতিহাসে বিরল; আর একদিকে, তাহারই সুযোগে, আর একদল নর-পশু এক শয়তানী ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহাদের বিজাতীয় বিদ্বেষ, ধনলোভ এবং কাম-লালসা চরিতার্থ করিতেছে; একদিকে অহিংসার নপুংসক-লীলা, আর একদিকে হিংসার নারী-মেধ,—ইহা দেখিলে শরৎচন্দ্র আর লেখনী ধারণও করিতেন না। কিন্তু তাঁহার ঐ উক্তিও অনুভূতিকে ছাড়াইয়া তত্ত্বকথায় পৌঁছিয়াছে, অর্থাৎ উহাতে একটি ভাবস্থির দৃষ্টিও আছে। ইহার পর শ্রীকান্ত সেই দৃষ্টি হারাইয়াছে, হতাশার দারুণ দুঃখে সে অভিশাপ দিতেছে—

"সম্মুখে কালো আকাশের অনেকখানি ব্যাপিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া জ্বলিতেছে; সেই দিকে চাহিয়া বেদনায়, ক্ষোভে ও নিষ্ফল আক্ষেপে বারবার অভিসম্পাত করিতে লাগিলাম...

আধুনিক সভ্যতার বাহন তোরা—তোরা মর্! কিন্তু যে নির্ম্মম সভ্যতা তোদের এমন ধারা করিয়াছে তাহাকে তোরা কিছুতেই ক্ষমা করিস্ না। যদি বহিতেই হয়, ইহাদিগকে তোরা দ্রুতবেগে রসাতলের দিকে বহিয়া লইয়া যা।" [তৃতীয় পর্ব্ব, পৃঃ ১৫৩]

ইহাই শরৎচন্দ্রের বোধ হয় জীবনব্যাপী অশান্ত আক্ষেপ—ইহাই লেখক শরৎচন্দ্রের লেখনীর স্বভাব-ধর্ম্ম। ইহা হইতেই তাঁহার রচনা-নিহিত ভাবধারা ও ভাবুকতা এবং তৎসম্পর্কিত চিন্তা-বস্তুর মূল্য-বিচার করা যাইতে পারে। শরৎচন্দ্রের রচনায় এই যে মর্ম্মান্তিক আর্ত্তধ্বনি, উহাই সারা পৃথিবীর মানবকুলের আর্ত্তনাদ বটে; ঐ অভিসম্পাতও যথার্থ, কিন্তু তাহাকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে ক্ষত্রিয়ের বাহু চাই, নতুবা উহার প্রতিধ্বনি শূন্য আকাশে মিলাইয়া যাইবে। মানুষের দুঃখযন্ত্রণাকে এমন করিয়া বক্ষে ও কণ্ঠে ধারণ করিবার প্রয়োজন যতই থাকুক, এবং ধর্ম্মযুদ্ধে শক্তি ও সাহস সঞ্চার করিবার একটা বড় কাজ কবিদেরই বটে, তথাপি উহাই উৎকৃষ্ট কবি-কর্ম্ম নয়। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানুষ ও মানুষের জীবনকে একটি মহতী প্রতিষ্ঠা দান করে—ঐ দুঃখ ও দুর্গতির মধ্যেই চিরন্তন নরনারী-হৃদয়ের অসীম উৎকণ্ঠাকে একটি রসরূপে আমাদের চিত্তগোচর করে; সমাজ নয়, রাষ্ট্র নয়, কোন নীতি-নিয়মের প্রতিষ্ঠা নয়—মানুষের পাপ-তাপকেই, তাহার মোহ ও ভ্রান্তিকেই একটি অপূর্ব্ব মহিমা দান করিয়া, তাহার সর্ব্বগ্লানি ও ও সর্ব্বপরাজয়কে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া—নর-পূজার অর্ঘ্যরচনা করে। কিন্তু যেহেতু কবিও মানুষ, তাই তাঁহার সেই ব্রত প্রায় ভঙ্গ হয়; সেই অমৃতপাত্র ভরিয়া তুলিতে তাঁহার হাত কেবলই কাঁপিতে থাকে,—বিশেষ করিয়া যখন সংসারে একটা বড় দুঃসময় আসে। তখন কবিও নিজের শক্তি ও নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া গান গাহিতে কুণ্ঠা বোধ করেন, যদিও তাঁহার সেই ধর্ম্ম তিনি ত্যাগ করিতেও পারেন না, যথা—

"If you will read aright and pardon me
Who strive to build a shadowy isle of bliss
Midmost the beating of the steely sea,
Where tossed about all hearts of men must be;
Whose ravening monsters mighty men shall slay,
Not the poor singer of an empty day."

WILLIAM MORRIS.: *An Apology*,

[ধূলার উপরে আলিপনা আঁকি, মন্দেরে বলি ভালো,—
ধরিও না দোষ, ভুল বুঝিও না, ক্ষমিও আমারে, ভাই!
চৌদিকে ঢেউ গরজে ভীষণ—নিকষের চেয়ে কালো—
তারি মাঝখানে প্রবালের দ্বীপ শ্যামলে ভরিতে চাই।

জানি, কারো প্রাণে একতিল সুখ-সান্ত্বনা হেথা নাই ;—
দানব দলিতে চাই বাহুবল—নব বীর-অবতার,
সে তো নয় এই ভাঙা-আসরের দীন-হীন বীণ্‌কার !]

কিন্তু শরৎচন্দ্রকে তাহাও করিতে হয় নাই ; তাঁহার ব্যক্তি-হৃদয়ের আক্ষেপ-বিক্ষেপ যেমনই হোক,—এই উপন্যাসে তিনি সমাজের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যতই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া থাকুন না কেন, তৎসত্ত্বেও, নর-নারীর—বিশেষ করিয়া নারী-হৃদয়ের যে অসীম ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই দুঃখকে সহ্য করিবেন না বলিয়াই যেন—প্রেমকে অস্বীকার করার ছলে, তাহার যে অনির্ব্বচনীয় মাধুরী উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার কবিধর্ম্ম ও কবিকর্ম্ম সার্থক হইয়াছে। তাই শ্রীকান্ত-উপন্যাস এমন রোমান্স হইয়া উঠিয়াছে ; সেই রোমান্স যে মিথ্যা নহে—শরৎচন্দ্রের এই কবি-কীর্ত্তি তাহারই সাক্ষ্য দিতেছে। জীবনে রোমান্স আছে, খুব বেশিই আছে, তার কারণ—ঐ নারী-চরিত্র, উহাদের ঐ স্বভাবই সংসারকে নিত্য-রোমান্সে ভরিয়া রাখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ কবির ঊর্দ্ধতম কল্পনাও এই রোমান্সের কূল পায় না ; ঐ নারী-স্বভাবের বিকাশ ও বিকার জগৎটাকে—অর্থাৎ পুরুষের জীবন-ক্ষেত্রকে—হয় অগ্নি-ক্ষেত্র, নয় পুণ্যক্ষেত্র করিয়া তোলে।

সম্পূর্ণ